শিরোনাম: সরকারী নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৮৬০-২০০০ খ্রি.)

[ডক্টর অব ফিলোসফি (**Ph.D**) ডিগ্রি অর্জনের জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

আনন্দ বিকাশ চাকমা

(পিএইচ.ডি গবেষক)

সহকারী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আগস্ট ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

[*সরকারী নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৮৬০-২০০০ খ্রি.)* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ডক্টর অব ফিলোসফি (**Ph.D**) ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।]

আনন্দ বিকাশ চাকমা

(ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলো)

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রেজি. নংঃ ৪৬/২০১৪-২০১৫

যোগদান তারিখঃ ১০ নভেম্বর ২০১৪

জমাদান তারিখঃ আগস্ট ২০১৮

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. আশফাক হোসেন

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

ট্রেজারার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব আনন্দ বিকাশ চাকমা ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের একজন নিবন্ধিত পিএইচডি গবেষক। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৪৬/২০১৪-২০১৫ এবং তিনি বিগত ১০/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখ থেকে আমার তত্ত্বাবধানে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে "ডক্টর অব ফিলোসফি **(Ph.D)**" ডিগ্রির জন্য তাঁর "সরকারী নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৮৬০-২০০০ খ্রি.)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। আমার জানামতে, ইতিপূর্বে উক্ত শিরোনামে কোনো গবেষণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি তাঁর একক ও মৌলিক গবেষণার ফল। আমি তাঁর অভিসন্দর্ভটির চুড়ান্ত পাণ্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় পড়েছি এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি। অভিসন্দর্ভটি পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পর্ষদে উপস্থাপন করার সম্মতি প্রদান করছি।

(অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, “সরকারী নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৮৬০-২০০০ খ্রি.) শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক রচনা। তথ্যসূত্রে সন্নিবেশিত তথ্য, উদ্ধৃতাংশ ও উপাত্ত ছাড়া এই অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো গ্রন্থের অনুকরণে রচিত হয়নি। অভিসন্দর্ভটি পূর্বে প্রকাশিত হয়নি বা ডিগ্রি অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভে মোট ৪০৬ পৃষ্ঠা আছে।

[আনন্দ বিকাশ চাকমা]
(ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলো)
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম- ৪৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

জন্ম, শৈশব, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের কঠিন দিনগুলোতে পাশে দাঁড়ানো

চারজন নারী

মাতা রঙিলা চাকমা,

বড়বোন সতীরানি চাকমা,

ধর্মতঃ বোন গৈরিকা চাকমা

ও

আমার সহধর্মিনী সুলেখা চাকমার উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

এ অভিসন্দর্ভে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সরকারি নীতির পটভূমি, স্বরূপ ও প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছে। গবেষণাধীন বিষয়ের ওপর প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে এ অধ্যয়ন যুক্তি উপস্থাপন করছে যে, ব্রিটিশ-ভারতের সরকারি নীতি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ-ভারতের মূলধারার রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে বহির্ভূত রেখে পৃথকভাবে শাসন করে সাম্রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষা করা। এ রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য এলাকার উপযোগী করে পৃথক রেগুলেশন প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলেও একটি ব্রিটিশ অনুগত গোষ্ঠী গড়ে তোলার কৌশল হিসেবে স্থানীয় রাজাদের দিয়েছে বিবিধ প্রণোদনা। কিন্তু এর বিনিময়ে পার্বত্য অঞ্চল রয়ে যায় উপমহাদেশে চলমান রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আবহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় এবং অনাগত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। অন্যদিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের নীতি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে দেশের মূলধারার রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একীভূত করা। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রের প্রবেশের পথে সকল ঔপনিবেশিক আইনি প্রতিবন্ধকতা দূর করে নতুন আইনকানুন প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উন্মুক্ত সাধারণ অঞ্চলে পরিণত করা হয়। এই অকস্মাৎ রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এমনকি সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। ফলে সরকারি নীতি ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনার মধ্যে বড় রকমের দূরত্ব ও বৈপরিত্য সৃষ্টি হয়। এই দুয়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে একদিকে যেমন সংকট ও সংঘাত তৈরি হয়েছে অন্যদিকে একই সমান্তরালে চলেছে সমন্বয় ও সমঝোতার বহুমুখীন প্রয়াস। এভাবে শতবছরের কালসীমায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের যে ছবি প্রতিফলিত হয়েছে তা সাম্প্রতিক ইতিহাস তত্ত্ব এবং গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে বর্তমান অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে “সরকারী নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৮৬০-২০০০ খ্রি.)” শিরোনামে আমার এই গবেষণা কর্ম এবং অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমি অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও আনুকুল্য পেয়েছি। স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. আশফাক হোসেন মহোদয়ের নাম। নয়াদিল্লিতে থাকাকালে আমার কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর দূরদর্শী, বাস্তবধর্মী পরামর্শ দিয়ে আমাকে তাঁর ফেলো হিসেবে বাংলাদেশে এসে গবেষণা করার বিরল সুযোগ প্রদান করেন। স্থানীয় ও বৈশ্বিক ইতিহাসের ওপর সাম্প্রতিক তত্ত্ব ও ইতিহাসচর্চার ধারা সম্পর্কে পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই মহান শিক্ষকের আনুকুল্য লাভ ছিল আমার গবেষণা জীবনের একটি টার্নিং পয়েন্ট। স্যার যুক্তরাজ্যের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। সিলেট জেলায় ১০০ বছরের ঔপনিবেশিক বিশ্বায়নে যে রূপান্তর ঘটেছে তার ওপর কাজ করেছেন– দীর্ঘ পরিসরে গবেষণা কলাকৌশল কী তা দেখিয়েছেন। এ ধরনের পরিশ্রমী গবেষণা আমাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে এবং তার একটি তাত্ত্বিক প্রভাব আমার গবেষণায় পড়েছে। অধিকন্তু বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার হিসেবে নিজের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ গবেষণা নির্দেশনা আমাকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকতে নিরন্তর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। গবেষণা কাজের প্রত্যেকটি ধাপে তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও দিক নির্দেশনা আমার পাথেয় হয়ে থাকবে।

২০১৪ সালের নভেম্বরে পিএইচ.ডি গবেষক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর আমি যখন আমার কর্মস্থল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকায় আসা-যাওয়া এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও গবেষণাধীন এলাকায় গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহের ব্যয়ভার বহন নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম তখন স্যার নিজেই আমাকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পিএইচ.ডি ফেলোশিপের জন্য আবেদনের পরামর্শ প্রদান করেন। যথারীতি আমি *ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলোশিপ* লাভ করি। এতে আমার প্রতিমাসে ঢাকায় যাতায়াত এবং গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করা সহজ হয়। এই আর্থিক প্রণোদনা

ছিল আমার জন্য একটি বড় প্রাপ্তি। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষকে জানাই অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে মঞ্জুরী কমিশনের রিসার্চ সাপোর্ট ও প্রকাশনা বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মামুন পাটওয়ারী ভাইয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণাধীন বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির সান্নিধ্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি। এঁদের মধ্যে রাঙামাটির বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিক অ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার উদার, হৃদ্যতাপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ী সহযোগিতার কথা আমার চিরদিন স্মরণে থাকবে। তাঁর কাছে যখন গিয়েছি, যখন যা চেয়েছি অত্যন্ত অকৃপণ ও অকাতরে উজার করে দিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলির তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। তাঁর স্মৃতি ও সংগ্রহে থাকা অজানা তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য উপাদান আমার হাতে তুলে দিয়ে তিনি আমার গবেষণা কাজে মৌলিক অবদান রাখতে গভীরভাবে সহায়তা করেছেন।

এছাড়া পারিবারিক ও পেশাগত জীবনে ভীষণ ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ প্রদান করার জন্য রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির অনেক ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমা (প্রাক্তন মন্ত্রী), শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়, শ্রী গৌতম দেওয়ান (প্রাক্তন রাঙামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান), শ্রী বিজয় কেতন চাকমা, শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা, ডা. এ কে দেওয়ান (প্রাক্তন রাঙামাটি পৌরসভা চেয়ারম্যান), প্রফেসর ড. সুধীন কুমার চাকমা, শ্রী অনন্ত বিহারী খীসা, স্বর্গীয় নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, শ্রী মংক্য শোয়ে নু নেভী, শ্রী দেবদত্ত খীসা (অবসর প্রাপ্ত যুগ্ম সচিব), শ্রী অনিরুদ্ধ চাকমা, শ্রী লক্ষী কুমার চাকমা, শ্রী উষাতন তালুকদার এমপি, শ্রী অরুনেন্দু ত্রিপুরা প্রমুখের অনানুষ্ঠানিক ও থিমেটিক সাক্ষাৎকার আমাকে গবেষণাধীন বিষয়ের গভীরে যেতে আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ও পিএইচ.ডি নীতিমালার আলোকে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সমুখে সেমিনার বক্তব্য প্রদান গবেষকের জন্য একটি মূল্যবান শিক্ষণীয় অনুষঙ্গ। ইতিহাস বিভাগের পরম শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন ও বর্তমান শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল মহোদয় যথাসময়ে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সমুখে আমাকে পিএইচ.ডি প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিনার বক্তব্য প্রদানের সদয় সম্মতি ও সুযোগ প্রদান করেছেন।

উনাদের প্রতি সকৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ, প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একইভাবে সেমিনার আয়োজনে বিশেষ সহযোগিতা দিয়েছেন অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম মহোদয়। তাঁর প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা রইল। এছাড়া কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. মোফাখ্খারুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল, অধ্যাপক ড. আশা ইসলাম নাইম, জনাব গোলাম সাকলায়েন সাকী মহাশয়সহ সেমিনারে উপস্থিত ও অনুপস্থিত বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সকল সদস্য-সদস্যাকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সেমিনারে উত্থাপিত তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও গঠনমূলক পরামর্শ আমার গবেষণা কাজের মান বৃদ্ধিতে অনেক সহায়ক হয়েছে। পাশাপাশি দুটি সেমিনার সফলভাবে আয়োজন ও সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ইতিহাস বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা ধন্যবাদের সাথে স্মরণ করছি।

গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত হেরিটেজ আর্কাইভস, কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি, দিল্লির তিনমূর্তি তথা জহওরলাল নেহরু স্মৃতি গ্রন্থাগার, আইসিএইচআর লাইব্রেরি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার, কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং তথা সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি, চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশন লাইব্রেরি, চট্টগ্রামের কালেক্টরেট লাইব্রেরি, রাঙামাটি ও বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট লাইব্রেরিসহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠা সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী যাদের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। একই সাথে সবার নাম, পদবি উল্লেখ করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

অধ্যয়ন ছুটি ছাড়া গবেষণা কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা দুরূহ ব্যাপার। আমার গবেষণা কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার লক্ষে আমাকে আড়াই বছরের শিক্ষাছুটি মঞ্জুরের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি আমার বিভাগের বরিষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর (অব.) ড. মাহমুদুল হক মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরামর্শের কথা স্মরণ করছি। পাশাপাশি বিভাগের সকল শিক্ষক ও সহকর্মীকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. নিজাম আহমেদ স্যার তাঁর সংগ্রহে থাকা ১৯৭০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ আমাকে দিয়ে যে সহযোগিতা করেছেন তা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। এছাড়া থিসিস কম্পোজের জটিল কাজগুলোতে শুরু থেকে কষ্ট সহ্য করেছে বিভাগের কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-কাম-উচ্চমান সহকারী তারেকুল ইসলাম।

যাঁর হাত ধরে আমার গবেষণা কাজের হাতে খড়ি সেই মহান শিক্ষাগুরু, প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন স্যারের শ্রী পাদপদে জানাই অসংখ্য প্রণাম এবং তাঁর সহধর্মিনী আসমা সিরাজুদ্দীন মহাশয়াকেও জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। শুরু থেকে গবেষণা কাজ দ্রুত শেষ করার প্রতি উনাদের নিত্য তাগাদা আমার কাজের গতি সঞ্চারে অন্যতম নিয়ামক শক্তি ছিল।

পরিশেষে গবেষণা কাজ চালাতে গিয়ে পরিবারের অনেক দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে যার ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দিয়েছি সে হলো আমার সহধর্মিনী সুলেখা চাকমা। সে হাসিমুখে সংসারের সমস্ত কাজ একা হাতে সামলে নিয়েছে সুতরাং আমার সকল কৃতিত্বের সেও বড় অংশীদার। বড় মেয়ে আরং পিইসি পরীক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও তাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারিনি বলে অনুতাপ রয়ে গেল। এছাড়া স্কুলে যাতায়াতে সময় দিতে পারবো না বলে ছোট ছেলে মার্গ চাকমার বিদ্যালয় যাত্রাও একবছর পিছিয়ে যায়।

সবশেষে দীর্ঘ চার বছরের কাজ আজ সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার পথে যাঁদের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করেছি তাঁদের প্রত্যেকের সুস্বাথ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার কৃতজ্ঞতার বয়ান সমাপ্ত করছি।

আনন্দ বিকাশ চাকমা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

গবেষণার সারসংক্ষেপ i

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ii

সূচিপত্র vi

সারণি তালিকা ix

ভূমিকা x

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত উৎসসমূহের পর্যালোচনা xvi

কেন এই গবেষণা? xxv

গবেষণা পদ্ধতি xxvi

প্রথম অধ্যায় : তত্ত্বীয় আলোচনা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিচিতি ১ – ৩৫

১.১ গবেষণার তত্ত্ব কাঠামো

১.২ পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের বহির্ভূতকরণ নীতির পরিচিতি

১.৩ ‘পলিসি অব ইনক্লুজন’ বা রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তকরণ নীতির ধারণা

১.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি নীতির প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি

১.৫ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নীতির পটভূমি ও পরিচিতি

১.৬ পার্বত্য অঞ্চলে রাষ্ট্রের প্রবেশ: *কার্পাস মহল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উদ্ভব*

দ্বিতীয় অধ্যায়: ব্রিটিশ নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ৩৬ – ৯১

২.১ ব্রিটিশদের রাজনৈতিক বহির্ভূতকরণ নীতির প্রাথমিক পর্ব: *তফসিলি জেলা ঘোষণা*

২.২ ব্রিটিশদের পাহাড়ি ও বাঙালি বিভেদ নীতির প্রয়োগ

২.৩ ১৯০০ সালের রেগুলেশন ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ডি সি

২.৪ ব্রিটিশভক্ত সুবিধাভোগী সামন্ত শ্রেণি গঠন ও জনপ্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতি

২.৫ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ‘ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাক্টস’ ঘোষণা

২.৬ সাইমন কমিশন, গোল টেবিল বৈঠক ও অনগ্রসর অঞ্চল: প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম

২.৭ ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ‘সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত এলাকা’ ঘোষণা

২.৮ ‘সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত এলাকা’ ঘোষণার যুক্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য ছিল?

২.৯ দেশ বিভাগের আয়োজন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতাদের রাজনৈতিক উদ্যোগ

২.১০ সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে সংযুক্তি

তৃতীয় অধ্যায় :পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের নমনীয় ভূমি ও রাজস্ব নীতি ৯২ – ১৫৩

৩.১ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার

৩.২ 'উপজাতীয়' রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সার্কেল ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন

৩.৩ মৌজাভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা ও হেডম্যান পদ প্রবর্তন

৩.৪ জুমকর : ঔপনিবেশিক তোষণ নীতির হাতিয়ার

৩.৫ হালচাষ ও ভূমি রাজস্ব প্রবর্তন : চিফদের কমিশন প্রাপ্তি

৩.৬ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতির প্রভাব

চতুর্থ অধ্যায়: প্যাকিস্তান সরকারের নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৫৪ – ২১৩

৪.১ পাকিস্তান সরকারের 'জাতীয় সংহতি নীতি' ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

৪.২ প্রাক-পাকিস্তানি যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের বিচ্ছিন্নতাবোধ

৪.৩ পাকিস্তানের অভ্যুদয়, সীমানা সমস্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তি

৪.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

৪.৫ পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তি

৪.৬ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের গণতন্ত্রের অভিষেক

৪.৭ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

৪.৮ গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির রাজনৈতিক তাৎপর্য

৪.৯ ১৯৭০ এর নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি

৪.১০ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

পঞ্চম অধ্যায় : পাকিস্তান সরকারের উন্নয়ন নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ২১৪ – ২৪২

৫.১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতির প্রেক্ষাপট

৫.২ কর্ণফুলী পেপার মিল প্রতিষ্ঠার পটভূমি

৫.৩ কর্ণফুলী পেপার মিলের প্রভাব

৫.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে কর্ণফুলী পেপার মিলের অবদান

৫.৫ কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (কাপ্তাই বাঁধ)

৫.৬ শিক্ষা উন্নয়ন নীতি

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম **২৪৩ – ৩২২**

৬.১ পটভূমি

৬.২ রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি:

ক) ১৯৭৩ সালের নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম

খ) ১৯৭৯-১৯৯৬ সালের নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিবর্তন

৬.৩ প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে অন্তর্ভুক্তি

ক) বঙ্গবন্ধু সরকারের বাকশাল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তি

খ) এরশাদ সরকারের স্থানীয় সরকার গঠন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে পাহাড়িদের অন্তর্ভুক্তি

গ) ১৯৯৭ এর শান্তিচুক্তি, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি

সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ ৩২৩ – ৩৩১

পরিশিষ্ট ৩৩২– ৩৭৬

অ্যালবাম ৩৭৭ – ৩৮২

শব্দকোষ ৩৮৩

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিদের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৩৮৪ – ৩৮৭

গ্রন্থপঞ্জি ৩৮৮– ৪০৬

সারণি তালিকা

	পৃষ্ঠা
১.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিভিত্তিক জনসংখ্যার তুলনামূলক বৃদ্ধির পরিসংখ্যান, ১৯০১-২০০১ খ্রি.	৩৪
৩.১ পার্বত্য জেলা থেকে ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের পরিসংখ্যান, ১৮৬২-১৯২৭ খ্রি.	৯৭
৩.২ ১৮৮১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে বিভিন্ন রাজস্ব সার্কেলে বিভক্তির পরিকল্পনা	১০৪-১০৫
৩.৩ সার্কেল ভিত্তিক মৌজার তালিকা	১১৫
৩.৪ ১৮৯৫ সালে চাকমা সার্কেলের সাথে সরকারের জুমকর বন্দোবস্ত বিবরণী	১১৯
৩.৫ ১৮৮১ সালে সার্কেল ভিত্তিক সরকারে জুমকর খাতে রাজস্বপ্রাপ্তির পরিসংখ্যান	১২৫
৩.৬ ১৯১৫ সালে জুমকর থেকে সরকার ও তিন সার্কেলের চিফের আয়ের তুলনামূলক চিত্র	১২৬
৪.১ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত ও প্রতিনিধিত্বকারী প্রার্থী তালিকা	১৭৮
৪.২ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার নির্বাচনী এলাকা, ভোটারদের অংশগ্রহণ, প্রার্থী সংখ্যা	১৮০
৪.৩ সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে মাধ্যম প্রসঙ্গে আনুষ্ঠানিক নেতাদের মতামত জরিপ	১৯২
৪.৪ স্থানীয় নেতাদের সাথে জনগণের যোগাযোগ প্রশ্নে অনানুষ্ঠানিক নেতাদের মতামত জরিপ	১৯২
৪.৫ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের তালিকা	২১০
৬.১ ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৯৯ ও ৩০০ আসনে ভোটের হিসাব	২৮০

মানচিত্র তালিকা

১.১ আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক সীমানায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান	২০
২.১ ১৯৪৭ সালে বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশন অংকিত মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান	৮৯
৩.১ ১৯২৭ সালে মৌজা জরিপ ফলাফল মানচিত্রে প্রদর্শন	১৪২
৩.২ ব্রিটিশ আমলে হালচাষ বৃদ্ধি, বাজার ও থানার চিত্র	১৫৩
৪.১ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্দেশক ম্যাপ	১৬৭
৫.১ ১৯৫৭ সালের কর্ণফুলী প্রজেক্টের মানচিত্র	২৩৭

লেখচিত্র তালিকা

৬.১ ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসনভিত্তিক ভোটের চিত্র	২৯৪
৬.২ ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচনে দলভিত্তিক ভোটের চিত্র	২৯৫
৬.৩ ১৯৭৩, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জাতীয় দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভোট প্রাপ্তির চিত্র	২৯৫

ভূমিকা

ব্রিটিশ সরকার ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলকে 'হিল ট্র্যাক্টস অব চিটাগং' বা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নাম দিয়ে সরাসরি শাসনাধীনে নিয়ে নেয়। গহিন অরণ্য আচ্ছাদিত ঐ সীমান্ত অঞ্চলে আন্ত:উপজাতি দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন ও শান্তিপ্রিয় পাহাড়ি লোকদের (হিল পিপল) নিরাপত্তা বিধানকে তারা নতুন জেলা সৃষ্টির যুক্তি হিসেবে দেখালেও অঞ্চলটির ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং সেখানকার অনাহরিত বিপুল বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিকটিও উপনিবেশিক শাসকদের সক্রিয় বিবেচনায় ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলায় উদ্ভুত জাতীয়তাবাদী ধারণা তথা উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসনে নিয়োজিত কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার জন্ম দেয়। কারণ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালিই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা। ফলে ব্রিটিশ সরকার উক্ত আন্দোলনের প্রভাব থেকে নবগঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে মুক্ত রাখার কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলার আইনসভার এখতিয়ার বহির্ভূত ঘোষণা করে। শুধু তাই নয় পার্বত্য জেলার প্রশাসন পরিচালনার জন্য ১৯০০ সালে *চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন, ১৯০০* নামে বিশেষ শাসন বিধি জারি করে। এ রেগুলেশনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার সমতল জেলা থেকে পার্বত্য জেলায় বাঙালিদের প্রবেশ, বসতি স্থাপন, চলাচল ও জমিজমা ক্রয়ের ওপর কঠোর সরকারি বিধি নিষেধ আরোপ করে। আলোচ্য গবেষণায় বিশ শতকের শুরুতে পার্বত্য জেলায় ব্রিটিশদের এ নীতিকে রাষ্ট্রের 'পলিসি অব এক্সক্লুজন' বা 'বহির্ভূতকরণ শাসন নীতি'–র সূচনা পর্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অত:পর ভারতীয় জাতীয়তাবাধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, স্বদেশীর সফলতা, লক্ষ্ণৌ চুক্তির মতো অসামান্য চুক্তির[১] মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ঐক্য ব্রিটিশদেরকে বাধ্য করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করতে। ব্রিটিশ সরকার মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন পাস করে ঠিকই কিন্তু বাংলার সম্প্রসারণশীল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন রাখতে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে উপজাতি অধ্যুষিত জেলাটিকে 'ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাক্টস' ঘোষণা করে। এ গবেষণায় এ ঘটনাকে বহির্ভূতকরণের বিকাশ পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে মুখপাত্র সামন্ত প্রভুরা যাতে ব্রিটিশ

[১] যশোবন্ত সিংহ, *জিন্না: ভারত, দেশভাগ স্বাধীনতা* (কলকাতা: আনন্দ সংস্করণ, ২০০৯), পৃ. ৮৫।

বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয় বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরর ঢেউ পার্বত্য চট্টগ্রামে আছড়ে না পড়ে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার সরকারি উদ্‌যোগে হালকৃষি প্রবর্তন, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা, জুমকর থেকে চিফদের সর্বোচ্চ কমিশন প্রদান, রাজা, রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান, প্লাউরেন্ট কমিশন প্রদানসহ নৃপতিবর্গকে বিবিধ আর্থিক সুবিধা প্রদান করে। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল স্থানীয় এলিট বা শিরোমণি গোষ্ঠী কেন্দ্রিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ শিরোমণি গোষ্ঠী (এলিট শ্রেণি) ছিল ব্রিটিশদের স্বীকৃত তিনজন পাহাড়ি রাজা ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক পরিভাষায় যারা সার্কেল চিফ পদবাচ্যে বিভূষিত। এর পরের ধাপে ছিল দেওয়ান, রোয়াজা উপাধিধারী নৃপতিবর্গের সহযোগী গোষ্ঠী যাদেরকে মৌজা গঠন করে হেডম্যান পদ দিয়ে তুষ্ট করে রাখে।

অন্যদিকে ১৯০০ সালের বিধি বলে জেলায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল নিষিদ্ধ। সমকালীন বাংলা ও ভারতের জনগণ যখন উপনিবেশের করাল গ্রাস থেকে মুক্তির অন্বেষায় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ, স্বাধীনতা এভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত নেতৃত্ব নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য উপনিবেশিক শাসকদের কাছে সঁপে দেয়। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন প্রাদেশিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রবর্তনের পদক্ষেপ নিচ্ছে তখন পার্বত্য রাজারা প্রাদেশিক সংস্কার প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকার জন্যই উঠে পড়ে লাগে। হামজা আলাভি যথার্থই বলেছেন, 'In the rural areas of India, the old pattern of Indian feudalism was replaced by a new system, with a class of landed magnates who were made subordinate to the colonial regime and became also its principal allies in India.'[২] পাহাড়িদের এরূপ রাজনৈতিক আচরণকে রাষ্ট্রের 'পলিসি অব এক্সক্লুজন' এর প্রত্যক্ষ ফল বলে এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। পাহাড়ি সমাজের এসব বিপরীতমুখী রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের হেতু, প্রকৃতি ও প্রভাব নিয়ে কোনো নিবিড় গবেষণামূলক কাজ একাডেমিক পর্যায়ে হয়নি। কাজেই বর্তমান গবেষণা কর্ম উক্ত বিষয়গুলির অনুসন্ধান, উদ্‌ঘাটন ও উপস্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্ত-বতাকে সম্যকভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি নিবিড় প্রয়াস বলে বিবেচিত হতে পারে।

---

[২] Hamza Alavi, 'India: Transition from Feudalism to Colonial Capitalism' Journal of Comtemporary Asia, 10:4(1980), p. 398. Cited by Ashfaque Hossain, *Historical Globalizaton and Its Effects: A Study of Sylhet and Its People, 1874-197,* PhD. Diss. (University of Nottingham, UK. 2009), p. xi.

অন্যদিকে উত্তর-উপনিবেশকালে অর্থাৎ দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনে ব্রিটিশ প্রবর্তিত বহির্ভূতকরণ নীতি বহাল রাখার চেয়ে জেলাটিকে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক বলয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাকে প্রাধিকার দেয়। পাকিস্তান সরকারের নীতির লক্ষ্যবস্তু শুধুমাত্র চিফদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তাদের মনোযোগের ক্ষেত্র ব্যক্তি থেকে অঞ্চলকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। যেমন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঐ জেলার জনসাধারণকে প্রাদেশিক আইনসভায় সর্বপ্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ করে দেয়। ইতিপূর্বে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনবলে বিচ্ছিন্ন থাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে এভাবে প্রাদেশিক আইনসভার এখতিয়ারাধীনে আনার প্রক্রিয়াকে আলোচ্য গবেষণায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'পলিসি অব ডেমোক্রেটিক ইনক্লুজন' বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিককাল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

পাকিস্তানের এমন নীতি গ্রহণের হেতু তার জন্মগত মৌলিক ও উপরি উভয় কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল।[৩] কারণ দেশের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে এক হাজার কিলোমিটারের মতো অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান ছিল। পূর্ব বাংলা ছিল পাকিস্তানের সব চাইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত– একটি প্রত্যন্ত প্রদেশ। পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব বাংলার মধ্যে সবচেয়ে পূর্বের সীমান্তবর্তী জনপদ। এই জনপদের অধিবাসীদের সাথে শাসকগোষ্ঠীর ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক, ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক, সমাজ কাঠামো ও রাজনৈতিক মানসিকতা কোনো দিক দিয়ে মিল ছিল না। এমতাবস্থায় দেশের সীমান্তবর্তী এই জনপদকে কিভাবে একত্রিত রাখা যা তা পাকিস্তানের জন্য বড় সমস্যা। সুতরাং ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও কাল্পনিক জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনির্মাণের জন্য জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ ও ঐতিহ্য নিরপেক্ষ একইধাঁচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই একমাত্র মন্দের ভালো অবলম্বন ছিল। ষাটের দশকে এই জাতীয় সংহতি স্থাপন প্রক্রিয়া সুদৃঢ়করণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাদেশিক পর্যায় থেকে ইউনিয়ন তথা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। সে উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রবর্তিত হয় মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা। মৌলিক গণতন্ত্রাধীনে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। পার্বত্য জনপদে গড়ে উঠে নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তাছাড়া পাকিস্তান সরকার অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে

[৩] আশফাক হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের জন্ম ও জাতিসংঘ* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, প্রথম প্রকাশ ২০০২), পৃ. ২১।

যেমনি পাহাড়ি অধ্যুষিত জমিজমার ওপর শিল্পকারখানা, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে তেমনি পাহাড়িদের কল্যাণেও প্রতিষ্ঠা করে বিপুল সংখ্যক নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গড়ে উঠে চলাচল উপযোগি যোগাযোগ ব্যবস্থা। আধুনিকায়নের এসব পদক্ষেপ পাহাড়ি সমাজের উপর নানামুখী প্রভাব ফেলে কারণ শিল্পায়ন, আধুনিকায়ন ও গণতন্ত্রায়নের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। আর গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক। শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের অভিঘাতে পাহাড়িদের জীবনদর্শনে ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। বেঁচে থাকার বিকল্প হিসেবে তারা ঝুঁকে পড়ে শিক্ষার দিকে। এতে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গড়ে ওঠে প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রকামী শিক্ষিত সচেতন শ্রেণি। এ প্রসঙ্গে কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আদিত্য দেওয়ানের পর্যবেক্ষণটি উল্লেখযোগ্য:

> Since the commissioning of the Kaptai Hydro-dam, education has become the only means through which a Chakma family could hope to survive. Many Chakma families attached to the land and to agriculture sent their children to school after the formation of the lake. Since then their numbers grew as more families found that education was the only means through which they could find employment in the government offices.[8]

সুতরাং এখানেও পাহাড়ি সমাজের ওপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন নীতির প্রভাব বেশ দৃশ্যমান। রাষ্ট্র গৃহীত এসব নীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, প্রকৃতি ও পরিণতি অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করা এ গবেষণার অন্যতম বিবেচ্য।

স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারসমূহের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন নীতির অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে পাহাড়িদের জাতীয় জীবনের মূলধারার সঙ্গে ‘একীভূতকরণ নীতি’। বাংলাদেশের এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং বাঙালি ‘জাতীয় পরিচিতির ছায়াতলে’ পাহাড়িদের একীভূতকরার সরকারি নীতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ প্রতিক্রিয়া হয় আধুনিক রাজনীতি সুলভ। সরকারের একীভূতকরণ নীতির প্রতিফল হিসেবে পাহাড়ি জনমানসে জন্ম নেয় আধুনিক গণমুখী রাজনৈতিক চৈতন্য। তারা সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক কূপমণ্ডুকতার খোলচ থেকে বেরিয়ে এসে গণ সংগঠনভিত্তিক রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করে। এ পর্বটি পার্বত্য অঞ্চলের রাজনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে একটি বড় বাকঁবদলকারী ঘটনা। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের আঞ্চলিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ ছিল সামন্ত নেতৃত্বের হাতে। ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে

---

[8] Aditya Kumar Dewan, *Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh*, PhD dis. (Montreal: McGill University, 1990), p. 340.

অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি ও সমাজের ক্ষমতা বিন্যাসে লক্ষণীয় মেরুকরণ ঘটায়। একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ও রাজনীতির মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভাব ঘটে শিক্ষিত গণমুখী রাজনৈতিক নেতৃত্বের। অন্যদিকে রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে অন্তরালে চলে যায় প্রথাগত সামন্ত নেতৃত্ব। ফলে বাংলাদেশের সরকারি নীতির লক্ষ্যবস্তুতে যুক্ত হয় নব্য পৃথক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী পাহাড়ি নেতৃত্ব।[৫]

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাহাড়িরাও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র আন্দোলনে নেমে পড়ে। ফলে দেশের একটি অঞ্চলে রাজনৈতিক সংহতি সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামরিক এবং গণতান্ত্রিক সরকারসমূহ দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করে পাহাড়িদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার নীতি গ্রহণ করে। সরকারের এ উদযোগে সাড়া দেয় সশস্ত্র আন্দোলনরত পাহাড়ি রাজনৈতিক দল জেএসএস। ফলে বাংলাদেশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নতুন যুগে প্রবেশ করে।

উপরের আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে গবেষণাধীন সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুটি বিপরীতধর্মী শাসননীতি অনুসৃত হয়েছে। তাই এ গবেষণার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হলো

১) পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত বহির্ভূতকরণ শাসননীতির, পটভূমি, কারণ, প্রকৃতি ও পরিধি পর্যালোচনা করা।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তকরণ ও বাংলাদেশ সরকারের জাতিগত একীভূতকরণ নীতির প্রেক্ষাপট, স্বরূপ এবং প্রভাব পর্যালোচনা করা।

৩) উভয় নীতির প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলো কীভাবে সাড়া দিয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

এ উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে আলোচ্য গবেষণা কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ডিসকোর্স বা জ্ঞানকাণ্ডে এ গবেষণা কর্ম নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখবে বলে আমরা মনে করি। যথা: ১) এ অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি নীতির একটি গঠনমূলক ও ইতিবাচক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। ২) সরকারি নীতি কীভাবে একটি অনগ্রসর

[৫] জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে আবার সামন্ত নেতৃত্বকে বেছে নেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত নেতৃত্বের প্রতীক চাকমা রাণী বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। অন্যদিকে বান্দরবানের সামন্ত নেতা অং শৈ প্রু চৌধুরীকে ১৯৭৯ নির্বাচনে জয়যুক্ত হলে খাদ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

অঞ্চল ও তার অধিবাসীদেরকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে তার একটি বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ এ অভিসন্দর্ভে পাওয়া যায়। ৩) পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোকে দেশের মূলধারার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে বহির্ভূত রাখার সরকারি তোষণ নীতি ও কৌশলের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এ গবেষণায় পাওয়া যায়। ৪) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে একটি গোত্র ও প্রথাভিত্তিক জাতিসত্তার সমাজকাঠামো ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্রমবিবর্তনের একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ এ গবেষণায় ফুটে উঠেছে। ৫) রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত একটি অঞ্চলে অপ্রধান জাতিগোষ্ঠীগুলোর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সরকারের নমনীয় নীতি এবং বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, ভূমি কমিশন, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স) সেই বৈচিত্র্যকে পরোক্ষ স্বীকৃতি প্রদান কীভাবে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে তার একটি চমৎকার পাঠ এ গবেষণায় পাওয়া যায়।

জ্ঞানকাণ্ডের ক্ষেত্রে এ গবেষণার উপর্যুক্ত মৌলিক অবদানগুলোকে বিস্তারিত কলেবরে মোট সাতটি অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়টি** হলো গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো এবং বাছাইকৃত মৌলিক ধারণাগুলোর পরিচিতিজ্ঞাপক। এর সাথে আধুনিক জ্ঞানজগতে সম্পূর্ণ অজানা ভূখণ্ডে (টেরা ইনকগনিটা) কীভাবে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রবেশ ঘটেছে এবং ঐ অজানা ভূখণ্ড কার্পাস মহল হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটি জেলার উদ্ভব ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ব্রিটিশ সরকারের বহির্ভূতকরণ নীতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য, স্বরূপ ও ১৯৪৭-এ বি-উপনিবেশিকরণের যুগসন্ধিক্ষণে এ বহির্ভূতকরণ নীতির অন্ত:সারশূণ্যতার চিত্র দেখানো হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** রাজনৈতিক নীতির পরিপূরক হিসেবে ব্রিটিশদের ভূমি ও রাজস্ব নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। **চতুর্থ অধ্যায়** বি-উপনিবেশিকরণের পরবর্তী রাষ্ট্র পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতির নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায়টি** পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তান সরকারের উন্নয়ন নীতির একটি নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যেখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে এ অঞ্চলের উন্নয়ন নীতিগুলোর পেছনে পাকিস্তান সরকারের মূল টার্গেট ক্ষুদ্র জাতিগুলোর উচ্ছেদ সাধন শুধু নয় (প্রচলিত সাহিত্যে যা প্রায়শ বর্ণিত হয়) বরং অন্য নিয়ামকগুলোও ক্রিয়াশীল ছিল। এখানে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে প্রথমত, আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্কের কারণে পাকিস্তানকে দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের সমকক্ষ বা ভারতকে

ছাড়িয়ে যাওয়ার তাগিদ এবং দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদী– এই দুই বিপরীত শিবিরে বিভক্ত বিশ্ব ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক শিবিরের নিয়ন্ত্রক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কোন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাটকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন। **ষষ্ঠ অধ্যায়ে** স্বাধীনতার অব্যাবহিত পর থেকে বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামের অপ্রধান জনগোষ্ঠীগুলোর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরমধ্যে বাকশাল, বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন অন্যতম। একইসাথে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া হিসেবে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখাচ্ছে কিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি ও সরকারি দল আওয়ামী লীগ থেকে পাহাড়িরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পক্ষান্তরে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ওপর পাহাড়িদের আস্থা ফিরে এসেছে। যার চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি সম্পাদনে। সুতরাং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করে। **সপ্তম অধ্যায়ে** তথা এ গবেষণার উপসংহার বা চুড়ান্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যয়ন এ উপসংহারে উপনীত হচ্ছে যে ১৮৬০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ-ভারতের নীতি ছিল কৌশলগত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহির্ভূত রাখা যেখানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সরকারসমূহের নীতি ছিল পাহাড়িদেরকে রাজনৈতিকভাবে বহির্ভূকরণ থেকে অন্তর্ভুক্তকরণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। সে প্রচেষ্টায় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার অর্থ বিচ্ছিন্ন করা, ধবংস করা নয় বরং নতুন কিছু বাস্তবতা বিনির্মাণ করা, বাস্তবতার আলোকে ঐ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন চিন্তার জাগরণ ঘটা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত উৎসাদি পর্যালোচনা

১৯৯০ এর দশক থেকে একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো জেলার ওপর যদি লিখিত বা প্রকাশিত রূপে নানা জনের নানা মতের প্রতিফলন ঘটে থাকে তাহলে যে কেউ নির্দ্বিধায় বলতে পারে সেটি পার্বত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু এর সবগুলো ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়। কারণ ঐতিহাসিক দলিলপত্র, আত্মজীবনী ও অন্যান্য উৎসকে ইতিহাস পুনর্গঠনের উপাদান হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন নিখুঁত পরীক্ষা নিরীক্ষা। ইতিহাস গবেষণায় এ প্রক্রিয়াকে বলা

হয় উৎসের সমালোচনামূলক যাচাইকরণ বা Critical Examination of Sources । উৎস যাচাইকরণের এ কাজটি দুভাবে সম্পন্ন হয়। যথাঃ বাহ্যিক ত্রুটি নির্ণয় ও অভ্যন্তরীণ যথার্থতা নিরূপণ। এসব বিষয়ের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে বর্তমান গবেষণায় সংগৃহীত উপাদানগুলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে (১৯৯০ দশকের আগে) ও পরে প্রকাশিত গবেষণামূলক পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধও প্রভৃতি উপাদান। বাছাইকৃত উৎসগুলোকে বিষয়বস্তু অনুসারে ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যথা-

১) পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস ও অধিবাসীগুলোর নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতিমূলক আকর গ্রন্থাদি

এ শ্রেণির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভেলাম ভেন সেন্দেলের সম্পাদনায় *ফ্রান্সিস বুকানন ইন সাউথ-ইস্ট বেঙ্গল (১৭৯৮)* শিরোনামে প্রকাশিত ফ্রান্সিস বুকাননের ১৭৯৮ সালের ভ্রমণ বিবরণী যেখানে প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য, ভৌগোলিক অবস্থা, জুমচাষ, পাড়াগ্রামের অবস্থা, চাকমা রাজা টব্বর খাঁ ও বোমাং রাজা কংহ্লা প্রুসহ পূর্ব ও দক্ষিণের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর পরিচিতি সম্পর্কে জানা যায়। এরপর উল্লেখ্য ক্যাপ্টেন (পরবর্তীতে লে. কর্নেল) টমাস হার্বার্ট লুইনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যাদির আলোকে লিখিত ও ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত *হিল ট্র্যাক্টস অব চিটাগং এন্ড ডুয়েলার্স দেয়ারইন।* এ গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সামগ্রিক বিবরণ এবং ট্রাইবগুলোর নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম বইটির শিরোনামে লুইনের দৃষ্টিভঙ্গির নিরপেক্ষতার ছাপ থাকলেও পরের বছর তিনি সেই নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি। অন্য কথায় ক্যাপ্টেন লুইন উনিশ শতকের মানব সভ্যতার বিবর্তনবাদী তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হন এবং সেটার সুস্পষ্ট ছাপ তাঁর পরবর্তী গ্রন্থের শিরোনামে ফুটে উঠেছে। ১৮৭০ সালে একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বইয়ের শিরোনাম দেন *ওয়াইল্ড রেচেস অব সাউট-ইস্টার্ন ইন্ডিয়া*। অর্থাৎ তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ওপর বন্যজাতির পরিচিতি আরোপ করেই বসলেন। তাঁর পরবর্তী বই ১৯১২ সালে *এ ফ্লাই অন দ্য হুইল অর হাউ আই হেল্পড্‌ গভর্ন ইন্ডিয়া* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে পার্বত্য রাজাদের সাথে ব্রিটিশদের সম্পর্ক নিয়ে মূল্যবান আলোচনা আছে।

উইলিয়াম উইলসন হান্টারের *এ স্ট্যাটেস্টিক্যাল এ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল* ষষ্ঠ ভলিউমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যান নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা আছে যদিও অনেক তথ্য ক্যাপ্টেন লুইনের গ্রন্থ থেকে পুনরুৎপাদিত। হান্টারের গ্রন্থের আপ্ত বাক্য হলো ``The history of the Chittagong Hill

Tracts is mainly the history of the various tribes inhabiting it."[৬] হান্টার ট্রাইবগুলোকে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' বা স্বাধীন এবং 'ডিপেন্ডেন্ট' বা পরাধীন– এদুভাগে বিভক্ত করেছেন। আলেকজান্ডার মেকেঞ্জির *হিস্ট্রি অব দ্য রিলেশনস অব দ্য গভর্নমেন্ট উইথ দ্য হিল ট্রাইবস অব দ্য নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অব বেঙ্গল* (১৮৮৪) গ্রন্থে সন্নিবেশিত "চিটাগং ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবস্" অধ্যায়টিতে খুমি, সেন্দু, বনযোগি, মুরং কুকিদের সেভেজ (হিংস্র), অ্যাগ্রেসিভ ট্রাইবস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটিতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে উক্ত উপজাতিগুলো এবং ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এলাকার শান্তিপ্রিয় উপজাতিগুলোর সম্পর্ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠনের সামরিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। রবার্ট হেনরি সেনেইড হাটকিনসনও তাঁর *এন এ্যাকাউন্ট অব চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস* (১৯০৬) ও *বেঙ্গল আসাম ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার: চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস* (১৯০৯) এই দুটি গ্রন্থে ক্যাপ্টেন লুইনের মতো জেলার প্রশাসনিক ইতিহাসের পাশাপাশি নৃতাত্ত্বিক জাতিগুলোর উৎপত্তির ইতিহাস, সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির খাতিরে ব্রিটিশ প্রশাসক ইতিহাসকারদের গ্রন্থসমূহে বন্যজাতি, আদিম জাতি, উপজাতি, সভ্যতাহীন, অনগ্রসর জাতি প্রভৃতি পরিচিতিজ্ঞাপন অভিধাগুলোর প্রয়োগ ছিল। তাঁদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা সভ্যতার আদিম স্তরে অবস্থানকারী। সভ্যতার সংস্পর্শ উপজাতিদের জন্য কষ্ট বয়ে আনলেও ক্যাপ্টেন লুইন বলেছেন 'তবুও এক মুহূর্তের জন্য আমি তাদের বর্তমান বন্যদশাকে সমর্থন করতে পারি না। এসব জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা সহজ সরল হলেও আধুনিক সভ্যজীবনের রীতি নীতির প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।' আধুনিক ও সভ্য করতে গিয়ে তারা পৃথক শাসনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

উপরি-উক্ত গ্রন্থসমূহ আলোচ্য গবেষণার জন্য শুধু ঐ সময়ের জন্যই প্রযোজ্য যখন সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল; স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট সেখানে অনুপস্থিত। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রশাসক-ইতিহাসবিদ জে. পি. মিল যথার্থই বলেছেন, ''Two officials at any rate, Captain Lewin and Mr. Sneyd Hutchinson, have in the past gained some knowledge of the people by long residence among them, but the books of both only leave us asking for more."[৭]

---

[৬] W W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol VI: (Chittagong Hill Tracts, Chittagong, Noakhali, Tipperah, Hill Tipperah) (New Delhi: D. K Publishing House, London, 1876, First Repnt, 1973), p. 18.

[৭] J. P. Mills, ``Note on tour in the Chittagong Hill Tracts in 1926 by J P Millls, I.C.S,'' in *Census of 1931,* Vol. VI. Part II, Appendix II, P. 515.

পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত ডেনিস ও লুসিয়েন বের্নোর "চিটাগং হিল ট্রাইবস"(১৯৫৭) ও "এথনিক গ্রুপস অব চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস *(জেএএসপি*, ১৯৬৪)" এবং লরেন্স জি লোফলারের "এ নোট অন দ্য হিস্ট্রি অব দ্য মার্মা চিফস্ অব বান্দরবান *(জেএএসপি*, ১৯৬৮)" প্রবন্ধগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণভাবে উপজাতিদের বিশেষত বান্দরবানের বোমাং রাজা এবং বোমাং সার্কেলের নৃজাতিগুলোর সমকালীন জীবনধারা নিয়ে রচিত। ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমবিকাশ নিয়ে ঐ প্রবন্ধগুলো কদাচিৎ আলোকপাত করেছে। অতপর প্রফেসর পিয়েরে বেসাইনের *দি ট্রাইবসমেন অব চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস* (১৯৫৮) গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর অভিমত চাকমা ও মারমারা উপজাতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো অতিক্রম করেছে। সেজন্য তিনি বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম রেখেছেন 'দ্য হিলমেন'। এটি নি:সন্দেহে সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একটি সুলিখিত গ্রন্থ যেখানে পাহাড়িদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বর্ণনার পাশাপাশি মানবজাতি হিসেবে পৃথিবীতে তাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের ওপর পাকিস্তান আমলের শিল্পায়ন, নগরায়ন ও বাঙালিকরণের প্রভাব সম্পর্কে খুবই দূরদর্শী মন্তব্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। যেহেতু বইটি ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত সুতরাং তার পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ধারণা এখানে পাওয়া যায় না।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রের নীতিকে নেতিবাচক ধারায় ব্যাখ্যানির্ভর গ্রন্থসমূহ

এ শ্রেণির গ্রন্থগুলো একাডেমিক ও গবেষণাধর্মী। এ গবেষণা গ্রন্থগুলো পাহাড়িদের জীবন জীবিকার ওপর রাষ্ট্রের ভূমিকাকে নেতিবাচক ধারায় ব্যাখ্যা করেছে। এ ঘরানার গ্রন্থগুলোর শিরোনাম ও উপস্থাপন পদ্ধতি লক্ষ্য করলেই তাদের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু প্রতিভাত হয়। যেমন- আদিত্য কুমার দেওয়ানের গবেষণা কর্ম *ক্লাস এন্ড এথনিসিটি ইন দ্য হিলস অব বাংলাদেশ* এর মূল প্রতিপাদ্য ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উন্নয়ন নীতি এবং সেখানে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর অর্থায়ন ও অনুদান পার্বত্য আদি বাসিন্দাগুলোর ধ্বংস ডেকে এনেছে। তিনি বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতিকে 'ধ্বংসাত্মক ও জাতিগত নির্মূলীকরণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলকে বর্ণনা করেছেন, 'দ্য পোস্ট-কলোনিয়াল ডেস্ট্রাকশন অব দ্য সিএইচটি' শিরোনামে। ফলে আদিত্য কুমার দেওয়ানের গবেষণাটিতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ বা বস্তুনিষ্ঠতার ঘাটতি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। রাষ্ট্রত্রয় পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশ কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে যা পাহাড়ি সমাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদে কল্যাণকর বলে

প্রতীয়মান হয়েছে আর কিছু পদক্ষেপ বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সদর্থক বিষয়গুলির চেয়ে নঞর্থক বিষয়গুলিই দেওয়ানের গবেষণায় প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এ ঘরানার পণ্ডিতদের মধ্যে আরও আছেন আমেনা মহসীন। তাঁর *দ্য পলিটিক্স অব ন্যাশনেলিজম : দি কেজ অব চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস বাংলাদেশ (১৯৯৭)* শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা যায়। নি:সন্দেহে এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর সম্পাদিত গবেষণা কর্মগুলোর মধ্যে আঙ্গিক বিচারে অন্যতম ভাল কাজ। তিনিও দেখিয়েছেন, উপনিবেশ উত্তর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী শাসননীতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদেরকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। স্থানীয়দের করেছে অধিকতর প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের নামে তার আধিপত্যবাদী চরিত্র পাহাড়িদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। স্বপন আদনান, ভেলাম ভ্যান সেন্দেলের গবেষণাও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের ওপর রাষ্ট্রের ভূমিকার নেতিবাচক আলোচনায় ঠাসা। প্রথম জনের বইয়ের শিরোনাম *মাইগ্রেশন, ল্যান্ড এলিয়েনেশন এন্ড এথনিক কনফ্লিক্ট* যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের দারিদ্র্যের পশ্চাতে সরকারের মাইগ্রেশন ও ভূমি নীতিকে আলোচনার মূল বিষয় হিসেবে বাছাই করে পাহাড়িদের দারিদ্র এবং পাহাড়ি-অপাহাড়িদের চলমান দ্বন্দ্বের প্রধান কারক হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে ভেলাম ভ্যান সেন্দেল "দ্য ইনভেনশন অব দ্য 'জুম্মজ': স্টেট ফরমেশন এন্ড এথনিসিটি ইন সাউথইস্টার্ন বাংলাদেশ (১৯৯২)" প্রবন্ধে রাষ্ট্রীয় নীতি ও জুম্মদের রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে আলোচনায় দেখিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রের (ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) প্রবেশ এবং বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির আধিপত্যবাদী চরিত্রই বিকল্প সাংস্কৃতিক কাঠামো অর্থাৎ জুম্ম পরিচয় ভিত্তিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে। তিনি এবং ভল্ফগ্যাং মে ও আদিত্য দেওয়ানের সম্পাদিত *দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস : লিভিং ইন এ বর্ডারল্যান্ড (২০০১)* গ্রন্থে দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসচর্চায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের উপেক্ষিত থাকা এবং জাতীয় স্বার্থের জন্য তাদের স্থানীয় স্বার্থের ক্রমাবনতির সচিত্র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উপস্থাপন করে। এছাড়া ১৯৮০ সালে ভল্ফগ্যাং মে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর একটি বেশ ভাল গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেন যেটির বাংলা ভাষান্তরিত রূপ *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম সমাজ* শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মুঘল আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ তুলে এনেছেন। কিন্তু আলোচ্য গবেষণা ক্ষেত্রটির ওপর তাঁর আলোচনা অতিশয় সামান্য। একইভাবে তাঁর সম্পাদিত

জেনোসাইড ইন চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস, বাংলাদেশ (১৯৮৪) রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক ঘটনাবলি দিয়ে সাজানো গ্রন্থ। সুতরাং এ ঘরানার গ্রন্থগুলো প্রস্তাবিত গবেষণা বিষয়ে কোনো আলোকপাত করে না।

৩) সরকারসমূহের নীতিকে সমর্থন করে লিখিত গ্রন্থাবলি

তৃতীয় ঘরানার লেখকরা সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতির যৌক্তিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। যেমন মিজানুর রহমান শেলী সম্পাদিত *দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস অব বাংলাদেশ: দ্য আনটোল্ড স্টোরি* (১৯৯২) এ শ্রেণির প্রথম গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে ঐতিহাসিক ও আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দাবি করা হয়েছে এ সমস্যা বাংলাদেশের সৃষ্ট নয়, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্ত্বাগুলোর স্বতন্ত্র পরিচিতির রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি ও ব্রিটিশ-ভারত এমনকি পাকিস্তানি শাসনতন্ত্রে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকা বিশেষ শাসন ফিরিয়ে আনার দাবিতে পাহাড়িদের সশস্ত্র সংগ্রামকে খুব সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটির বস্তুনিষ্ঠতাকে ম্লান করা হয়েছে। গ্রন্থটির উপসংহারে বলা হয়: "As the untold story related in this work clearly shows the hitherto intractable factor in this process has been the violence and terrorism senselessly practised by a handful of foreign-linked, misguided armed men belonging to a single tribe in the Chittagong Hill Tracts." এটা সাধাসিধে কথা যে সহিংসতা যুদ্ধমান পক্ষগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে, একপক্ষের দ্বারা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য জাতিসত্তার তুলনায় একটি জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বেশ অগ্রসর অথচ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সুতরাং আন্দোলন সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণ প্রাধান্য না থাকাটাই অস্বাভাবিক। সেজন্য বোধ হয় সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অকপটে বলেছেন, ''As the most educated and, therefore, most politically conscious tribe, their leadership role in such politico-military mobilization was inevitable."[৮] শেলীর গ্রন্থে বাংলাদেশ সরকারের নীতিকে বর্ণনা করা হয়েছে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে; যে নীতি একটি একক উপজাতির কিছু সংখ্যক লোকের সহিংসতা ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও নড়চড় হয় না। তাঁর বক্তব্য: "The ethos of the Bangladeshi mechanism for solving this none-too-unique problem in the present day world has been the democratic and participatory politics and peaceful dialogue. ... Despite all this the

---

[৮] Syed Anwar Husain, *War and Peace in Chittagong Hill Tracts: Retrospect and Prospect* (Dhaka: Agamee Prakashani, 1999), p. 22.

Government and the people of Bangladesh have never waved from the peacful path of democracy."[৯]

সর্বোপরি গ্রন্থটির মূল আলোচনা বাংলাদেশ সরকারের নীতি নিয়ে। তাই আলোচ্য গবেষণাধীন সময়ের দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৮৬০-১৯৭১ পর্যন্ত সময়ের ব্রিটিশ-ভারত ও পাকিস্তান সরকারের নীতিগুলো নিয়ে নিবিড় পর্যালোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ ধাঁচের গ্রন্থের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হলো মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের লিখিত *পার্বত্য চট্টগ্রাম: শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন*, সাংবাদিক-লেখক সৈয়দ মুর্তজা আলীর *দ্য হিচ ইন দ্য হিলস্*, খালেদ বেলাল সম্পাদিত *দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস: ফ্যালকর্ণি অব দ্য হিলস্* গ্রন্থাদি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কিছু স্মৃতি ও কিছু সংবাদপত্র থেকে তথ্য যোগাড় করে লেখা এসব গ্রন্থে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও তার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

৪) পার্বত্য অঞ্চলে ইন্সার্জেন্সি, শান্তি প্রক্রিয়া ও শান্তিচুক্তির পূর্বাপর নিয়ে লিখিত গ্রন্থাদি

এ শ্রেণির গ্রন্থগুলো ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত। সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের *War and Peace in Chittagong Hill Tracts: Retrospect and Prospect* শীর্ষক গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইন্সার্জেন্সি, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া ও শান্তিচুক্তির অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক তাৎপর্য নিয়ে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে কেন্দ্র ও প্রান্ত বা অঞ্চলের চ্যালেঞ্জিং সম্পর্ক হিসেবে ধরে তার উপজাত (বাই-প্রোডাক্ট) হিসেবে সৃষ্ট অন্যান্য প্রপঞ্চগুলোর সংক্ষিপ্ত, তবে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। নূহ-উল-আলম লেনিনের সম্পাদিত *জুম পাহাড়ে শান্তির ঝর্ণাধারা: ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি (১৯৯৮)*, সেলিনা হোসেন রচিত *পার্বত্যভূমির পথেপ্রান্তরে (১৯৯৯)* উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থে সামরিক বাহিনীর উদ্‌যোগে শান্তিচুক্তির পূর্বে ১৯৯৭ সালের (৯-১১ জুন) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকার এবং জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য, মূল্যায়নের সমাহারে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে হুমায়ুন আজাদের *পার্বত্য চট্টগ্রাম: সবুজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝর্ণাধারা (১৯৯৭)* গ্রন্থটি

[৯] Mizanur Rahman Shelly, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untold Story* (Dhaka: Centre For Development Research, 1992), p. 170.

ব্যতিক্রম। তাঁর মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তির জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের অধীনে প্রণীত সামন্ত শাসনই দায়ী।[১০] তিনি স্বায়ত্তশাসন, বা উপজাতীয় সংসদ নয় বরং পার্বত্য এলাকা সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার উন্নতি ও আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি অশান্তি দূর করার মহৌষধ বলে লিখেছেন। অন্যদিকে আহমদ ছফার *শান্তি চুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ* গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সংকটি ঘনীভূত আকার ধারণ করে একটি প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে সকলের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার শুরু উনিশ শ' একাত্তর সালে।'[১১] তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাধান সূত্র হিসেবে তিনি বলছেন, 'বাংলাদেশে যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু রহিয়াছে পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে তাহার প্রকৃত অংশীদার করিয়া তুলিতে হইবে।'[১২] দুজনেই লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী। তাদের বর্ণনা তাই মননধর্মী, গবেষণাধর্মী নয়। দুজনের বক্তব্যের মধ্যে বেশ সাদৃশ্যও আছে। যেমন হুমায়ুন আজাদের মতে, 'চুক্তিবদ্ধ শান্তি বেশ সন্দেহজনক ব্যাপার, চুক্তির মধ্যেই থাকে চুক্তিভঙ্গের বীজ।' কিন্তু তাই বলে দেশের একটি অংশে অশান্তি জিইয়ে রাখা অরাজনৈতিক কাজ, অনৈতিহাসিক কাজ হতো। দেশের ঐক্য, সমৃদ্ধির জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতেই হয়।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় লেখকদের নিপীড়ন ও সংগ্রামের বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থাদি:

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজেদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলি স্থানীয়দের আবেগ, চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে– এটা স্বাভাবিক। পাহাড়িদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, লেখালেখির হাত আছে তারাও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উদ্ভব, প্রকৃতি, জটিলতা ও তার সমাধান সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাভাবনা গ্রন্থাগারে তুলে ধরেছেন। সিদ্ধার্থ চাকমার, *প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম* (১৯৮৬), জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ* (১৯৯১), প্রদীপ্ত খীসার *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা* (১৯৯৬), বিপ্লব চাকমার *পার্বত্য চট্টগ্রাম: স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে* (১৯৯৭), রাজকুমারী চন্দ্রা রায়ের লিখিত *ল্যান্ড রাইটস অব দ্য ইন্ডিজেনাস পিপলস অব চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস, বাংলাদেশ (২০০০)*, শরদিন্দু শেখর চাকমার রচিত *পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ইতিকথা এবং তাদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন* (২০০২) উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বাংলাদেশ আমলে

---

[১০] হুমায়ুন আজাদ, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: সবুজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), ভূমিকা অংশ

[১১] আহমদ ছফা, *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০১২; ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ১৮।

[১২] আহমদ ছফা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭।

চলমান পাহাড়িদের সশস্ত্র আন্দোলনের কারণ, ভূমি অধিকার ও বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপের ত্রুটি বিচ্যুতি বর্ণনা। একাডেমিক তাগিদ বা দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় তাদের উদ্দেশ্য নয় সুতরাং ঐ এলাকার বাসিন্দা হওয়াতে লেখকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আন্দোলন সংগ্রামে জড়িত পক্ষের চলমান ঘটনার ব্যাখ্যান (ইন্টারপ্রেটেশন) তাদের লেখনির মধ্যে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ব্রিটিশদের বহির্ভূত শাসন নীতির সুদুরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রভাব, পাকিস্তান সরকারের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ তাদের গ্রন্থে অনুপস্থিত।

৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে ‘চাকমা সমস্যা’ আখ্যায় লিখিত গ্রন্থাদি

এ শ্রেণির লেখকরা মূলত উত্তরপূর্ব ভারতের। বিশ শতকের আশির দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে ৬৬ হাজার পাহাড়ি শরণার্থীর ঐ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে। ফলে ঐ রাজ্যের রাজনীতিবিদরা তো বটেই শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরাও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে জানতে আগ্রহ বোধ করেন। কিন্তু আশ্রিত শরণার্থীদের মধ্যে সিংহভাগ চাকমা হওয়ায় এবং শান্তিবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাদের ধারণা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা মূলত ‘চাকমাদের আন্দোলনজনিত সমস্যা।’ এজন্য বিকশ কুমার চৌধুরী ও চন্দ্রিকা বসু মজুমদার তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ের শিরোনাম রেখেছেন যথাক্রমে *জেনেসিস অব চাকমা মুভমেন্ট (১৭৭২-১৯৮৯): হিস্টরিক ব্যাকগ্রাউন্ড* (১৯৯১) ও *জেনেসিস অব চাকমা মুভমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস* (২০০৩)। প্রথম বইটির পরিসর খুবই সংক্ষিপ্ত; এটি ঘটনাসমূহের একটি সময়ানুক্রমিক (ক্রনোলজিক্যাল) বর্ণনা। তবে দ্বিতীয় গ্রন্থটি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক উন্নয়নকে ‘চাকমাদের আন্দোলন’ হিসেবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। চন্দ্রিকা বসু মজুমদার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন নীতিকে ‘চাকমা আন্দোলনের’ মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

উপর্যুক্ত ছয় প্রকার গ্রন্থ পর্যালোচনা এটা স্পষ্ট যে, কোনো শ্রেণির গ্রন্থই ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের নীতির পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উপস্থাপন করে না। বরং অধিকাংশ গ্রন্থই বাংলাদেশ সরকারের নীতির খণ্ডিত চিত্র উপস্থাপন করে যেখানে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সরকারের নীতি নিবিড় অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও উপস্থাপনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সুতরাং ১৮৬০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি নীতির একটি ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য গবেষণার প্রয়োজন আছে। সেই তাগিদ থেকেই আলোচ্য গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে।

কেন এই গবেষণা ?

সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশল হিসেবে ঔপনিবেশিক স্বার্থে বহির্ভূতকরণ প্রক্রিয়া এবং জাতি-রাষ্ট্রের স্বার্থে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রক্রিয়ার তুলনামূলক গবেষণাটি বিদ্যামান জ্ঞানকাণ্ডের নতুন ব্যাখ্যার যোগান দিবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। পাশাপাশি গণতন্ত্রায়ন ও আধুনিকায়নের সাথে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তকরণ প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নতুন চিন্তার উদ্রেক করতে পারে। গবেষণাটির তাত্ত্বিক গুরুত্বের সঙ্গে একাডেমিক গুরুত্বও অনেক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বি. এ. (সম্মান) সিলেবাসে ‘বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৭২ হইতে–’ শিরোনামে একটি ১০০ নম্বরের কোর্স অন্তর্ভুক্ত আছে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংহতি সমস্যা (প্রবলেম অব পলিটিক্যাল ইন্টিগ্রেশন অব বাংলাদেশ) একটি গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষ বি. এ সম্মান শ্রেণির পাঠ্যক্রমেও ‘এথনিক মাইনোরিটিজ অব বাংলাদেশ’ নিয়ে ১০০ নম্বরের কোর্স পঠিত ও অধীত হয়; এ কোর্সের সিলেবাসের অর্ধেক অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সাজানো। গবেষণাটি সম্পন্ন ও প্রকাশিত হলে এ কোর্সের শিক্ষার্থীরা নতুন আলোকে বিষয়টির ওপর ধারণা লাভ করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু পর্যাপ্ত লিখিত উপাদানের অভাব, দুর্গমতা, নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য ও ভাষাগত ভিন্নতাসহ বোধগম্য কারণে অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের যেমন বলেছেন, ‘ঢাকায়, দেশের কেন্দ্রে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বেশি ভাবার সময় আমার হয়নি, যেমন হয় না অধিকাংশের।’[১৩] পার্বত্য অঞ্চলে শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধ থেকে সৃষ্ট ক্ষোভ এবং সামষ্টিক জাতিগত আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রাম ও সেই সংগ্রাম প্রশমিতকরণে সরকারের অধিকমাত্রায় সামরিক কৌশল নির্ভরতা অঞ্চলটিকে রেখেছে দীর্ঘকালব্যাপী অশান্ত ও সংঘাতময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ প্রসঙ্গে আবার হুমায়ুন আজাদের অকপট মন্তব্য, ‘সরকারগুলোও আমাদের বেশি কিছু জানাতে চায়নি, রাখতে চেয়েছে অন্ধকারে।’[১৪]

---

[১৩] হুমায়ুন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।
[১৪] হুমায়ুন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে না নেওয়ার এটি একটি বড় কারণ। বাংলাদেশ আমলে যেকজন পণ্ডিত পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কাজ করেছেন তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো উপরে আলোচিত হয়েছে। অথচ এ অঞ্চলের জনমানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সমগ্র বাংলার চিরায়ত সামাজিক ইতিহাস ঐতিহ্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৈরী বাস্তবতাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে তার সমাজের গভীরে গিয়ে সমস্যাটির প্রকৃতি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু একাডেমিক পর্যায়ে ঐ অঞ্চলের পাহাড়িসমাজের সাথে সরকারের সম্পর্ক প্রায় অনালোচিত রয়ে গেছে। সরকার অনুসৃত নীতিসমূহ আপাতদৃষ্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলেও দীর্ঘমেয়াদে কোনো কোনো নীতি বা কর্মসূচি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শীর্ষ স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মানিক লাল দেওয়ান কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্যবাসীদের অপ্রত্যাশিত ও উল্লেখযোগ্য উপকার (শাপেবর) হয়েছে বলে তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং নিবিড় অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত ব্যাখ্যানসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান করবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে রাষ্ট্র ও পাহাড়ি সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের ঐতিহাসিক ক্রমবির্বতনের একটি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। পরিশেষে বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণেও এ গবেষণা কর্মটি সহায়ক হবে। কোনো গ্রন্থই শেষ কথা বলতে পারে না, প্রত্যেক গ্রন্থেরই কাজ হচ্ছে আগামী প্রজন্মের কাজের সুবিধার জন্য তাকে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করার জন্য সাহায্য করা। ঠিক তেমনি আমার এই গবেষণাও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আগ্রহী ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য সহায়ক উপাদান হবে বলে মনে করি।

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণা কর্মে তুলনামূলক ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সরকারি প্রকাশনাসমূহ থেকে প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, যাচাই এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কলকাতা সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার, কলকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, বাংলাদেশ ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারি দপ্তর, গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিলপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ আমলের অপ্রকাশিত দলিল দস্তাবেজের মধ্যে *প্রসিডিংস অব দ্য ওনারেবল লেফটেনেন্ট গভর্নর অব বেঙ্গল*

(পলিটিক্যাল, জুডিশিয়াল ও রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট), *ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট অব চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস (১৯২৬)* ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকাশিত সরকারি নথিপত্র যেমন *সিলেকশনস্ ফ্রম দ্য করেসপনডেন্স অন দ্যা রেভিনিউ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, ১৮৮৭ ও ১৯২৯*, জে পি মিলস্ এর *রিপোর্ট অন দ্য এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, ১৯৩০* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত *রিপোর্ট অন দ্য এডমিনিসট্রেশন অব চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ১৯৪৯-৫০*, ১৯৫০-৫১, ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৩-৫৪ মূল্যবান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশনা *এ রিপোর্ট অন দ্য প্রবলেম অব চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস এন্ড বাংলাদেশ রেসপন্সেস ফর দেয়ার সলিউশন*, ১৯৯৩ বাংলাদেশ সরকারের নীতি সম্পর্কে মূল্যবান উপাদান। এছাড়া ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোর ওপর প্রকাশিত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হেরিটেজ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ, রাঙামাটির চাকমা রাজ কার্যালয় আর্কাইভস ও রাঙামাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের লিখিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত গ্রন্থাদি, বিশেষত ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন ও হাটকিনসনের আকর গ্রন্থাবলি, বিভিন্ন গবেষকদের সম্পাদিত গবেষণা কর্ম, দেশি-বিদেশি সংবাদ ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ, স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রকাশিত আদিবাসিদের লোকসাহিত্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তও ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, গবেষণাধীন সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সাথে এবং পাহাড়িদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রত্যেকটা ধাপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকায় এমন অভিজ্ঞ ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ভাষ্য ও বর্ণনাগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যমান সাহিত্যে বর্ণিত তথ্যের চেয়েও অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ; অনেক অব্যক্ত ব্যাখ্যা উঠে আসে তাঁদের বর্ণনা থেকে। এম্পিরিক্যাল মেথড বা অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে এই গবেষণায় বহুমুখীন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সর্বমোট ২৫টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। থিমেটিক পদ্ধতিতে গৃহীত এসব সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তগুলো ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের কার্যকারণ বিশ্লেষণে প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহারণ স্বরূপ, শ্রী কল্প রঞ্জন চাকমা, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, শ্রী যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, রাজা দেবাশীষ রায়, জনাব কাজী নজরুল ইসলাম, জনাব এ কে এম মকছুদ আহমেদ, শ্রী গৌতম দেওয়ান, এ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, ডা. এ. কে দেওয়ান, শ্রী দেবদত্ত

খীসা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ একেকজন জীবন্ত ইতিহাসের আধার। এছাড়া ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থাবলি যা পরীক্ষণ ও পরীবীক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়কাল, স্থান ও তাদের পরিচিতি। উপরন্তু যেখানে প্রযোজ্য, পাহাড়ের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে গবেষকের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিও এ গবেষণায় সন্নিবেশিত হয়েছে। যদিও উৎসের কাছাকাছি থাকায় গবেষকের প্রভাবিত হওয়ার কিছুটা ঝুঁকি রয়েছে; তবে তত্ত্বাবধায়কের সহায়তায় এই ঘাটতি পূরণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

১.১ গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো

২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আমার উপস্থাপিত গবেষণা প্রস্তাবনার প্রাথমিক শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্রীয় নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ও পিএইচ.ডি ভর্তি সংক্রান্ত বোর্ড অব এডভান্সড্ স্টাডিজ সভার পরামর্শক্রমে শিরোনামটি আংশিক পরিমার্জন করে 'রাষ্ট্রীয়' প্রত্যয়টির পরিবর্তে 'সরকারী' প্রত্যয়টি প্রতিস্থাপন করে চূড়ান্ত করা হয় 'সরকারী নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৮৬০-২০০০ খ্রি.)'।

গবেষণার জন্য দীর্ঘ সময়কালের (১৪০ বছরের) ঘটনা প্রবাহকে বেছে নেওয়া হয়েছে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা একাডেমিক জগতে ইতিহাসচর্চায় হার্ভার্ড ইতিহাসবিদ ডেভিড আর্মিটেজ ও ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ জো গুলডি উপস্থাপিত 'Longue Duree'(Long Term) বা 'দীর্ঘকালীন ইতিহাস গবেষণা'র নতুন ধারার গুরুত্বকে বিবেচনা করে।[১] উক্ত তত্ত্বে বিশ্বের সমস্যাসংকুল বর্তমানকে সম্যকভাবে অনুধাবন করে ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণের জন্য ইতিহাস গবেষণার প্রচলিত 'স্বল্পকালীন' রেওয়াজকে 'অসফল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং 'দীর্ঘকালীন সময়' যার ব্যাপ্তি নূন্যতম অর্ধশতক বা ১০০ বছর হবে– সেটিকে ডক্টোরাল গবেষণার জন্য আশু প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিযুক্ত বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এর পূর্বে মার্কিন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ভিক্টর এসলের ''Minimal Political Inclusion of Minorities at Risk: The Case of the Americas, 1870-2000" শীর্ষক গবেষণা কর্মটিও দীর্ঘ পরিসরে (Long Term) গবেষণায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রস্তাবিত গবেষণা বিষয় ''সরকারী নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৮৬০-২০০ খ্রি." এর কালগত পরিসর দীর্ঘ হওয়াতে অবধারিতভাবে পরপর তিনটি রাষ্ট্রের– ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– বিভিন্ন পদ্ধতির সরকারের প্রসঙ্গটি সামনে উঠে আসে। যেমন ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সরকার, সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক সরকার এবং অগণতান্ত্রিক সামরিক সরকার। কিন্তু সরকারের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা এ গবেষণার আওতাভুক্ত নয়। বরং বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির সরকারসমূহের পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রয়োগের ধরন এবং তার প্রভাবে ঐ অঞ্চলের

---

[১] Jo Guldi and David Armitage, *The History Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) তাঁরা উক্ত গ্রন্থে ফরাসি পণ্ডিত Farnand Braudel এর ফরাসি শব্দবন্ধ 'Longue Duree' বা দীর্ঘ কালীন ইতিহাস গবেষণার ধারায় ফিরে যাওয়ার তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করাই হলো আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য। বর্তমান গবেষণা কর্মটিতে পাশ্চাত্যের ক্ষমতা বিশ্লেষক মিশেল ফুকোর ক্ষমতা সম্পর্কিত তত্ত্বটিকে গবেষণার যুক্তি বিনির্মাণের জন্যে তত্ত্বকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, ফরাসি নাগরিক মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) ছিলেন একাধারে একজন দার্শনিক, সাইকোলজিস্ট এবং ইতিহাসবিদ যাঁর চিন্তা ও গবেষণার মূল ক্ষেত্র ছিল সমাজ, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার ক্ষমতা সম্পর্কিত সমস্যার রহস্য উদ্ঘাটন ও প্রতিপাদন। অধ্যাপক সার্গিউ ব্যালান ফুকোর ক্ষমতা ধারণাটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ‘‘Foucault studies-- in what he calls, ‘‘the analysis of Power”-- how various institutions exert their power on groups and individuals, and how the latter affirm their own identity and resistance to the effects of power.”[২] এটি ঠিক যে, মিশেল ফুকোই সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা প্রয়োগের ইতিবাচক প্রভাব বা ফলাফল নিয়ে আলোচনার নতুনতর ডিসকোর্স উন্মোচন করেছেন। তাই এ গবেষণায় উত্তর-আধুনিক জ্ঞান চর্চায় অন্যতম চিন্তাবিদ মিশেল ফুকোর ভাষিত রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশল এবং তদনুযায়ী এর প্রভাব বিশ্লেষিত হবে। ফুকোর মতে, ‘‘আধুনিক ক্ষমতা” শুধু দমন বা অত্যাচার করে না।” ক্ষমতার ইতিবাচক স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *Histoire de la sexualite* (vol. I) গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘We must overcome the idea that power is oppression, because-- even in their most radical form-- oppressive measures are not just oppression and censorship, but they are also productive, causing new behavior to emerge.’’[৩] অর্থাৎ ক্ষমতা মানেই দমনপীড়ন এ ধারণা থেকে আমাদের অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে কারণ . . . দমনমূলক নীতিও উৎপাদনশীল, যা নতুন আচরণের উদ্ভবে অনুঘটক হয়। ফুকো তাঁর *ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ* বা *শৃঙ্খলা ও শাস্তি* গ্রন্থে অনবদ্য ভাষায় আরও লিখেছেন, ‘‘We must cease once and for all to describe the effects of power in negative terms: it ‘‘excludes”, it ‘‘represses”, it ‘‘censors”, it ‘‘abstracts”, it ‘‘masks”, it ‘‘coneals”. In fact, power produces; it produces reality; it produces domains of objects and rituals of truth. [অর্থাৎ ক্ষমতার প্রতিফলগুলি নিছক নেতিবাচক ধারায় বর্ণনার অভ্যাস আমাদের চিরতরে পরিহার করা উচিত। ক্ষমতা শুধু ‘বিচ্ছিন্ন করে’, ‘দমন করে’, ‘নিন্দা করে’ ‘ঢেকে রাখে’, ‘লুকিয়ে রাখে’, তা নয়, আসলে ক্ষমতা উৎপাদন করে, এটা উৎপাদন করে বাস্তবতা, এটা নির্ধারণ করে

---

[২] Sergiu Balan, ``M. Foucault’s View on Power Relations’’ in *Cogito,* Journal of ``Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucharest: 2. 2 (2010): pp. 56-61.

[৩] M. Foucault, *History de la sexualite: La volonte de savoir* (Paris: Gallimard, 1976), cited by Sergiu Balan, in *op., cit*., Trans. Robert Hurley, *The History of Sexuality* Vols. 1-3 (New York, Pantheon)

বস্তুর বিচরণসীমা এবং নির্মাণ করে সত্যের তন্ত্রসমূহ।”]⁸ ক্ষমতা প্রয়োগ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্ট, ‘‘Power is employed and exercised through a netlike organization.’’[৫] ‘‘While power is not a possessed capacity it can be exercised by individuals, groups, or states.’’[৬] ফুকোর ক্ষমতার বহুমুখীনতার দর্শনটির মিল রয়েছে ডেভিড এরিকসনের বিবৃত– ‘‘Policy determines politics”– এ আপ্ত বাক্যটির সঙ্গে। তিনি দেখিয়েছেন ‘‘কীভাবে সরকারি নীতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর রাজনীতি নির্ধারণ করে দেয়” ।[৭] বলা যায় ফুকো যেটাকে বলছেন ‘ডিসিপ্লিন’ বা ‘অনুশাসন’ সেটাকেই এরিকসন বলছেন ‘পলিসি’ বা নীতি’। ফুকো আরও বলছেন ক্ষমতা যেখানে প্রয়োগ করা হয় সেখানে প্রতিরোধও হয়, সেটা ব্যক্তিও হতে পারে গোষ্ঠীও হতে পারে। তাঁর স্পষ্ট ভাষ্যঃ ‘‘Where there is power there is resistance.”[৮] পার্বত্য চট্টগ্রামেও সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগের প্রতিক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে; ফুকো এমন ঘটনাকে ক্ষমতার উৎপাদনশীল বা ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখেছেন এজন্য যে, এতে করে প্রতিরোধকারীদের মধ্যেও এক ধরনের সচেতনতা, শৃঙ্খলাবোধ, একতাবোধ জাগ্রত হয়।

ক্ষমতা প্রয়োগের আরও একটি দিক আছে ফুকো যার নামকরণ করেছেন গভর্নমেন্টালিটি (gouvernementalite)।[৯] তিনি গভর্নমেন্টালিটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

> an ensemble formed by institutions, procedures, analyses and reflections, the calculations and tactics that allow the exercise of this very specific, albeit very complex form of power, that has population as its target, as its principal form of

---

[8] M. Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (London: Allen Lane, 1977), p.194. আরও দ্রষ্টব্য- এম. এম. আকাশ ‘‘ক্ষমতা প্রশ্ন ও মিশেল ফুকোর মতামত” পারভেজ হোসেন সম্পাদিত *মিশেল ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা* (ঢাকাঃ সংবেদ, ২০০৭), পৃ. ১৯২-২১২।

[৫] M. Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-77* (London: Harvester Press, 1980), p. 98; cited by Sergiu Balan, *op., cit.,*

[৬] Peter Digeser, ‘‘The Fourth Face of Power,” *The Journal of Politics*, 54.4(1992): 977-1007.

[৭] David F. Ericson (ed.), *The Politics of Inclusion and Exclusion: Identity Politics in Twenty-First Century America* (New York and London: Routledge, 2011), p. 2.

[৮] M. Foucault, *History de la sexualite: La volonte de savoir*, (Paris: Gallimard, 1976), Trans. Robert Hurley, *The History of Sexuality* Vols. 1-3(New York, Pantheon)

[৯] According to explanation of Dean, Foucault’s Governmentality is ``Government is any more or less calculated and rational activity, undertaken by a multiplicity of authoritiesand agencies, employing a variety of techniques and forms of knowledge that seeks to shape conduct by working through our desires, aspirations, interests and beliefs, for definite but shifting ends and with a diverse set of relatively unpredictable consequences, effects and outcomes. Mitchell Dean, *Governmentality: Power and Rule in Modern Society* (London, New Delhi: Sage 2010), p.18.

knowledge, political economy, as its major form of knowledge, and apparatuses of security as its essentian technical instrument .[১০]

ফরাসি বা ইংরেজি দুই ভাষাতেই শব্দটি নতুন। ফুকো শব্দটি তৈরি করেছেন গভর্নমেন্ট শব্দের অর্থ থেকে এটিকে পৃথক করতে। তাই একে শুধু প্রশাসন না বলে বলা যায় প্রশাসনিকতা। এর মূল কথা হলো ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য। কোনো সাধারণ অর্থে কল্যাণ নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ কল্যাণের জন্য। কারণ একটি রাষ্ট্রের জনগণ কখনো একরৈখিক অবস্থায় বিরাজমান থাকে না। থাকে বিভিন্ন চাহিদা ও স্বার্থের জনগোষ্ঠী। ফলে একেক জনগোষ্ঠীর কল্যাণ একেক রকম হয়। জনগোষ্ঠীর কোনো বিশেষ অংশের জন্য দরকার বুনিয়াদি শিক্ষার, কোনো অংশের দরকার সংস্কৃতি সুরক্ষার। কোনো অংশের দরকার বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার। এসব বিচিত্র চাহিদা ও স্বার্থ পূরণ করার লক্ষ্যেই বিভিন্ন সরকারি নীতি কার্যকর করা দরকার আর সেটা করতে গেলেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রশ্নটি এসে যায়। তখন প্রশাসনিকতা সম্প্রসারিত হয় এবং বহুরূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়।[১১] অর্থাৎ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যও রাষ্ট্রকে ক্ষমতার আশ্রয় নিতে হয়। ফুকো দেখিয়েছেন শাসনের স্বার্থে রাষ্ট্র তথ্য সংগ্রহ করে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করছে। এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সমাজনীতি, সরকারি ও বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা কার্যকর করা হয়। এই ব্যাপক কর্মকাণ্ড হল প্রশাসনিকতার অঙ্গ।[১২]

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রের প্রবেশের সাথে সাথে গভর্নমেন্টালিটি বা সরকারি প্রশাসনিকতার উপস্থিতি জোরালো হয়েছে, এবং তার প্রতিফলও দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায়।

এযাবৎ কালের পণ্ডিতদের গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসেবে সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগকে কেবল 'বিচ্ছিন্ন করে', 'দমন করে', 'আড়াল করে' ইত্যকার ভূমিকায় বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ঘরানার পণ্ডিতদের মধ্যে ভল্ফ গাং মে (১৯৮০), আদিত্য কুমার দেওয়ান (১৯৯০), হাসানুজ্জামান চৌধুরী (১৯৯৩), আমেনা মহসীন (১৯৯৭) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রবেশ, অবস্থিতি ও সম্প্রসারণের ফলে পার্বত্য জনগোষ্ঠীদের সামগ্রিক জীবনধারায় এসেছে পরিবর্তন। অথচ তাঁদের আলোচনায় ক্ষমতার ইতিবাচক প্রতিফলগুলি স্থান পায়নি যা আলোচ্য গবেষণার যৌক্তিকতাকে আরও পরিপক্ক করেছে।

---

[১০] Foucault's Lecture titled on *governmentality (1978)*

[১১] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ''ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত: গ্রামশি ও মিশেল ফুকো '' পারভেজ হোসেন সম্পাদিত *মিশেল ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা* (ঢাকা: সংবেদ, ২০০৭), পৃ. ১৭০-১৭৮।

[১২] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পশ্চিমের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক: গ্রিকো-রোমান ইতিহাসচর্চা থেকে উত্তর-আধুনিক চিন্তা ভাবনা* (কলকাতা: মিত্রম, ২০১৪, প্র. প্রকাশ ২০১০), পৃ. ৪০১।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল ১৮৭ বছর, পাকিস্তানি শাসনাধীনে ছিল ২৪ বছর এবং সর্বশেষ বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শাসিত হচ্ছে ৪৫ বছর ধরে। কিন্তু প্রস্তাবিত গবেষণার প্রারম্ভিক সময় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দকে সুচিন্তিতভাবে বেছে নেয়া হয়েছে ; কেননা ঐ বছর থেকে পৃথক প্রশাসনিক ইউনিট অর্থাৎ জেলা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে। আর ঊর্ধ্ব কালসীমা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থির করা হয়েছে। এটি একটি শতকের শেষ সীমা। উপরন্তু ঐ সময়ের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তকরণ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এবার আসা যাক 'সরকারী নীতি' শব্দযুগলটি কেন চয়ন করা হয়েছে বা এ গবেষণায় 'সরকারী নীতি' বলতে কী বুঝানো হয়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ও সামরিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে বেশকিছু সময় ধরে। পরিণামে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত শাসকবর্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ধরনানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের নীতিতেও বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ গবেষণায় ১৮৬০-২০০০ খ্রি. পর্যন্ত সরকারসমূহের ক্ষমতা প্রয়োগ নীতিকে মোটা দাগে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১৮৬০-১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারসমূহের অনুসৃত নীতিকে 'পলিসি অব এক্সক্লুজন' বা 'বহির্ভূতকরণ নীতি' এবং অন্যদিকে উপনিবেশ-উত্তর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত সরকারসমূহের নীতিকে 'পলিসি অব ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন' বা জাতীয় সংহতকরণ নীতি' হিসেবে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি নিচের ৩টি বড় প্রশ্নকে সামনে রেখে এ গবেষণা এগিয়ে যাবে। যথা-

(ক) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কেন এবং কীভাবে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোকে মূলধারার রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বহির্ভূত করে রেখেছিল?

(খ) এ বহির্ভূতকরণ নীতি পাহাড়িদের রাজনৈতিক চিন্তাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

(গ) পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে কোন প্রেক্ষাপটে এবং কী প্রক্রিয়ায় তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হলো?

১.২ ব্রিটিশদের 'পলিসি অব এক্সক্লুজন' বা 'রাজনৈতিক বহির্ভূতকরণ নীতি'র পরিচিতি

প্রথমে দেখা যাক এ গবেষণায় ব্রিটিশদের ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশল হিসেবে অনুসৃত 'পলিসি অব এক্সক্লুজন' বা 'বহির্ভূতকরণ নীতি' বলতে কী বুঝানো হয়েছে। বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এখানে তার সারসংক্ষেপ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হবে। সাধারণভাবে বলা যায় ব্রিটিশ সরকার অনুসৃত 'ডিভাইড এন্ড রুল' বা বিভেদনীতির সাহায্যে শাসন পদ্ধতির আরেকটি প্রতিরূপ

হল ‘পলিসি অব এক্সক্লুজন’ বা বহির্ভূত রেখে শাসন পদ্ধতি। অবশ্যম্ভাবীরূপে এখানে দুটি প্রশ্ন ক্রিয়াশীল : তার একটি হল কাকে বহির্ভূত রাখা হয়েছিল? এবং অন্যটি হল কোথা বা কিসের থেকে বহির্ভূত রাখা হয়েছিল?

প্রথমে জানা প্রয়োজন কাকে বহির্ভূত রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার সভ্যতার বিবর্তনবাদী তত্ত্বের মাপকাঠিতে ফেলে বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীকে ‘অগ্রসর’ ও ‘অনগ্রসর’– এ দুটি বর্গে বিভক্ত করে। ‘অগ্রসর’ বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রেসিডেন্সি বা প্রদেশসমূহের সমতল এলাকার বসবাসরত হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠী যারা সভ্যতার মাপকাঠিতে কিছুটা ‘সভ্যস্তরে’ উন্নীত হয়েছিল। আর ‘অনগ্রসর’ বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত বিশাল জনগোষ্ঠীকে। ব্রিটিশ ডিসকোর্সে যাদেরকে পাহাড়ি (হিলম্যান), বন্যজাতি (ওয়াইল্ড রেস), আদিম অধিবাসী (প্রিমিটিভ পিপল), উপজাতি (ট্রাইবস), তফসিলভুক্ত উপজাতি (সিডিউল ট্রাইবস্) ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত করানো হয়েছে। সভ্যতার ক্রম বিবর্তনে এরা নিচু স্তরের (ইনফেরিওর র‍্যাঙ্ক) বলে চিহ্নিত হয়। এখানেও ব্রিটিশ শাসকরা সফলভাবে ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে ‘সভ্য’র বিপরীতে ‘আদিম’ বা ‘অগ্রসর’ এর বিপরীতে ‘অনগ্রসর’– এ দুটি ‘কল্পিত সম্প্রদায়ে’ বিভক্ত করে। এক কথায়, আধুনিক জাতীয়তাবাদের কল্পিত ছকে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষকে উপস্থাপন করা হয়। জাতীয়তাবাদের একজন প্রধান সমালোচক বেনেডিক্ট এন্ডারসন এ অবস্থাকে বলেছেন ‘Imagined Community’ তাঁর মতে, একটি বলবান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিউনিটি জাতীয়তাবাদী কল্পরাজ্যে সকল পরিসর দখল করে ফেলে।[১৩]

যাহোক এথনিক মাইনোরিটি বা ‘অনগ্রসর’দের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের যুক্তি হল তাদের প্রত্যেকের প্রত্যন্ত এবং সুগম্যতাবর্জিত এলাকায় আদিম জীবন ও বসতি ছিল এবং সর্বক্ষেত্রেই তারা ছিল পশ্চাৎপদ। শুধু তাই নয় তারা জাতিতে উন্নীত হয়নি সুতরাং উপজাতি। উপজাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন, সরল, সমতাবাদী, অনুন্নত ও স্থানীয় ধর্মে বিশ্বাসী অন্যতম। এসব বিবেচনায় ভারতে জাতি বনাম উপজাতি রাজনৈতিক বিভাজনের শুরু ব্রিটিশ আমলে বলে নৃতত্ত্ববিদদের অভিমত। এসব উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে ব্রিটিশরা পৃথক জেলা গঠন করে আবার সেই জেলাগুলোতে পৃথক শাসন পদ্ধতি প্রয়োগের লক্ষে ‘সিডিউল ডিস্ট্রিক্ট এ্যাক্ট, ১৮৭৪’ বা তফসিলভুক্ত জেলা আইন, ১৮৭৪ প্রণয়ন করে। প্রধানত এসব তফসিলভুক্ত জেলাসমূহে বসবাসরত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ওপরই ব্রিটিশ সরকার ‘পলিসি অব এক্সক্লুজন’ বা বহির্ভূতকরণ শাসননীতি প্রয়োগ করে। এ শাসননীতির রাজনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। কেননা উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারত উপজাতি প্রসঙ্গে ব্রিটিশদের অনুসৃত নীতি পুনর্বহাল

[১৩] Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,* (London: Verso, 1991), p. 6-7.

রাখে এবং ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৪২ অনুচ্ছেদে ব্রিটিশদের তালিকাভুক্ত গোষ্ঠীগুলোকেই উপজাতি বলে স্বীকার করা হয় প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে।[১৪]
এ তালিকায় ছিল প্রায় ৪০০ উপজাতি যাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ বাংলার সীমান্তবর্তী জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি জাতিগোষ্ঠীগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা ১৯৪৭ সালে দেশভিাগের ফলে পাকিস্তানের ভাগে পড়ে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের অধিবাসি।[১৫]

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করা যাক এ প্রসঙ্গটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও বৃহৎ কলেবরে আলোচনা করা হবে। শাসনকার্যে সুবিধার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিল। এর মধ্যে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ‘প্রেসিডেন্সি’ রূপে শাসিত হত। প্রেসিডেন্সিসমূহ একজন গভর্নর এবং ইংল্যান্ডের সম্রাট কর্তৃক মনোনীত তিন সদস্যযুক্ত একটি শাসন পরিষদ কর্তৃক শাসিত হত। প্রেসিডেন্সি ব্যতীত অন্য প্রদেশগুলির শাসনভার লেফটেনেন্ট গভর্নর অথবা চিফ কমিশনারের ওপর ন্যাস্ত হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে উক্ত প্রদেশসমূহ শাসনের জন্য ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠন করা হয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঐ পরিষদে ১২ জন মনোনীত সদস্যের আইনসভায় বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা আটজন এবং দেশিয় ও ইংরেজ দুই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই বেসরকারি সদস্যদের মনোনীত করা হত।[১৬]
এরপর ১৯০৯ ও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশসমূহের জন্য আইনসভার আকার ও ক্ষমতা এবং বেসরকারি সদস্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়। যেমন বঙ্গীয় আইনসভায় সদস্যসংখ্যা ১৮৯২ সালে ২১ জন, ১৯০৯ সালে ৪৬ জন, ১৯১৯ সালে ১৫০ এবং ১৯৩৭ সালে ২৫০ জনে উন্নীত হয়। ১৯০৯ সাল থেকে সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বেসরকারি সদস্যদের নির্বাচনের বিধান করা হয় এবং নির্বাচিত আইনপরিষদ প্রদেশের কল্যাণার্থে কিছু কিছু বিষয়ে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি) আইন প্রণয়নের অধিকার পায়। এরপর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলির শাসন ব্যবস্থায় আরও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়। তত্ত্বগতভাবে ১৯৩৫-এর আইনে ১৯১৯ সালের আইনে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় দায়িত্বশীল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসিত সরকার এবং তা কার্যকর হয় ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে। প্রদেশে নির্বাচিত আইনসভা ও ব্যবস্থাপক পরিষদের বিধানও পাকাপোক্ত করা হয়। এসব

---

[১৪] ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২(১) এবং সংবিধানের তফসিলি উপজাতি অর্ডার ১৯৫০-এ উপজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার শর্তাবলী বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে গঠিত উপজাতি সংক্রান্ত লকুর কমিটি নিমোক্ত শর্তাবলী নির্দিষ্ট করে: a) indications of primitive traits; b) distinctive culture; c) shyness of contact with the community at large; and d) backwardness.

[১৫] এন. কে. বোস, *ট্রাইবাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া*, উদ্বৃত- আন্দ্রে বেতেই, ‘‘ভারতের উপজাতির সংজ্ঞা এবং কিছু সমস্যা,’’ ভেলাম ভ্যান সেন্দেল ও এলেন বল, *বাংলার বহুজাতি: বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ* (কলকাতা: আইসিবিএস, ১৯৯৮), পৃ. ২৭।

[১৬] বিপন চন্দ্র, *আধুনিক ভারত*, ভাষান্তর- গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯), পৃ. ২৫৩-২৫৪।

আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো এটা বুঝা যে ব্রিটিশ ভারতের সব জেলাকে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হয়নি। বলা বাহুল্য ইতিপূর্বে আলোচিত তফসিলভুক্ত উপজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলোকেই প্রতিনিধি প্রেরণের সুবিধার আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়। ঠিক উল্টোভাবে আবার প্রাদেশিক পরিষদকে বঞ্চিত রাখা হয় তার প্রণীত জনকল্যাণমুখী আইনের সুবিধা তার প্রদেশভুক্ত সমস্ত জেলায় সমানভাবে পৌঁছে দেওয়ার এখতিয়ার থেকে। ব্রিটিশদের এক্সক্লুজন প্রক্রিয়া শুধু আইনসভার ক্ষেত্রে নয় স্বাভাবিক চলাচল ও বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত ছিল। যেমন ১৯০০ সালের চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস প্রবিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সমতলবাসিদের চলাচল, জমিজমা ক্রয়, বসতি স্থাপন ও স্থায়ী বসবাসের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

এখন সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা যেতে পারে, কেন বহির্ভূতকরণ– এ প্রশ্নটির উপর? ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ সরকার অনুন্নত উপজাতি শ্রেণির তালিকা সম্পূর্ণ করে। এ জেলাগুলোর অবস্থান দক্ষিণ-ভারতের মাদ্রাজের অন্তর্গত লাক্ষাদ্বীপ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলায় বিস্তৃত। যার আয়তন প্রায় ২,০৭,৯০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১৩ মিলিয়ন। ব্রিটিশ সরকার তাদের ওপরই তার 'পলিসি অব এককুজন' নীতি প্রয়োগ করে।[১৭] কিন্তু বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু বাংলা প্রদেশের সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বহির্ভূতকরণ।

এটা স্পষ্ট যে, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত ঐসব জেলা– যেগুলো বহির্ভূতকরণ শাসন নীতির আওতায় পড়েছিল– সামষ্টিকভাবে একটি বিরাট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিশাল এলাকার জনসংখ্যাকে মূলধারার শাসনব্যবস্থা থেকে বহির্ভূত রাখার পেছনে ব্রিটিশ নীতি নির্ধারকদের সভ্যতা ও সমাজের অগ্রগতির বিবর্তনবাদী যুক্তিই কাজ করেছিল। জেড এ আহমেদের ভাষায় তা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ফুটে উঠেছে,

> The main argument employed by the Government of India in Justification of the policy of excluding large tracts from the normal administration of the country is that the elaborate system of law and legal procedure which prevails in the more advanced areas cannot be comprehended by backward tribes, and is not suited to their cultural level. It is argued that the British Indian system of administration will bring about a complete breakdown of the primitive communal organisations and will sap the economic and moral life of these tribes. The application of alien rule laws would throw these straightforward, truthful and honest primitives into the clutches of exploiters coming from the more advanced territories, and by disturbing the tribal customs would create such conflicts and conflagrations in these areas as would involve the Government in serious difficulties. It is therefore,

---

[১৭] Z. A. Ahmad, *Excluded Areas Under the New Constitution,* (Allahabad: All India Congress Committee, 1937), p. 2.

considered best to allow these primitive communities to live in their age-old isolation.[১৮]

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীভুক্ত একটি বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী যারা ব্রিটিশদের মতে ‘উপজাতি’, ‘পাহাড়ি’ বিভিন্ন নামে শ্রেণিভুক্ত এবং ‘অনগ্রসর’ তাদেরকে দেশের মূল ‘অগ্রসর’ জনসংখ্যার সংস্রব থেকে বহির্ভূত রাখার নীতি গৃহীত হয়। শুধু তাই নয় সমাজের ‘অনগ্রসর’ অংশকে কথিত ‘অগ্রসর’ অংশের জন্য প্রদেয় নানাবিধ রাজনৈতিক অধিকার ও সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছিল। যেমন- সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জনপ্রতিনিধি বেছে নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয় ‘পলিসি অব এক্সক্লুজন নীতি’র দোহাই দিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ও সেখানকার পাহাড়িদের প্রতি অনুসৃত নীতিই ব্রিটিশদের বহির্ভূতকরণ শাসননীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশল হিসেবে ব্রিটিশদের বহির্ভূতকরণ শাসন নীতির প্রকৃতি ও পরিধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি, ভূমি রাজস্ব, অর্থনীতি ও শিক্ষা জীবনের ওপর এর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে তা পরীক্ষা করা হয়েছে।

১.৩ ‘পলিসি অব ডেমোক্রেটিক ইনক্লুজন’ বা ‘গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি নীতি’

ইনক্লুজন একটি সাম্প্রতিক প্রপঞ্চ বা ধারণা। রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে ইনক্লুজন বা অন্তর্ভুক্তি নীতির কোনো সংক্ষিপ্ত, একক ও সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। এখানে দুই যুগের বিশেষজ্ঞদের সংজ্ঞাগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত জাতি-রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক ও টেরিটরিয়াল সংহতি স্থাপনের ডিসকোর্স হিসেবে একাডেমিক জগতে ‘ইন্টিগ্রেশন’ ধারণাটির ব্যাপক চল ছিল। এই আলোচনায় ‘ইন্টিগ্রেশন’ ধারণাটি ইনক্লুজন এর পূর্ব সংস্করণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। জাতিগত বা ন্যাশনেল ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় কতকগুলো রাজনৈতিক আচরণ ও রীতি পদ্ধতি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য যেগুলোর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলে ধরা যায় রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তকরণ সেখানে বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্র বিজ্ঞানী মাইরন ওয়েনার কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

He mentioned national integration which means the process of bringing together culturally and socially discreet groups into a single territorial unit and the establishment of a national identity. It generally implies `the existence of an ethnically plural society’ in which each group has its own language or cultural

[১৮] *প্রাগুক্ত*

qualities and it refers to the need for `creating sense of territorial nationality which overshadows-- or eliminates-- subordinate parochial loyalities.'[১৯]

মাইরনের এ সংজ্ঞাটিতে অনেকগুলো বিষয়ের একীভুতকরণের কথা বলা হয়েছে যেগুলো বহুত্ববাদী চেতনাসম্পন্ন সমাজ ব্যতীত অর্জন করা বেশ জটিল কাজ। সব স্বার্থগোষ্ঠী, দল, শ্রেণি, সংঘ, ধর্মীয় সম্পদায়, নৃতাত্ত্বিক জাতি সবকিছুর সমন্বয়ে একটি জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস এখানে বিধৃত হয়েছে যে-ব্যবস্থায় সব স্বার্থগোষ্ঠীই সংসৃষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে মাইরন রাজনৈতিক ইন্টিগ্রেশনের কথা বলেছেন; ইনক্লুজনের নয়। আসলে *ইনক্লুসিভ*, *ইনক্লুজন* প্রত্যয়গুলি এখন *ইন্টিগ্রেটিভ*, *ইন্টিগ্রেশন* প্রত্যয়গুলোর পরিমার্জিত রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমনটি এডমিনিস্ট্রেশন এর পরিবর্তে গভর্নেন্স প্রত্যয়টি অধুনা ব্যবহৃত হয়। বিগত শতকের নব্বই এর দশক থেকে পশ্চিমা দুনিয়ার একাডেমিক জগতে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তকরণ ও প্রতিনিধিত্বমুলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণকে সমার্থক করে দেখা হচ্ছে।[২০] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী John S. Dryzek এর গবেষণায় সেটি স্পষ্ট। রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে তাঁর নির্দেশিত সূচকগুলো আরও তাৎপর্যপূণ। যথা-

> Entry into state can come through organization as an interest group and associated lobbying activities; Participation in policy development and implementation through ongoing negotiation between group leaders and public officials; Participation in conventional party and electoral politics, either by organization as a party or in formal affiliation with an established party; accceptance of governmental appointments by group leaders; or enhanching the group's ability to participate in policy making through changes in publice policy. This sort of inclusion or entry into the state therefore involves more than attainment of basic citizenship rights such as the right to vote and associate.[২১]

উদ্ধৃত সংজ্ঞানুসারে বিচার করলে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল যেমন আছে তেমনি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাজনৈতিক দলের সাথে প্রত্যক্ষ এবং কার্যকর সম্পৃক্ততাও আছে। আবার

---

[১৯] Myron Weiner, ''Political Integration and Political Development,'' *in Claude E Welch, Jr. (ed.),Political Modernization: A reader in Comparative Political Changes* (Belmont, California:Wadsworth Publishing Company Inc. 1967), pp. 150, 160 cited by B. P Barua, *Ethnicity and National Integration in Bangladesh: A study of the Chittagong Hill Tracts,* (New Delhi: Har-Anand Publications Pvt. Ltd.2001), pp.19-20.

[২০] David F. Ericson, (ed.) *The politics of Inclusion and Exclusion*: *Identiy Politics in the Twenty-First Century America* (New York: Routledge, 2011), p. 1.

[২১] John S. Dryzek, ''Political inclusion and the dynamics of Democratization.'' in *American Political Science Review* 90.3(1996): 475-487.

একইভাবে দলীয় নেতা হিসেবে সরকারি পদে সমাসীন হওয়ার দৃষ্টান্তও আছে। যেমন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে জেএসএস প্রধান জে.বি. লারমার দায়িত্ব গ্রহণ।

এবার আসা যায় এই যুগের বিশেষজ্ঞদের ইনক্লুজনের সংজ্ঞা বা ধারণা প্রসঙ্গে। সম্প্রতি (২০১২) দুজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ড্যারন এসিমোগলু ও জেমস রবিনসন বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্রসমূহের সাফল্য ও ব্যর্থতার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় 'Inclusive' প্রত্যয়টির সার্থক তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছেন। তাদের দীর্ঘ পনের বছরের গবেষণার ভিত্তিতে লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ *Why Nations Fail?* এ 'Inclusive institution' শব্দবন্ধ দুটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, যেসব রাষ্ট্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'Inclusive' পলিসি নিয়েছে তারা সফল ও সম্পদশালী হয়েছে। আর যেসব রাষ্ট্র 'extractive' পলিসি প্রয়োগ করেছে তারা ব্যর্থ ও দরিদ্র রয়ে গেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তারা উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার কথা তুলে ধরেছে। ড্যারন এসিমোগলু ও জেমস রবিনসন অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:

> We will refer to political institutions that are sufficiently centralized and pluralistic as inclusive political institutions. When either of these conditions fails, we will refer to the institutions as extractive political institutions. Extractive political institutions concentrate power in the hands of a narrow elite and place few constraints on the exercise of this power. . . . [While] Inclusive political institutions, vesting power broadly, would tend to uproot economic institutions that expropriate the resources of the many, erect entry barriers, and suppress the functioning of markets so that only a few benefit. . . . The first level of our theory is about an institutional interpretation of history. . . . [and] Central to our theory is the link between inclusive economic and political institutions and prosperity.[২২]

উক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির যে-পরিচয় মেলে তার সাথে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রদ্বয়ের অনুসৃত 'পলিসি অব ইনক্লুজন' নীতি কতটুকু সামঞ্জস্যপুর্ণ তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আলোকে বিবেচনা করলে গবেষণাধীন সময়ের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ১৯৫৮-১৯৭০ পর্যন্ত একযুগ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত পনেরো বছর সময়কালে 'inclusive economic and political institutions' এর উপস্থিতি ছিল কিনা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়।

কারণ ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে 'পলিসি অব ইনক্লুজনে'র ধারণা তেমন প্রচলিত ছিল না – বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে। অবিভক্ত পাকিস্তানে একটি শক্তিশালী সামরিক-বেসামরিক ক্ষুদ্র এলিট

[২২] Daron Acemoglu and James Robinson, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* (USA, Turkey: Crown Business, 2012), p. 94.

গোষ্ঠীই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে যারা শক্তিশালী সেন্ট্রালাইজড বা কেন্দ্রীভূত নীতিতে আগ্রহী হলেও প্লুরালিস্টিক বা বহুত্বের ধারণায় ছিল চরম বিরোধী। বালুচিস্তানের গেরিলা নেতা ও বালুচিস্তান গণমুক্তি ফ্রন্টের একজন সামরিক অধিনায়ক চাকার খান এক সাক্ষাৎকারে অনুযোগের সুরে বলেছেন,

> এরা কোনোদিনও স্বীকার করেন নি ভারত থেকে আলাদা হওয়া দেশ পাকিস্তান হচ্ছে বাঙালি, সিন্ধি, বালুচি, পাঞ্জাবি আর পাঠানের সমন্বয়ে গঠিত একটা বহুজাতিক রাষ্ট্র। এরা বার বার বলতে থাকেন যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা এক জাতি ও জাতীয়তার ধুয়া তুললেন।[২৩]

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচিস্তান উভয় প্রদেশ উপজাতি প্রধান অঞ্চল হিসেবে খ্যাত। পাঠান, সিন্ধি, বালুচি প্রত্যেকের উপ-আঞ্চলিকতাবাদ প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তান সরকার এদের জাতিগত বা আঞ্চলিক পরিচিতিকে ধর্মভিত্তিক এক পাকিস্তানি পরিচয়ের ছত্রতলে নিয়ে আসে এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে চারটি প্রদেশকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান নামে একটি ইউনিট গঠন করে এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তা বহাল থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের অনুসৃত নীতি কোনো মতেই আধুনিক অর্থে ইনক্লুসিভের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস ও বাস্তবতা থেকে একটু ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত।(১.৪ অংশে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)

‘ইনক্লুজন’-এর তৃতীয় এবং আধুনিকতম প্রয়োগ দেখিয়েছেন ডেভিড এরিসন তাঁর সম্পাদিত *দ্য পলিটিক্স অব ইনক্লুজন এন্ড এক্সক্লুজন* বইতে যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত থাকা প্রান্তিক দল, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের দেশ ও সরকার পরিচালনায় অর্থপূর্ণ ও কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রদানের লক্ষ্যে সে দেশে ‘ডেমোক্রেটিক ইনক্লুজন’ ইস্যুটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। ডেভিড এরিকসনের গ্রন্থে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া হিসেবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ, আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারি নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচিত হয়েছে।[২৪]

---

[২৩] লরেন্স লিফসুলজ, *বাংলাদেশ : আনফিনিশড রিভ্যুলিউশন*, মুনীর হোসেন (অনু.) *অসমাপ্ত বিপ্লব: তাহেরর শেষ কথা* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ৫ম মুদ্রণ ২০১৬, ১ম সং, ১৯৮৮), পৃ.৬৯।

[২৪] This book examines different types of political inclusion and exclusion and their distinctive dimensions and dynamics. Why are particular social groups excluded from equal participation in political processes? How do these groups become more fully included as equal participants? Often, the critical issue is not whether a group is included but how it is included. Collectively, these essays elucidate a wide range of inclusion or exclusion: voting participation, representation in legislative assemblies, representation of group interests in processes of policy formation and implementation, and participation in discursive processes of policy framing. See, Ericson, *op. cit.*,

উপরি-উক্ত মানদণ্ড বা সূচকগুলোর উপস্থিতিকে ইনক্লুজন হিসেবে ধরে নিলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতিকে 'পলিসি অব ইনক্লুজন' পর্যায়ভুক্ত বলে ধরা যায়। কেননা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছে। যেমন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম গণতান্ত্রিক অভিষেক পর্বে ভোট পড়েছিল শতকরা ২৯ ভাগ।[২৫] অতপর ১৯৭০-এর নির্বাচনে ভোট গৃহীত হয় ৫১ ভাগের কাছাকাছি। সত্তরের নির্বাচনে পার্বত্য জনগণকে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে চট্টগ্রাম থেকে পৃথকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ আমলে অনুষ্ঠিত ১৯৭৩ এর নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তখন ২৯৯ আসনে ১,৩০,১৪৯ জন ভোটারের মধ্যে ৮৫,৪৫১ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে শতকরা হিসেবে যা ৬৬ ভাগ।[২৬] পার্বত্যবাসীদের ভোটে অংশগ্রহণ যেমন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সংসদীয় আসনও তিনটিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ শুন্য পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিগত দেড় যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী পদে সমাসীন থাকছেন পার্বত্য এলাকা থেকে নির্বাচিত সাংসদবৃন্দ।

১.৪ পাকিস্তানের 'জাতীয় সংহতি নীতি'র প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি

সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথাগত রাজাদের সার্কেল চিফ প্রশাসন বলবৎ রাখা, বিশেষ জেলাকে প্রাদেশিকীকরণ এবং গণতন্ত্রায়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকেই এ গবেষণায় 'পলিসি অব ইন্টিগ্রেশন' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু এর একটি ইতিহাস আছে। অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দুদের শাসনে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে এ শংকা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যেই পাকিস্তানের সৃষ্টি। অন্য কথায়, উপমহাদেশে একটি বৃহৎ সংখ্যালঘু সমস্যার আশু সমাধানের জন্যই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেখা গেল নতুন সংখ্যালঘু সমস্যা। তবে নবসৃষ্ট পাকিস্তানে এবার মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়; সংখ্যালঘু হিসেবে শাসিত হওয়ার ভয় তাদের তিরোহিত। এবার সংখ্যালঘু অমুসলমানরা। কেননা পাকিস্তানের সীমানা নির্দিষ্ট হওয়ার পর দেখা গেল পাকিস্তানের ভাগে পড়া মোট

---

[২৫] কামালউদ্দিন আহমেদ, '' 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচন: স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ'' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ৪৭৫।

[২৬] এ এস এম সামসুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন (১৯৭০-২০০১)* (ঢাকা: বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ. ৬৪।

৭০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ১৫ মিলিয়ন জনসংখ্যাই অমুসলিম সংখ্যালঘু। অমুসলিমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হিন্দু, খ্রিষ্টান, পার্সী ও বৌদ্ধ।[২৭]

এ তিন ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে আছে উপজাতীয় হিন্দু (পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী) ও বৌদ্ধ (চাকমা, মারমা, তংচঙ্গ্যা, চাক)। বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকে আবার ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রদত্ত উপজাতি[২৮] পরিচয় বহন করছে। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মধ্যে অধিকাংশই পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানে। হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার (৪১.৯ মিলিয়ন) ২২ ভাগ।[২৯] পাকিস্তানের বৌদ্ধদের মধ্যে যাদের অধিকাংশই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এবং যারা সবাই পূর্ব পাকিস্তানের একটি জেলা– পার্বত্য চট্টগ্রামে– বসবাস করে তারা হল দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। এদের সংখ্যা ৩,১৯,০০০। সুতরাং সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান উক্ত জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে সাংবিধানিকভাবে কী নীতি গ্রহণ করে তা ছিল একটি কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ভারতে সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬-এর জুলাই মাসে। উক্ত নির্বাচনে কংগ্রেস ২১০টি হিন্দু আসনের মধ্যে ১৯৯ টি এবং মুসলিম লীগ ৭৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৩ টি আসন লাভ করে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের গগনচুম্বী পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত ভারতের লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সভাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয় যার একটি হল ভারতের জন্য এবং অন্যটি নতুন পাকিস্তানের জন্য। এ সংবিধান সভার দুটি প্রধান কাজ হল সংবিধান রচনা করা এবং নতুন সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পার্লামেন্টের ভূমিকা পালন করা।

---

[২৭] G. W. Choudhury, *Constitutional Development in Pakistan* (London: Longman, 2nd edition, 1969), p. 58.

[২৮] ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের প্রস্তাবনায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয় যে উপজাতীয় অধিবাসীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বসবাসরত সকল অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত করা প্রয়োজন। এতে 'জুম্ম' ও 'পাহাড়ি' উভয় পরিচিতি ছাপিয়ে উপজাতি পরিচিতিই স্বীকৃত হয়। আবার এ আইন বহাল থাকা অবস্থায় ২০১০ সালে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়। সেই আইনে ইতিপূর্বে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে প্রতিষ্ঠিত 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের' নামকরণ পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' এবং ঐ আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাগুলোকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ২৩-ক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ''রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করিবেন। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকরিতে এখনো বহাল আছে উপজাতি কোটা, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটা। এটা হলো বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া অপ্রধান জাতিসত্তাগুলোর পরিচিতিকে কেন্দ্র করে আইনগত দিকের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলোর মধ্যেও তাদের সামষ্টিক পরিচিতি নিয়ে কোনো ঐক্যমত্য বা সর্বজন গ্রহণযোগ্য অভিধা নেই। ১৯৭২ সাল থেকে জেএসএসের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে 'জুম্ম জাতি' পরিচিতি নির্মাণের প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু নব্বই দশকের গোড়াতে তাদের সমর্থনপুষ্ট ছাত্র, নারী ও গণ পরিষদ 'জুম্ম' বাদ দিয়ে 'পাহাড়ি' ছাত্র পরিষদ, 'পাহাড়ি' গণপরিষদ নাম দিয়ে গঠনতন্ত্র রচনা করে। আবার ১৯৯৭-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও ১৯৯৮ সালে প্রণীত পা. চ. আঞ্চলিক পরিষদ আইনে উপজাতি পরিচয় স্বীকৃত থাকা অবস্থায় ২০০০ সাল থেকে জেএসএসের কর্ণধার সন্তু লারমা ও সমতলের আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং কে নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম। তাই আলোচ্য গবেষণায় গবেষণাধীন অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিচিতি হিসেবে পরস্পর পরিবর্তনযোগ্যভাবে উপজাতি, পাহাড়ি, পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা অভিধা ব্যবহার করা হয়েছে।

[২৯] Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration* (Dhaka: UPL, 2nd Imp. 2001), p. 23.

পাকিস্তানের ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৭ এর ১০-১৪ জুলাই। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পার্লামেন্টের বা সংবিধান সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন ১১ আগস্ট। উক্ত সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কী হবে এবং সংখ্যালঘুদের বিষয়ে রাষ্ট্রের নীতি কী হবে সে বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য পার্লামেন্টে একটি কমিটিও গঠিত হয়। এমনতর অবস্থায় পাকিস্তানের সংসদে ১১ আগস্ট সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে নতুন রাষ্ট্রের নীতি প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন যা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয় এবং তারা এটিকে 'ম্যাগনা কার্টা' বলে বিবেচনা করেন।[৩০] ভাষণের সারমর্ম হল এই:

> You may belong to any religion or caste or creed --- that has nothing to do with the business of the state . . . we are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste, or creed and another. We are starting with this fundemental principle that we are all citizens and equal citizens of one state . . . you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual but in the political sense as citizens of the State.[৩১]

উক্ত ভাষণে ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতপাত, মত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলনকালে পাকিস্তানের রূপকার জিন্নাহ ঘোষণা করেন:

> The flag of Pakistan was not the 'flag of any one particular party of community' and as I visualise it, the state of Pakistan will be a state where there will be no special privilages, no special rights for any one particular community or individual. It would be state where citizens will have equal privillages and will share equally all the obligations that lie on the citizens of Pakistan.[৩২]

প্যাকিস্তানের স্থপতির উপরে উদ্ধৃত নীতিগুলোই পাকিস্তানের পরবর্তী রাষ্ট্রীয় নীতির ইঙ্গিতবাহী। অর্থাৎ পাকিস্তান 'জবরদস্তিমূলক ইন্টিগ্রেশন' বা ইনক্লুজনের পথে এগুবে এটা স্পষ্ট। জিন্নাহ অল্প কদিন জীবিত ছিলেন তাই তার 'অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ' এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে বৈপরিত্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। তবে তিনি যে ঢাকার উর্দুভাষী রাজনৈতিক এলিটদের পরামর্শে বাংলা ভাষার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন তা আজ ইতিহাস। ফলে পরবর্তীকালে জিন্নাহর ঘোষণা মোতাবেক রাষ্ট্র কর্তৃক সকলকে

---

[৩০] G.W. Choudhury, *Op., Cit.*, pp. 58-59.

[৩১] Pakistan, *Constituent Assembly Debates*, Vol. 1. No. 2., pp. 19-20.

[৩২] *The Pakistan Times*, October 27, 1960.

সমসুযোগ-সুবিধা ও অধিকার প্রদানের নীতি উপেক্ষিত হয়। পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পাঞ্জাবি-মোহাজের চক্রের আধিপত্য কায়েম হয়। অন্যান্য জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায়, এমনকি প্রদেশের ওপর পাকিস্তানি জাতিগঠন ধারণা চাপিয়ে দেয়া হয় যার মূল তত্ত্ব ছিল এই যে শুধু ইসলামের মাধ্যমেই সিন্ধি, বালুচ, পাঠান, পাঞ্জাবি, বাঙালি, উপজাতির স্বতন্ত্র সংস্কৃতির মধ্যে একটা ঐক্য সৃষ্টি সম্ভব। আল্লাহ্ ও রাষ্ট্রের চোখে দেশের সবাই প্রথমত পাকিস্তানি, অন্য কিছু নয়।[৩৩]

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা মুসলিম নয়। সুতরাং ইসলামের জিগির এখানে ধোপে টিকবে না। ফলে পাকিস্তানি জাতি নির্মাতাদের এ এলাকায় ধর্মনিরপেক্ষ পন্থায় অগ্রসর হতে হয়। সেই পথ হলো নতুন আইন প্রণয়ন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিল্পায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তান সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধন করে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটাধিকার প্রদান করে। ১৯৬০ সালে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অত:পর ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালে নির্বাচনকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অংশগ্রহণ আরো জোরালো হয়।

১.৫ বাংলাদেশের রাজনৈতিক একীভূতকরণ নীতির পটভূমি ও পরিচিতি

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়েছে। এখানে এর একটি সংক্ষিপ্ত সার উপস্থাপন করা হল। পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের রাষ্ট্রক্ষমতাকে একপেশে ও গোষ্ঠীস্বার্থে প্রয়োগ, আকাশচুম্বী অর্থনৈতিক শোষণ ও অবহেলা এবং সাংস্কৃতিকভাবে জাতিগত চরিত্র ও মর্যাদা হননের নীতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় বাংলাদেশ। পাকিস্তানের সামরিক, কূটনৈতিক সমস্তঅভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে সগৌরবে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারও স্বাধীনতার অব্যবহিত পর তার বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা অধ্যুষিত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাজনৈতিকভাবে সুসংহত রাখা এবং পাহাড়ি জনগণের আনুগত্য আদায়ের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তকরণ নীতি গ্রহণ করে। নব্য রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি সম্পর্কিত নথি ও তথ্যসূত্র অপ্রতুল ও দুষ্প্রাপ্য। সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিবেদনই এ ব্যাপারে সামান্য আলোকপাত করে। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের (তখন প্রচার মাধ্যমে উপজাতীয় শব্দের দাপুটে প্রচলন ছিল) ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে বলে ঘোষণা দেন এবং বাংলাদেশের চাকরিতে উপজাতীয়দের ন্যায্য

[৩৩] লরেন্স লিফসুলজ, *বাংলাদেশ : আনফিনিশড রিভ্যুলিউশন*, পৃ. ৬৫।

হিস্যা প্রদান করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৩৪] অতপর ১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণায় তাঁর সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতির আভাস পাওয়া যায়: ‘‘Hill Tracts people as citizens of Bangladesh would enjoy equal facilities with people elsewhere in the country.’’[৩৫] অর্থাৎ ‘‘উপজাতীয় জনগণও স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক এবং অন্যান্য নাগরিকের মতোই সমান সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করবে।’’[৩৬]

বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১০ ভাগ এলাকা নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নীতিগত অবস্থান বঙ্গবন্ধুর ১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটিতে প্রদত্ত ভাষণে পরিষ্কার হয়। সেখানে অগণিত পাহাড়ি জনতার বিশাল সমাবেশে ঘোষণা করেন:

> পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের আর উপজাতীয় হিসেবে গণ্য করা হইবে না। তাহারা দেশের অন্যান্য এলাকার লোকদের সাথে সমান ও পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করিবেন . . . বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে পার্বত্য অধিবাসীদের ‘উপজাতীয়’ বলিয়া গণ্য করার বৃটিশ ও পাকিস্তানি শাসকদের অনুসৃত নীতির অবসান ঘটিয়াছে।[৩৭]

উক্ত ভাষণে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে পার্বত্যবাসী যে-বৈষম্যের ও বঞ্চনার স্বীকার হয়েছে তা অবসানের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের জনগণ যে সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকারের সুর এ ভাষণে প্রতিধ্বনিত হয়। শুধু তাই নয় স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার স্তরের সকল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধিকন্তু বঙ্গবন্ধু উত্তর রাষ্ট্র ক্ষমতায় সমাসীন সরকারসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। এর মধ্যে উপজাতীয় (২০১০ সাল থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর) সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উপজাতি জনগণ জাতীয় রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল স্রোতে চলে আসবে বলে আশা করা হয়।

এভাবে উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সরকারসমূহ সাম্রাজ্য সুসংহত রাখার উদ্দেশ্যে অঞ্চল ও জাতপাত ভেদে পৃথক পৃথক প্রশাসনিক রীতিপদ্ধতি প্রয়োগের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি থেকে

---

[৩৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২।
[৩৫] *Morning News*, June 7, 1973.
[৩৬] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ৭ই জুন ১৯৭৩ ।
[৩৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, শনিবার, ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৯৭৩ খ্রি.

সরে এসে রাজনৈতিক সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে ‘পলিসি অব ইন্টিগ্রেশন’ বা ‘সংহতকরণ নীতি’ গ্রহণ করে।

১.৬ ‘পলিসি অব ইন্টিগ্রেশনে’র ধারণাগত ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা

‘পলিসি অব ইন্টিগ্রেশনে’র নীতির ধারণাগত ও প্রয়োগিক কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বে তাবৎ রাষ্ট্রের ট্রাইবেল পলিসি প্রায় একই রকম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক প্রভুদের নিকট থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ জাতি-রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের সীমানার ভিতর যেসব অপ্রধান জাতিগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে একীভূতকরণের লক্ষ্যে দুটি নীতি অবলম্বন করে। এর একটি হল ডিট্রাইবেলাইজেশন বা বি-উপজাতীয়করণ নীতি যেখানে উপজাতীয়রা নিজস্ব রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় পরিত্যাগ করে প্রধান জাতিস্বত্ত্বার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাথে সংহতি ও একাত্ম হবে বলে ধরা হয়। অন্যটি হল ‘ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি’ বা ‘বৈচিত্র্যের মধ্য ঐক্যস্থাপন নীতি’ যেখানে রাষ্ট্রীয় সীমানায় অন্তর্ভুক্ত সকল অপ্রধান জাতিগোষ্ঠীসমূহ তাদের পৃথক নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও একাত্ম হবে বলে ধরা হয়।[৩৮] উপমহাদেশের দিকে তাকালে দেখা যায় ভারত তার জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য বহুলাংশে দ্বিতীয় কৌশল অবলম্বন করেছে যেখানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছে প্রথম পন্থা। অবশ্য বর্তমান (২০১৫-১৯) ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে (যেমন টেক্সট বুক পরিবর্তন, খ্রিস্টান-মুসলমানদের উপর নির্যাতন) তা ভারতের বহুত্ববাদী আদর্শকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

১৯৪৭ সাল থেকে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের জাতি নির্মাণের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয় রাজনৈতিক একীভূতকরণ নীতি। অন্য কথায় ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশ পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংহত রাখাই নতুন পাকিস্তান নির্মাতাদের ধ্যান জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য দরকার হয় সকল জাত, বর্ণ, শ্রেণি, বিশ্বাস ভেদাভেদ ভুলে কেবল ধর্মভিত্তিক নুতন জাতীয় পরিচিতি অর্থাৎ পাকিস্তানি পরিচয় ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং পাকিস্তানি জাতি গঠনের প্রক্রিয়া মজবুত ও মসৃণ হওয়ার পথে সমস্ত

---

[৩৮] Rafiqul Islam Chowdhury, et al., *Tribal Leadership and Political Integration: A case Study of Chakma and Mong Ttribes of Chittagong Hill Tracts*, (Chittagong: Faculty of Social Science, University of Chittagong, July 1979), p. 3.

প্রতিবন্ধকতাকে ধুলিসাৎ করাকেই তারা শ্রেয় বলে গণ্য করেছে। এস এম আলী পাকিস্তানের জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন,

> Pakistani leaders believed that national integration would be best served by dismantling barriers to the germination of a new national identity through intense interaction between the majority and the minority communities. They rejected the 'museum anthropology' view of multicultural societies, which sought to preserve minority characteristics so that future generations, presumably of the majority community, could come to observe and wonder. A unified vision of modernization was adopted for the development of the entire nation, in which maintenance of a patchwork state at varying stages of socio-political and technological evolution was thought unacceptable in a modern, post-colonial society.[৩৯]

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে এটি স্পষ্ট যে, নতুন জাতীয় পরিচিতি নির্মাণের পথে সমস্ত বাধাগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। ব্রিটিশরা যা করেছিল সাম্রাজ্যকে দ্রোহ-বিদ্রোহ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য এবং যা ছিল সাম্রাজ্যের সংহতি ও দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য সহায়ক সেটাই স্বাধীন পাকিস্তানে জাতীয় সংহতি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি বা প্রতিবন্ধক বলে বিবেচিত হয়। এমনতর বিবেচনার হেতু পাকিস্তানের আবির্ভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যার একটি হল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রখর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং অন্যটি ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি। নব্য পাকিস্তানে জিন্নাহ ও তাঁর অনুসারী নবাগত মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় মুহাজিরদের কোনো নির্বাচনী এলাকা ছিল না এবং তৃণমূলে কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। বলা যায় তারা 'ভাসমান নেতৃত্ব'। আশ্চর্যজনকভাবে এদের ওপর নির্ভরশীল ছিল মুসলিম লীগের রাজনীতি। ফলে আঞ্চলিকতা ও উপজাতিকতা তাদের নিকট অপ্রিয় বিষয় ছিল। পরিণামে এসব আঞ্চলিকতা ও উপজাতিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে পাকিস্তানি জাতি নির্মাতারা চেয়েছিল এক 'পাকিস্তানি' জাতীয় পরিচয় নির্মাণ করতে যার বহিরাবরণ হবে ধর্ম। তারা ভর করেছিলেন অতিমাত্রায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের ওপর। তা করতে গিয়ে তারা বহুত্বকে উপেক্ষা করেছেন সচেতনভাবে আর একককে করেছেন মুখ্য বিবেচ্য। অধ্যাপক রওনক জাহান যথার্থই বলেছেন, ''The policy pursued by the ''national elite''[of Pakistan] in the early years-- a policy of one state, one government, one economy, one language and one culture.[৪০]

---

[৩৯] S. Mahmud Ali, *The Fearful State: Power, People and Internal War in South Asia* (London and New Jersey: Zed Books, 1993), p. 11.

[৪০] Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration,* 2nd Impr. (Dhaka: UPL, 2001), p. 28.

প্রতিবেশী বৈরী রাষ্ট্র ভারতের সীমানায় রয়েছে পাকিস্তানের অধিকাংশ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। পূর্ব পাকিস্তান তিন দিক থেকে ভারত বেষ্ঠিত। সুতরাং উভয় অংশের উপজাতি অধ্যুষিত সীমান্তবর্তী জেলাগুলোই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংহতি ও নিরাপত্তার জন্য বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত পাহাড়ি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত জেলা যার দুদিকে ভারত আর একদিকে বার্মা [মানচিত্র-১ দ্রষ্টব্য]। তাই তাদেরকে জাতীয় মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই। সেজন্য পাকিস্তানি নেতৃত্ব শক্তি প্রয়োগ করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। যেমন- স্বাধীনতার অব্যাবহিত পর পাকিস্তান পার্বত্য চট্টগ্রামে বালুচ রেজিমেন্টের সেনা পাঠিয়ে পাহাড়িদের পাকিস্তানভুক্তি বিরোধী আন্দোলন মোকাবেলা করেছিল। তাই পাকিস্তান শুরুর দিকে পার্বত্যবাসীদের প্রতি যে ইন্টিগ্রেশন বা সংহতি নীতি গ্রহণ করে সেটিকে 'আরোপিত অন্তর্ভুক্তকরণ' বলা যায়।

মানচিত্র নং ১

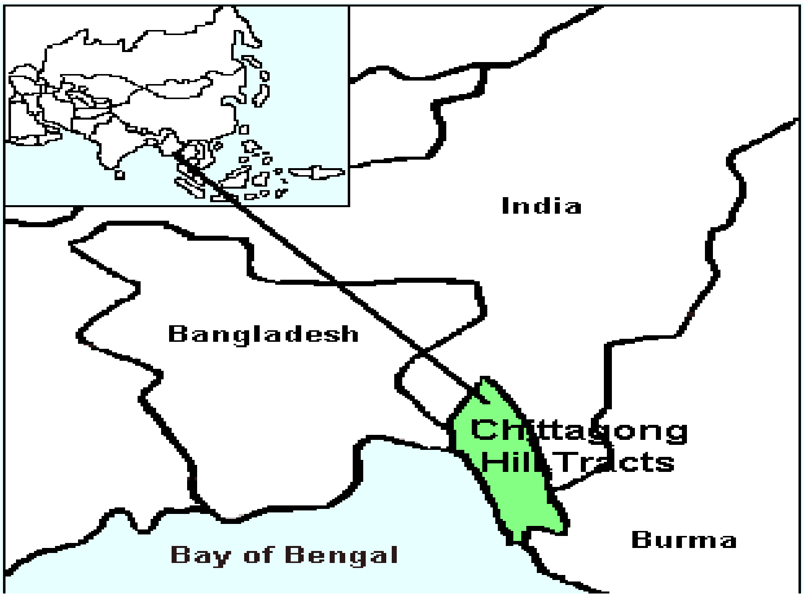

উৎস: CTTA: Counter Terrorist and Trends and Analysis. Vol. 3, Issue 4. International Center for Political Violence and Terrorism Research. April 2011

১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশ সামরিক শাসনের কবলে পড়লে পাকিস্তান যুগের রাষ্ট্রদর্শনের বহুলাংশে পুনরুত্থান ঘটে। ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি কায়দায় শক্তি প্রয়োগ করা হয়। শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক ইনক্লুজনের পথে এটি একটি বড় অন্তরায় ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারসমূহ সেটি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনায় প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটির মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর পরিচিতিমূলক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে মিশেল ফুকোর ব্যাখ্যাত ক্ষমতার উৎপাদনশীল চরিত্র বা ক্ষমতা প্রয়োগের প্রতিফল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণার রোডম্যাপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া ডেভিড এরিকসনের ‘‘Policy determines politics’’ গবেষণা কর্মের প্রতিপাদ্য ধরে নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক সরকারসমূহের বহির্ভূতকরণ এবং উপনিবেশ পরবর্তী সরকারসমূহের রাজনৈতিক একীভূতকরণ– এ পুরো প্রক্রিয়ার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সহায়ক হিসেবে থাকছে ইতিহাস, রাজনীতি বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি প্রভৃতি জ্ঞান-শৃঙ্খলার মিলিত ধারা।

১.৭ পার্বত্য অঞ্চলে রাষ্ট্রের প্রবেশ: কার্পাস মহল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উদ্ভব

কার্পাস মহল নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত, বস্তুনিষ্ঠ, এবং সংজ্ঞামূলক বর্ণনা দিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম গেজেটিয়ার প্রণেতা ও প্রশাসক-ইতিহাসবিদ, H. J. S. Cotton। তাঁর মতে,

> In the revenue language of Chittagong the `Kapas’ or Cotton Mehal denotes the revenue from the area now included in the Hill Tracts. The Hill Tracts were not formed into a separate district till 1860, and before that time the whole revenue derived from them was credited to Chittagong under the heading of Kapas Mehal.[৪১]

বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্রে অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অস্তিত্ব ছিল **১৮৬০** থেকে **১৯৮৩** খ্রি. পর্যন্ত। **১৯৮৩** থেকে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ইতিহাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে কোনো জেলার অস্তিত্ব কার্যত নেই। (রাঙামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি এ তিন জেলা নিয়ে কল্পিত অঞ্চল– পার্বত্য চট্টগ্রাম) **১৮৬০** খ্রিষ্টাব্দে একটি পৃথক প্রশাসনিক জেলা হিসেবে গঠিত হওয়ার পূর্বে এ এলাকা চট্টগ্রাম জেলার অংশ ছিল। মুঘল ও কোম্পানি আমলের চট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রে এ পার্বত্য অঞ্চলটি **কার্পাস মহল** নামে নথিভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য যে মুঘল আমলে প্রত্যেক সুবাকে কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগণা বা মহালে বিভক্ত করা হত। *আইন-ই-আকবরী*তে সুবা বাংলাকে উনিশটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে বেশ কতগুলি পরগণা বা মহালে বিভক্ত করার কথা উল্লেখ আছে। পরগণা বা মহালই ছিল শাসনের সর্বনিম্ন ইউনিট বা এলাকা। কিন্তু কার্পাস মহল কোনো পরগণা ছিল না। এমনকি মুঘল সরকারের কোনো প্রশাসনিক ইউনিটই ছিল না কারণ **১৭১৫** খ্রিষ্টাব্দের আগে

---

[৪১] H. J. S Cotton, *Memorandum on the Revenue History of Chittaong* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1880), p. 189.

কার্পাস মহলের অধিপতিরা মুঘল সরকারকে কোনো রাজস্ব বা নজরানা দিত না বলে প্রমাণ আছে। তাহলে কার্পাস মহলের অন্য অর্থ অনুসন্ধান করতে হয় অন্য কোথাও। মুঘল সরকার কর্তৃক উসুলকৃত রাজস্ব দুই ভাগে বিভক্ত ছিল– *মাল* ও *সাইর*। ভূমি রাজস্বকে *মাল* বলা হতো, কিন্তু ভূমি রাজস্ব ছাড়া অন্যসব প্রাপ্যকে এক সঙ্গে *সাইর* বলা হতো। *সাইর* এর মধ্যে ছিল: বহির্বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির ওপর শুল্ক, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পণ্যের ওপর শুল্ক, টাকশালের আয়, ব্যাংকার বা সুদ ব্যবসায়ীদের ওপর আরোপিত কর, কর্মকর্তা, জমিদার এবং অন্যদের পেশকাশ, নজরানা, সালামি ইত্যাদি।[৪২]

১৭১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পার্বত্য চাকমা রাজারা সমতলের ব্যাপারীদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবসা করার সুবিধার প্রতিদান স্বরূপ স্বেচ্ছায় মুঘল সরকারকে বাৎসরিক ভিত্তিতে কার্পাস প্রদানে সম্মত হয়।[৪৩] সে-হিসেবে এটি ছিল সাইর রাজস্ব অর্থাৎ এক প্রকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পণ্য পরিবহন শুল্ক। যেহেতু শুল্ক রূপ নজরানা দেওয়া হতো কার্পাসে তাই অঞ্চলটি **কার্পাস মহল** নামে পরিচিত হয়। বাংলার দেওয়ানি বা জমিদারি লাভের পর কোম্পানি মুঘল কায়দায় রাজস্ব উসুল করতে থাকে। চট্টগ্রাম ছিল কোম্পানির নিকট হস্তান্তরিত প্রথম তিনটি জেলার একটি। মীর কাসিম ও কোম্পানির মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ১৭৬১ সালে চট্টগ্রাম জেলা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কোম্পানি সরকার চট্টগ্রাম জেলায় দুটি উৎস থেকে রাজস্ব উসুল করতো তার একটি হল ভূমি রাজস্ব এবং অন্যটি হল সাইর রাজস্ব বা বিবিধ খাত থেকে সংগৃহীত রাজস্ব। এ বিবিধ খাতসমূহ হল যথা: ১) হাটবাজার; ২) চৌকি বা ঘাট ও দালাস ; ৩) সায়ের কসবা; ৪) ঘাট কাটালি; ৫) পান মহল; ৬) তামাক মহল; ৭) *কার্পাস মহল*; ৮) দাওকাটি মহল; ৯) মাই মহল; ১০) গুরকাটি মহল ও ১১) নিমক মহল। সুতরাং বিবিধ রাজস্ব খাতের ৭ নং তালিকায় বর্ণিত কার্পাস মহলটি চট্টগ্রামের জেলার পুর্বদিকের পাহাড়ি এলাকা নিয়ে গঠিত– চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল।[৪৪] সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি নাম কার্পাস মহল হিসেবে পরিচিত ছিল। চট্টগ্রামের বিখ্যাত খান পরিবারের লেখক মৌলভী হামিদুল্লাহ খানের *আহাদিসুল খাওয়ানিন* বা চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে (১৮৭১) পার্বত্য এলাকায় বিস্তর কার্পাস উৎপাদনের বিবরণ পাওয়া যায়:

> ইসলামাবাদের (মুঘল আমলের চট্টগ্রাম) পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে বিচিত্র সব পাহাড়ি জাতি। এরা জুমিয়া, চাকমা, মগ ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাদশাহী আমল থেকে তারা দিল্লির অনুগত্য স্বীকার করে চলেছে। ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশের অনুগত হিসেবে নিরুপদ্রবে বাস করছে। তারা আজো রাষ্ট্রানুগত। পার্বত্য অঞ্চলের এসব নিরীহ

---

[৪২] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* প্রথম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০), পৃ. ৫৩।

[৪৩] Alamgir Muhammad Serajuddin, ''The Chakma Tribes of the Chittagong Hill tracts in the 18th century'', *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* 1(1984): 90-98.

[৪৪] Alamgir Muhammad Serajuddin, *The Revenue Administration of East India Company in Chittagong 1761-1785* (Chittagong: University of Chittagong, 1971), p.149-150.

> অধিবাসীরা উৎপাদন করে বিস্তর তুলা, কার্পাস আর সুতা। কার্পাস উৎপাদন করেই এরা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা ক্ষেত খামারে প্রচুর কার্পাসের চাষ করে। কার্পাস উৎপাদন কমবেশি সকল উপজাতিদের মধ্যে বিরাজমান ছিল।[৪৫]

চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিশাল পার্বত্য এলাকা জুড়ে পাহাড়িরা জুমচাষ করতো এবং কার্পাস উৎপাদন করতো। ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ সালে উম্রি পালংসহ (রামুর পূর্বে বাঘখালি উপত্যকার একটি মারমা গ্রাম; যে-সর্দারের নেতৃত্বাধীন এই গ্রাম, তার উপাধি উম্রি পালং) পাঁচটি জুমিয়া মারমা গ্রামে সুতোর উৎপাদন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

> উম্রিপালং, পোমাঙ এটসেইন, তাউঙ পোক, তা-মাঙ-দাউঙ-সা, লাউঙ-দাউঙ্‌ সা, আর-রা-ও-সা পাঁচটি গ্রাম রাউসা–রোয়াসা–রোয়াজা কর্তৃক শাসিত; রাউসা হলো উম্রি পালং এর করদ প্রজা। সর্দারকে কোম্পানির নিকট সুতোর উপঢৌকন পাঠাতে হয়; সর্দার অনেক পরিমাণ সুতো চট্টগ্রামে পাঠায় এবং চট্টগ্রাম প্রদেশ থেকে ওই সুতো লক্ষ্মীপুরের কারখানায় রপ্তানি করা হয়। [৪৬]

স্মরণাতীত কাল থেকে কার্পাস তুলা ছিল পার্বত্যবাসীদের জুমে উৎপাদিত গুরুত্বপূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্য। উচ্চ পার্বত্যভূমি আঁঠাল প্রকৃতির; তাই সেখানে তুলার চাষ উৎকৃষ্ট হয়। ক্যাপ্টেন লুইন যেমন লিখেছেন, ‘‘The Hill Tracts, indeed, seem peculiarly well fitted, both in soil and climate, for the production of cotton.”[৪৭] এক জুমিয়া দম্পতি বৎসরে নয় কানি (প্রায় এগার বিঘা) জমিতে জুম করতে পারে। ততটুকু পরিমাণ জমিতে ৬ আড়ি ধানের পাশাপাশি ৩ আড়ি কার্পাস বীজ বপন করা যায়। ফলন ভাল হলে প্রত্যেক আড়ি (১৬ সের) জুমে ৫ মণ হতে ১০ মণ কার্পাস পাওয়া যায়। সে-হিসেবে প্রতি জুমিয়া পরিবার সর্বোচ্চ ৩০ মণ পর্যন্ত কার্পাস ফলায়। সেখান থেকে তারা কিছু তুলা নিজেদের বস্ত্র তৈরির প্রয়োজনে সংরক্ষণ করে এবং অবশিষ্ট তুলা চট্টগ্রাম জেলা থেকে আসা ব্যাপারীদের নিকট বিক্রি করতো। ক্যাপ্টেন লুইনের বর্ণনানুসারে প্রতি বছর ৫৫,৮৫৪ মণ তুলা জুমিয়া কৃষকরা সমতলের বাজারে নিয়ে আসতো।[৪৮] এজন্য জে পি মিলস্ তুলা বা কার্পাসকে বলেছেন, ‘The cotton crop is an unfailing

---

[৪৫] মৌলভী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর, *আহাদিসুল খাওয়ানিন: চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস* (বাংলায় অনু.) ড. খালেদ মাসুকে রসুল, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩, প্রথম প্রকাশ ১৮৫৫) পৃ. ৫১। বি. দ্র. মূল গ্রন্থটি ফার্সি ভাষায় লেখা।

[৪৬] Willem van Schendel (ed.) *Fransis Buchanan in Southeast Bengal (1798*), Dhaka: UPL, 1992 (অনু.) সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮* (ঢাকা: আইসিবিএস ৫, ১৯৯৪), পৃ. ৮৬।

[৪৭] Capt. T. H. Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong and the Dewellers therein; with Comparative Vocabularies of the Hill Dialect*s (Calcutta: Bengal Printing Company, Ltd, 1869), p. 8.

[৪৮] Capt. T. H. Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong and the Dewellers therein*; p. 8.

source of cash.'[৪৯] যার বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে পাহাড়িরা পরিবারের ব্যবহার্য যাবতীয় দ্রব্য যেমন লবণ, তেল, শুটকি ইত্যাদি ক্রয় করে নিয়ে যেত। উইলিয়াম হান্টারও পার্বত্য এলাকা থেকে কার্পাস তুলাকে প্রধানতম রপ্তানি দ্রব্য বলে উল্লেখ করেছেন:

> Raw cotton forms, undoubtedly, the most valuable export from the Hill Tracts, some portion of the crops is locally consumed in the manufacture of home-spun cloth; but the greater part is sold to the Bengali traders and floated to Chittagong on bamboo rafts.[৫০]

অন্যদিকে ১৯০৯ সালে সতীশ চন্দ্র ঘোষের *চাকমা জাতি* গ্রন্থে উনিশ শতকের প্রথম থেকে চট্টগ্রামের উত্তর অঞ্চল সীতাকুন্ডের পাহাড়ে ৭-৮শত পরিবার জুমিয়া মঘদের দ্বারা জুমচাষের কথা উল্লেখ করেছেন।[৫১] জুমিয়ারা জুমচাষের মাধ্যমে তুলা উৎপাদন করতো যা পুর্বেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং দক্ষিণে কক্সবাজারের রামুর উম্রিপালং থেকে সীতাকুন্ড পর্যন্ত এবং পূর্বে বুকানন বর্ণিত, 'হাতিকা মু' (হাতির মুখ: বরকলের একটি মৌজা) পশ্চিমে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কার্পাস মহল।

১৭৬১ সালে কাউন্সিল প্রধান হিসেবে হ্যারি ভেরেলস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন উত্তর কার্পাস মহলের অধিপতি ছিলেন চাকমা রাজা শেরমুস্ত খাঁ। তৎকালীন চট্টগ্রামে যে-৩৯ জন জমিদার খাজনা আদায় করতেন শেরমুস্ত খাঁ তার অন্যতম। ভ্যারেলস্ট দেখতে পান মুঘল আমল থেকে রাঙ্গুনীয়ার কোদালা মৌজায় চাকমা রাজার বন্দোবস্তীকৃত জমিদারি এস্টেট যেমন রয়েছে তেমনি কার্পাস মহল থেকে মুঘল সরকারকে কার্পাস প্রদানের কর্তৃত্বও তাঁর। সুতরাং সমতলের জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীদের সাথে কার্পাস মহলের রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির আগেই তিনি এর একটি ফয়সালা যথোচিৎ মনে করলেন। সেজন্য ভেরেলস্ট দায়িত্বভার গ্রহণের দুবছর পর ১৭৬৩ সালে চাকমা রাজা শেরমুস্ত খাঁর এখতিয়ারধীন সীমা নির্দেশ করেছেন ঠিক এভাবে, ''All the hills from the Pheni river to the sangu, and and from Nizampur road to the hills of the Kuki Raja''[৫২]

অন্যদিকে সাঙ্গু নদী উপত্যকায় আরেকজন পার্বত্য রাজা কার্পাস মহলের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি হলেন মারমা জাতির সর্দার কংহ্লা প্রু। যার বিস্তারিত বর্ণনা বুকানন লিপিবদ্ধ করেছেন ১৭৯৮ সালে। এটি আশ্চর্যজনক যে, ভেরেলস্টের ঘোষণার সাথে বুকাননের বর্ণনার চমৎকার সাযুজ্য

---

[৪৯] J. P. Mills, ''Notes on the Peoples of the Chittagong Hill Tracts." *Census of India*, 1931, Appendix II.

[৫০] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal* Vol. VI (Delhi: D. K. Publishing House, repnt 1973), 199.

[৫১] সতীশ চন্দ্র ঘোষ, *চাকমা জাতি*, (কলকাতা: অরুণা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ৭৪।

[৫২] R. H. Sneyd Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer* (Delhi: Vivek Publishing Company, Reprint, 1978, 1st issue 1909), 24.

রয়েছে। কারণ বুকানন সাঙ্গু নদীর তীরে স্রোতোস্বিনী সুয়ালকে অত্যন্ত প্রভাবশালী এক মগ গোত্রপতির রাজ্য প্রত্যক্ষ করেন। বুকাননের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

> ১৮ এপ্রিল ১৭৯৮। ভোরবেলায় আমি কাউঙ-লা-প্রুর সঙ্গে দেখা করার জন্য রওয়ানা হই; বাঙালিরা কাউঙ-লা-প্রুকে একটা অশ্রুতিমধুর শব্দের খেতাব দিয়েছে 'পোন গিরি'। [আরাকান শাসনামলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তাদের প্রদত্ত উপাধি- বোমাঙগ্রি] বাজার থেকে তিন চার মাইল দূরে এসে একটা স্রোতস্বিনীর মুখোমুখি হলাম; যা তরঙ্গবহুল এবং বৃষ্টির জলে উচ্ছসিত, এর নাম সুলোক। প্রণালীর উপর দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমি জুম সর্দারের আবাসস্থলে পোঁছুই, নদীর পূর্ব প্রান্তে তার আবাস। . . . পৌঁছুনোর অল্প পরেই কাউঙ-লা-প্রু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; কাউঙ-লা-প্রু একজন ছোটখাট নির্ভীক প্রকৃতির দুরন্ত মানুষ, যার অবয়বে বার্মিজদের বৈশিষ্ট্য প্রকট, এবং মনে হল তাঁর বয়েস পঞ্চাশের মতো। অনেক সাঙ্গপাঙ্গের সঙ্গে পালকিতে করে তিনি এসেছেন, কিন্তু সবাই সহজ স্বাভাবিক। কাউঙ্-লা-প্রু খুব ভদ্রলোক; . . . তিনি বললেন, জুম্মদের আসল নাম 'মা-রা-মা', এবং এই 'মা-রা-মা'রা এই অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে বাস করছে। [যাহোক] এ সর্দারের আসল নাম অভিধা হলো: পো-মাঙ কাউঙ-লা-প্রু। পোমাঙ হলো তাঁর খেতাব, যার অর্থ প্রধান নেতা, সর্দার অধিপতি। কাউঙ-লা হলো তাঁর মূল নাম; আর 'প্রু' অর্থ হলো সাদা, এটা তাঁর পরিবার বা বংশের নাম।[৫৩]

এ কংহ্লা প্রু বান্দরবন জেলার বোমাং সার্কেলের রাজাদের প্রবাদপ্রতীম কিংবদন্তী পুরুষ। আর বোমাং রাজা কংহ্লা প্রুর ছিল সাঙ্গু নদীর তীরে জমিদারি। তিনি অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৯০-১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা রাজা জান বক্স খাঁর পাশাপাশি কোম্পানি সরকার এই কংহ্লা প্রু র সঙ্গেও কার্পাস আদায়ের দশসনা বন্দোবস্ত সম্পাদান করে।

মৌলভী হামিদুল্লাহ খান তাঁর *আহাদিসুল খাওয়ানিন* বা খানদের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে, আরেক জন বিচক্ষণ মগ/মারমা সর্দারের কথা উল্লেখ করেছেন। যার বংশদরগণ লুইনের (১৮৬৬-১৮৭৪) বদান্যতায় তৎকালীন রামগড় মহকুমা বা সাবডিবিশনের অধীন মানিকছড়িতে মানরাজা বা মং সার্কেলের রাজা হিসেবে স্বীকৃত হন। মৌলভীর বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ

> আমার জানা একটা আশ্চর্য ঘটনা এই যে মগ গোত্রের একটি লোকের নাম ছিল কোনছা দাহমায়ী (কুঞ্জ ধামাই) সে বাস করতো পাহাড়ের উত্তর অঞ্চলে। আমার পিতার জমিদারির অন্তর্গত ছিল তার বসতবাড়ি।... সে নিজের প্রাণঢালা খেদমত আর প্রতিভার বলে আমার পিতার দরবারে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করে। . . . আমাদের জমিদারির মধ্যে পাহাড়ি অঞ্চলের এক স্থানে জমিন ছিল কার্পাস চাষের বেশ উপযোগি। পিতা লোকটাকে আমাদের সরকার থেকে সে জমিন বন্দোবস্ত দিয়ে দেন। বিনিময়ে লোকটা খাজনা হিসেবে কিছু অর্থ আমাদের সরকারে জমা দিত। সে ছিল পিতার একান্ত অনুগত এবং তাঁর হুকুম পালনে অত্যন্ত তৎপর।[৫৪]

[৫৩] সালাহউদ্দীন আইয়ুব (অনু.) *দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুকানন (১৭৯৮)*, পৃ. ১১১-১১৪।
[৫৪] মৌলভী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর, *আহাদিসুল খাওয়ানিন: চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস*, পৃ. ৭৬।

সরকারি প্রকাশনাতেও মানরাজা কনজয় মতান্তরে কুঞ্জ ধামাইয়ের (১৭৯৬-১৮২৬) প্রশংসাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায় যা মৌলভীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে। ১৯৩৬ সালের কলকাতা গেজেট মং রাজা কুঞ্জ ধামাই সম্বন্ধে লিখেছিল,

> Of the successive Mong Raja, the name of Mong Raja became prominent. He was an energetic administrator. He assisted the authorities in various ways and in recognition of his extra-ordinary valour and devotion to duty, he obtained the reward of a ‘‘sword’’ of Honour from the British Government. The ‘‘sword” was called in the local language as ‘‘Dhamai” and presentation of a sword of honour was so widely circulated in the Hill Tracts that Kongjoy’s family title ‘‘Manraja” was absorbed and his name became prominent as being the *holder of Dhamai.* Mongraja Kongjoy was thus commonly known as Kongjoy Dhamai.[৫৫]

চট্টগ্রামের এই প্রভাবশালী জমিদার মৌলভী খান বাহাদুরের বদান্যতায় একখণ্ড জমি লাভ ছিল ভাগ্যান্বেষী কুঞ্জ ধামাই ও তাঁর উত্তর পুরুষদের জন্য পরম আশীর্বাদস্বরূপ। এ জমি লাভের সূত্রধরে তারা প্রভুদের খেদমত ও মনোরঞ্জনের সময়োচিত পদক্ষেপের গুণে ব্রিটিশ শাসকদের বদান্যতা লাভ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে মান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পরবর্তী মং দলপতি ক্যজ সাইনের (১৮২৭-১৮৭০) কৃতকর্মেও এ ঘটনার সমর্থন মিলে যখন ক্যাপ্টেন লুইন স্বগোক্তি করেন:

> I bethought myself of a visit of thanks which I owed to the Mong Raja, who had given me the guardian image of my bed chamber, and who wished to entrust to me the care and education of his son. On reaching Maniksari, the chief’s village, I was lodged in a large room in the Raja’s own house, which was ordinarily used by him as palace of assembly or to transact business in. This was a mark of great and special favour, as no Englishkman had hitherto been thus admitted into family intimacy ... On the present occaison, being an honoured guest, my dinner was prepared under the Rani’s own supervision, and when it was served she herself pressed me to eat, and even selected and offered me with her own slender fingers certain specially choice and delicate morsels. I had courageously consumed cane tops, bamboo shoots, with divers unknown comestibles, when my hostess appeared, smiling with hospitable intent, and bearing in her hand a small brass cup, which she placed before me. It contained four large white grubs, delicaltely fried in oil, and offered to my shuddering lips.[৫৬]

---

[৫৫] ‘‘Family History of the Mong Raja,” *The Calcutta Gazette*, May 14, 1936, p. 4.

[৫৬] Lt. Col. T. H. Lewin, *A Fly on the Wheel* (London: Constable and Company Ltd., 1912), pp. 237-238.

ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করে বিবিধ সুবিধা আদায় উনিশ শতকের বাংলায় উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির রেওয়াজে পরিণত হয়। মং রাজারা তার ব্যতিক্রম নন।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সরাসরি ব্রিটিশ অধিকারে আসার আগে চাকমা ও দুই মঘ সর্দারের শাসনাধীনে ছিল চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, খিয়াং, বম, লুসাই প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন যাদের জীবিকার মূল অবলম্বন হল জুমচাষ।

১৭৭২ সাল থেকে কোম্পানি কার্পাস মহল থেকে রাজস্ব আদায় শুরু করে। কিন্তু মুঘল আমল থেকে প্রচলিত কার্পাস আদায়ের পদ্ধতি পরিবর্তন করে। কার্পাস মহলের কর আদায়ের নামে কোম্পানি সরকার চাকমা রাজার প্রধান দেওয়ান রনু খাঁকে পাশ কাটিয়ে বাইরের লোকদেরকে কার্পাস মহলের ইজারা প্রদান করলে[৫৭] চাকমারা ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করে এবং ১৭৮৭ সালে চাকমা রাজা জান বখশ খাঁ লর্ড কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে বিদ্রোহের অবসান ঘটান।[৫৮] অতঃপর কর্ণওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। কিন্তু কোম্পানি সরকার ১৭৯৩ সাল থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনায় বাংলায় প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা কার্পাস মহল খ্যাত পার্বত্য অঞ্চলে প্রয়োগ করেনি। ফলে একই জেলাভূক্ত চট্টগ্রামের জমিদাররা ভূমিতে স্থায়ী স্বত্ব বা মালিকানা লাভ করলেও পার্বত্য রাজারা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা থেকে কার্পাস মহলকে বহির্ভূত রাখার লর্ড কর্ণওয়ালিসের এ নীতি ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির ইঙ্গিতবাহী। তবে ১৭৯০-১৭৯১ সাল থেকে দুই পার্বত্য রাজা এবং অন্য পেটি সর্দারদের সাথে কার্পাস তুলার পরিবর্তে নগদ টাকায় (৫৩৮১ টাকা ও ৫৭০৩ টাকায়) খাজনা আদায়ের দশসনা বন্দোবস্ত ব্যবস্থা জারি হয়।[৫৯]

চট্টগ্রাম জেলার বিবিধ রাজস্ব উৎসের অন্যতম উৎস হিসেবে 'কার্পাস মহল' খ্যাত পাহাড়ি উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য এলাকার প্রশাসনিক যোগাযোগ কেবলমাত্র রাজস্ব উসুল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পার্বত্য রাজারা তাদের অধীনস্ত দেওয়ান, রোয়াসা, পাইংসি, আমু প্রভৃতি প্রশাসকদের দিয়ে স্ব স্ব অঞ্চল শাসন করতেন। মাঝে মধ্যে চট্টগ্রামের কমিশনারগণ কার্পাস মহলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বাংলা সরকার কমিশনার দিগকেই সে বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের তাগাদা দিতেন। ১৮২৯ সালে চট্টগ্রামের কমিশনার ন্যাথানিয়েল হেলহেড এর মন্তব্য প্রতিবেদনটি বেশ আলোচিত: তাঁর প্রতিবেদনে তিনি বাংলা সরকারকে অবহিত করেন যে পাহাড়ি উপজাতিরা ব্রিটিশ প্রজা নয় এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার

---

[৫৭] Suniti Bhushan Qanungo, *Chakma Resistance to British Domination* (Chittagong: Published by author, 1998), p. 52.

[৫৮] R. H. Sneyd Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer*, p. 24.

[৫৯] Henry Rickets, ``Report on the Forays of the wild tribes of Chittagong Frontier'' in *Selections from the Records of the Bengal Government* N. XI, Calcutta: 1853, pp. 78-100.

কোনো অধিকার বাংলা সরকারের নেই। সরকার তার প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কি জবাব দিয়েছেন সেটি অজানা। কিন্তু ১৮২৪ সালে ইঙ্গ-বার্মিজ যুদ্ধের মাধ্যমে কার্পাস মহলের প্রতিবেশি রাজ্য আরাকান ব্রিটিশ দখলাধীনে চলে আসার পর 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতি' পরিবর্তন হয়। উক্ত যুদ্ধের পর ১৮২৬ সালে সম্পাদিত *ইয়ানদাবো চুক্তির* শর্তানুসারে বর্মী রাজা তাঁর প্রভাবাধীন করদরাজ্য আসাম, কাছার ও মনিপুর ব্রিটিশদের নিকট ছেড়ে দিলে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক হিসাব নিকাশ নতুন মোড় নেয়। এসময় চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশদের পরিকল্পনা ছিল চট্টগ্রাম বন্দরকে রপ্তানি বন্দর হিসেবে গড়ে তোলা। এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হবে কাছাড়, সুরমা উপত্যকা ও মণিপুরে উৎপন্ন দ্রব্য। [৬০]

বার্মা থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে অবাধ বিচরণশীল স্বাধীনচেতা অদম্য উপজাতিরা (সেন্দু, বনযোগী, ম্রুং, খুমি, খিয়াং) ব্রিটিশদের এ অনুপ্রবেশ তাদের অবাধ স্বাধীনতার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে কোম্পানি সরকার ঐ উপজাতিদের সঙ্গে সম্মুখ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। অদম্য উপজাতিরা তাদের লুঠতরাজ, খুন, জ্বালাও পোড়াও, অপহরণ প্রভৃতি অপরাধী কার্যক্রমের মাধ্যমে 'পূর্বাঞ্চলের মারাঠা' হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৮৩০ এর দশকে নাগাদের কোম্পানি বসতি ও সীমান্ত চৌকির উপর আক্রমণ দিয়ে শুরু হয় এ সংঘাত। শুধু তাই নয় যুদ্ধবাজ উপজাতিরা ত্রিপুরা রাজা, চাকমা রাজা এবং বোমাং রাজাদের ভাড়াটে সেনা (মার্সিনারিজ) হিসেবেও সম্পদ বানাতে থাকে। উত্তর-পূর্ব ভারত বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক সুবির ভৌমিকের পর্যবেক্ষণে যা উঠে এসেছেঃ ''The region has also witnessed the frequent use of the Lushai tribesmen as mercenaries in Tripura and the Chittagong Hill Tracts, both by rebellious royalist pretenders and by the Kings.''[৬১]

১৮৪০ এর দশকে বোমাং রাজ পরিবারের উত্তরাধিকার প্রশ্নে পারিবারিক বিবাদ ঘটলে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। একইভাবে এ সময়ে রানি কালিন্দী সৃষ্ট মনুষ্য-তালুকদারদের মধ্যেও আধিপত্য বিস্তারের লড়াই শুরু হয়। ফলে পরিস্থিতি এভাবে আরো চলতে দেয়া যায় কিনা শাসক মহলে আলোচনা চলতে থাকে। প্রথমে বোমাং রাজ পরিবার সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। বোমাং রাজা কংহ্লা প্রু (১৭৫৬-১৮১৯), যিনি কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীর থেকে নাফ নদী পর্যন্ত শাসন করতেন, তাঁর উত্তরাধিকারী সাথাং প্রুর মৃত্যুর (১৮২২-১৮৪০) পর বোমাং রাজ পরিবারে উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদের সুত্রপাত। সাথাং প্রুর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর ভাই ওম প্রুর নিকট কার্পাস মহলে দায়িত্বভার অর্পণ করে যান। কিন্তু তাঁর

---

[৬০] Henry Rickets, ``Report on the Forays of the wild tribes of Chittagong Frontier''p. 78-100.
[৬১] Bhaumik, Subir, *Insurgent Crossfire North-East India*, (New Delhi: Lancer Publishers Pvt. Ltd., 1996), p. 57.

অজনপ্রিয়তা ও অব্যবস্থাপনার ফলে তার অন্য ভাইরা বান্দরবান থেকে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ঐ এলাকায় নিজ নিজ রাজত্ব কায়েম করে। এভাবে রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই আরম্ভ হয়। তারা এক ভাই অপর ভাইকে পরাভূত করার জন্য আক্রমণাত্মক উপজাতিদের ভাড়াটে সেনা হিসেবে নিয়োগ করে। এতে ঐ এলাকায় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আক্রমণ প্রতি আত্রমণ, খুন, অপহরণ, লুঠতরাজ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে রাজস্ব আদায় নির্বিঘ্ন করার জন্য কোম্পানি সরকারের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ আমলে উত্তর-পূর্ব ভারত বিশেষজ্ঞ আলেকাজান্ডার ম্যাকেঞ্জি সমকালীন পরিস্থিতির একটি চমৎকার তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন।

> From 1840 a state of anarchy prevailed owing to the family quarrels of the Phrus which first drew the serious attention of Government to the internal conditions of the Hill Tracts. During the two years preceding Satung Phru's death we had heard from time to time of sanguinary attacks upon villages subordinate to the Phrus. In 1830, in 1834 and again in 1835, such raids had taken place; the attacking parities being Mrungs, Kumis, or Bunjogis. Before 1830 our records are almost blank, recording nothing but the payments of revenue at the appointed times. Now, how ever, the dissensions of the Phrus and the anarchy which followed brought about a series of outrages, of which few details reached the ears of local officers at the time, but of the reality of which there was an ample evidence discovered afterwards. The fact appears to have been that the various members of the Phru family took up different positions in the hills, and perpetrated constant forays upon each other's villages, calling in the outer tribes to assist in the bloody work. These threatened the security of our revenue and demanded premptory interference.[৬২]

বোমাং রাজ পরিবারের উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার চট্টগ্রামের তৎকালীন কমিশনার মি. হেনরি রিকেটসকে পুরো ঘটনার সরেজমিনে প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রেরণ করে। কমিশনার মি. রিকেটস সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত তদন্ত সাপেক্ষে কংহ্লাইঞোকে দক্ষিণ কার্পাস মহলের চিফের দায়িত্ব দেন এবং বাকীদেরকে নির্দিষ্ট গোত্রের ওপর রাজস্ব সংগ্রাহক হিসেবে দায়িত্ব দেন এবং ভ্রাতৃ বিবাদ ভুলে সবাইকে বান্দরবনে বসবাসের বন্দোবস্ত করেন। সেই সাথে সরকারকে প্রদেয় রাজস্ব ৪,৫৬৪ টাকা থেকে কমিয়ে ২৯১৮ টাকায় নির্ধারণ করেন এই শর্তে যে, তারা এলাকার শান্তি রক্ষার্থে অর্থাৎ আক্রমণকারী উপজাতিদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সর্বোপরি রিকেটস সর্বপ্রথম কার্পাস মহলকে রেগুলেশন

---

৬২ Alexander Mackenzie, *History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of North-East Frontier of Bengal* (Calcutta: The Home Department Press, 1884), p. 333.

জেলা চট্টগ্রামের অংশ হিসেবে শাসনের ত্রুটি কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। প্রকারান্তরে তিনি কার্পাস মহলকে চট্টগ্রাম জেলা থেকে আলাদা করার সুপারিশ করেন। সুতরাং ১৮২৯ সালে কমিশনার হেলহেড ও ১৮৪৭-এর কমিশনার রিকেটসের কার্পাস মহল সর্ম্পকিত নীতিগত অবস্থান সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। কিন্তু বোমাং শাসনাধীন গ্রামসমূহে কোলাডাইন নদীর তীর থেকে আসা কুকি উপজাতিদের তাণ্ডব চলতেই থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে চাকমা রানি কালিন্দীর শাসনাধীন কার্পাস মহলেও তাঁর অধীনস্ত দেওয়ানদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। তাঁর দুই প্রভাবশালী দেওয়ান গিরিশচন্দ্র দেওয়ান ও ত্রিলোক চন্দ্র দেওয়ানের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তারা উভয়ে কুকিদেরকে ভাড়াটে সেনা হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। এক পর্যায়ে ত্রিলোক চন্দ্র দেওয়ান বিপক্ষ দলের ভাড়াটে কুকিদের হাতে প্রাণ হারালে তার পুত্র নীলচন্দ্র দেওয়ান মর্মাহত হয়ে ভ্রাতৃঘাতী বিরোধ মীমাংসার জন্য তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। কেননা রানি কালিন্দীর পক্ষে রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে বিরাজমান প্রাণঘাতি দ্বন্দ্ব নিরসন সম্ভবপর নয়। সেজন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য ও আশ্রয় লাভের আশায় চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বিরোধ মীমাংসা এবং নিষ্ঠুর ও দুর্ধর্ষ কুকিদের বশে আনার জন্য যে প্রভূত অর্থ ও শক্তির ব্যয় প্রয়োজন সে তুলনায় ঐ রাজ্য দখল করে আর্থিকভাবে সরকারের লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানান। পরে নীল চন্দ্র দেওয়ানের অনুরোধে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং জানতে পারেন যে কয়েকটি কারণে অঞ্চলটি সরাসরি শাসনে নিলে ভবিষ্যতে ফলদায়ক হবে। কামিনী মোহন দেওয়ান তাঁর আত্মজীবনীতে এর বর্ণনা দিয়েছেন,

> নিলচন্দ্র দেওয়ানের আগ্রহাতিশয়ে তদন্তক্রমে (ম্যাজিস্ট্রেট) জানিতে পারিলেন যে ক্ষুদ্র হইলেও কর্ণফুলী নদীর যথেষ্ট গভীরতা আছে; তাহাতে বৃহদাকার বাষ্পীয় যানাদি যাতায়াতের পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। পরন্তু পাহাড়ের উপত্যকা ভূমিগুলি অনেক স্থলে সমতল হলকৃষি উপযোগী জমিতে পূর্ণ রহিয়াছে। বিশেষত ব্রহ্মদেশ ও আসামের এই মধ্যবর্তী উপজাতি অধ্যুষিত জায়গা অধিকারে না থাকিলে ভবিষ্যতে অসুবিধার কারণ উপস্থিত হইতে পারে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া, তিনি এ বিষয়ে গভর্ণর বাহাদুরকে লিখিয়া তাঁহার সম্মতি আনয়ন করিলেন।[৬৩]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত নিরসন এবং আগ্রাসী উপজাতিদের দমন এবং সম্প্রসারণশীল ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে কার্পাস মহল সরাসরি শাসনাধীনে নিয়ে আসা জরুরি হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু আর্থিকভাবে অলাভজনক হওয়ায় শাসক মহলে আরো বিশদ চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত করা হয় এবং ১৮৩৩ সালের কোম্পানি সনদে ইউরোপীয় উদ্যোক্তাদেরকে

---

[৬৩] কামিনী মোহন দেওয়ান, *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী* (রাংগামাটি: সরোজ আর্ট প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ১৬-২৪।

বাংলায় জমি ক্রয় ও ইজারা নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। এ সময় থেকে বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্যিক লেনদেন ও বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিক চাষাবাদ নতুন গতি লাভ করে। আসামে ইতিমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে চা উৎপাদন শুরু হয়েছে। চা উৎপাদনের জন্য নিরাপত্তা বিধান পূর্বশর্ত। তাই আগ্রাসী উপজাতিদের যেকোনো উপায়ে বশে আনা বাংলা সরকারের নীতি নির্ধারকদের বিবেচনায় আসে। সেই লক্ষে ১৮৩২ সাল থেকে নাগাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। কিন্তু চট্টগ্রামের পূর্বদিকের কুকিরা ব্রিটিশ নাগরিকদের ওপর অরিরাম আক্রমণ চালাতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকাও চা চাষের উপযুক্ত। সুতরাং দিগন্ত বিস্তৃত পার্বত্য এলাকা ইউরোপীয় উদ্যোক্তাদের নেক নজরে চলে আসে। শুধু তাই নয়, ভারতে রেলপথের জনক লর্ড ডালহৌসীর সময়কালে রেলপথের নির্মাণ কাজ বেসরকারি উদ্যেক্তাদের ওপর অর্পিত হয়। সুতরাং সম্প্রসারণশীল রেলপথের স্লিপার তৈরির জন্য কাঠ এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কাঠ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে পার্বত্য এলাকার বনভুমি ব্যবহার তাদের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু কার্পাস মহলের নানা প্রান্তে শীতকালে প্রতি বছর লুসাই সেন্দুদের আত্রমণ কোম্পানি সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ১৮৫৩ সালে পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য পুনরায় কুরি ও কলভিন পূর্বাঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং তারাও রিকেটস এর অনুরূপ সুপারিশ ব্যক্ত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোম্পানি সরকার দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থায় থাকে।

অতপর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিতে একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনে তার পুনর্গঠন অনিবার্য করে তুলেছিল। এর ফলে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ‘এন এ্যাক্ট ফর দ্য বেটার গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া’ শীর্ষক একটি আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস করে ভারতের শাসন ক্ষমতা বাণিজ্যিক সংস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে এসে যায়। অর্থাৎ ইংল্যান্ড যে রাজা অথবা রানি দ্বারা শাসিত হবে, ভারতও তাঁর দ্বারা শাসিত হবে, এ নিয়ম চালু হয়। এর ফলে বিদ্রোহোত্তর কালে ভারত-সরকারের নীতিতেও আসে পরিবর্তন। চট্টগ্রামের পাহাড়ি সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে তাই কোম্পানি সরকারের দোদুল্যমান নীতিরও অবসান হয়।

এদিকে কুকিদের উপর্যুপুরি আক্রমণ এবং সে আক্রমণ মোকাবেলায় পাহাড়ি চিফদের অসহায়ত্ব কার্পাস মহলের নিরাপত্তা নিয়ে স্থানীয় শাসকমহলে সৃষ্টি হয় গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৯ সালে বাংলা সরকারের লে. গভর্নর পিটার গ্রান্ট কার্পাস মহলের শাসন সরাসরি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রনে নেওয়ার সুপারিশ করেন। ১৮৬২ সালের সরকারি কার্যবিবরণীতে এ প্রসঙ্গে লেখা হয়

> This tract of country having frequently been the scene of murderous raids supposed to be committed by the savages inhabiting the Hills to the still further

East, North-East, and South-East, generally known by the common name of ‘‘Kookies”, its removal from the jurisdiction of the local tribunals and its government by a special Agency were proposed by the Govt. of Bengal in 1859, and in 1860 Act XXII was passed, and the appointment of a Superintendent was authorised.[৬৪]

এরপর ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে তিপেরা (বর্তমান কুমিল্লা) জেলার ব্রিটিশ প্রজাদের ওপর লুণ্ঠনপ্রিয় কুকি উপজাতিরা ভয়াবহ আক্রমণ চালায় ম্যাকেঞ্জি যাকে ‘গ্রেট কুকি ইনভেশন’ বলে আখ্যা দেন। ৪০০-৫০০ কুকি দল ১৫টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, ১৮৫ জন ব্রিটিশ প্রজাকে হত্যা করে এবং শতাধিক বন্দি করে নিয়ে যায়। এতে ব্রিটিশ সরকারে টনক নড়ে, ম্যাকেঞ্জি সরকারি হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে লিখেন,

In 1859, the interference of Government again became necessary, and with a view to protect our hill subjects from the aggressions of the frontier tribes, the Lieutenant-Governor recommended that the country east of the cultivated plain country of Chittagong should be removed from the operation of the General Regulations, and that an officer, to be called the Superintendent of the Joom Tract, should be appointed.[৬৫]

লে. গভর্নরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের জুনে ২২ নং আইন পাস করে চট্টগ্রাম জেলার রেগুলেশন থেকে পৃথক করে চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস বা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা নামে আলাদা প্রশাসনিক জেলা গঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত প্রথম লিখিত আইন হলো এই ১৮৬০ সালের ২২ নং আইন। ঐ আইনবলে বাংলা সরকার ক্যাপ্টেন এস আর ম্যাগরাথকে পার্বত্য অঞ্চলের প্রথম সুপারিনটেন্টেড নিয়োগ করে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুনের ৩৩০০ নং সরকারি পত্রে বাংলা সরকারের সচিব এ. আর. ইয়ং সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে ক্যাপ্টেন ম্যাগরাথের নিয়োগ ও তাঁর এখতিয়ার, দায়িত্ব-কর্তব্য, ক্ষমতা বিস্তারিত জানিয়ে দেন। তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

I am directed to forward, for your information, the accompanying copy of the correspondence (Judicial Procedings 21st July 1859, Nos. 106-11; 22nd September 1859, Nos. 44-46; 27th October 1859, NO. 193; 5th January 1860, Nos. 86-93 and 12th April 1860, Nos 97-103; Letter to the Home Department, No. 1080, dated 10th March and Letter from the Home Department, No. 749 dated 5th April), which led to the creation of the appointment of Superintendent of the Chittagong Hill Tracts, to which you have been nominated. This correspondence will put you in possession of the circumstances which suggested the necessity of that appointment, and of the objects contemplated by it.[৬৬]

---

৬৪ *Proceedings of the Lt. Governor of Bengal during 21st April 1862*. Judicial Dept. Calcutta: Bengal Secretariat Office, Proceedings No. 226-27. Pp. 152-159.

৬৫ Alexander Mackenzie, *Op., Cit.*, p. 341.

৬৬ *Selections from the Correspondence on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts 1860-1927* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1929), p. 228.

যদিও চট্টগ্রাম জেলাকে ভেঙ্গে পৃথক একটি জেলা গঠিত হয় তবুও রেগুলেশন জেলা চট্টগ্রামের সন্নিহিত অঞ্চল বিধায় চট্টগ্রাম নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন জেলার নামকরণ করা হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা'। অতপর সঙ্গে সঙ্গে সরকারি নোটিফিকেশন জারি করা হয় যেখানে বিধৃত আছে:

> It is hereby notified that Act XXII of 1860, being ''an Act to remove certain tracts in the Eastern border of the Chittagong district from the Jurisdiction of the tribunals established under the General Regulations and Acts,'' will effect from and after the 1st August next.[৬৭]

এভাবে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ব্রিটিশ ভারতের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে নতুন জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামের। কার্পাস মহল ও তার জুমিয়া বাসিন্দারা লাভ করে নতুন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সত্তা। নবসৃষ্ট জেলার উত্তরে ছিল দেশিয় রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরা, দক্ষিণে পার্বত্য আরাকান বা আরাকান হিল, পশ্চিমে রেগুলেশন জেলা চট্টগ্রাম এবং পূর্বে স্বাধীন কুকিদের লুসাই পাহাড়। আয়তনের দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর তুলনায় বেশ বড়– ৬৮৮২ বর্গমাইল। চট্টগ্রামের আয়তন ২৪৯৮ বর্গমাইল, নোয়াখালীর আয়তন ছিল ১৫৫৭ বর্গ মাইল এবং তিপেরার (কুমিল্লা) আয়তন ছিল ২৬৫৫ বর্গমাইল। কিন্তু ১৮৭২ সালের জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান দেখলে এর উল্টো চিত্র পরিলক্ষিত হয়। যেখানে চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ১১,২৭,৪০২ জন, নোয়াখালী ও তিপেরার (কুমিল্লা) যথাক্রমে ৭,১৩,৯৩৪ ও ১৫,৩৩,৯৩১ জন সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৬৯,৬০৭।[৬৮] ১৮৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিযুক্ত সুপারিনটেন্ডেন্টের পত্র অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছিল ৬৬,৭৭৮ জন।[৬৯] ১৯০১ সালের আদম শুমারী মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের শতকরা ৯৩ ভাগ ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠী আর অবশিষ্ট ৭ ভাগ ছিল বাঙালি ও অন্যান্য। এ জেলায় বাঙালিদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ এখানে হালচাষের ব্যবস্থা নেই এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বন-বনানীর মনোহর ও বৈচিত্র্যময় নৈসর্গিক সৌন্দর্যে হিংস্র জীব জন্তুরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা বসিয়ে রেখেছে। উজ্জ্বল চির সবুজ বনাঞ্চল দ্বারা আচ্ছাদিত এ এলাকার জলবায়ু বহিরাগতদের কাছে বড্ড অস্বাস্থ্যকর ঠেকত। ১৮৪৭ সালের পার্বত্য অঞ্চল পরিদর্শনকারী ব্রিটিশ কর্মকর্তার অভিমতে তারই আভাস মিলে:

> The country is so unhealthy, so difficult, and so remote, we really have no hold it. Our police officers are almost invariably attacked with fever on the 4th or 5th day after

---

[৬৭] *Ibid*, p. 230.

[৬৮] Census of Bengal, 1872, (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), p. 29.

[৬৯] From Capt. J. M. Graham, Superintendent of Hill Tracts to W. G. Young, Commissioner of Ctg. Div. No. 30 Date 5th Feb 1863. *Proceedings of the Lt. Governor of Bengal.Poll. Dept. Proc.no. 76-78.*

entering forest. Even the elephant hunters whose vocation takes them into the forest only in the finest season, oftentimes suffer much.[৭০]

এসব সীমাহীন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে হিংস্র বন্যজন্তু ও বিপদজনক কীট পতঙ্গাদির সাথে সতত লড়াই করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা পার্বত্য এলাকায় জনপদ গড়ে তুলে তিলে তিলে। ১৯০১ সালের সেন্সাস অনুসারে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা ৪৪,৩২৯ জন, মগ(মারমা) ৩৪৭০৬ জন, তিপেরা (ত্রিপুরা) ২৩,৩৪১ জন, মুরং (ম্রো) ১০,৫৪০ জন, কুকি, ১৬১৫ খামি (খুমি) ১৪৬৯ জন, খিয়েং ৪১৬, বনযোগী (বম) ৬৯৬, পাংখো ১৪৪ ও মুসলমান শেখ ৪,৯০৬ জনসহ মোট বাঙালি ৮৭৬২ জন।[৭১] ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তিন রাষ্ট্রের শাসনে জেলার প্রেক্ষাপট দ্রুত পাল্টে যায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আর বহিরাগতদের কাছে বিপদজনক ও অস্বাস্থ্যকর বাসভূমি হয়ে থাকেনি। একশত বছর পর ২০০১ সালের জন জরীপে দেখা যায় তিন পার্বত্য জেলা মিলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এবং বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমানে সমান হয়েছে যার মধ্যে পাহাড়ি ৬,৯৮,০২৮ জন এবং বাঙালি ৬,৯৩,৭৬২ জন।[৭২] নিম্নের সারণিতে এ তা দেখানো যায়:

সারণি - ১.১[৭৩]

ক্রমিক নং	জাতি-গোষ্ঠীর নাম	১৯০১ সালে জনসংখ্যা	জাতি-গোষ্ঠীর নাম	২০০১ সালে জনসংখ্যা
১	চাকমা	৪৪,৩২৯	চাকমা	৩,৫৮,০২১
২	মঘ(মারমা)	৩৪,৭০৬	মারমা	১,৮০,৭৪০
৩	ত্রিপুরা	২৩,৩৪১	ত্রিপুরা	৮৪,৩০৪
৪	মুরং (ম্রো)	১০,৫৪০	ম্রো	২৮,১০৯
৫	খামি	১,৪৬৯	তঞ্চঙ্গ্যা	২৭,৫৭৭
৬	কুকি (পরবর্তীতে লুসাই, বম, পাংখোয়া)	১,৬১৫	বম	৯,২৫০
৭	মুসলমান শেখ	৪,৯০৬	খিয়াং	২,৬৪৭
৮			পাংখোয়া	২,৫৬৮
৯			চাক	২,৫৩৬
১০			খুমি	১,৫৮১
১১			লুসাই	৬৯৫
			মোট পাহাড়ি	৬,৯৮,০২৮
মোট		১,২৪,৭৬২	মোট বাঙালি	৬,৯৩,৭৬২

[৭০] *Selections*, p. 72; Alexander Mackenzie ও পার্বত্য এলাকার আবহাওয়া প্রসঙ্গে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন- 'অত কঠিন, অত শত্রুতাপূর্ণ ও অত অজানা একটি দেশ।' পৃ. ৩৩৫।

[৭১] Census of India, 1901, Vol. VI B, part: 111, P. 122-123 & R. H. Snyed Hutchinson, p. 15-17

[৭২] আদম শুমারী রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মতে তিন পার্বত্য জেলার মোট জনসংখ্যা ১৩,৯১,৭৯০ জন।

[৭৩] Census of India, 1901, Vol. VI B, part: 111, P. 122-123 & R. H. Snyed Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts*, District Gazetteer, Calcutta, 1909 (Delhi: Vivek Publishing Company, 1978) p. 15-17 এবং আদম শুমারী ২০০১।

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯০১ সালে মুসলমান শেখসহ মোট সাতটি ক্ষুদ্রজাতির উল্লেখ রয়েছে যা নৃগোষ্ঠীর নানা অংশের একটি ক্ষুদ্রতর বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত প্রদান করে এবং যেখানে পাহাড়ি অধিবাসীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০০১ সালে ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় যারা সম্মিলিতভাবে বাঙালির চেয়ে কিছুটা বেশী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রিটিশ নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

২.১ রাজনৈতিক বহির্ভূতকরণ নীতি: *তফসিলি জেলা থেকে সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত এলাকা*

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে চাকমা ও বোমাং রাজার শাসনাধীন কার্পাস মহল কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা নামে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হয় তা আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের প্রবর্তিত 'পলিসি অব এক্সক্লুজন নীতি'র পটভূমি, প্রয়োগ, প্রভাব ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা হবে। ব্রিটিশদের 'বহির্ভূত রেখে শাসনের পদ্ধতি' হল উপনিবেশবাদের জঠরে জন্ম নেওয়া 'বিভেদ ও শাসন নীতি'র আরেকটি প্রতিরূপ।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সরাসরি ব্রিটিশ ভারতের শাসনাধীনে চলে আসে। ১৮৫৭ সালের ভয়াবহ বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ রাজের শাসন শুরু হয় ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদরা যাকে আখ্যায়িত করেছেন 'নিউ ইন্ডিয়া' বা 'নব ভারত' নামে। শাসন কর্তৃপক্ষের এ রদবদল ভারতে শাসননীতির ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বয়ে আনে। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক জেলা গঠনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে আধুনিক প্রশাসনের গোড়া পত্তন হয়। নতুন জেলায় ব্রিটিশ প্রভুত্বের ভিত শক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮৬০ সালের জুন মাসে সুপারিনটেন্ডেট পদবিধারী একজন সামরিক কর্মকর্তাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পদায়নের মধ্য দিয়ে। বাংলার লে. গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রান্ট (১৮৫৯-৬২) ১৮৬০ সালে প্রণীত ২২ নং আইনবলে নতুন জেলার প্রশাসন পরিচালনার দিক নির্দেশনা জারি করেন। ঐ আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিনটেন্ডেন্টের পদমর্যাদা চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশানারের অধীন এবং তিনি বাংলার লে. গভর্নরের আজ্ঞাবহ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে বাংলা প্রদেশের অংশ বিশেষ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম কলকাতা থেকে প্রশাসিত হতে শুরু করে। ভেলাম ভেন সেন্দেল নতুন এ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে 'এক অভূতপূর্ব ঘটনা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৭৪] তাঁর মতে ব্রিটিশাধিকারের আগে পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম

---

[৭৪] ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল (সম্পা.), *বাংলার বহুজাতি: বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতি প্রসঙ্গ* (কলকাতা: আই সি বিএস, ১৯৯৮), পৃ. ১১২।

রাষ্ট্রধারণার বাইরে ছিল এবং সামরিক কারণেই ব্রিটিশ-ভারতীয় রাষ্ট্রের অত্রাঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঘটে। যেহেতু ভয়াবহ কুকি আক্রমণের জের[৭৫] হিসেবে পার্বত্য জেলা সৃষ্টি হয় সেহেতু জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সুপারিনটেন্ডেন্টের প্রাথমিক কাজ ছিল তিনটি। যথা- ১) স্বাধীন কুকি উপজাতিসমূহের গতিবিধি (লুসাই, সেন্দু, বনযোগি, পাংখো, খুমি, মুরং) তদারক করা; প্রয়োজনে দমননীতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে তোষণনীতির সাহায্যে তাদেরকে শান্ত ও সুবাধ্য প্রজার কাতারে নিয়ে আসা। ২) চিফদের প্রভাব, ক্ষমতা, প্রজাদের সাথে তাদের সম্পর্কের ধরন প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ; ৩) সর্বোপরি নতুন জেলার সমস্ত হাল হকিকতনামা প্রস্তুত করা। নতুন কর্মকর্তার জন্য কলকাতা থেকে বেঁধে দেওয়া ২০টি প্রতিপালনীয় বিধানাবলীর দিকে একবার নজর দিলে ব্রিটিশদের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতির প্রাথমিক চিত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিধি ১১ ও বিধি ১৫ তুলে ধরা হলো:

> Rule-11. You will enquire into the nature and extent of the authority exercised by the chiefs over the people, and endeavour to ascertain what, if any, dependent tenures exist under the chiefs; the nature of such tenures; and what right and privileges they confer on the holders.
> Rule-XV. You must endeavour to discover the numerical strength, resources, geographical position, and means of livelihood of the different separate tribes upon our frontier; to ascertain what tribes are in the habit of making raids and forays on other tribes; who are the chiefs of the several tribes, and whether they acknowledge any actual or nominal allegiance to any power; and whether the chiefs exercise authority over any other villages than those in which they severally reside. You will report upon the practicability of making arrangement for the security of the rest of the hill frontier, similar to those made with the Poung Raja for his part of that frontier.[৭৬]

উপরোক্ত দুটি অনুসরণীয় বিধিতে ব্রিটিশদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত প্রাথমিক উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায় এবং এটাও স্পষ্ট হয় যে, নব অধিকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের কাছে এক অজানা ভূখণ্ড। কিন্তু জেলায় নিযুক্ত পরিশ্রমী, দক্ষ ও সাহসী অফিসারদের কর্মদক্ষতায় এক দশকের মধ্যে ব্রিটিশদের নিকট এটি আর অজানা ভূখণ্ড থাকেনি। ১৮৬৭ সাল থেকে প্রেক্ষাপট দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে বিশেষ করে যখন জেলার সমস্ত ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারের উপর ন্যস্ত হয়। ১৮৬৯ সালে জেলার প্রথম ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন টমাস হার্বার্ট লুইন (পরবর্তীতে শুধু ক্যাপ্টেন লুইন), তাঁর উত্তরসুরী জেলা প্রশাসক রবার্ট হেনরি

---

[৭৫] কুকি আক্রমণের জন্য পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
[৭৬] *Selections,* p. 230.

হাটসিনসনের দৃষ্টিতে যিনি 'দ্য পাইওনিয়ার অব দ্য হিল ট্র্যাক্টস'[৭৭] এবং আমেনা মহসিন যাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে "আর্কিটেক্ট অব ব্রিটিশ হেজিমনি"[৭৮] বা ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েমের স্থপতি' বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে লিখিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সাড়া জাগানো পথিকৃত গ্রন্থ *The Hill Tracts of Chittagong and The Dwellers therein*[৭৯] প্রকাশের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ-ভারতের শাসকমহল পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়।

যাহোক উপরোক্ত নির্দেশনা সঙ্গে নিয়ে ১৮৬০ সালের ১ আগস্ট প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট মাদ্রাজ আর্টিলারির ক্যাপ্টেন এস. আর. ম্যাগর্যাথ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন এবং প্রথমে বরকল ও পরে কাচালং-এ সদরদপ্তর করার প্রচেষ্টা চালান। পরে কর্ণফুলী নদীর ৬৫ মাইল উজানে রেগুলেশন জেলা চট্টগ্রামের পূর্ব দিকের সমতল ভূমি ও নবসৃষ্ট জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্যভূমির সন্ধিস্থল চন্দ্রঘোনা নামক স্থানে জেলার প্রথম সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। এভাবে দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন পড়ে। ১৮৬০ সালের ১ আগস্ট থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত প্রথম তিনজন সুপারিনটেন্ডেন্ট ওই চন্দ্রঘোনা সদর দপ্তর থেকে দায়িত্ব পালন করেন। ক্যাপ্টেন এস. আর. ম্যাগর্যাথ, ক্যাপ্টেন জে. এম. গ্রাহাম ও ক্যাপ্টেন জি. ম্যাকগিলের কার্যকাল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও কুকিদের সম্ভাব্য অবস্থান অনুসন্ধানেই শেষ হয়। গ্রাহাম কুকিদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন ১৮৬৩ সালের ১০ মার্চ। চুক্তিতে ৯ জন কুকি সর্দার সাক্ষর করে।[৮০] ক্যাপ্টেন গ্রাহাম ও ম্যাকগিলের পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন বিষয়ে পেশকৃত সুপারিশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যবহ। ক্যাপ্টেন গ্রাহাম জেলার উত্তর অংশের মেয়াদ উত্তীর্ণ রাজস্ব বন্দোবস্তগুলি মারমাদের দলনেতা ক্যঅজ সাইনের নামে নথিভুক্ত করে মং রাজা হিসেবে তাঁর প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এটি ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসনিকভাবে বিভাজিত করণের ইঙ্গিতবাহী যা পরে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়। জি ম্যাকগিল (১৮৬৩-৬৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে কলকাতা কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করেন:

---

৭৭ R. H. Sneyd Hutchinson, *An Account of the Chittagong Hill Tracts* (Calcutta: The Bengal Secretaritat Book Depot, 1906), p. 130.

৭৮ Amena Mohsin, *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (Dhaka: The University Press Ltd., 2002), p. 29.

৭৯ Capt. Thomas Herbert Lewin, লিখিত The *The Hill Tracts of Chittagong and The Dwellers therein: Comparative Vocabularies of the Hill Dialects 1869* গ্রন্থটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর লিখিত প্রথম আকর আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণের ইতিহাসসহ প্রত্যেকটা নৃগোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস ও ভাষার ওপর আলোকপাত করা হয়।

৮০ Govt. of Bengal. *Proceedings of the Hon'ble Lt. Governor of Bengal, June 1863*. Judl. Dept. Proc. No. 61. p. 5.

> I would strenuously urge that the assimilation of the system of government of the country to that of a regulation district is most unadvisable. The conditions of the two cases are totally different. Besides the important differences of race and character, *it should be remembered that people of this tracts are nomad race, having no tie to any particular spot of soil, and owing a sort of feudal allegiance to their chiefs. It may be conceived how difficult it is to apply to a people so constituted the rules of the Acts and Regulations.*[৮১]

জি. ম্যাকগিল দেখিয়েছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ মূলত যাযাবর এবং যাদের কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাথে সম্পর্ক নেই। এদের আনুগত্য কেবল সামন্ত শাসকদের প্রতি। স্মরণ রাখা ভাল যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার মানদণ্ডের বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা স্তরের নৃগোষ্ঠী বসবাস করে যদিও তাদের উৎপাদন পদ্ধতি অর্থাৎ জুমচাষ সমধর্মী। লক্ষণীয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমা নৃগোষ্ঠীদের নৃপতি কেন্দ্রিক শাসন ছিল। তারা স্থায়ী রাজধানীতে বসবাস করে রাজকীয় শাসন পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদেরকে ঢালাওভাবে *নোমেড বা যাযাবর* পর্যায়ভুক্ত করে সাধারণীকরণ করাটা ছিল একটি ঔপনিবেশিক প্রকল্প; যার সুদুর প্রসারী লক্ষ্য হল ঔপনিবেশিক আধুনিকায়নকে জায়েজ করা। কথিত ''যাযাবর'' জুমিয়ারা নিয়মিত বিরতিতে জমি পাল্টায়। জুমিয়া গ্রামগুলো তুলনামূলকভাবে অধিকতর স্থায়ী হলেও বছর বছর জমি পরিবর্তনের বিষয়টাকেই বহিরাগত পশ্চিমা শাসকরা জোর দেয়। এটা সত্য যে, গত দু-তিনশ বছরে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীদের বারবার ঠাঁই বদল করতে হয়েছে। কিন্তু এটা তাদের কোনো অন্তর্নিহিত 'যাযাবর' বৃত্তির কারণে নয়। চট্টগ্রাম এলাকাটা ছিল একটা রাজনৈতিক সীমান্ত যেটাকে ঘিরে অতীতে ত্রিপুরা, আরাকান, চাকমা, মুঘল শক্তিসমূহের চতুর্মুখী লড়াই ছিল। রাজনৈতিক সীমানা পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ অঞ্চলের মানুষেরা বারবার স্থান পরিবর্তন করেছে।[৮২] তাছাড়া কোনো সুনির্দিষ্ট প্লট বা অংশের সাথে উপজাতিদের ভূমির কোনো সম্বন্ধ নেই– এজন্য বিশেষ শাসন দরকার এ যুক্তিও তর্কের উর্ধ্বে নয়। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জনবিরল অঞ্চল। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯ জনের কম লোকের বসবাস। অর্থাৎ জুমচাষের জমি ছিল মানুষের অনুপাতে অনেক বেশি। বস্তুতপক্ষে, তখনকার দিনে সমস্যাটা ছিল জমির নয়, বরং জুমিয়ার স্বল্পতা। জুমিয়াকে জুমচাষ করতে হতো হিংস্র বন্য প্রাণীর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে। সুতরাং জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার্থে তখন দলবদ্ধ হয়ে বসবাস ছাড়া উপায় ছিল না। তারপরও গোত্র প্রধান তথা

---

[৮১] Government of Bengal, Political Department, Political branch, *Proceedings no. 56.* Mr. Makgill letter no. 190. dated 5th August 1864, p. 53.

[৮২] প্রশান্ত ত্রিপুরা ও অবন্তি হারুন, *পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ* (ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভাইরনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ২০০৩), পৃ. ৯৯।

দেওয়ানের অনুমতি সাপেক্ষে সাধারণ জুমিয়ারা জুমচাষের জমি নির্বাচন করতো। সুতরাং পরিবেশ ও প্রতিবেশের এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে জমির সাথে উপজাতিদের কোনো সম্পর্ক নেই এরকম ঔপনিবেশিক ধারণা ক্রটিপূর্ণ এবং বাস্তবতা বিবর্জিত।

ম্যাকগিলের ব্যবস্থাপত্রের দ্বিতীয় অংশটি বেশ চিত্তাকর্ষক। তিনি উপজাতিদের জাতিকতার মৌলিকত্ব সংরক্ষণ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন,

> Another point of general policy which I wish to urge in this place is, that the nationality of the hillman should be preserved most carefully; that the country should be governed through people of the country; and that foreigners or the Bengalis, etc. should be admitted with the greatest caution. In this respect my opinion will ... be found to agree with that of all officers who have given the subject due consideration. The character of the people is, as a rule, simple, manly and upright, but it is an undoubted fact that the more they associate with the people of the plains, the quicker do these characteristics disappear and I think we owe it to preserve them as much as possible from the contact.[৮৩]

ম্যাকগিলের উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দুটি পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ নীতির জন্য গভীর তাৎপর্যবহ। পর্যালোচনায় দেখা যাবে ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় তাঁর পেশ করা এ-সুপারিশ পরবর্তী ব্রিটিশ নীতি নির্ধারণে গভীর প্রভাব ফেলেছে। উপরোক্ত অনুচ্ছেদদ্বয় থেকে কতকগুলো বিষয় স্পষ্ট হয় :

১. রেগুলেশন জেলার প্রচলিত শাসনপদ্ধতি পার্বত্য জেলার জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ দুই জেলার অধিবাসীদের জীবনধারা সম্পূর্ণ আলাদা। পার্বত্য জেলার বাসিন্দাদের কোনো সুনির্দিষ্ট জমির প্লটের সাথে স্থায়ী সংযোগ নেই এবং এদের মধ্যে যাযাবর প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে বিরাজমান এবং তারা স্ব স্ব গোষ্ঠীপতিদের প্রতি সামন্তধাঁচের আনুগত্য প্রদর্শন করেন।
২. এ পার্বত্য অঞ্চল শাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে এবং এক কথায় জেলার অধিবাসীদের ভাল মন্দ দেখার ভার তার ওপর ছেড়ে দিতে হবে।
৩. পার্বত্যবাসীদের জাতীয়তা ও চারিত্রিক সারল্যতাকে সযত্নে সুরক্ষা করতে হবে। তাদের লোকদের মাধ্যমে অর্থাৎ চিফদের দিয়ে তাদের শাসন করতে হবে। অন্য বহিরাগতদের বিশেষ করে বাঙালিদের এ জেলায় প্রবেশের ওপর কঠোর নজরদারি আরোপ করতে হবে। কারণ যত বেশি তারা বাঙালিদের সংশ্রবে আসবে তত দ্রুত তাদের আদিম, সৎ, সরল গুণাবলিগুলো হারিয়ে ফেলবে।

---

[৮৩] *Selections,1929,* p. 13.

উপরোক্ত সুপারিশগুলো নেহায়েত কোনো সুপারিশ নয় বরং ঔপনিবেশিক স্বার্থ সুরক্ষার সুস্পষ্ট প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র। এধরনের প্রেসক্রিপশন ব্রিটিশ-ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একদম নতুন না হলেও এযাবৎ রাষ্ট্রকাঠামোর বাইরে থাকা বিভিন্ন আদিবাসি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য জনপদের জন্য অভিনব ব্যবস্থাপত্র।[৮৪] অধিকন্তু এ ব্যবস্থাপত্র পাহাড়িদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রতিবন্ধক হলেও ঔপনিবেশিক সামগ্রিক স্বার্থ সুরক্ষায় অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। এভাবে পাহাড়িদের জীবন ও সমাজকে 'সহজ', 'সরল' 'স্পষ্টবাদী' ইত্যকার আখ্যা দিয়ে আদর্শায়িত করে তারা নিজেদেরকে সেই সমাজের রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। এর মাধ্যমে তারা যে-তাগিদটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করলেন সেটি হলো পার্বত্য জেলায় তাদের প্রবেশ এবং শাসনপদ্ধতির দর্শনকে আত্মসমর্থন করা। সুতরাং রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে নৃগোষ্ঠীগুলোর জীবনযাত্রাকে পুরাতন বৃত্তের মধ্যেই অচল করে রাখার প্রয়াস এ ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যাহোক এ ফর্মূলার প্রায়োগিক দিক সর্বতোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যই ভেবে চিন্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ক্যাপ্টেন লুইনকে সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় যিনি তাঁর নিয়োগের স্বপক্ষে বলেছেন 'উন্নততর প্রশাসন ব্যবস্থা' কায়েমের জন্য তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ। বলা প্রাসঙ্গিক যে ১৮৫৫ সালে বিহারের ভাগলপুর এবং বীরভুম জেলা থেকে সাঁওতাল অধ্যুষিত ৫০০০ বর্গমাইল অঞ্চল পৃথক করে সাঁওতাল পরগণা নামে জেলা গঠন করে তথায় সাঁওতালদের উপযোগী প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে মি. এশলি ইডেনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। যাহোক ক্যাপ্টেন লুইন পাহাড়ি লোকদের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের এজেন্ডা নিয়ে ১৮৬৬ সালের ১৫ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার নতুন সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন লুইনের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাহস ও বিচক্ষণতার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বিপরীতে পাহাড়ি গোষ্ঠীপতিদের (স্থানীয়ভাবে রাজা) প্রভাব ক্রমশ খর্ব হওয়া শুরু হয়। তাঁর সময়ে ১৮৬৬ সালের মে মাসে তখনো চট্টগ্রাম কালেক্টরের অধীনে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব সুপারিনটেন্ডেন্টের ওপর হস্তান্তর করা হয়। ১৮৬৭ সালে পার্বত্য জেলার কর্মকর্তার পদবি 'উপজাতীয়দের

---

[৮৪] ইতিমধ্যে রাজমহল অঞ্চলের প্রশাসক Augustus Cleveland পাহাড়িয়াদের বেলায় এ ধরনের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। তিনি পাহাড়িয়া সর্দার, নেতা ও উপনেতাদের জন্য বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা পেনশনের ব্যবস্থা করেন। উক্ত অঞ্চলের উপজাতি সর্দারদের কর্তব্যের তালিকা ঠিক করে দেন: পাহাড়িয়া এলাকার প্রত্যেকটি অপরাধের খবর সরকারি দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া, হাঙ্গামায় নিজেদের প্রভাবে শান্তি স্থাপন করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সাহায্য করা–এইসব কর্তব্যে সর্দারেরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এইভাবে পাহাড়িয়া অঞ্চলে ইংরেজ সরকারের অনুগত একটি সর্দারদল গড়ে ওঠে। ক্লীভল্যান্ড তাদের দিয়ে আদালত গঠন করে রাজমহলকে সাধারণ বিচারালয় থেকে পৃথক করেন ১৭৮২ সালে। দেখুন- সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী* (কলকাতা: ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রা. লি. ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০০), পৃ. ১২৮-১২৯।

সুপারিনটেন্ডেন্ট’ থেকে ‘ডেপুটি কমিশনারে’[৮৫] পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর ওপর রাজস্ব, বিচার ও ফৌজদারি সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয় যা সাধারণ জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ প্রাপ্ত হন না। ক্যাপ্টেন লুইন পার্বত্য রাজাদের ওপর ছলে বলে কৌশলে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ শাসনকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর জীবনীকারও লুইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে একই কথা লিখেছেন, Thomas Lewin ``saw as his first and paramount task the need to crush and extinguish the influence of these chiefs.’’[৮৬] ক্যাপ্টেন লুইনের দুই মেয়াদের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তৃত হয়। ম্যাকগিলের বিমূর্ত সুপারিশগুলো ক্রমান্বয়ে বাস্তব রূপ লাভ করে। ক্যাপ্টেন লুইন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্বমুখী সম্প্রসারণেও গভীর মনোনিবেশ করেন।

১৮২৬ সালে ইয়ান্দাবো চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার বার্মা থেকে আসাম, টেনাসেরিম, আরাকান লাভ করে। ১৮৬০ সালে অধিগ্রহণ করে চট্টগ্রাম জেলার নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত পুর্বাঞ্চল। আরাকান থেকে আসাম পর্যন্ত গিরিবহুল অরণ্য অঞ্চলে অনগ্রসর অধিবাসীদের বসবাস। এদের মধ্যে আগ্রাসী লুসাই কুকিরা তখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ প্রভাবাধীন ভূখণ্ডে রীতিমত উৎপাত চালাচ্ছে। ক্যাপ্টেন লুইনের ভাষায়:

> Our relations with the independent frontier tribes, Lushai, Shendu, and others, were very unsatisfactory. We had no direct dealings with them, nor were we able to prevent or punish the periodic raids which they made into British territory for the purpose of obtaining slaves and booty. It was necessary to make our cordon of police posts thoroughly effective, in order to repel force by force.[৮৭]

সুতরাং লুসাইদের বশে আনতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্ত রাখা খুবই জরুরি। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বাঙালি মহাজনদের খপ্পরে পড়ে যাতে সাঁওতালদের মতো বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে তার জন্যও দরকার ‘অগ্রসর’ বনাম ‘অনগ্রসর’ এর মধ্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণের নতুন ফন্দি। যেমনটি সমতলের ভারতে হিন্দু মুসলমানদের ধর্মভেদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে জাতিগত মেরুকরণ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যের সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার ঘৃণ্য কৌশল তারা উদ্ভাবন করে তেমনি নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য দরকার ভিন্ন নীতি ও কৌশলের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার। এ-তাগিদ থেকেই উদ্ভাবিত হয় ‘তফসিলী’ শাসন পদ্ধতির। ‘তফসিলি শাসন পদ্ধতি’টি ঔপনিবেশিক নীতির অংশ যার মমার্থ হল ‘বেড়া দিয়ে ঘিরে

[৮৫] পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শাসনকর্তার পদবী প্রথমে ১৮৬০-১৮৬৭ পর্যন্ত ছিল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ১৮৬৭-১৮৯২ পর্যন্ত ডেপুটি কমিশনার, ১৮৯২-১৯০০ পর্যন্ত এসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট, ১৯০০-১৯২০ পর্যন্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট আবার ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ এবং আজ অবধি ডেপুটি কমিশনার।

[৮৬] Tridiv Roy, *The Departed Melody*, 2003, p. 40.

[৮৭] Lieut. Col. Thomas H. Lewin, *A Fly on the Wheel or How I Helped to Govern India* (London: Constable and Company Ltd, 1912), p. 206.

রাখা এবং শাসন করা’। এটি পাহাড়ির ওপর নির্বিঘ্নে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা খাটানোর প্রাথমিক হাতিয়ার। ফরাসি চিন্তক ও ক্ষমতা বিশেষজ্ঞ মিশেল ফুকোর মতে, কারাগারে ঠিক মাঝখানে নির্মিত নিবিড় পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে সকল বন্দিকে নজর রাখা হতো যাকে তিনি নামকরণ করেছেন ‘প্যান-অপটিসিজম’।[৮৮] ঠিক একইভাবে তফসিলি জেলা ও ইনার লাইন রেগুলেশন (১৮৭৩) দিয়ে পাহাড়িদের এক অঞ্চলে গণ্ডিবদ্ধ করে জেলা শাসককে দিয়ে সকল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে শাসন করা।

এ প্রক্রিয়ায় ভারতের সভ্যতার আলো থেকে দূরে অবস্থান করা ‘অনগ্রসর লোকদের’ আবদ্ধ রাখা হয়। তাইতো দেখা গেছে ভারতে যেসব পার্বত্য অঞ্চল প্রধানত আদিবাসীদের বাসভূমি সেসব অঞ্চলগুলিতেই এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ‘তফসিলি জেলার মোর্চা’ গঠন করা হয়। তবে এটিও হঠাৎ করে প্রবর্তন করা হয়নি। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গৃহীত হয়েছে এ ফর্মূলা যদিও প্রাথমিক অবস্থায় এটির নামধাম ভিন্নরূপে ছিল যেমন ‘নন-রেগুলেশন অঞ্চল বা প্রদেশ’। B. H. Baden Powell কোম্পানি আমলে রেগুলেশন এবং রেগুলেশন বহির্ভূত অঞ্চলের উদ্ভব সম্পর্কে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন:

> Starting with the ‘idea of the Presidencies’ as the centres of government, we have already seen that each Presidencies under its governor and Council as empowered to enact a code of ‘Regulations’ for its government, in the days before 1834, when a general Legislative Council was formed. When therefore any territory was added by conquest or treaty to a Presidency as it was first supposed would be the ordinary course such territory or Province came under the existing ‘Regualations’; and further, the course of its official appointment was governed by an act of parliament. But when . . . Provinces were acquired which were not and could not be, annexed to any of the three Presidencies, their official staff could be provided as the Governors-General pleased, and was not governed by any statute; and what was perhaps of greater importance still, the existing Regulations of the Bengal, Madras, or Bombay Codes did not apply proprio-vigore. Such Provinces were then called ‘Non-Regulation Provinces’.[৮৯]

ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্বে অর্থাৎ কোম্পানির শাসনের সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম (কলকাতা), ফোর্ট সেন্ট জর্জ (মাদ্রাজ) এবং বোম্বাইয়ের শাসন পরিষদগুলি যেসব ‘রেগুলেশন’ জারি করতেন, তার দ্বারাই ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসন চলতে থাকে। নতুন নতুন অঞ্চল শাসনভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি বুঝতে পেরেছিল যে, সব অঞ্চল বা প্রদেশকে এসব রেগুলেশনের সাহায্যে

---

[৮৮] এম এম আকাশ,“ক্ষমতা প্রশ্ন ও মিলে ফুকোর মতামত” পারভেজ হোসেন (সম্পা.), *মিশে ফুকো : পাঠ ও বিবেচনা* (ঢাকা: সংবেদ, ২০০৭), পৃ. ১৯২-২০২।

[৮৯] B. H. Baden Powell, *The Land System of British India* (New Delhi: Low Price Publications, 1896 1st pub. 1892)

শাসন করার অসুবিধা আছে। ফলশ্রুতিতে অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে রেগুলেশন বহির্ভূত (নন-রেগুলেটেড) প্রদেশ বলে পৃথক করে নিয়ে ভিন্ন ধরনের শাসন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। যেমন– আসাম ও বার্মা প্রদেশদ্বয়ের শাসনভার চিফ কমিশনারের হস্তে সমর্পিত হয়। A. B. Keith এর লেখায় নন-রেগুলেশন অঞ্চল বা প্রদেশসমূহের শাসনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে সৃষ্ট অসুবিধার সমাধান সূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> The Act of 1853 was found inadequate. The solution of now adopted was to permit the governor-general in council . . . to take under his immediate authority any territory and thereafter to provide for its administration. The officers placed in charge of such districts to whom were delegated such powers as were not held proper to be reserved to the central authority, were styled in practice Chief Commissioners, a style recongnised by an Act of 1870.[৯০]

রেগুলেশন বহির্ভূত সব প্রদেশ, অঞ্চল বা জেলাতে আবার বিধি বিধানের বিভিন্নতা লক্ষণীয় মাত্রায় উপস্থিত ছিল। এই বিধানগুলি মূল রেগুলেশনগুলির তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পর থেকে কিছুটা ভিন্নতরভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই জেলা শাসনের জন্য ১৯০০ সালে চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন জারি হয় আর ওই রেগুলেশনের অধীনে ৫৪টি বিধি জারি করা হয়। যা এখনো ‘হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল’ নামে ব্যাপক আলোচিত। যাহোক এভাবে কোম্পানির শাসনকাল থেকেই ‘রেগুলেশন’ প্রদেশ ও ‘রেগুলেশন বহির্ভূত প্রদেশ’ নামে দুই শ্রেণির অঞ্চল সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে প্রদেশের শাসনব্যবস্থা একই রকম করা হলেও জেলাতে বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাসমূহে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। সাধারণভাবে সে-ধরনের শাসন পদ্ধতিই হলো ‘তফসিলভুক্ত জেলা’ পদ্ধতি।

১৮৬১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় পরিষদ আইন (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট) পাস হয়। রেগুলেশন বহির্ভূত অঞ্চলের জন্য গভর্নর-জেনারেল অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেসব বিধি নির্দেশ তৈরি করেছিলেন এই আইনে সেগুলিকে বৈধতা দেওয়া হয়। রেগুলেশন জেলা চট্টগ্রামের পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে পৃথক জেলা গঠনের লক্ষ্যে প্রণীত ১৮৬০ সালের ২২ নং আইনটিও বৈধতা পায়। ১৮৭০ সালে সরকার ভারত গভর্নমেন্ট আইন পাস করেন। এতে স্থানীয় গভর্নমেন্ট কতগুলি বিশেষ অঞ্চলের শাসনের জন্য যেসব বিধি-নির্দেশ তৈরি করেন সেগুলিকে অনুমোদন করার জন্য সপারিষদ গভর্নর জেনারেলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী গভর্নর-জেনারেল বহু নতুন বিধান প্রবর্তন করেন। তম্মধ্যে ১৮৭৪

---

[৯০] A. B Keith, *A Constitutional History of India* (Lahore: Lawyers home, Abridged, 1965 first published in 1936), p.168.

সালে ভারতীয় আইনসভা প্রণীত 'তফসিলভুক্ত জেলা আইন'(সিডিউলড্ ডিস্ট্রিক্ট এ্যাক্ট ১৮৭৪ এর ১৪ নং আইন) অন্যতম। এই আইন বলে স্থানীয় গভর্নমেন্ট বা প্রাদেশিক গভর্নরকে কতগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়, বিশেষ অঞ্চলগুলিকে নির্দিষ্ট করে একটি তালিকা[৯১] এই আইনের সঙ্গে করা হয়। *১৮৭৪ সালের ১৪ নং আইনের ১ নং তফসিলের তিন নম্বর খণ্ড অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম 'তফসিলভুক্ত জেলা'র অন্তর্ভুক্ত হয়।*[৯২] কোম্পানি শাসনে যেগুলো রেগুলেশন বহির্ভূত ছিল ব্রিটিশ রাজের আমলে সে অঞ্চলগুলোকেই তফসিলি জেলা ঘোষণা করা হল এবং এর বিশেষ দিক হলো এ অঞ্চলগুলি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ৯৯ ভাগ আদিবাসী ছিল। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজন এই যে প্রথমবারের মতো 'তফসিলী ঘেরা বেড়া'র মধ্যে পড়ে গেল অন্য অর্থে উপবিবেশবাদ সৃষ্ট 'নিষিদ্ধ কুয়োর' গর্তে নিক্ষিপ্ত হল সেখান থেকে আর উঠে দাঁড়ানো এবং দৌড়ানো দুটোই কঠিন হয়ে পড়ল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে যে বাংলা প্রদেশের প্রচলিত শাসন থেকে দূরে রেখে বিশেষ কায়দায় শাসন করা দরকার তার আভাস উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে চট্টগ্রামের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার হেনরি রিকেটস দিয়েছিলেন। এরপর সুপারিনটেন্ডেন্ট জি. ম্যাকগিলের সুপারিশে তা আরো জোরালো ও দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হলো। পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে ম্যাকগিল সুপারিশ করেছিলেন রেগুলেশন জেলার বিধি-বিধান পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ জাতিগত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিবেচনায় দুই জেলার লোকজন আলাদা। এরা বাঙালি নয়, পাহাড়ি উপজাতি (হিল ট্রাইবস) এবং যাযাবর ধাঁচের জীবন যাপন করে। তাঁর যুক্তিটি আপাত দৃষ্টিতে সঠিক মনে হয়। কিন্তু নিবিড় অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে এটি একটি ঔপনিবেশিক 'কূটচাল'। ম্যাকগিলের 'যাযাবর তত্ত্ব' জেলার সিংহভাগ অধিবাসীদের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। কারণ তার কয়েক বছর পরেই উইলিয়াম হান্টার জানাচ্ছেন, ''In one point in particular, the Chakmas differ from all other hill tribes -- viz. that they are averse to changing the sites of their villages. From generation to generations, the village is kept at

---

[৯১] নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলি তফসিলভুক্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়: আসাম, আজমীর, মাড়ওয়ার, কুর্গ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর বিভাগ, অঙ্গুলমহল, এডেন, সিন্ধু প্রদেশ, পাঁচমহল, পশ্চিম খান্দেশের মেওয়াসি সর্দারদের তালুকসমূহ, চান্দা জমিদারি অঞ্চল, ছত্রিশগড় জমিদারি অঞ্চল, চিন্দোয়ারা জায়গীরদারি অঞ্চল, গঞ্জামের ১৪টি মালিয়া, ভিজাগাপট্টনমে ৯টি মালিয়া, গোদাবরী জেলার কতকগুলি অংশ, লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, হাজারা, পেশওয়ার, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা গাজী খাঁ, লাহোল স্পিতি, ঝাঁসি বিভাগ, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল, তরাই পরগণা, মির্জাপুর জেলার চারটি পরগনা, বারাণসি মহারাজার পারিবারিক বসতি অঞ্চলসমূহ, দেরাদুন জেলার জৌনসার বাওয়ার এবং মণিপুর পরগনা (মধ্য ভারত এজেন্সি)। দেখুন- সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী*, পৃ. ১৩৪।

[৯২] Letter No. 60p.Í D. From C. W. Bolton Esq., Offg. Secretary to the Government of Bengal to the Commissioner of the Chittagong Divission. 15 May 1896.

one place.''[৯৩] বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রশাসক-ইতিহাসবিদ হাটকিনসন আরো জোরালোভাবে পাহাড়িদের 'যাযাবর প্রবণতা তত্ত্ব' নাকচ করে দেন। তাঁর জবানীতে তা দেখা যেতে পারে:

> as regards the supposed tendency of *juming* to encourage the nomadic habits of the hill tribes, this is quite a mistaken idea. The very great majority of villages are permanent and have occupied their present site for a very large number of years. Take Bandarban for instance; this is the larges of the hill villages and its population is entirely jumeah, but it has occupied its priesent site for mort than 80 years and will continue to do so. The same may said of all principal villages. The jumea will invariably return to his village immediate after the juming season is over, even though he may have to go a considerable distance involving a journey of two or three.[৯৪]

তবে হান্টার ও হাটকিনসনের শতাধিক বছর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে একই চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন ফ্রান্সিস বুকানন। তিনি ১৭৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল বরকল (বর্তমানে রাঙামাটির জেলার একটি উপজেলা) যাওয়ার পথে তিনি স্থায়ী চাকমা গ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন : 'বসন্ত নদীর মোহনার নিকটবর্তী গ্রাম খুব বড়, এই গ্রামে বাড়িঘর আছে পঞ্চাশটির মতো; লোকালয় পরিপূর্ণ গ্রাম। চাকমারা এখানে স্থায়ীভাবে বাস করে। এখানে দিওয়ানের শাসন চলে।'[৯৫] ১৮৪৭ সালে বান্দরবান সফরে গিয়ে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার হেনরি রিকেটসও একই অবস্থা অবলোকন করেছেন। তাঁর অবলোকিত ভাষ্য: 'Like the two chiefs families, some of the superior rowajas or village chiefs have fixed residences.'[৯৬]

উপর্যুক্ত প্রামাণ্য তথ্যের আলোকে এটা স্পষ্ট যে, ১৮৬৪ সালে যখন ম্যাকগিল এ যাযাবর তত্ত্বটি উপস্থাপন করছেন তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুমিয়ারা আরো অনেক স্থায়ী গ্রামে থিতু হয়েছিল। তাছাড়া পরবর্তী কয়েক দশকে পার্বত্য জেলার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোকজনও স্থায়ী গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত হয়। একটি পরিসংখ্যান এ দেখা যায় ১৮৭৪ থেকে ১৯১৯ সাল এ ৪৫ বৎসরের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের যাযাবর প্রবণতা অনেক হ্রাস পেয়েছে তার প্রমাণ স্থায়ী গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি। ১৮৭২-এ পরিচালিত প্রথম আদম শুমারী রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় স্থায়ী পাড়া বা গ্রামের সংখ্যা ছিল ২৯৬টি। ১৯১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪০১টি। অন্যদিকে স্থায়ী মৌজা গঠিত হয় ৩৭৬টি। কিন্তু তা

---

[৯৩] W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. vi, p. 49.
[৯৪] R. H S Hutchinson, *An Account of the Chittagong Hill Tracts*, pp. 52-53.
[৯৫] ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্পা.), *দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮)*, (অনু)সালাউদ্দীন আইয়ুব, পৃ. ১৪১।
[৯৬] *Report on Forays*, 1847: p. 80.

সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পশ্চাৎপদতার বা অনগ্রসরতার তকমা দিয়ে আবার বাংলার আইনসভার আওতা থেকে বাইরে রেখে বিশেষ শাসনের অধীনে রেখে দেয়।

আসলে ব্রিটিশ শাসন আগাগোড়া বর্ণবাদী ভাবাদর্শের শাসন। ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিরা নিজেদেরকে সভ্য এবং জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ রক্তের বা শ্রেষ্ঠ জাতের বংশোদ্ভূত বলে জাহির করত। ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় ইতিহাসে অন্যান্য সাম্রাজ্যের উন্নতর সংস্করণ– এ বিষয়ে ইংরেজদের দম্ভোক্তির অন্ত ছিল না, যে-কায়দায় তারা ভারতীয়দের 'কাল আদমি' বলে শাসন করেছিল। একই ছকে এবং ছাঁচে তারা ভারতীয়দের থেকে আদিবাসীদের ভাগ করেছিল। ভাবখানা এমন যে ব্রিটিশরা আর্য আর ভারতীয়রা অনার্য; অন্যদিকে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা আর্য কিন্তু পার্বত্য জনজাতিরা বন্য, আদিম, যাযাবর অর্থাৎ অনার্য। ব্রিটিশরা তাদেরকে ঘেরা বেড়া দিয়ে পিতৃবৎ শাসন করে আধুনিক করে তুলতে বদ্ধ পরিকর(?)। এজন্য বঙ্গীয় আইনসভার আইন, রেগুলেশন ও বিধি-বিধান পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয় যদিও পূর্ব বাংলার অন্যান্য মফস্বল জেলার ৯৮ ভাগ নিরক্ষর, আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ বাঙালি লোকসংখ্যার জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাদের বর্ণবাদী বিবেচনাবোধ বৈপরিত্যে পূর্ণ।

যাহোক 'পশ্চাৎপদ' জনগোষ্ঠী হিসেবে পার্বত্যবাসীদের ১৮৭৪ এর তফসিলি জেলা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হল। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের বহির্ভূতকরণ শাসননীতির সূচনাপর্ব এবং এ আইনের বলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে যেকোন মূল্যে বা অজুহাতে 'বিশেষভাবে শাসনের' দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বুনিয়াদ রচিত হল। অন্যদিকে দীর্ঘদিন বাঙালি মন্ত্রী উপদেষ্টা পরিবেষ্ঠিত হয়ে থাকা স্থানীয় চিফগণ যাতে ব্রিটিশদের এ নয়া কৌশল বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় সে আয়োজনও সম্পন্ন হল। বাংলার লে: গভর্নর নিজে ১৮৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন, যা ইতিপূর্বে কখনই হয়নি, এবং এক দরবারের আয়োজন করেন যেখানে চাকমা দলপতিকে [রায় বাহাদূর রাজা হরিশ চন্দ্রকে] রাজা উপাধি দেওয়া হয়, যা ঐ অঞ্চলে তথা চাকমাদের জীবনে বিশেষ দিন হিসেবে বিবেচিত।[৯৭] এভাবে ক্রমশ বিশেষ শাসনের চেতনা পার্বত্যবাসীদের 'মগজে ঢুকিয়ে' দেওয়া হল যা পরবর্তীকালে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়। অনেকটা রক্ত প্রবাহের মতো। এপদ্ধতিতে অনগ্রসর পার্বত্যবাসীদেরকে স্বদেশীয় সমতলবাসী থেকে আলাদা রাখার প্রয়াসও খানিকটা পূর্ণ হল। অর্থাৎ পার্বত্যবাসীদের বুঝিয়ে দেওয়া হল– তোমার সাদৃশ্য আছে ঐ সব তফসিলভুক্ত বাসিন্দাদের সাথে, প্রেসিডেন্সির বাসিন্দাদের সাথে নয়। আবার এটাও জানিয়ে দেওয়া হল ঐ দলে তুমি একা নও বা এ বিশেষ ব্যবস্থা শুধু তোমার অঞ্চলের জন্য নয় ; তোমার অঞ্চলের সাথে

[৯৭] ''প্রোসিডিংস অব দ্য ওনারেবল দ্য লে. গভর্নর অব বেঙ্গল'' জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট অফিস, কলকাতা, আগস্ট ১৮৭৫, পৃ. ৮৩-১০১।

৩৪টি অঞ্চল যেখানে বাস করে আরো প্রায় দেড় কোটি বাসিন্দা। কিন্তু পার্বত্য নৃগোষ্ঠীর মধ্যেও যাতে রাজনৈতিক ঐক্য, আন্ত:জাতি সংহতি গড়ে উঠতে না পারে সে-ব্যবস্থা ব্রিটিশরা করেছে। কারণ ঐক্য সেটা জাতিগত হোক আর অঞ্চলগত হোক ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসকদের নিকট বড় বিভীষিকাময় বস্তু। সেজন্য সাম্প্রদায়িক বা উপজাতীয় সংহতি ও ঐক্যের পথে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা ব্রিটিশ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সরাসরি শাসন করতে এসে এখানে তারা দুই গোষ্ঠী সর্দারের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ক্যাপ্টেন লুইন, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসনের রূপকার, প্রায় সর্বক্ষেত্রে চিফদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> These chiefs had hitherto exercised paramount authority throughout the hills, keeping all power, profit, and information in their own hands, and, with a view to maintaining their position, they had hitherto opposed all efforts of the Government representative to introduce any change whatever into the administration. It was plain that, unless I were content to be the merest shadow of authority, I must convince them that my power was greater than theirs.[৯৮]

এর মধ্যে রানি কালিন্দী যার বিরোধিতার কবলে পড়েন সব থেকে বেশি। ক্যাপ্টেন লুইন লিখেছেন, ‘‘রানি একজন বৃদ্ধা, বিধবা মহিলা, যিনি পক্ষপাতদুষ্ট উপদেষ্টা দ্বারা প্রভাবিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমার অবস্থানকালের পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত তাঁর মনোভাব অটলভাবে শত্রুতাপূর্ণ ছিল।’’[৯৯] রানি কালিন্দী সম্বন্ধে উনিশ শতকের শেষ দশক এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে দায়িত্বপালনকারী আর এইচ এস হাটকিনসন রানি কালিন্দী সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, ‘‘চল্লিশ বছর ধরে সে ছিল সরকারের জন্য কন্টক সদৃশ।’’[১০০] বলা বাহুল্য রানির পূর্বসূরীদেরও রয়েছে গর্বিত অতীত যারা ১৭৭৬-১৭৮৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ একযুগের অধিকাল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন এবং প্রভাবশালী গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস যাদের আঞ্চলিক অধিকার চুক্তির মাধ্যমে স্বীকার করেছিলেন।

অন্যদিকে দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিলেন বোমাং রাজা মম্ফ্রু। অষ্টাদশ শতক থেকে বোমাং রাজারা তাদের অর্থ বিত্ত, প্রভাব প্রতিপত্তি ও শৌর্য-বীর্যের জন্য বিখ্যাত। ১৭৯৮ সালে ফ্রান্সিস বুকানন বোমাং রাজা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। তিনি লিখেছেন,

---

[৯৮] Lt. Col. T. H Lewin, *A Fly on the Wheel*, pp. 206-207.
[৯৯] ঐ, পৃ. ২১৭।
[১০০] R. H Hutchinson, *An Account of Chittagong Hill Tracts*, p. 94.

> The proper appellation for this Chief is Po-mang Kaung-la Pru. Pomang is his title, and signifies Captain. Kaung-la is his proper name; Pru, which signifies white, is the name of the family... He has about twenty Hindoo Servants, and still more Mohammedans, his Dewan or Minister being of that religion.The Domestic who takes care of his table is a Rajbunjee.... Besides his numerous family, he has a great number of Ma-ra-ma slaves, that is, persons of the tribe who incur Debt to him, and say, if you will discharge my Debt, I will become your slave. ... The house of the Chief is constructed like those of the other Joomeas, but is much larger than that of Aung-ghio-se. He has Chairs, Carpets, Beds, Mats, and other furniture. The yard is surrounded by a fence made of Posts and Mats, and is dignified with the title of Fort.[১০১]

সুতরাং দুই গোষ্ঠীপতির সংহতি ও ঐক্য নব অধিকৃত জেলার ব্রিটিশ শাসনের জন্য আপদ ডেকে আনার আশংকা ব্রিটিশদের মনে ছিল। সুতরাং স্থানীয় রাজাদের প্রভাব খর্ব করে ব্রিটিশ শাসন পাকাপোক্ত করা নিষ্কটক ছিল না। টি এইচ লুইনও তা অকপটে স্বীকার করেছেন। রাজাদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল নিম্নরূপ:

> To begin with, there was the hitherto supreme power of the hereditary chiefs, who indeed paid tribute to our Government, but who stood entirely between us and the people. They were very jealous of their authority, and I quickly recognised that I must either gain their co-operation or set them entirle aside, if I wished to reach the people. The stick or the sugar-stickÍfor them the choiceÎbut by one or the other, or by both, I intended to rule.[১০২]

ক্যাপ্টেন লুইন রাজাদের প্রভাব ও দর্প চুর্ণ করে নিজের প্রভাব ও দর্প জাহির করতে শুরু থেকেই তৎপর ছিলেন। তাঁর পূর্বসূরী সুপারিনটেন্ডেন্ট ক্যাপ্টেন জে. এম. গ্রাহাম ও জি. ম্যাকগিলের চিন্তাধারার আদলে তিনি রাজাদের স্বীয় প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায়ের অসীম ক্ষমতা যা ছিল তাদের 'কর্তৃত্বের বাহ্যিক চিহ্ন ও অভ্যন্তরীণ ভিত্তি' তা নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ করার জোর তৎপরতা চালান। এতে করে রাজাদের চিন্তা ভাবনা স্ব স্ব সার্কেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ফলে ঐক্য ও সংহতি বাধাগ্রস্থ হবে। পক্ষান্তরে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ মজবুত হবে। শুধু তাই নয় রানি কালিন্দীর অপ্রতিরোধ্য প্রভাবও খানিকটা ক্ষুণ্ন হবে। উল্লেখ্য চাকমা রানি কালিন্দীর সাথে লুইনের প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব, কর্তৃত্বের ও ব্যক্তিত্বের সংঘাতে পরিণত হয় এবং রানির জনপ্রিয়তা ও গগনচুম্বী প্রভাবে কোনো রূপ ব্যত্যয় ঘটাতে না পেরে

---

[১০১] Willem van Schendel (ed.), *Francis Buchanon in Southeast Bengal(1798) :* His Journey to Chittagong, the Chittagong Hill Tracts, Noakhali and Comilla, (Dhaka:The University Press Ltd. 2nd Imp. 2008. 1st pub. 1992.) , p. 91.
[১০২] Lt. Col. T. H. Lewin, *A Fly on the Wheel,* p.211.

লুইন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে চাকমা রাজ্যের উত্তর সীমা ৬৫৩ বর্গমাইল এলাকা রানির কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নতুন মং রাজা নামে তৃতীয় সামন্ত রাজার শাসনে অর্পণ করার ছক তৈরি করেন।[১০৩] এছাড়া চিফদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে এবং আনুগত্য তুলে নিয়ে কোনো প্রজা যদি নিরপেক্ষ অবস্থানে বসবাস করতে চাই তার জন্য তিনি সদর খাসমহল সার্কেল তৈরি করেন। খাসমহলে বসবাসরত জুমিয়ারা কোনো বিশেষ চিফের অধীনে ছিল না; তাদের রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার দেখাশুনা করতেন ডেপুটি কমিশনার। আসলে এটা ও ছিল চাকমা রাজার শাসনাধীন এলাকা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে করা আরেকটি সার্কেল। এর মূল কারণ লুইন নিজেকে চিফের ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখতে চেয়েছিলেন তাই তার পরিচালনাধীনে একটি সার্কেল করতে সিদ্ধান্ত নেন[১০৪] অন্যদিকে লুইন বোমাং রাজার প্রভাব ক্ষুণ্ন করতে বোমাং রাজার শাসনাধীন দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রাম– কর্ণফুলী থেকে নাফ নদীকে বান্দরবান, রুমা ও মাতামুহুরী– তিন সার্কেলে বিভক্ত করার ছক আঁকেন। এভাবে ১৮৮৪ সালে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম পঞ্চ সার্কেলে খণ্ডিত হয়। চাকমা চিফের সার্কেল, বোমাং চিফের সার্কেল, মং চিফের সার্কেল, সদর খাসমহল (বা লুইন সার্কেল) ও সাঙ্গু খাস মহল। কিন্তু লুইনের খাসমহল ধারণাটি চরমভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং পরে পরিত্যক্ত হয়। এবং ১৯০০ সালে চুড়ান্তভাবে তিনজন পাহাড়ি রাজার পরিচালনাধীনে তিনটি রাজস্ব সার্কেল এবং সরকারি বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি রিজার্ভ ফরেস্ট সার্কেল মিলে মোট চার সার্কেল ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। হাটকিনসন যথার্থই বলেছেন, Experience proved the Khas mahal to be a complete failure as an administrative unit and they were abandoned and in 1900 the district was finally divided into four circles.[১০৫] এখানে অন্তরালে ছিল নৃগোষ্ঠী ভিত্তিতে সার্কেল বিভক্ত করে সম্প্রদায়গত স্বার্থ চিন্তার বীজ বপন যাতে নৃগোষ্ঠীয় সংহতি গড়ে উঠতে না পারে।

ব্রিটিশদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি ও জাতিগত বিভেদনীতি

জাতিগত বিভেদ নীতি প্রয়োগ করে চট্টগ্রামের বাঙালিদের থেকে পাহাড়িদের পৃথকীকরণ করার প্রক্রিয়ার পেছনেও ছিল সুদুরপ্রসারী রাজনৈতিক অভিসন্ধি। ম্যাকগিলের সুপারিশ ছিল বাঙালিদের সংশ্রব থেকে পাহাড়িদেরকে পৃথক করে রাখতে হবে। তা না হলে তারা তাদের আদি সারল্য হারিয়ে ফেলবে– এ হলো ঔপনিবেশিক পর্যবেক্ষণ। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ত্রিপুরা জাতি বাঙালি হিন্দুদের ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে যায়নি। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের সাথে মিশলে পার্বত্য জাতিরা বাঙালিদের ক্ষতিকর প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হবে– এ অজুহাতে পার্বত্য জেলার

---

[১০৩] Tridiv Roy, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১.
[১০৪] ভক্ষগ্যাং মে, *কৌম সমাজ*, ৭১।
[১০৫] R. H. S Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts, District Gazetteer*, P. 13.

অধিবাসীদেরকে সামষ্ঠিকভাবে 'হিলম্যান' বা 'ট্রাইবাল' বা উপজাতীয় পরিচিতি আরোপ করে। অর্থাৎ তারা বাঙালিদের থেকে আলাদা এ ধ্যান ধারণার বীজ বপন করে। এটাও ঠিক ব্রিটিশ অধিকারে আসার আগে পার্বত্য জাতিদের কোনো সাধারণ পরিচিতি জ্ঞাপক শব্দ বা প্রত্যয় ছিল না। আবার এটিও জেনে রাখা দরকার যে ইংরেজরা পার্বত্য প্রদেশে আসার আগে পাহাড়ি লোকেরা কেউ চাকমা, মারমা, পদবি ব্যবহার করতো না। নাম জিজ্ঞেস করলে কেবল নামটাই বলত। ভিন্ন ভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীকে সহজে চিহ্নিত করার জন্য সাহেবরা চাকমা, ত্রিপুরা, মঘ (মারমা) ইত্যাদি নামের শেষে জুড়ে দিয়েছিল।[১০৬] কিন্তু ব্রিটিশরা নিছক পরিচিতি বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে তাদের সামষ্ঠিক পরিচয় 'হিল ট্রাইবস' বলে জাতিগত অভিধায় চিহ্নিত করেনি। আসল কথা হল ১৮৫৭ সালের দুঃসহ স্মৃতি ব্রিটিশ নীতি নির্ধারকদের সবসময় তাড়া করে বেড়াত। ডাফরিন যেমন ১৮৮৮ সালে মন্তব্য করেন, '৩০ বছর আগের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্রিটিশরা 'যেসব শিক্ষা পেয়েছিল সর্বদাই সেগুলো স্মরণে রাখা উচিত'।[১০৭] বাংলা ছিল উপনিবেশবাদ বিরোধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূতিকাগার। বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনা পাহাড়িদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই ভবিষ্যতে ভারতীয়দের মধ্যে যাতে কোনোরূপ রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠতে না পারে সেজন্য তারা নানা কৌশলে ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তৈরি করে। প্রদেশগুলোকে ভাগ করে রেগুলেশন, নন-রেগুলেশন প্রদেশ, দেশিয় রাজ্য প্রভৃতিতে। জেলাগুলোও ভাগ করে সাধারণ জেলা ও তফসিলভুক্ত জেলা বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে। হিন্দু ও মুসলিম এ দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যকে উস্কে দেয় বিচ্ছিন্নতার দিকে। শুধু তা নয় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের (হরিজন) ও দলিতদের হিন্দু সমাজ দেহ থেকে আলাদা করে সৃষ্টি করে 'তফসিলি জাতি'। বাংলা প্রদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আসাম থেকে বার্মা পর্যন্ত পার্বত্য এলাকায় যে জনগোষ্ঠী বসবাস করে তাদেরকে ভারতের সমতলের বাসিন্দাদের ক্রম প্রসারমান রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেই ব্রিটিশ নীতি নির্ধারকরা উপজাতীয়দের আলাদা বর্গভুক্ত করে। এজন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল ছিল তাদের আইনাস্ত্র। ১৯০০ সালের ৫১ বিধিতে অবাঞ্চিত অস্থানীয়/ অ-আদিবাসী ব্যক্তিকে জেলা থেকে বহিষ্কার করার বিধান করা হয়েছিল।. ৫২ (এ) বিধিতে বলা হয়েছে,

> এখানে যাহাই কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, চাকমা, মগ অথবা পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুসাই পাহাড়, পার্বত্য আরাকান, বা ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোনো পাহাড়ি ট্রাইব আদিবাসী (হিল ট্রাইব ইনডিজেনাস) ব্যতীত কোনো ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসের জন্য প্রবেশ করিতে পারিবেন না, যতক্ষণ না তিনি ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক তাঁহার এখতিয়ারের অধীনে মঞ্জুরীকৃত কোনো অনুমতি পত্র লাভ করেন।

[১০৬] মৃত্তিকা চাকমা (সম্পা.) *ডাঃ ভগদত্ত খীসা রচনা স্মারক*, (রাংগামাটিঃ ডাঃ পরশ খীসা প্রকাশিত, ২০১২), পৃ.২২২।
[১০৭] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত* ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ. ১৩।

অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনের মতে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের এসব বিধি ছিল: very harsh provisions under the surplice of so-called protection of tribal rights and privileges.[১০৮]

১৯০০ সালের রেগুলেশন ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ডিসি

ম্যাকগিলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল পার্বত্য জেলা শাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে অর্থাৎ জেলার ভালমন্দ তার ওপর ছেড়ে দিতে হবে। ম্যাকগিলের অভিমত ছিল, ‘‘A wide latitude must always be allowed to the officer in charge of these tracts in passing executive orders; he should have the fullest means of doing so, and he, alone, should be responsible for the well-being of the district.’[১০৯] প্রশ্নাতীত অবাধ ক্ষমতাচর্চার অধিকার চাই পার্বত্য জাতিদের ওপর যথেচ্ছাভাবে শাসন চালাতে। আসলে ভারত এবং পরবর্তীকালে আফ্রিকায় ব্রিটিশরা জেলা প্রশাসকের যে নৈতিক মানদণ্ড দাঁড় করিয়েছিল ম্যাকগিলের চিন্তাধারা সেটারই প্রতিধ্বনি। অনিল শীলের গবেষণায় এমন চিত্র পাওয়া যায়,

> In the classical theory of district administration which the British evolved in India and were later to take to Africa, the essential function of this man of all work was to discover and to mould the state of opinion in his district. To do this, he had to be constantly on tour, attentive to grievances, representing the Sarkar, acting, as the old phrase has it, as the Father and Mother of his district.[১১০]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নিযুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসকগণ নিজেদের এমনটায় ভাবতেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৮৬৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী সুপারিনটেন্ডেন্ট থেকে ডেপুটি কমিশনার করা হয় এবং রাজস্ব, বিচার, পুলিশ ও নির্বাহী দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ডেপুটি কমিশনার হয়ে ওঠেন ছোট খাট গভর্নর। ক্রমশ ডেপুটি কমিশনার হয়ে ওঠেন জেলার সর্বময় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। বস্তুত, ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনে জেলা প্রশাসককে জেলার ক্ষুদ্র স্বৈরশাসকে পরিণত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিমালার ৭ নং অনুচ্ছেদ বিবৃত আছে,

> Chittagong Hill Tracts to be a district under the Superintendent (after 1920 Deputy Commissioner). The Chittagong Hill Tracts shall constitute a district for the purpose of criminal and Civil jurisdiction and for revenue and general purposes,

[১০৮] Syed Anwar Husain, *War and Peace in Chittagong Hill Tracts: Retrospect and Prospect*, p. 8.
[১০৯] *Selections*, p. 13.
[১১০] Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism: Competition and collaboration in the later nineteenth century* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971, 1st published 1968), p. 4.

> the Superintendent shall be the District Magistrate and subject to any orders passed by the Local Government under Section 6, the general administration of the said tracts, in criminal, civil, revenue and all other matters shall be vested in the Superintendent.[১১১]

এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিষয়ে একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয় যে এ জেলার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন সকল বিষয়ের ওপর কিং-পিন (King-pin),[১১২] অনিল শীলের মতে, ``the vital figure in the system'' ।[১১৩] ১৯০০ সালের রেগুলেশনের মাধ্যমে বাংলা প্রদেশের সাধারণ আইন কানুন থেকে পার্বত্য জেলাকে বহির্ভূত রেখে শাসনের নীতি মোটামুটি পাকাপোক্ত হয়।

তথাপি ১৯০০ সালের মে মাসে জারি করা রেগুলেশনকে স্থানীয় পাহাড়িরা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বড় মাইলফলক হিসেবে দেখে। বর্তমান চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় এ রেগুলেশনকে 'নিঃসন্দেহে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহের অন্যতম একটি আইন হিসেবে' গণ্য করেন।[১১৪] দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি স্কলার টিটন চাকমা তাঁর গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনকে পাহাড়িদের জন্য 'ম্যাগনা কার্টা' হিসেবে তুলনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা এরকম:

> The new regulation, which could be described as the ``Magna-Carta'' to the indigenous peoples, recognizes autonomy for the ``hill peoples'' and restrict outsiders, people other than the ``hill indigenous peoples'' to ``enter'' or ``reside'' permanently in the Chittagong Hill Tracts.[১১৫]

এ রেগুলেশনের বিশেষত্ব হলো এটি কার্যকর হওয়ার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিষয়ে প্রণীত সকল আইন (১৮৬০ সালের ২২ নং আইন, ১৮৭৪ সালের তফসিলি আইন, ১৮৯২-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি) বাতিল ঘোষিত হয়। ১৯০০ সালের পর 'হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল' সাংবিধানিক আইনের আঙ্গিকে কাজ করে, যা এই অঞ্চলে অন্যান্য আইনের প্রয়োগের অধিক্ষেত্র ও ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে।[১১৬]

---

[১১১] *The Chittagong Hill Tracts Regulation*, section- 7.

[১১২] Mohammad Ishaq (ed.), *Chittagong Hill Tracts District Gazettteer*, p. 257.

[১১৩] Anil Seal, *op. cit.*, p. 4.

[১১৪] রাজা দেবাশীষ রায় ও প্রতিকার চাকমা (সম্পা.), *পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০* (ঢাকা: এএলআরডি, ২০১৪), পৃ. ১৮।

[১১৫] Titan Chakma, *A Study on the Tribal Buddhists in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh* an unpublished PhD Thesis (Delhi: University of Delhi, 2005), Pp.50-51.

[১১৬] ঐ,

সরকারি প্রকাশনায়ও এ ধরনের কথা পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়। যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে,

> The codified laws applicable to other parts of the subcontinent were not considered suited to the requirments of the unsophisticated and simple tribesmen of the Hill Tracts. So, the government framed an act of simple rules under Regulation 1 of 1900 which formed the basis of the criminal, civil and revenue administration of the district.[১১৭]

এজন্য বোধ হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম গবেষক আদিত্য দেওয়ান '১৯০০ সালের রেগুলেশন' কে (পরবর্তীতে এ রেগুলেশনের সম্পুরক হিসবে জারি করা ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালে 'ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া' ও 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' সহ) বর্ণনা করেছেন 'a protective legislation'[১১৮] হিসেবে। ১৯০০ সালের রেগুলেশনের পর পরবর্তী ৪৭ বছর ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিষয়ে কোনো রেগুলেশন প্রণয়ন করেনি। এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ঔপনিবেশিক সরকার ঘোষিত এ বিশেষ বিধান দুই একটি বিধি বাতিল বা সংশোধন ব্যতিরেখে আজ অবধি বহাল আছে।

এ রেগুলেশন পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন প্রথাগত সার্কেল চিফ বা রাজা এবং ৩৮০টি মৌজার হেডম্যানদের কর্তৃত্ব স্বীকার করেছে, যাঁরা ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছাড়াও বিচার নিষ্পন্ন করার জন্য লিখিত আইন/সংবিধি ও প্রথাগত আইন প্রয়োগ করে।[১১৯] অর্থাৎ পাহাড়িদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার্থে, তাদের আচার-প্রথা, রীতি-নীতি এবং তাদের জাতিগত বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি সুরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার এ বিধি প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এ বিধি যে আগাগোড়া সাম্রাজ্যের স্বার্থে প্রণীত সে প্রসঙ্গে নিশ্চুপ। উপনিবেশবাদবিরোধী অথচ স্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতাকামী রাজনীতি সচেতন জাতীয়তাবাদী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশকে চিরতরে নিষিদ্ধ করতেই সরকার অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এ বিধি প্রণয়ন করেছে। ৫২ নং বিধি বলে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা ত্রিপুরা, লুসাই প্রভৃতি জাতিসত্তার বংশোদ্ভূত লোক ছাড়া অন্য জেলার লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ বা বসতি স্থাপনে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ করে। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার যা চেয়েছে তা এস মাহমুদ আলী সুস্পষ্ট করেছেন: ''The raj sought to sanitise and insulate the hills from the 'corrupting' influence of the incipient nationalist revolutionary movement, for which Bengal provide a

[১১৭] Mohammad Ishaq, *Bangladesh District Gazetteer: Chittagong Hill Tracts*, পৃ. ২৫৬।

[১১৮] Aditya Kumar Dewan, *op., cit.*, p. 438.

[১১৯] রাজা দেবাশীষ রায়, ঐ, পৃ. ১৯।

fertile spawning ground.[১২০] আবার ৩৪ বিধি বলে বহিরাগতদের এ জেলায় জমিজমা ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও সরকার কখনো জমিতে পাহাড়িদের স্বত্ব বা মালিকানা স্বীকার করেনি। রাজকুমারী চন্দ্রা কালিন্দি রায় ব্রিটিশদের এই অস্বীকৃতির নীতিকে উনিশ শতকে ইউরোপীয়দের আদিবাসীদের জমি দখলের ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত 'ডকট্রিন অব টেরা নুলিয়াস' ('Terra Nullius') এর প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ মতবাদের মমার্থ হলো উপনিবেশবাদীরা আসার আগে ঐ জমি কারোর স্বত্ব ছিল না।[১২১] যাহোক ১৯০০ সালের রেগুলেশন দিয়ে বাঙালিদেরকে জমি কেনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করলে পাহাড়িদের জমির মালিকানা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না এ চরম সত্য বরাবর উপেক্ষিত থেকে গেছে। এটা সুবিদিত যে, রানি কালিন্দী থেকে প্রত্যেক রাজা জমির ওপর স্থায়ী স্বত্বের দাবি করলে সরকার পৌনপুনিকভাবে সে-দাবি অস্বীকার করেছে এবং ঘোষণা করেছে জমির মালিক ব্রিটিশ রাজ; রাজারা খাজনা সংগ্রাহক মাত্র। ব্রিটিশ অধিকর্তারা বারংবার ঘোষণা করেছে,

> এই পর্বতে বসবাসরত অর্ধ-সভ্য উপজাতিদের বোঝানো হয় যে তারা যে জমিতে বাস করছে তা হল রানির অধীন, অর্থাৎ ভারতবর্ষের একটি অংশ। অতএব সরকারই সব সম্মানের উৎস। . . . পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমস্ত জমিই সম্রাটের মালিকানাধীন, উপজাতীয় রাজাদের কোনো মালিকানা স্বত্ব নেই। সরকারের তরফ থেকে কর আদায়ের ও খাজনা আদায়ের যে অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে, সেইটুকুই কেবলমাত্র তাদের ক্ষমতা।[১২২]

ব্রিটিশ-নির্ভর সামন্ত শ্রেণি ও জনপ্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতি

স্বায়ত্তশাসনের অন্যতম দুটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত যথা- রাজনৈতিক মত প্রকাশের অধিকার ও ভূমি অধিকার যেখানে স্বীকৃত নয় সেখানে সাংস্কৃতিক বিকাশের সুরক্ষাকবচ বিষয়টি অন্তঃসারশূণ্য শ্লোগানে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকার ৩৪, ৫১ ও ৫২ নং বিধিতে পার্বত্য জেলায় বঙ্গীকরণ ঠেকাতে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ১৮ নং ধারা বলে সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার্থে তা যেকোনো সময় সংশোধন, সংযোজন ও বাতিলের ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখে দিয়েছে। শুধু তাই নয় রেগুলেশনের ১৮ ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে ৫৪টি বিধি প্রণীত হয়েছে এবং রেগুলেশনে সংযুক্ত করা হয়েছে। ১৮ নং ধারা ব্যবহার করে উপনিবেশিকোত্তর সময়ে শাসকগোষ্ঠীর কলমের খোঁচায় ঐসব কথিত সুরক্ষা বিধি সংশোধন বা বাতিল বা উপেক্ষিত হয়েছে। আবার ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ১-১০ বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দেওয়ানি মামলা বিচারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে, ঐ বিধিসমূহ দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ

---

[১২০] S. Mahmud Ali, *The Fearful State: Power People and Internal war in South Asia*, p.175.

[১২১] Rajkumari Chandra Roy, *Land Rights of the Indigenous peoples of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (Copenhagen, International work group for indigenous affairs, 2000), p. 50.

[১২২] গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, পলিটিক্যাল ব্রাঞ্চ, প্রসিডিংস ১-২(জুন ১৯১৮),ইস্যু অব এ ওয়ার্নিং টু দ্য মং চিফ, চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস, ফর ডেরেলিকশন অব ডিউটি।

ফৌজদারি বা দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত রাখা হয়েছে, কারণ দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং কোনো সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তির সুবিচার তো দূরের কথা উচ্চতর আইন বা আদালতের আশ্রয় লাভের সুযোগটুকুও এ বিধি দেয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ১৯ ধারামতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনব্যবস্থার কোনো আইনের সাংবিধানিক মর্যাদার প্রশ্ন কোনো আদালতে উত্থাপন করা যেতো না।[১২৩] সুতরাং ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বুঝা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের চলাচল, বসতি স্থাপন ও জমি ক্রয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা ছাড়া এতে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক বিকাশের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোনো ব্যবস্থাই এতে ছিল না। বরং এ বিধি বলে ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় একটি রাজনীতিবিমূখ সুবিধাভোগী সামন্ত শ্রেণি গড়ে উঠার রাষ্ট্রীয় আয়োজন সুসম্পন্ন হয়। চন্দ্রিকা বসু মজুমদারের মূল্যায়ন এক্ষেত্রে সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

> Under colonial ruler CHT was treated by the British like any other colonized area. The Deputy Commissioner who was in charge of the the Hill Tracts was entrusted with lot of power. He was the link between village headman and other chiefs of the tribes. Therefore, like any other place, colonial ruler in CHT simply created a privileged class to work for the benifit of colonial rule. . . . So, In the name of the maintainance of peace and trampling down the political consciousness of the people of Chittagong Hill Tracts, the British Government made a typical hereditory aristrocracy of privileged class in the society. Here, there was no scope of growth and development of democratic institutions which ensure mass participation.[১২৪]

আপাতদৃষ্টিতে ১৯০০ সালের রেগুলেশন বলে সৃষ্ট ত্রিস্তর বিশিষ্ট সার্কেলভিত্তিক সামাজিক, প্রশাসনিক, রাজস্ব ও বিচারিক কাঠামো (চিত্র ২.১), চাকমা চিফ (স্থানীয়ভাবে দক্ষিণ এশীয় প্রতীক 'রাজা' পরিচয়দানকারী), বোমাং চিফ ও মং চিফের রাজকীয় আবরণ, অভিষেক ও পুন্যাহপোলক্ষে আয়োজিত আড়ম্বরপূর্ণ দরবার অনুষ্ঠান, সামাজিক বিচারিক ক্ষমতা, সুরম্য রাজপ্রাসাদ ও রাজ পরিবারবর্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চা দেখে মনে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজতন্ত্র বিরাজমান।

---

[১২৩] রাজা দেবাশীষ রায় ও প্রতিকার চাকমা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬।

[১২৪] Chandrika Basu Majumder, *Genesis of Chakma Movement In Chittagong Hill Tracts* (Kolkata: Progressive Publishers, 2003), p. 5.

চিত্র : ২.১

কিন্তু সেই চাকচিক্য বহিরাবরণ শুধু দৃষ্টিনন্দন ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য, কার্যত (ডি ফ্যাক্টো), জেলার প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণে তাদের ভূমিকা গৌণ। তারা নিজ নিজ সার্কেলে প্রভূত ক্ষমতাবান হলেও ব্রিটিশ আইনের চোখে তাঁরা ছিলেন শুধুই খাজনা সংগ্রাহক। অধিকন্তু সার্কেল চিফদের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা মোটেই সুরক্ষিত ছিল না। ছিল ডেপুটি কমিশনারের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। তিনি কোনো কারণে গোষ্ঠীপতিদের ওপর ক্ষুদ্ধ হয়ে যদি নেতিবাচক সুপারিশ গভর্নরের নিকট প্রেরণ করেন তাহলে সে-অধিকার সার্কেল চিফদের হাতছাড়া হতে সময় লাগে না। যেমন ১৯২৫ সালে ডেপুটি কমিশনার সি জি স্টিবেনের সুপারিশ অনুসারে সার্কেল চিফদের ভূমি রাজস্ব আদায়ের কমিশন প্রাপ্তির সুবিধা বাতিল করা হয়।[১২৫] এতে চিফদের যে-আর্তনাদ ও হতাশা পরিদৃষ্ট হয় তাতে তাদের উপরোক্ত রাজকীয় আচারের অন্তঃসারশূণ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯৩৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির সংশোধন করে ইতিপূর্বে প্রদত্ত সকল দায়িত্ব থেকে চিফদের অব্যাহতি দিয়ে কার্যত 'ঠুঁটো জগন্নাথে' পরিণত করা হয়। এছাড়া পাকিস্তান আমলে যখন চাকমা রাজাদের গৌরবের প্রতীক রাজপ্রাসাদ কাপ্তাই বাঁধের অথৈ জলে নিমজ্জিত হয় তাতে ভেসে ওঠে (প্রজাদের রক্ষা দূরের কথা নিজ প্রাসাদ রক্ষায় অক্ষমতা) চিফদের অসহায়ত্বের নির্মম বাস্তব ও মর্মস্পর্শী চিত্র। ১৯০০ সালের বিধি বলে ডেপুটি কমিশনারের প্রশাসনে পাহাড়িদের কোনো বক্তব্য প্রদানের জায়গা ছিল না। সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো তাদের জন্য কিন্তু তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নয়। বাংলাদেশ বিষয়ক প্রখ্যাত গবেষক ভেলাম ভ্যান সেন্দেল তাই আক্ষেপের সুরে লিখেছেন,

> দুঃখের বিষয় এই যে, {১৯০০ সালের বিধি বলে} আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না, আর কেউ কেউ যা চেয়েছিলেন সেই কৌম সমাজের অধিকারও অস্বীকৃত হয়েই থাকে। এর বদলে এমন এক ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যেখানে 'বিচ্ছিন্নতা'ই ক্রমবর্ধমান আকার ধারণ করে এবং পর্বতের অধিবাসীরা ক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। বরঞ্চ বৃটিশরাই পর্বতবাসীদের সরাসরি শোষণ করতে শুরু করে। . . . বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের ভুমি সংক্রান্ত অধিকার রক্ষায় যত না উৎসাহী ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী ছিল

---

[১২৫] *Joint Reply of the Three Chiefs of the Chittagong Hill Tracts To Mr. Mills' Report, 1929*, p. 37 & *Selections*, p. 430.

ঔপনিবেশিক অর্থভাণ্ডারে ভাল অঙ্কের রাজস্বলাভ করতে। তাদের মূল উৎসাহ ছিল আঞ্চলিক গোষ্ঠীপতিদের মাধ্যমে চাষিদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা।[১২৬]

পূর্বের আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে, সত্যিকার অর্থে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদেরকে গোত্রগত স্বায়ত্তশাসনের কোনো সুযোগ দেননি। ইংরেজ সরকার নিজেদের সাম্রাজ্য সুরক্ষার নীতি সার্থক করার জন্য যখন যেমন ইচ্ছা বিধি-বিধান তৈরি করে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রয়োগ করেছেন। সুবোধ ঘোষের ভাষায়, 'এটি না ছিল চীফতন্ত্র, বরং বলা যায় চীফদের সাহায্যে ইংরাজ অফিসারতন্ত্র।'[১২৭] এস মাহমুদ আলী আরো একধাপ এগিয়ে ১৯০০ সালের আইনকে অভিহিত করেছেন 'উপজাতীয় স্বশাসন বিনাশের আইনি অভিব্যক্তি' হিসেবে। তাঁর মতে,

> The Act of 1900 was the legal expression of the final destruction of tribal self-government: that was replaced with colonial administration under a veneer of indigenous institutions. The act integrated the district with the empire's judicial system but also erected barriers to its socio-cultural assimilation. For the first time, the law made distinction between highlanders and plains people.[১২৮]

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ডেপুটি কমিশনারের ওপর যেভাবে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে তাতে শাসন পদ্ধতিকে রেগুলেশনি স্বৈরতন্ত্র বলাই যুক্তিযুক্ত। জেড এ আহমেদ সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা না বললেও তার বর্ণনা পার্বত্য চট্টগ্রামের চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে:

> The system of administration in all tribal areas is highly authoritative and autocratic. Many of these areas which are frontier tracts are kept under a form of military occupation. All executive and judicial powers are concentrated in the hands of a few government officials, usually headed by a Deputy Commissioner who is vested with almost dictatorial authority in all matters. In most cases he is the District Magistrate as well as the Sessions Judge and also the highest executive officer.[১২৯]

---

[১২৬] ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল (সম্পা.), *বাংলার বহুজাতি: বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতি প্রসঙ্গ*, পৃ. ১১৩-১১৪।
[১২৭] সুবোধ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫।
[১২৮] S. Mahmud Ali, *The Fearful State*, p. 174 & Bangladesh Groep Nederlend, ''The Road to Repression: Aspects of Bengali Encroachment on the CHT 1860-1983.'' in Wolfgang Mey, (ed.) *Genocide in the CHT, Bangladesh*, (Cophenhegan: 1984), p. 22-23.
[১২৯] Z. A. Ahmed, *প্রাগুক্ত*, p. 8.

১৯০০ সালের রেগুলেশন হয়ে ওঠে ব্রিটিশদের সুপরিকল্পিত বহির্ভূত শাসন নীতির মোক্ষম হাতিয়ার। অন্যদিকে সীমিত স্বাতন্ত্র্যের অনুমতি প্রদান করে সমগ্র অঞ্চলকে কীভাবে সামগ্রিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এই নিয়ন্ত্রণ বিধি তারই পরিচায়ক।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাক্টস' ঘোষণা

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের প্রথম দশকেই বাংলা ও ভারতের রাজনীতি উত্তাল রূপ ধারণ করে। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর বৃহত্তর বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিমে 'বাংলা' এবং পূর্বে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে দুটি প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত ছয় বৎসর স্থায়ী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাও যুক্ত হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশটির পথচলা খুব দীর্ঘতর না হলেও ভারতের পরবর্তী ইতিহাসে এই প্রদেশ সৃজনের রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক প্রভাব অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে স্বদেশী আন্দোলন নামে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গুণগত ও পরিমাণগত– দুই দিক থেকে এক ধাপ এগিয়ে যায়। বঙ্গবিভাগ রোধের জন্য যেভাবে ভারতের সকল শ্রেণি পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র আন্দোলন শুরু করে তাতে শুধু কলকাতা নয় লন্ডনেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা হয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় বঙ্গভঙ্গ রদ। সুমিত সরকার সেই উত্তাল দিনগুলোর অনবদ্য বিবরণ দিয়েছেন, 'জুলাই ১৯০৫ এর পর চমকপ্রদ দ্রুততায় আন্দোলন তার প্রথাগত নোঙর ছিঁড়ে বেরিয়ে এল, গড়ে তুলল নানান ধরনের নতুন ও জঙ্গী কৌশল, টেনে আনল আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি মানুষকে এবং ছড়িয়ে পড়ল স্বরাজের সংগ্রামে।"[১৩০] বাংলার সেই উদ্দীপনা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন– "তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা ব'লে ভাসা তরী।[১৩১]

মফস্বল এলাকাগুলি যে কী পরিমাণে স্বদেশি চেতনায় ও সংগ্রামে জেগে উঠেছিল তৎকালীন বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলা তার প্রকৃষ্ট উদারণ। শুধু বরিশাল নয় মাদারিপুর, বিক্রমপুর, কিশোরগঞ্জ ছিল পূর্ব বাংলার স্বদেশির শক্ত ঘাঁটি। স্বদেশি সংগ্রামে রাজনীতিক, ছাত্র, শিক্ষক, নারী-পুরুষ, ব্যবসায়ী, পুরোহিত, কবি-সাহিত্যিক, উকিল, ব্যারিস্টার, সাংবাদিক, কৃষক, শ্রমিক সকল মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে নবভারতের অভ্যুত্থান ঘটেছে।[১৩২] উপনিবেশবাদের আসল চেহারা সে চিনে ফেলেছে এবং তার

---

[১৩০] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত*, পৃ.৯১।

[১৩১] উদ্ধৃত- হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১), পৃ.৫৭।

[১৩২] বিপন চন্দ্র , *আধুনিক ভারত*, পৃ. ৪০৬-৪০৮।

মুলোৎপাটনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যার শেষ অভিষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ। এভাবে নতুন নতুন ভাবধারা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজের আকাঙক্ষাও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের শেষাংশে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে উত্তর ভারতের মুসলমান সমাজে যে নবচেতনার উম্মেষ ঘটেছিল বিশ শতকের গোড়াতে এসে সেই চেতনা রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়। ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দল– নিখিল ভারত মুসলিম লীগ– গঠন তার বহিঃপ্রকাশ। দল গঠনের পর মুসলমানরা ব্রিটিশ-ভারতের নীতি নির্ধারণী পর্ষদে তাদের প্রতিনিধিত্ব আদায়ের প্রয়াস চালায় বড়লাট মিন্টো ও ভারত সচিব মর্লির কাছে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণয়ন করে। এ আইনে ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য ভারতীয় আইনপরিষদে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে পৃথক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করা হয়। বঙ্গীয় আইন পরিষদে ২৮টি নির্বাচিত আসনের ৫টি (১৮%) মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। বলা বাহুল্য ১৯০৯ সালে যে-পৃথক নির্বাচনের বীজ বপন হয় তা ব্রিটিশদের প্রচ্ছন্ন প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ এসে ফলবতী বৃক্ষে পরিণত হয়। ১৯০৯ থেকে পরবর্তী সকল সাংবিধানিক সংস্কার আইন প্রণয়নের প্রাক্কালে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব ও সংরক্ষিত আসনের ইস্যুটি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত ও স্বীকৃত হয়।[১৩৩]

কিন্তু ব্রিটিশদের কৌশলী এবং সাবধানী নীতির কারণে স্বীয় প্রদেশে ঘটে যাওয়া ব্যাপক আন্দোলনের ছিঁটেফোটা প্রভাবও পড়েনি পার্বত্য চট্টগ্রামে। ১৯০০ সালের রেগুলেশন দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে করে রাখা হয় রাজনীতি নিষিদ্ধ এলাকা। স্বদেশি, স্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা এসব অধিকারজ্ঞাপক প্রত্যয় সেখানে তখনো অশ্রুতপূর্ব ধারণা। ওখানকার তিন সার্কেল চিফ একান্তভাবে ব্রিটিশভক্ত 'রাজস্ব সংগ্রাহক' হিসেবে স্ব স্ব পদ ও বৈষয়িক স্বার্থ চিন্তাতেই মগ্ন। জনগণের রাজনৈতিক বিকাশ তাদের কাছে ছিল স্বার্থহানিকর। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তারা অতটা ভাবিত ছিলেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামের চিফরা কোনো দাবিই উত্থাপন করেনি। যার ফলে ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কিছুই ছিল না।

১৯১৪-১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঢামাডোলে ব্রিটিশ-ভারতে সকল সাংবিধানিক সংস্কার বন্ধ ছিল। অন্যদিকে যুদ্ধকালীন ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ১৯১৬ সালে সম্পাদিত হয় লক্ষ্ণৌ চুক্তি। ১৯১৭ সালে ২০ আগষ্ট ভারত

[১৩৩] মো. মাহবুবুর রহমান, 'মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি ১৯০৬-১৯৩৫ এবং ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন একটি পর্যালোচনা, মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশ চর্চা*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি, ২০০৮), পৃ. ১-৩৪।

সচিব ই এস মন্টেগু কমন্সসভায় ভবিষ্যতে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন[১৩৪] এবং ঐ বছর ১০ নভেম্বর তাঁর ভারত সফর ভারতবাসীর মধ্যে নতুন করে স্বপ্ন জাগায় দায়িত্বশীল সরকার পাওয়ার।[১৩৫] ১৯১৮ সালে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে তিনি সাংবিধানিক সংস্কার প্রতিবেদন দাখিল করেন। এ রিপোর্টের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টফোর্ড সংস্কার আইন। এই আইন অনুসারে প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বেশ কিছু সংখ্যক বিষয় আইনসভার হাতে ছেড়ে দেয়া হয় যেখানে বিশেষ করে বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যগণ ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। এভাবে প্রাদেশিক শাসন বিষয়ে সীমিত আকারে হলেও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক সরকার আগের তুলনায় বৃহত্তর পরিসরে স্বশাসন ভোগ করে।

কিন্তু মন্টফোর্ড প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যে কি জুটল? এই প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা ১৮৭৪ সালে তফসিলি বা তালিকাভুক্ত জেলার আদিবাসীদের ভাগ্যে সামান্য কিছু ছিল। আদিবাসি সমাজ সম্বন্ধে ''বিশেষ ব্যবস্থার নীতি' পূর্ববৎ বহাল থাকে। রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, ''আদিবাসী সমাজে এমন কোনো উপাদান নেই যার ওপর ভিত্তি করে কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো যেতে পারে।''[১৩৬] এ ধরনের যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে কারণ যেখানে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন ম্যানুয়েলের ৫২ নং বিধিতে অন্য জেলার লোকদের অবাধ প্রবেশাধিকারেই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, যেখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে রাজনৈতিক উপাদান গজিয়ে উঠবে কীভাবে?

রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য কিন্তু সরকার ৮৭ বৎসরের শাসনকালে একটি মাত্র সরকারি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেই দায়িত্ব শেষ করেছে। ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত এলিমেন্টারি স্কুলটি যখন ১৮৯০ সালে হাই স্কুলে উন্নীত করা হয় তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭ হাজার আবার ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে তখনও ঐ একটি মাত্র সরকারি স্কুলই ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ জনসংখ্যার জন্য। এমনতর বাস্তবতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় রাজনৈতিক সচেনতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়।

কিন্তু রাজনৈতিক উপাদান গড়ে উঠেনি এ অজুহাত তুলে ১৮৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ তফসিলি জেলাগুলো যে-ব্যবস্থায় শাসিত হচ্ছিল ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনেও সেই গভর্নর-জেনারেল বা তাঁর প্রতিনিধি গভর্নরের খাস শাসনে রেখে দেয়া হয়। পরিবর্তন শুধু পুরাতন কয়েকটি জেলার তালিকা

---

[১৩৪] আতফুল হাই শিবলী ও মো. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস*, ১৭৭৩-১৯৭২ (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৯), পৃ.৬০-৬১।

[১৩৫] ঐ।

[১৩৬] সুবোধ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০।

থেকে বিযুক্তকরণ এবং 'তফসিলি জেলার' বদলে ব্যাকওয়ার্ড বা 'অনগ্রসর অঞ্চল' নামকরণ। নতুন অনগ্রসর অঞ্চলের তালিকায় ছিল নিম্নোক্ত অঞ্চলসমূহ: ১) লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম, ৩) স্পিতি, ৪) অঙ্গুল জেলা, ৫) দার্জিলিং জেলা, ৬) লাহৌল, ৭) গঞ্জাম এজেন্সি, ৮) ভিজাগা পট্টম এজেন্সি, ৯) গোদাবরী এজেন্সি, ১০) ছোটনাগপুর বিভাগ, ১১) সম্বলপুর জেলা, ১২) সাঁওতাল পরগণা জেলা, ১৩) গারো পাহাড় জেলা, ১৪) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ, ১৫) মিকির পাহাড়, ১৬) উত্তর কাছাড় পাহাড়, ১৭) নাগা পাহাড়, ১৮) লুসাই পাহাড়, ১৯) সদিয়া বলিপাড়া ও লখিমপুর সীমান্ত অঞ্চল।[১৩৭]

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রতিবেদন উক্ত জেলা গুলোকেই 'অনগ্রসর অঞ্চল' হিসেবে অভিহিত করে এবং ১৯১৯ সালের আইনের প্রবিধি উক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয় বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্রিটিশ নীতি বড় ধুরন্ধর এই অর্থে যে, উপরে বর্ণিত অনগ্রসর এলাকাগুলোকে আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে যাতে তাদের মধ্যেও কোনো ধরনের সংহতিবোধ মাথা চাড়া দিয়ে না উঠে। যেমন- ক) কতকগুলি অঞ্চল সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইনসভায় একেবারে কোনো প্রতিনিধিত্ব পায়নি এর মধ্যে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ (মাদ্রাজ), পার্বত্য চট্টগ্রাম (বাংলা), স্পিতি (পাঞ্জাব) ও অঙ্গুল (উড়িষ্যা) উল্লেখযোগ্য। খ) কতকগুলি অঞ্চলে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়, যথা- দার্জিলিং, লাহৌল, এবং আসামের সমগ্র অনগ্রসর অঞ্চল। গ) কতকগুলি অনগ্রসর অঞ্চলে নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।[১৩৮] কিন্তু নিবিড় পর্যালোচনায় দেখা যায় কার্যকারিতার দিক থেকে সবগুলো অঞ্চলের শাসন গভর্নরের পরিষদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আরো দেখা যায় আইনসভায় যতই ভারতীয়দের কথা বলা বাড়ছে ততই 'অনগ্রসর অঞ্চল'গুলো বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছে। জেড এ আহমেদ অনগ্রসর অঞ্চল প্রসঙ্গে ব্রিটিশ নীতির বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> The Montague-Chemsford Reforms treated these areas as ''Backward Tracts'' and made the Provisions of the Government of India Act of 1919 inapplicable to them. A distincton was however made between those tracts which were wholly excluded from the Reforms and those which were subject to varying degrees of exclusion. The tracts which were completely excluded were not given any direct representation to the legislatures; nor were the legislatures allowed any jurisdiction over them. The Governor–in-Council was made solely responsible for their administration. This was secured by section 52 A (2) of the Government of India Act (1919) which prescribed that:

---

[১৩৭] সুবোধ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০-১৪১।

[১৩৮] সুবোধ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

(1)Neither the Central nor the Provincial Legislature shall have power to make laws applicable to the tract, but the Governor-in- Council may direct that any Act of the Provincial Legislature shall apply to the tract, subject to such exceptions or modifications as the Governor thinks fit.

(2) Proposals for expenditure in the tract need not be submitted to the vote of the Legislative Assembly or Provincial Legislature.

(3) No question may be asked about the tract and no subject relating to it may be discussed in the Assembly or (except with Governor's sanction) in the Provincial Legislature.[১৩৯]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় ব্রিটিশ সরকার অনগ্রসর এলাকার ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তক, নিখুঁত কৌশলী এবং সংবেদনশীল ছিল। বিভেদ ও শাসন কৌশল কত সুনিপুণ দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করা যায় উপরোক্ত অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর ত্রিধাবিভক্তকরণ এবং সে-অঞ্চলসমূহের ভালমন্দের ব্যাপারে ভারতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়াস ও প্রক্রিয়া থেকে আঁচ করা যায়। এতে করে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহে যেসব আইনি রূপ ও নাগরিক অধিকার বিস্তর ঘোষণা প্রচারণার মাধ্যমে প্রসারিত করা হয় সেসব সুবিধা থেকে উক্ত তালিকাভুক্ত 'অনগ্রসর অঞ্চল' গুলোকে বিচ্ছিন্ন ও বহির্ভূত রাখা হয়। **১৯১৯** সালের ভারত শাসন আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলার গভর্নর **১৯২১** সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাক্ট' বা 'অনগ্রসর অঞ্চল' ঘোষণা করেন। এরূপে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ বহির্ভূতকরণ নীতি ভারতীয় আইনের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত করা হল। অধিকন্তু এ ঘোষণা বাংলার ক্রমপ্রসারমান প্রতিনিধিত্বমূলক প্রাদেশিক আইনসভার প্রভাব বলয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবার বিচ্ছিন্ন করল।[১৪০]

এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শাসন বিষয়ে বাংলার লে. গভর্নরকে করা হয় সকল ক্ষমতার মালিক। তিনি যেকেনো সময়ে যখন মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশাসন ও শান্তির পক্ষে কোনো বিধি প্রয়োজন, উপযোগী এবং উপযুক্ত তখন তিনি তা প্রয়োগ করেন; নতুবা বিদ্যমান রুলস ও রেগুলেশন বাতিলও করেন। তিনি এতই শক্তিশালী যে, স্বেচ্ছামূলকভাবে তিনি অনেক কিছু করতে পারেন। তিনি আইন পরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। আইনে সেটা বারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, অনগ্রসর অঞ্চল শাসন বিষয়ে তাঁর কাজকর্মের ওপর কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করা যাবে না। গভর্নর হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন পরিষদ। গভর্নর আইন প্রণয়ন করেন এবং তাঁর আজ্ঞাবাহী ডেপুটি কমিশনার সেটা

---

[১৩৯] Z. A. Ahmed, *Excluded Areas under the New Constitution*, Allahabad, 1937, p. 2.

[১৪০] S. Mahmud Ali, ''This excluded the district from the influence of the increasingly representative provincial legislature.'' p. 175.

কার্যকর করেন।[১৪১] এভাবে এক অগণতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশে বন্দি করে রাখা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্ন বহির্ভূত শাসন আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৫-এ পনেরো বছরে সর্বভারতীয় রাজনীতি অনেক পরিবর্তন হয়। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থান, সত্যাগ্রহ, অহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, আইনসভার নির্বাচন, সাইমন কমিশন, আইন অমান্য আন্দোলন, গোলটেবিল বৈঠক, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস, মাস্টার দা সুর্যসেনের বিপ্লবী সংগ্রাম প্রভৃতি ঘটনা প্রবাহ নিয়ে সরব থাকে রাজনৈতিক অঙ্গন। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামে কলকাতা থেকে প্রেরিত দু'জন (এফ ডি আস্কলি ও জে. পি. মিল) কর্মকর্তার রিপোর্ট নিয়ে মাঠ গরম হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত মি. এফ ডি আস্কলির পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্ব প্রশাসন বিষয়ক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বেঙ্গল সরকার কর্তৃক ১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ তারিখ গৃহীত ২৪৭৬ পিডি নং রেজ্যুলেশন অনযায়ী ১৯২০ সালে সার্কেল পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও রামগড় মহকুমা গঠন করেন।[১৪২] প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া কিন্তু তা যদি করা হয় রাজনৈতিক অভিসন্দি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তখন সেই উদ্যোগ নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, যেমনটি হয়েছিল লর্ড কার্জনের ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগ নিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই প্রশাসনিক বিন্যাস উপজাতীয় চিফদের প্রশাসনের ওপর ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের গেড়ে বসে ভাগ বসানোর গুঢ় উদ্দেশ্যে বলে ধরা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৮৮১ সালে চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেল গঠিত হওয়ার পর ১৯১১ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সেন্সাস রিপোর্ট সংকলিত হতো চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেলকে ইউনিট ধরে এবং চিফদের মাধ্যমে। কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে সেই ধারা পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদম শুমারীর সময় রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও রামগড় সাব-ডিভিশনকে ইউনিট ধরা হয় এবং রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যায় তিন সার্কেলের পরিবর্তে সাধারণ জেলাগুলোর মতো সাবডিভিশনগুলোর শিরোনামই প্রতিস্থাপিত হয়েছে।[১৪৩] এ প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য এই যে, ঔপনিবেশিক প্রশাসনে চিফদের গুরুত্ব যে ফুরিয়ে যাচ্ছে এটি তার সংকেত। ভেলাম ভ্যান সেন্দেল লিখেছেন,

> The chief's power was also circumscribed by the fact that they were under the control of the bureaucracy. From the 1860s onwards, British officials with considerable powers resided in the district. They oversaw the chief's doings and formed the vangaurd of an extensive and expanding state bureaucracy with which

---

[১৪১] মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার '১৯৭২ সালে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবির আবেদনপত্র'। মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা.), *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: জীবন ও সংগ্রাম*, পৃ. ১৩১-১৩৪।

[১৪২] Notification No. 6251 L R., dated Calcutta, the 3rd July 1921, Notification by the Govt. of Bengal, Revenue Department.

[১৪৩] দ্রষ্টব্য ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ সেন্সাস রিপোর্ট ।

the chiefs and the other inhabitants of the Chittagong Hills had to come to terms.[১৪৪]

এতে চিফদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে। মরার ওপর খাড়ার ঘার মতো আরেকটি ঘটনা ঘটে। ১৯২৫ সালে চিফদেরকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় যে-সুবিধা তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামে হালচাষ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। এভাবে দেখা যায়, ১৮৭০ এর দশকে যেখানে ব্রিটিশ নীতি ছিল চিফদের সাথে নিয়ে শাসন করা সেখানে নতুন নীতি হয়ে দাঁড়ায় অব্যবস্থাপনা ও অপশাসনের অভিযোগে চিফদেরকে পাশ কাটিয়ে প্রশাসন চালানো। ১৮৭১ সালে কমিশনার হ্যাঙ্কির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ''to govern through the Chiefs by cultivating their friendship and maintaining their influence. The whole system of our administration is based on maintaining the status of the Chiefs, working through them and drawing them by closer ties towards ourselves.''[১৪৫] Sir Richard Temple, ১৮৭৬ সালের ৫ জুলাই তাঁর কার্যবিবরণীতে লিখেছেন, ''the Chiefs are the natural instruments of Government in the Hill Tracts.''[১৪৬]

ইতোমধ্যে বাংলার হিন্দুদের ও মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গি যেমন বহুদুর পাল্টেছে তেমনি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের মনোভাবও লক্ষণীয়ভাবে পাল্টে গেছে। ঠিক তেমনি ১৮৭০ দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিশাল এলাকা জুড়ে লুসাইদের বিদ্রোহ, লুঠতরাজ, আক্রমণ অব্যাহত ছিল। সুতরাং তখনো শাসকদের নিকট পার্বত্য রাজাদের প্রয়োজন ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯৮ সালে লুসাই পাহাড় সম্পূর্ণ ব্রিটিশ কব্জায় চলে আসে। এবং তা আসাম সরকারের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়। আবার এদিকে বিগত ৫০ বছরে প্রশাসন পরিচালনার অভিজ্ঞতায় ব্রিটিশ অধিকর্তারা পার্বত্য রাজাদের সামর্থ্য, জনসম্পৃক্ততা, জেলার ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে আদ্যপান্ত আয়ত্ত করেছে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে পার্বত্য রাজারা দিন দিন অধিকমাত্রায় ব্রিটিশভক্তে পরিণত হয়েছেন। ১৯২৫-এর ঘটনার পরও (যখন তাদেরকে রাজস্ব প্রশাসন থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়) তাঁদের টনক নড়েনি। তারা ১৯০৫ সালে কংগ্রেস কর্তৃক বর্জিত 'অধিকার আদায়ের আবেদন নিবেদনের পদ্ধতি' বা 'ভিক্ষাবৃত্তির আন্দোলন পদ্ধতি'[১৪৭] নিয়েই মগ্ন ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিষয়ে কোনো সংস্কার হলে এবং তা

[১৪৪] Willem van Schendel et. all, *The Chittagong Hill Tracts: Living in a borderland* (Dhaka: UPL, 2001), p. 59.

[১৪৫] *Joint Reply of the Three Chiefs of the Chittagong Hill Tracts To Mr. Mills' Report,* 1929 p. 37 & Sellections, p. 430.

[১৪৬] *ibid*

[১৪৭] ব্রিটিশ শাসনের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসী নেতাগণ তখন আন্দোলন চালাতেন। আবেদনের সহজ পথে অগ্রসর হওয়াই ছিল তাঁদের দস্তুর। ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি নিয়ে করুণা ভিক্ষার গ্লানি ও লজ্জা তাঁরা বরণ করে নিয়েছিলেন বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে। হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৫।

চিফদের স্বার্থের প্রতিকুলে গেলে চিফরা স্মারকলিপি প্রদান করতেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট। ১৮৭৪, ১৮৯৮, ১৯১৬, ১৯২৯, ১৯৩১ সালে তিনজন চিফের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি পাওয়া যায়।[১৪৮] এসব স্মারকলিপিগুলোর পাঠ থেকে এটি পরিষ্কার যে, ব্রিটিশদের প্রতি তাদের মোহভঙ্গ হয়নি। আরো দেখা যায় স্মারকলিপিগুলোতে চিফদের এবং হেডম্যানদের স্বার্থ ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিক এবং যোগাযোগ, জনস্বাথ্য শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে তারা একদম নিশ্চুপ। কোনো শব্দ, বাক্যই তারা জনগণের হিতের জন্য খরচ করেনি অথচ জনগণের প্রদত্ত নানাবিধ কর এবং আবওয়াব ছিল তাদের বিত্ত, প্রভাব, প্রতিপত্তির ভিত্তি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এসময় তাদের জন্য সুচিন্তিত কাজ হতো যদি তারা ব্রিটিশদের প্রতি মোহভঙ্গ করে আর তাদের দিকে ছাতক পাখির মতো কৃপা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা না করে গান্ধির নেতৃত্বে চলমান খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান নিয়ে জনগণের কাছে যেতেন। জনগণকে সাথে নিয়ে অধিকার সুরক্ষার জন্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন। এ প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিষয়ে একতরফা নীতি নির্ধারণের আগে ব্রিটিশ সরকার একটু ভাবত।

এসময়ে (১৯২৬-১৯২৭) লর্ড লিটনের নির্দেশে আসাম সরকারের একজন কর্মকর্তা, জে. পি. মিলকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনে চিফদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য পাঠানো হয়। তিনি দু'মাস অবস্থান করে তাঁর প্রতিবেদন তৈরি করেন। তিনি চিফদের রাজস্ব ও বিচারিক ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে ডেপুটি কমিশনারের উপদেষ্টা করার প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবের সারমর্ম নিম্নরূপ:

> My proposals are that the chiefs should no longer be employed revenue collectors and petty magistrates. To these tasks, with their inevitable admosphere of book keeping, rules, codes and inspecting officers, the chiefs are not suited either by character, upbringing, or position. They can be perfomed far better by subordinate officials. My desire is to see the chiefs, with undiminished incomes and with on influence only bounded by their capabilites.[১৪৯]

তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার সি. জি. স্টিভেনের প্রভাবে জে. পি. মিল যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন তা পার্বত্য চট্টগ্রামে চিফদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। চিফত্রয় ১৯২৯ সালে '*জয়েন্ট রিপ্লাই অব থ্রি চিফস অব চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস*' শিরোনামে এর বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট চিফদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাতে মনে হয় তাদের প্রতিবাদ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বরং মিলের প্রস্তাব ঐ সিদ্ধান্তের পেছনে অনুঘটের

---

[১৪৮] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

[১৪৯] Wolfgang Mey, (ed.) *J. P Mills and Chittagong Hill Tracts, 1926/27*, p. 63.

ভূমিকা পালন করেছে। যাহোক ঘটনাবহুল ভারতের ইতিহাসে এরই মধ্যে সাইমন কমিশন গঠন নিয়ে ভারতের রাজনীতি মাঠ পুনরায় গরম হয়ে উঠে।

সাইমন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক ও অনগ্রসর অঞ্চল : প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম

১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর ব্রিটেনে টোরি সরকার ভারতে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা খতিয়ে দেখতে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে সাত সদস্যের স্ট্যাটিউটরি কমিশন গঠন করে যা সাইমন কমিশন নামে ভারতীয় রাজনীতিতে খানিকটা পরস্পর বিরোধী অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল।[১৫০] শতভাগ শ্বেতাঙ্গ সদস্য[১৫১] দিয়ে গঠিত এ-কমিশন সম্পর্কে ভারতীয় রাজনীতিকগণ ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন ১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইতে পদার্পন করে। ভারতে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী ও অংশীজনদের সাথে বেঠক করে ব্যস্ত সময় পার করে কমিশন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ডোমিনিয়ন মর্যাদা দাবি করেছিল। ভারত সরকার এবং বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নররা স্ব স্ব প্রদেশের শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ 'অনগ্রসর অঞ্চল' শাসন বিষয়েও মেমোরেন্ডাম পেশ করে। ১৯৩০ সালে মে মাসে রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যায় ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়। কমিশন ''ক্ষমতা হস্তান্তরের যাবতীয় সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয় এবং সুপারিশে ডোমিনিয়ন মর্যাদা প্রদানের নামগন্ধও রাখেনি''।[১৫২]

অন্যদিকে কমিশন তার প্রতিবেদনে 'অনগ্রসর অঞ্চল' শিরোনামে কিছু সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে। উক্ত অংশে বাংলা প্রদেশের উত্তর পূর্বের সীমান্তস্থিত জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।[১৫৩] কমিশন সার্বিকভাবে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদত্ত 'অনগ্রসর অঞ্চল' বা 'ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাক্ট' কথাটাকে পরিবর্তন করে আরো দ্ব্যর্থহীন করতে 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' বা 'শাসন বহির্ভূত এলাকা' প্রতিস্থাপন এবং এলাকাগুলোর শাসনভার প্রাদেশিক সরকার থেকে ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তরের প্রস্তাব করে। কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর মধ্যে দুয়েকটি অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকী সবগুলিকেই সাধারণতন্ত্রের বাইরে রাখা উচিত। অনগ্রসর অঞ্চলের আদিবাসিরা যোগ্যতার ক্ষেত্রে যে-স্তরে পৌঁছতে পেরেছে, তাতে তারা সাধারণ শাসনতন্ত্রের মধ্যে থাকবার যোগ্য নয়। কমিশন মনে করে যে, দ্রুত রাজনৈতিক উন্নতির ওপর আদিবাসীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে না। অভিজ্ঞতালব্দ

---

[১৫০] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭*, পৃ. ২২৪।

[১৫১] কমিশনের সদস্যরা ছিলেন– স্যার জন এলেসব্রুক সাইমন (চেয়ারম্যান), ২) ভাইকাউন্ট ব্রুনহ্যাম, ৩) ব্যারন স্ট্র্যাথকোনা, ৪) জর্জ রিচার্ড ল্যান্ডফক্স, ৫) এডওয়ার্ড সিরিল কেডোগন, ৬) ভারনন হার্টশর্ন, ৭) ক্লীমেন্ট রিচার্ড এটলি।

[১৫২] যশোবন্ত সিংহ, *জিন্না: ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা*, পৃ. ১৪২।

[১৫৩] *সাইমন কমিশন রিপোর্ট*, ভলিয়্যুম ১, পৃ. ৬২ ও ভলিয়্যুম-১১, পৃ. ১২৭-১৩৪।

তথ্যের সাহায্যে দরদের সঙ্গে তাদের ওপর নজর দিলেই তারা সুখী হতে পারবে।[১৫৪] তার অন্যথা হলে আদিবাসীদেরসমূহ বিনাশের আশংকা রয়েছে বলে তাদের ধারণা।

কিন্তু সাইমন কমিশন প্রতিবেদন ভারতীয়দের দ্বারা নিন্দিত হলে ভাইসরয় আরউইন গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করেন যার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা সহজতর হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত লন্ডনে তিনটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রামের চিফরা অবহিত ছিলেন এবং তারা আশাবাদী একারণে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গটিও আলোচনায় আসতে পারে যদি 'অনগ্রসর অঞ্চল' প্রসঙ্গটি আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। কিন্তু ১২ নভেম্বর ১৯৩০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। অন্যদিকে অনগ্রসর অঞ্চলবহুল আসামের সরকারি মহলে এ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলে যেখানে আসামের মুখ্য সচিব নাগা পাহাড়, উত্তর কাছাড় পাহাড় এবং লুসাই পার্বত্য জেলাসমূহকে আগের মতো সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত রাখার প্রস্তাব করেন।[১৫৫] অন্যদিকে ১৯৩১ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট বাংলার সীমান্ত জেলার ভবিষ্যৎ শাসননীতি বিষয়ে একটি প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তটি হলো:

> The Government of Bengal had decided that, ``the backward tracts [Chittagong Hill Tracts, Darjeling] of this province must come under the control of the popular Executive, and that no exceptional treatment can be devised for them.[১৫৬]

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এ সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয় ও উদারনীতির পরিচায়ক। এ সিদ্ধান্ত পরবর্তী ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনে বহাল রাখা গেলে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিলে কার্যকর হওয়া স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক আইনসভায় ভোটাধিকার লাভ করত; যখন বাংলায় একলাফে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করা হয় ৩ থেকে ১৪ ভাগে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রগতির পথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি।

১৮৭৪ সাল থেকে বহির্ভূত শাসনে অভ্যস্ত এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের সুবিধাভোগী সামন্ত নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার জগত থেকে রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক আলোর পথের হাতছানি দেখতে পাননি। তাই তিন রাজা একজোট হয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিবের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামে তৃতীয় বারের মতো পৃথক শাসন চেয়ে দীর্ঘ স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। যেখানে তাঁরা দাবি করেন:

> That the entire British Indian System is now being revised, remoulded, and brought into line with India's natural aspiration to be an equal ally and partner with the other self-governing units inside the British Empire; that the Indian

---

[১৫৪] সুবোধ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।
[১৫৫] Wolfgang Mey, (ed.) *J. P Mills and Chittagong Hill Tracts, 1926/27*, p. 63.
[১৫৬] *ibid*, p. 34.

Princes, big and small, have been invited to join the Round Table Conference for the second-time as honoured partners and helpers in evolving a scheme of All-India Federal Dominion. That it is at this juncture when all the interests including those of outlying tracts like the Hill Tracts, are going to be considered with a view to frame in new constitute for India, the Chiefs ever loyal to the Sovereign Power beg of His Majesty's Prime Minister and the Hon'ble Secretary of State for India to be so kind as to review the whole position with regard to the administration of the Chittagong Hill Tracts and to reassure the Chiefs not ony as to their continuance of the established and enjoyed privileges but to a further expension of power so that

a) under any *scheme of Provincial autonomy the newly formed Bengal Legislative Council and Cabinet of Ministers may be debarred by Statute to exercise any authority direct or indirect over these three Chiefs and the tracts under their charge.*[১৫৭]

যাহোক প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে অনগ্রসর অঞ্চল নিয়ে কোনো আলোচনা না হওয়াতে রাজকীয় কাউন্সিল উপলব্ধি করে বিশাল এলাকাভুক্ত অনগ্রসর অঞ্চল বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। অন্তত এ সম্পর্কিত সাইমন কমিশনের প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনার দরকার রয়েছে। ভল্ফ গ্যাং মে হ্যালেটের উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন নিম্নোক্তভাবে:

The first Round Table Conference in 1930 ``did not deal specifically with the treatment of backward tracts '(Government of India, 1931) but it was understood by His Excellency in Council that ``the problem should be specifically considered by the Conference and that due regard should be paid to the views of the Statutory Commission and to the opinions already expressed by this and other local Governments.[১৫৮]

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত অঞ্চল ঘোষণা

অতপর গোল টেবিল বৈঠকের সুপারিশমালার আলোকে ব্রিটিশ সরকার স্বীয় বিবেচনায় ১৯৩৩ সালের গোড়ায় একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা সম্বলিত শ্বেতপত্রে অনগ্রসর অঞ্চল তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত প্রস্তাব সন্নিবেশিত হয়। প্রস্তাবগুলি যাচাই বাছাই ও মুল্যায়নের ভার লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে গঠিত কমনসভার যৌথ সংসদীয় কমিটির নিকট অর্পিত হয়। যৌথ সিলেক্ট কমিটি শ্বেতপত্রে সন্নিবেশিত প্রস্তাবগুলির অনুমোদন দেয়।

---

[১৫৭] *A Memorial of the three Chiefs regarding the Administration of the Backward District Chittagong Hill Tracts in Bengal*, p. 7.
[১৫৮] Wolfgang Mey, (ed.), p. 34.

> We have already expressed our approval of the principle of ''Excluded Areas,'' and we accept the above proposals as both necessary and reasonable so far as ''Excluded Areas'' proper are concerned. We think, however, that a distinction might well be drawn in this respect between ''Excluded Areas'' and ''Partially Excluded Areas'' and that the application of Acts to, or the framing of Regulations for, ''partially Excluded Areas'' is an executive act which might appropriately be performed by the Governor on the advice of his Ministers, the decision taken in each case being of course, subject to the Governor's special responsiblity for ''partially Excluded Areas,'' that is to say, being subject to his right to differ from the proposals of his Mininsters if he thinks fit.[১৫৯]

সংসদীয় কমিটি শ্বেতপত্রে সন্নিবেশিত প্রস্তাব গ্রহণ করে আরো সুপারিশ করে যে সম্পূর্ণ এবং আংশিক শাসন বহির্ভূত অঞ্চল তালিকা চুড়ান্তকরণের ক্ষমতা পার্লামেন্টের নিকট থাকবে, ভারত সরকারের হাতে নয়। কমিটির সুপারিশ বিল আকারে পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। এই বিলের ৯১ নং ধারার সঙ্গে বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা দেওয়া হয় যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত তালিকায় রাখা হয়। তালিকাটি এই- ক) সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল: ১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (সদিয়া, বলিপাড়া ও লখিমপুর অঞ্চল; ২) নাগা পাহাড় জেলা; ৩) লুসাই পাহাড়; ৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। খ) আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল- ১) উত্তর কাছাড় পাহাড়; ২) গারো পাহাড়; ৩) মিকির পাহাড়, ৪) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ; ৫) অঙ্গুল জেলা; ৬) ছোটনাগপুর বিভাগ; ৭) সম্বলপুর জেলা; ৮) সাঁওতাল পরগনা জেলা; ৯) দার্জিলিং জেলা; ১০) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ ১১) গঞ্জাম, ভিজাগাপট্টম ও গোদাবরী এজেন্সি।[১৬০]

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে অনগ্রসর অঞ্চলগুলোকে তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছিল। ভারত শাসন বিলের সঙ্গে সংযুক্ত উক্ত বহির্ভূত অঞ্চলের দুটো তালিকা দৃশ্যমান। প্রথম ভাগের অঞ্চলগুলোকে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইনসভার এখতিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হবে এবং অঞ্চল বা জেলাগুলো থেকেও আইনসভায় কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। অন্যদিকে আংশিক বহির্ভূত জেলাগুলো নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লাভ করবে। যাহোক ভারত শাসন বিলের সঙ্গে সংযুক্ত উক্ত তালিকা নিয়ে কমন্সসভায় তুমুল তর্ক বির্তক হয়। জি, এস ঘুর্যের গ্রন্থে যার কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। যার মধ্যে কট্টরপন্থী সদস্যদের মত গ্রাহ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ কর্নেল ওয়েজউডের অভিমত হলো, 'ভারতে মোট আদিবাসী প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষ। কিন্তু উক্ত তালিকায় শুধু ১ কোটি ৩০ লক্ষ আদিবাসীকে আলাদা করা হয়েছে।

[১৫৯] Z. A. Ahmed, *Excluded Areas under the New Constitution*, p. 4.
[১৬০] সুবোধ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯-১৬০।

এ সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে এবং আদিবাসীদের ওপর আরো বিশ-ত্রিশ বছর শাসন চালাতে হবে।' কমিশন সদস্য মি. এডওয়ার্ড ক্যাডোগান বহির্ভূত অঞ্চলের সংশোধিত তালিকা উপস্থাপন করেন। উইং কমান্ডার জেমস আরো একধাপ এগিয়ে বলেন, 'ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের থেকে আদিবাসীরা বিশিষ্টভাবে ভিন্ন একটি জাতি। যতবেশি সংখ্যায় তাদেরকে বহির্ভূত অঞ্চলের গণ্ডির মধ্যে আনা যায়, ততই ভালো।' কিন্তু বিরুদ্ধ মত যে ছিল না তা নয়। যেমন মি. বাটলার বলেছেন, যদি এই সময়ে আমরা বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখার নীতি গ্রহণ করি এবং বেশি করে নতুন নতুন অঞ্চলকে বহির্ভূত অঞ্চলে' নিয়ে আসি, তাহলে ফল ভাল হবে না। ভবিষ্যৎ ভারতের সাধারণ রাষ্ট্রতন্ত্রে আদিবাসীদের পক্ষে অন্য সকলের সঙ্গে সমভাবে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা দূরে সরে যাবে। আদিবাসীদের ব্যাপকভাবে সরিয়ে রাখার নীতি আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।[১৬১]

পার্লামেন্ট বিরুদ্ধবাদীদের মত গ্রহণ করে সংযুক্ত তালিকাটি বাতিল করে এবং প্রস্তাব পাশ করে প্রাপ্ততথ্যের ভিত্তিতে নতুনভাবে সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হবে। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত তালিকা উপস্থাপন করে যেখানে সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত অঞ্চলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৮টি তে আর পরের অংশে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৮টি। সেই তালিকা চুড়ান্তভাবে গৃহীত হয় ১৯৩৬ সালে।[১৬২]

ব্রিটিশ সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পার্বত্য চিফদের স্মারকলিপি কতটুকু ভূমিকা রেখেছে তা জানার সুযোগ নেই। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলার সাধারণ শাসনতন্ত্রের এখতিয়ারের মধ্যে নিয়ে আসার বেঙ্গল গভর্নমেন্টের প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়াতে অনুমিত হয় চিফদের স্মারকলিপিটি বিলেত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলম্ব হিসেবে কাজ করেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনার পর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত ও আংশিক বহির্ভূত এলাকা' ঘোষণা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সীমা ও শাসন সম্পর্কে ৮০, ৮৪, ৯১, ৯২, ৫২ ও ধারা যুক্ত হয়। ঐ আইনের ৯১ ধারা অনুসারে ১৯৩৬ সালের ৩রা মার্চ *দ্য কিংস মোস্ট এক্সিলেন্ট ম্যাজেস্টি ইন কাউন্সিল, দ্য গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া* এক্সক্লুডেড এন্ড পার্শিয়ালি ''এক্সক্লুডেড এরিয়াস" অর্ডার, ১৯৩৬ জারি করা হয়। ঐ আদেশের ১ নং তফসিলের ১ নং পার্ট অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত এলাকা ঘোষণা করা হয়।[১৬৩]

একটি 'সম্পূর্ণ শাসন-বহির্ভূত এলকা বা ''এক্সক্লুডেড এরিয়া" বলতে সম্পূর্ণভাবে আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকাকে নির্দেশ করে, যেখানে সাধারণ আইন ও রেগুলেশনগুলো সীমিতভাবে ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয় এবং যেখানকার প্রশাসন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অন্যদিকে একটি 'আংশিক শাসন-বহির্ভূত এলাকা' (পার্শিয়ালি এক্সক্লুডেড এরিয়া) হলো তুলনামূলকভাবে জাতিগতভাবে মিশ্র অধ্যুষিত,

---

[১৬১] সুবোধ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-১৬।
[১৬২] Z. A. Ahmed, *প্রাগুক্ত*, p. 4.
[১৬৩] Government of India Act, 1935 Extract.

কিন্তু অধিকাংশে আদিবাসী অধ্যুষিত ভূখণ্ড, যেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থা অনেকাংশে প্রদেশের প্রচলিত প্রশাসনের সাথে একীভূত এবং দেশে সাধারণভাবে প্রযোজ্য আইনগুলোর অধিকাংশই এই অঞ্চলে কার্যকর করা হয়। ৯২ ধারা অনুসারে প্রাদেশিক গভর্নর যদি নির্দেশ না দেন তবে ফেডারেল বা প্রাদেশিক আইনভায় গৃহীত কোনো আইন সম্পূর্ণ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না। গভর্নর ইচ্ছে করলে কোনো আইনকে বহির্ভূত অঞ্চলে প্রয়োগ করতে পারেন এবং ইচ্ছে করলে সেই আইনকে তার বিবেচনাসম্মত রদবদল করে নিতে পারেন। গভর্নর নিজেও বহির্ভূত অঞ্চলে শাসনের জন্য রেগুলেশন তৈরি করে নিতে পারেন। এসব রেগুলেশন গভর্নর-জেনারেলের দ্বারা সমর্থন করিয়ে নিতে হবে এবং সমর্থিত হবার পর তা আইনে পরিণত হবে।[১৬৪] এভাবে সাংবিধানিক আইনের অজুহাত দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে ভোট প্রদানের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হল। খাস গভর্নরী স্বেচ্ছাতন্ত্রের আয়ুষ্কাল অনির্দিষ্ট কালের জন্য সংস্কার করা হল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সামন্ত রাজা মনে করেছিলেন ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন বা শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বঙ্গীয় আইনসভার আইনি কাঠামো থেকে পৃথক রাখা গেলে তাদের সামন্ত শাসন অবিরাম গতিধারায় চালাতে পারবে। পার্বত্য জেলার ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব যা ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় সরকার কেড়ে নিয়েছে তা ফেরত পাবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সে দায়িত্ব তো ফেরত দেইনি বরং তাদের রাজস্ব এবং গোত্রভিত্তিক সামাজিক আদালত পরিচালনার যে বিচারিক ক্ষমতা ছিল তাও কেড়ে নিয়ে তিন রাজাকে জেলা প্রশাসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে আলংকারিক দায়িত্বে নিয়োজিত করে। চাকমা রাজ পরিবারের একজন সদস্য এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> The role of the government in the early years of British rule was confined to policing and supervision of revenue administration. All other matters were in the hands of the indigenous administration, with the Raja being the ultimate authority within his/her region. However, this was changed in 1937 when ‘‘a revlutionary change reversed the roles of the hill ‘Chiefs’ and the government (as represented by its superintendent, and later, the Deputy Commissioner) in the administration of the Hill Tracts. Whereas previously the three chiefs were `charged with the administration of the three circles, they found themseves assigned the role of advising the government on policy matters besides having their administrative powers curtailed.[১৬৫]

[১৬৪] সুবোধ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

[১৬৫] Rajkumary Chandra Kalindi Roy, *Land Rights of the Indigenous*, p. 29, & *The Calcutta Gazeette*, 27th No. Amendmends, The 10th December 1937, Rule no. 38.

রাজাদের সময়ের স্রোতের বিপরীতে চলার এর চেয়ে উত্তম প্রতিফল আর কী হতে পারে। যে-ব্রিটিশদেরকে তারা পরিত্রাতা মনে করতেন তারাই এবার তাদেরকে 'ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার' এ পরিণত করে। ব্রিটিশদের পার্বত্য নীতির এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আভাস ১৯২৭ সালে মিলের রিপোর্টেই পাওয়া গিয়েছিল। বলতে গেলে এখন চিফদের 'আমও গেল ছালাও গেল' অবস্থা।

'সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত এলাকা' ঘোষণার যুক্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য ছিল?

এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে ভারতের সাধারণতন্ত্র থেকে বহির্ভূত করে রাখার পেছনে তাদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক যোগ্যতার অভাবকে প্রধান যুক্তি হিসেবে ধরা হয় এবং অঞ্চলগুলোর শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার কথা গুরুত্ব পায়। জেড এ আহমদের নিম্নের মূল্যায়নটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

> The main argument employed by the Government of India in justification of the policy of excluding large tracts from the normal administration of the country is that the elaborate system of law and legal procedure which prevails in the more advanced areas cannot be comprehended by backward tribes, and is not suited to their cultural level. It is argued that the British Indian system of administration will bring about a complete breakdown of the primitive communal organisations and will sap the economic and moral life of these tribes. The application of alien rule laws would throw these straightforward, truthful and honest primitives into the clutches of exploiters coming from the more advanced territories, and by disturbing the tribal customs would create such conflicts and conflagrations in these areas as would involve the Government in serious difficulties. It is therefore, considered best to allow these primitive communities to live in their age-old isolation.[১৬৬]

উপরোক্ত যুক্তিগুলি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। উন্নত জেলায় প্রচলিত আইন অনগ্রসর জাতিসত্তাগুলোর বোধগম্য হবে না ১৯৩৫ এ সালে এসে এ যুক্তি সর্বতোভাবে মেনে নেয়া যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানুষ ১৮৬০ সালের আগে কোনো আধুনিক আইন বা রেগুলেশনের অধীনে ছিল না। গোত্রতান্ত্রিক সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানই ছিল তাদের আইনি ভিত্তি। কিন্তু ১৮৬০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ৭৫ বছরে পাহাড়িদের জীবন অনেক আইন ও রেগুলেশনের মুখোমুখি হয়েছে। ১৮৮১ সালে যখন ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন প্রণয়ন করা হয় সেই রেগুলেশন মোতাবেক গঠিত পুলিশ বাহিনীতে পাহাড়িরা অংশগ্রহণ করে এবং সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিল। ১৮৮৪ সাল থেকে ট্রাইবেল কাঠামো ভেঙ্গে যখন পাহাড়ি জুমিয়াদেরকে আঞ্চলিক সার্কেলে স্থায়ী গ্রামে বসবাসের জন্য বিধি প্রণয়ন করা হয় সেটাও সফল হয়।

---

[১৬৬] Z. A. Ahmed, *প্রাগুক্ত*, p. 5.

১৮৬০ এর দশক থেকে যখন জুমচাষের পাশাপাশি হালচাষ পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয় এবং সে লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করা হয় তাও পাহাড়িরা সফলতার সাথে গ্রহণ করেছে এবং ১৯৩৫ সালের আগে বিশাল উপত্যকা চাষের আওতায় চলে আসে (৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ১৯২৩-২৪ রাজস্ব বৎসরে ৯৫,২১০ টাকা ভূমি রাজস্ব আদায় প্রমাণ করে ভূমি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন তারা রপ্ত করেছে। সুতরাং অনগ্রসর এলাকার মানুষ আইনকানুন বিধি বিধান বুঝে না এযুক্তি অকাট্য নয়।

১৯৩৫ সালে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যাল্প হলেও একটি শিক্ষিত চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনব্যবস্থা অনগ্রসর অঞ্চলের কৌম সমাজকাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন এবং নৈতিক জীবনবোধ ধ্বংস করবে– এ যুক্তিও গভীর নিরীক্ষায় অকার্যকর প্রতীয়মান হয়। কারণ ইতিপূর্বে পাহাড়িসমাজ সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন ঢেড় বেশি কঠোর আইন পার্বত্য জেলায় প্রয়োগ হয়ে আসছে। ১৮৬৫ সালে ভারতীয় বন আইন পাস হয় সেই আইনের অধীনে ১৮৬৭ সাল থেকে বন সংরক্ষণ শুরু হয় এবং সংরক্ষিত বনে জুমচাষ (যা আদিবাসিদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন) নিষিদ্ধ করা হয়। কাঠ কুড়ানো ও গোচারণের সুযোগ-সুবিধা আটকে দিয়ে অরণ্য সম্পদের ওপর একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে ১৩৫৬ বর্গমাইল এলাকা সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়।[১৬৭] ১৯২৭ সালে যে বন আইন পাস করা হয় তাও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয় কারণ সেখানে বনজ সম্পদ আছে যা ব্রিটিশ বন অধিকর্তাদের কাছে অতীব মূল্যবান। পার্বত্য চট্টগামের অধিবাসীদের প্রতি বন বিভাগের অধিকর্তাদের মানসিকতা ছিল 'ভয়ংকর' ও নীচু প্রকৃতির। তবুও সে আইন প্রয়োগ করে জুমচাষের ভূমি থেকে পার্বত্য জনগোষ্ঠীদের বিচ্ছিন্ন করার সময় জাতিসত্তাগুলোর জীবনবোধ, বন ও ভূমির সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিবেচিত হয়নি। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ যখন আধুনিক সভ্যতা ও জীবনবোধের সংস্পর্শে এসেছে তখন তাদের সাংস্কৃতিক স্তর উপলব্ধির ক্ষমতা নিয়ে বাক-বিতন্ডা হচ্ছে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাস হওয়ার পর বছরই পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী চাকমা রাজবাড়ি থেকে বের হয় সাময়িক পত্রিকা– 'গৈরিকা'[১৬৮] যেখানে বাংলা, ইংরেজি ও চাকমা ভাষায় সাহিত্যচর্চা হত। চাকমাদের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ সাক্ষ্য দেয় তাদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার স্তর কোন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

---

[১৬৭] R. H. S Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer*, P. 72.

[১৬৮] ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এ সাময়িক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাহিত্যিক মুখপত্র ছিল যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণী মাধব বড়ুয়ার লেখাও প্রকাশিত হয়।

রাজনৈতিক উপাদানের ক্ষেত্রে বলা যায় যে ১৯১৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে *পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি* নামে একটি আধা-রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। (মনে রাখা ভাল মুসলিম লীগ হয়েছে তার মাত্র ১০ বছর আগে ১৯০৭-এ যার সদস্য ছিলেন মাত্র ৪০০; ৭ কোটি মুসলমানদের মধ্যে)। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম এমএলএ কামিনী মোহন দেওয়ানের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি সদ্যজাত এবং তার শিকড় গভীরে গ্রোথিত হয়নি ঠিক আছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে একদম রাজনৈতিক উপাদান নেই এ যুক্তি একটি খোঁড়া যুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার উৎকট বহিঃপ্রকাশ। ১৮৭৪ থেকে ১৯৩৫ দীর্ঘ ৬২ বছর ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে এমন বিশেষ যত্নে শাসন করে এসেছেন যার জন্য বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজনটা থেকেই যাচ্ছে। গভর্নমেন্টের পৃথক করে শাসন পদ্ধতির ব্যর্থতার নজির এর চেয়ে আর কী হতে পারে?[১৬৯] মূল কথা হলো যেমনটি জেড এ আহমেদ বলছেন, ''The Constitution, now enlarges the excluded areas and secures that they shall remain in every respect unaffected by the social and political forces at work in other parts of the country.''[১৭০]

এই যুক্তিটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেই প্রশ্নটি কিন্তু থেকে যায়। সামষ্ঠিকভাবে যেখানে 'সাধারণ শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো রাজনৈতিক যোগ্যতা লাভ করেনি' বলে অনগ্রসর অঞ্চলগুলি বহির্ভূত রাখা হলো সেখানে কিছু কিছু বহির্ভূত অঞ্চল থেকেই আবার প্রাদেশিক আইনসভায় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের আসন দেওয়া হলো। যেমন আসামের অনগ্রসর পাহাড়ি অঞ্চলসমূহ থেকে ৫টি এবং অনগ্রসর সমতলবাসী আদিবাসী নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ৪টি আসন। বাংলার জলপাইগুরি ও দার্জিলিং জেলার জন্য ১টি আসন ৪) বিহারে- ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার জন্য ৭টি আসন। এক্ষেত্রে দেখা যায় ঘোষিত নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের যুক্তি বিলক্ষণ সামঞ্জস্যহীন।[১৭১]

যে-বিচেনায় আসামের পার্বত্য জেলাগুলিতে আসন দেওয়া হলো সে একই বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অন্তত একটি মনোনীত আসন দেওয়া যেত; নির্বাচিত নাই বা দিল। কারণ বাংলার আইনসভার দিকে একটু নজর দিলে দেখা যায় সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জন্য প্রতিনিধিত্বের জায়গা রাখার সুযোগ ছিল। সাধারণ বা শহুরে হিন্দুদের জন্য ১২টি; গ্রামীণ হিন্দুদের জন্য ৬৬ টি (যার মধ্যে ৩০টি আসন তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত), মুসলান শহুরে ৬টি, আর গ্রামীণ এলাকার মুসলমানদের জন্য ১১১টি, এংলো ইন্ডিয়ান ৩টি, ইউরোপিয়ান, ১১টি, ভারতীয় খৃষ্টান ২টি, শিল্প, বণিক ও প্লান্টার্সদের জন্য ১৪টি, একই শ্রেণির ভারতীয়দের জন্য ৫টি, ভূ-স্বামীদের জন্য ৫টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২টি, শ্রমিকদের ৮টি, মহিলাদের (হিন্দু, মুসলিম ও এংলো) জন্য ৩টি। অন্যদিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে সাধারণ

---

[১৬৯] সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী*, পৃ. ১৬৩।

[১৭০] Z. A. Ahmed, *প্রাগুক্ত*, p. 6.

[১৭১] সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী*, পৃ. ১৬৪।

আরবান-২টি, গ্রামীণ ৮টি, মুসলমান আরবান ১টি, গ্রামীণ ১৬টি, ইউরোপিয়ান ৩ টি, আইনসভা নির্বাচিত ২৭টি গভর্নরের মনোনীত ৬টি যার মধ্যে মুসলিম মহিলা ১ জন, এংলো ইন্ডিয়ান মহিলা ১ জন, ১ জন ইহুদি ও ২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি।[১৭২]

একইভাগে পার্বত্য বৌদ্ধদের জন্যও ১টি আসন রাখা যেত। ঠিক তেমনি পার্বত্য আদিবাসীদের জাতিগত দিক বিবেচনায় ১টি আসন রাখা যেত। অন্যদিকে ১৯৩৫ সালে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়ে সারা ভারতে ১৯১৯ সালের মোট ভোটার ৭০ লাখ থেকে বেড়ে হয় তিন কোটি ষাট লক্ষ। আর বাংলায় ভোটাধিকার লাভ করে ৬৬,৯৫,৪৮৩ জন যার শতকরা হার ১৩.৪ ভাগ। ভোটাধিকারের যোগ্যতায় দেখা যায় বাংলার কোনো স্থায়ী বাসিন্দা ২১ বৎসর হলে এবং যিনি সরকারি কোষাগারে কোনো প্রকার কর দেন এবং মিডল স্কুল পর্যন্ত পড়া লেখা আছে তারা ভোটাধিকার লাভ করে। এ বিবেচনায় পার্বত্য জেলার সকল জুমিয়া পরিবার জুমকর এবং ভুমি রাজস্ব প্রদান করতো। আরো উল্লেখ্য যে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মুসলমানদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য কাউন্সিলে ভোটাধিকার লাভের যোগ্যতা শিথিল করেছিল এবং তফসিলি হিন্দুদের জন্যও বিশেষ যোগ্যতার মাপকাঠি তৈরি করেছিল।[১৭৩] সুতরাং একই বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রয়োজনে ভোট দানের যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা যেত। এজন্য প্রয়োজন ছিল পার্বত্য চিফদের উদ্যোগ এবং ব্রিটিশ-ভারত সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গি।

জমিদারদের জন্য এবং বণিক সমিতিগুলোর জন্য আসন বরাদ্ধ ছিল এবং ভারতীয় মুসলিম, ভারতীয় খৃষ্টান ও অনগ্রসর হরিজনদের জন্য আসন বরাদ্ধ রাখা গেলে ভারতীয় বৌদ্ধ হিসেবে (পার্বত্য তিন রাজাই বৌদ্ধ) একটি আসন দাবি করতে পারে যেমনটি ১৯৫৪ সালের বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ও হিন্দু উপজাতিদের জন্য দুটি আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়।

কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে যৌথ সংসদীয় কমিটির সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অনগ্রসর অঞ্চলগুলোতে আরো বিশেষ শাসনের দরকার। এই থেকেই বহির্ভূতকরণ নীতির দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করা যায়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা, নাগরিক অধিকার আদায় এবং সাংবিধানিক অগ্রগতির ইতিহাসে একটি বড় মাইলফলক। এ আইনবলে ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ ভারতে ১১টি প্রদেশে সম্প্রসারিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে (৭০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১১টি প্রদেশে ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ নিজেদের সরকার গঠনের সুযোগ পায়। বাঙালি প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ঐ নির্বাচনে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন ছিল একটি রাজনৈতিক বাঁকবদলের

---

[১৭২] এনায়েতুর রহিম, *প্রভিন্সিয়াল অটোনমি ইন বেঙ্গল (১৯৩৭-১৯৪৩)* (রাজশাহী: আইবিএস, ১৯৮১), পৃ. ২৫।
[১৭৩] ঐ, পৃ. ৩২।

দিকচিহ্ন। বিস্ময়করভাবে বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাত থেকে মফস্বলের নিম্নবর্গের নেতৃত্বের হাতে চলে যায় এবং বাংলায় দুই বৃহত্তম জাতীয়তাবাদী দল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে অসাম্প্রদায়িক ও গণমানুষের দল কৃষক প্রজা পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় আশাতীতভাবে। বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নয়নের এ পর্বে মফস্বল এলাকাগুলোতে অধিকসংখ্যক আসন বরাদ্দ করা হলে এযাবৎ রাজনৈতিকভাবে উপেক্ষিত পল্লি বাংলা হঠাৎ করেই রাজনীতিতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ তখন থেকে প্রাদেশিক আইনসভায় ক্ষমতা লাভে আগ্রহী যেকোনো দল বা উপদলকে পল্লি অঞ্চলের আসন লাভে বিশেষ মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। জয়া চ্যাটার্জীর পর্যবেক্ষণটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয় যখন তিনি বলেন,

> Bengal politics, which had hitherto centred upon the metrpolis of Calcutta and had revolved around primarily urban issues were now about to be pushed into the countryside. . . . No party had made a serious attempt to create an organizational base in rural Bengal. Now, suddenly, it was rural Bengal that mattered and any party or faction intending to achieve power in the provincial assembly had to win over the countryside.[১৭৪]

ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। কংগ্রেস যুদ্ধবিরোধী নীতি গ্রহণ করে তুমুল আন্দোলন শুরু করে অন্যদিকে জিন্নাহ এ সুযোগে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের কাছাকাছি এসে নিজের ব্যক্তিগত ও দলীয় অবস্থান পাকাপোক্ত করেন। মৌলানা আজাদের ভাষায়, ‘‘মি. জিন্নাহ তখন মুসলীম লীগের নেতা; তিনি ঠিক করলেন ব্রিটিশ আর কংগ্রেসের যেই মতান্তর দেখা দেবে, অমনি তিনি তার মওকা নেবেন।’’[১৭৫] ১৯৩৯ সালে ঘোষণা করেন তাঁর বহুল আলোচিত দ্বিজাতি তত্ত্ব। অবশ্য দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল প্রবক্তা ছিলেন দামোদর সাভারকর। এতে করে ব্রিটিশদের ‘ভাগ কর শাসন কর’ নীতিই ভারতীয় এলিট শ্রেণির স্বীকৃতি পেল। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব ঘোষিত হলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারতের স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয় এবং বিভক্ত ভারতের চিন্তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়, শুরু হয় হিন্দু মুসলমানের পৃথক পথচলা। ফলে বিলেত থেকে প্রেরিত সুনির্দিষ্ট ভিশনহীন কোনো মিশনই

[১৭৪] Joya Chatterji, *Bengal divided: Hindu communalism and partition, 1932-1947*(New Delhi: Cambridge University Press, 1996), p. 68.

[১৭৫] মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল*, সুভাষ মুখোপাধ্যায় (অনু), (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রা. লি. ২০০৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯), পৃ. ৮৭।

(যেমন- ক্রিপস মিশন, ১৯৪২)[১৭৬] আর নেতৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে সন্দেহপ্রবণ দুটি বিবদমান রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে একটি ছেদ বিন্দুতে মিলন ঘটাতে পারেনি। ১৯৪৫ সালের ২৫ জুন থেকে ১৪ জুলাই ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের ডাকে ওয়াভেল ১৪ জুন তারিখে বেতারে প্রচারিত তার পরিকল্পনার[১৭৭] ওপর অনুষ্ঠিত সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি এবং সিমলা সম্মেলনে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বক্তব্যে সিমলার ব্যর্থতার হেতু স্পষ্ট: ''ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সিমলা সম্মেলন একটি ঢেউভাঙা তটভূমি হিসেবে চিহ্নিত হবে। এই প্রথম আপসরফা ভণ্ডুল হল ভারত আর ব্রিটেনের মধ্যকার মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নে নয়, হল ভারতীয় গোষ্ঠীগুলোর বিভাজক সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে।''[১৭৮]

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বৃটেনে ক্ষমতার পালাবদল হলে ভারতেও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো নির্বাচিত গণপরিষদ গঠন। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত হলো কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। নির্বাচনের যে-ফলাফল পাওয়া যায় তাতে ভারতের মুসলমানরা ভারতের বুকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট রায় দিল। (জিন্নাহর মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারনার মূলে ছিল– পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। সে কর্মসূচি নিয়ে ৮০.৬% মুসলিম ভোট পেয়ে কেন্দ্রের ৩০টি আসনের সবকটি এবং প্রদেশের ৫০৯ টির মধ্যে ৪৪২টি আসন লাভ করে মুসলমানদের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় মুসলিম লীগ।)

ক্ষমতা হস্তান্তরের অংশ হিসেবে বিলেত থেকে প্রেরিত হয় 'মন্ত্রী মিশন'। ২৩ মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসে পৌঁছায়। মন্ত্রি মিশনের দৌত্যকর্মে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের আশা জাগ্রত হয়। কিন্তু চির লোভনীয় বস্তু ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে অনড় দুই রাজনৈতিক শিবিরের অহংবোধ, পারস্পরিক অসংবেদনশীল ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ, আপোষহীনতা সমঝোতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ভারত কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে মসৃণ না করে রক্তাক্ত করে ফেলে। কিন্তু ১৯৪৬ এর ১০ জুলাই তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুর বোম্বাইতে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে দেওয়া, মৌলানা আজাদের ভাষায় 'এক আজব বিবৃতি' ইতিহাসের মোড় পাল্টে দেয়। তারই রেশ ধরে ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট সারা ভারতে একটি কলঙ্কময় দিন হিসেবে হাজির হয়। ঐদিন এবং তার পরবর্তী মাসাধিক কাল ধরে কলকাতা, বিহার ও নোয়াখালী, গড়মুক্তেশ্বরসহ সারা ভারতে সংঘটিত নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক

---

[১৭৬] মৌলানা আজাদ লিখেছেন, 'ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ায় সারা দেশে আশাভঙ্গ আর ক্রোধ দেখা দেয়। ভারতীয়রা অনেকেই মনে করলেন যে কেবল মার্কিন আর চীনের চাপে পড়েই চার্চিল মন্ত্রীসভা স্যার স্ট্যাফোর্ডকে পাঠিয়ে ছিলেন; কিন্তু আদতে ভারতীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো মতলব মিষ্টার চার্চিলের ছিল না।' পৃ. ৫৭।

[১৭৭] সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান : প্রস্তুতি ও পরিণতি, ১৯৪৫-৪৭* (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২ ; প্রথম প্রকাশ ২০০২) পৃ. ১৩। এ গ্রন্থে ওয়াভেল পরিকল্পনার বিস্তারিত আছে।

[১৭৮] মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল*, পৃ.৮৬।

দাঙ্গার ফলে সৃষ্ট বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ব্রিটিশদেরকে দ্রুত ভারত ছাড়ার ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়ে দেয়। এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটলির পরের বছর ৩০ জুনের মধ্যে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা আসে।

২.৯ দেশ বিভাগ ও পার্বত্য নেতাদের রাজনৈতিক উদ্‌যোগ

চিফদের 'জনগণকে সাথে না নিয়ে একলা চলো নীতি' র বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'জনগণকে সাথে নিয়ে সাংগঠনিকভাবে অধিকার আদায় ও রক্ষা করার নীতি' নিয়ে চলার একটি ক্ষীণ ধারা এতদিন বহমান ছিল। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে যে, কামিনী মোহন দেওয়ান (১৮৯০-১৯৭৬) ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম দলগত রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃত। ব্রিটিশদের নিষেধাজ্ঞার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এবং তৎকালীন রাজনৈতিক সংস্কার বিমূখ চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায়ের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অপরিমেয় পরিশ্রম ও ত্যাগ তিতীক্ষার বিনিময়ে তিনি *পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৭৯] প্রথম দিকে এ সংগঠনের রাজনৈতিক চেতনা তেমন তীব্র ছিল না। স্থানীয় অভাব অভিযোগ, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সীমাবদ্ধ ছিল এর কার্যক্রম। ১৯৩৯ সালে দুই তরুণ গ্রাজুয়েট স্নেহকুমার চাকমা ও যামিনী রঞ্জন দেওয়ান জন সমিতিতে যোগদান করলে এতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত হয়। স্নেহকুমার চাকমা গান্ধীবাদের চেয়ে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের সশস্ত্র বিপ্লবী আদর্শকেই শ্রেয় ভাবতেন। ১৯৩৯ সালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে অভিষিক্ত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক হাওয়া পাল্টানো শুরু হয়। তাঁর লেখনী ও কর্মকাণ্ড তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ছায়া দেখতে পেতেন। তাঁর ভাষায়,

> After graduation[in 1937] it was my endeavour to turn the Chittagong Hill Tracts Peoples Association into a pure counterpart of the Indian National Congress which was forbidden in this non-regulated Excluded Area, and to train up the minds of the general public for active participation in India's freedom struggle in whichever form it might come to them. . . . I was boosted up to the highest executive position of the Peoples Association as General Secretary. I held that postition until the Chittagong Hill Tracts People Association became defunct after

[১৭৯] তিনি ছিলেন এ সমিতির কর্ম কমিটির সভাপতি এবং প্রধান প্রাণপুরুষ। তিনি এ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উদ্দেশ্য ও বার্তা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। তাঁর আপন জবানীতে শোনা যাক: ''আমি নিজে বহু টাকা ব্যয় করিয়া আমার বাড়িতে এক জনসভার আহ্বান করিলাম। নির্দিষ্ট দিবসে বহুদূর হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভায় মৃতকল্প জাতীয় জীবনে নব জীবন সঞ্চারের পক্ষে এ অভিনব উপায়ের ব্যাখ্যা করে বুঝানো হইল এবং সর্বসম্মতি ক্রমে তখনই সভাস্থলে সমিতির উদ্দেশ্য ও বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া জন সমিতি নামে এক সমিতি স্থাপন করা হইল এবং সকলকে সমিতির মেম্বার করিয়া কার্যকমিটির মেম্বারগণকেও ঐ সভায় নির্বাচিত করা হইয়াছিল। সকলের সম্মতিক্রমে ঐ সভায় আমাকে প্রেসিডেন্ট পদে বরণ করা হইয়াছিল।'' কামিনী দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

the ill-fated partition that threw Chittagong Hill Tracts into the occupation of unwanted Pakistan.[১৮০]

এভাবে স্নেহকুমার চাকমার জন সমিতিতে যোগদানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠনভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্রম জোরদার হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ-ভারত যুদ্ধে যোগদান করে। ব্রিটিশ শাসকদের প্রধান ভাবনার বিষয় হয় যুদ্ধ মোকাবেলা। যুদ্ধের ঢামাডোলে ভারতের শাসন সংস্কার বিষয়ক অন্যান্য প্রসঙ্গগুলি ছাপা পড়ে। ফলে বেশ কয়েক বছর সংগঠন গোছানোর সুযোগ পান জন সমিতির নেতারা। ১৯৪৫ সালের মধ্যভাগে নাৎসীবাহিনীর পরাজয়ে মিত্রপক্ষের জয় সুনিশ্চিত হয়। এদিকে ১৯৪৫ সালে ২৫-২৯ জুন ও ১৪ জুলাই সিমলায় লর্ড ওয়াভেলের উদ্যোগে ভারতীয়দের বড়লাট পরিষদে অধিক সংখ্যক সদস্যের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ভারতীয় নেতাদের যে-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে গান্ধী, নেহরু, আবুল কালাম আজাদ যোগদান করেন। সে সুযোগে কংগ্রেস নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির পক্ষ থেকে স্নেহকুমার চাকমা সিমলা গমন করেন এবং কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টি উত্থাপন করেন। পরের বছর ১৯৪৬ সালে মন্ত্রী মিশন ভারতে আসলে জন সমিতির পক্ষ থেকে সেখানেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়।[১৮১]

এদিকে *পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি*র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাজাদের আস্থা ছিল না। প্রবল বেগে ছুটে চলা ঘটনার ঘনঘটায় তারা উদ্বিগ্ন হলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতে অন্তর্ভুক্ত হলে (?) স্বাধীন ভারতে তাদের স্ব স্ব সার্কেল প্রশাসন ও পদমর্যাদার (যদিও ব্রিটিশরা ইতিমধ্যে সব কেড়ে নিয়েছে) কী হাল হয় তা নিয়ে। সুতরাং তারাও ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে তাদের দাবি দাওয়া তাদের মতো করে ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের নিকট তুলে ধরার লক্ষে 'চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস হিলম্যান এসোসিয়েশন' বা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি গণ-সংঘ' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন।[১৮২] রাজাদের পছন্দের ব্যক্তি অবনী রঞ্জন দেওয়ান হলেন এর প্রেসিডেন্ট। আপাতদৃষ্টিতে এ পদক্ষেপ পার্বত্য রাজাদের রাজনৈতিক মত ও পথ পরিবর্তনের দিকচিহ্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তারা ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল রাঙামাটিতে আগত ভারতের গণপরিষদের (কংগ্রেস) এ্যাডভাইজারি সাব-কমিটির[১৮৩] নিকট যে দাবিনামা– স্ব স্ব সার্কেলে দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা (প্রিন্সলি স্টেট)– তুলে ধরলেন তা হতাশাজনক। তাঁদের সংগঠন *হিলম্যান এসোসিয়েশন* দাবি করল:

---

১৮০ D. K. Chakma (ed.), *The Partition and the Chakmas and other writings of Sneha Kumar Chakma*, (India: pothi.com, 2013), p. 39.

১৮১ *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ১। পরিশিষ্টে স্মারকলিপি দ্রষ্টব্য।

১৮২ *গৈরিকা*, ১২ শ বর্ষ ১৩ শ সংখ্যা, ১৩৫৪।

১৮৩ এ. বি ঠক্করের নেতৃত্বে ডা. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, জয়পাল সিংহ, রাজকৃষ্ণ বোস, ফুলবান সাহা ও জয়প্রকাশ নারায়ণ রাঙামাটি সফর করে। সেই কমিটিতে স্নেহকুমার চাকমাকে কো-অপ্ট সদস্য করা হয়।

> পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলকে চাকমা, বোমাং এবং মং রাষ্ট্র বলেই মেনে নিতে হবে। এ রাষ্ট্রগুলো একযোগে দেশের শাসনভার চালাবে এবং শুধু দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং যানবাহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলোই ছেড়ে দেবে– অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সমস্ত ভার থাকবে জাতীয় রাজা এবং জাতীয় মন্ত্রীসভার উপর।[১৮৪]

সামন্ত শাসনের প্রতিভু পার্বত্য চিফরা যে এখনো রাজনৈতিক বাস্তবভূমিতে পা রাখেননি এবং বিচ্ছিন্নতার নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তার প্রমাণ তাদের অচল, সেকেলে দেশীয় রাজ্যের মর্যাদাসহ পৃথক শাসনের দাবি। দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে গান্ধী, নেহরু বা কংগ্রেসের নীতি ছিল 'ভারত স্বাধীন হবার পর সব রাজা-মহারাজাদের রাজ্যপাট গুটিয়ে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে মিশে যেতেই হবে। এর কোনো বিকল্প বরদাস্ত করা হবে না।''[১৮৫] চিফদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাহীনতা দেখে যে কারো আশ্চর্য লাগবে এ জন্য যে, যে-কংগ্রেসের নীতি হল দেশীয় রাজ্যের অবসান সেই কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছেই পার্বত্য রাজারা নতুন করে দেশীয় রাজ্যের জন্য ধর্ণা দিলেন। তাদের দাবির পক্ষে তদবির করার উদ্দেশ্যে গঠিত *হিলম্যান এসাসিয়েশন*ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে নিজেদের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি বলে দাবি করতে থাকে এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত থাকা সত্ত্বেও। দেশ ও জাতির এ ক্রান্তিকালে পার্বত্য নেতাদের দরকার ছিল একজোট হয়ে একই সুরে কথা বলা। কিন্তু হীন স্বার্থচিন্তা ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে সে-পথে পরিচালিত করেনি। তারা পৃথক পৃথক পথ বেছে নিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গির মতানৈক্য ও তিন রাজার বিশেষ স্বার্থে গড়া হিলম্যান এসোসিয়েশনের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি– এভাবে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হল ক্ষুদ্র জেলার গুটিকয়েক মানুষের কতিপয় নেতার মতামত। ফলে কী কংগ্রেস, কী গভর্নর-জেনারেল কী বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান এমনকি মুসলিম লীগ সবার কাছেই নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দিতে ব্যর্থ হন পার্বত্য নেতারা।

১৯৪৭ সালের মার্চে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের যেকোনো ফর্মূলা তৈরির অবাধ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা নিয়ে গভর্নর-জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর রাজোচিত গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও প্রত্যুৎপন্নতার গুণে ৩ জুনেই ভারত বিভাগসমেত ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মূলায় বিবদমান দুই শিবিরকে রাজি করে ফেলেন। ঐতিহাসিক ৩ জুন ফর্মূলার[১৮৬] সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল ভারত ভাগ হবে এবং সেই সাথে ভাগ হবে দুই মসুলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ– বাংলা ও পাঞ্জাব। এই দুই প্রদেশের অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহ ভারত ইউনিয়নে যুক্ত হবে এবং সেটা করা হবে উক্ত জেলাসমূহ থেকে

---

[১৮৪] কুমার কোকনদাক্ষ রায়, এম এ, ''পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি গণ সংঘ'' গৈরিকা, ১২ শ বর্ষ, ১৩ শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩১.

[১৮৫] ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক লাপিয়ের, *ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট*, রবি শেখর সেনগুপ্ত (অনুদিত), (কলকাতা: এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লি., ২০০৫), পৃ. ১১১।

[১৮৬] মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল*, পরিশিষ্ট ৫: '৩ রা জুন ফর্মূলা' পৃ. ১৮৩-১৮৬।

প্রতিনিধিত্বকারী প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে। ফলে দুই প্রদেশের সীমানা নির্ধারণ হয়ে ওঠে দুই শিবিরের প্রধান বির্তকের বিষয়। জিন্নাহ সীমানা নির্ধারণের কাজটি জাতিসংঘ অথবা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু নেহরু এতে দীর্ঘসূত্রিতা ও বিলম্বের যুক্তি দিয়ে তাতে ভেটো দেন। এরপর জিন্নাহ প্রস্তাব করেন ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টের বয়োজ্যেষ্ঠ বিচারকদের মাধ্যমে কমিশন গঠনের। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন ভারতের উষ্ণ আবহাওয়া উক্ত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অসহনীয় হবে বলে সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। অতপর তিনি প্রস্তাব করেন বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য দুটি কমিশন গঠিত হবে, সেই কমিশনে কংগ্রেস মনোনীত দুইজন এবং লীগ মনোনীত দুইজন বিচারপতি সদস্য থাকবেন। কিন্তু চেয়ারম্যান হবেন মাউন্টব্যাটেন যাকে মনোনীত করেন তিনিই। অতপর তিনি সিরিল র‌্যাডক্লিফকেই উভয় সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান পদে মনোনীত করেন।[১৮৭]

৩ জুনের ফর্মূলা অনুযায়ী বাংলা বিভাগ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার আইনসভার অধিবেশন বসে। মুসলিম ও অমুসলিম সদস্যদের যৌথ অধিবেশন পার্টিশনের বিপক্ষে রায় দেয়। অতপর অমুসলিম জেলার সদস্যগণ এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যগণ আলাদা অধিবেশনে বসে। অমুসলিম সদস্যদের অধিবেশন বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দেয় যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ সদস্যদের অধিবেশন রায় দেয় বিপক্ষে। যেহেতু ৩ জুন ফর্মূলা মতে অমুসলিম জেলার সদস্যদের মধ্যে যদি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলা বিভাগের পক্ষে রায় দেয় তাহলে বাংলা বিভক্ত হবে বলে শর্ত ছিল। ফলে বাংলা ব্যবচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়। স্মর্তব্য যে, বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ৯৭ ভাগ অমুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এ বিষয়টি বাউন্ডারি কমিশনের ওপরই ছেড়ে দেন। এছাড়া তিনি দেশীয় রাজ্যগুলোর জন্য গা বাঁচানোর মতো ফর্মূলাও বের করেন। সিদ্ধান্ত হয় দেশিয় রাজ্যগুলোর রাজা রাজড়াগণ সংযুক্তি আইন বা এ্যাকসেস এ্যাক্ট সই করে ভারত ও পাকিস্তানে যোগ দিবে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন ফর্মূলার একটি বড় অনালোচিত ত্রুটি ছিল এই যে তিনি এক্সক্লুডেড এরিয়াগুলোর প্রসঙ্গে কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা বাতলে দেননি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য অন্তত একটি গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও প্রয়োজন মনে করেননি যেমনটি করা হয়েছিল সিলেটের ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য যে, সেই ১৮৭৪ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকার 'তফসিলি জেলা', 'অনগ্রসর অঞ্চল' ও সর্বশেষ 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' রূপে বিশেষ ব্যবস্থায় (খাস গভর্নরতন্ত্রে) ৩৬টি জেলা ও অঞ্চল শাসন করে আসছিল। এগুলোর বেশির ভাগ অহিন্দু ও অমুসলিম উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য এলাকা। দেশীয়

---

[১৮৭] Farooq Ahmad Dar, ''Boundary Commission Award: The Muslim League Response'' in *Pakistan Journal of History and Culture*, 33.1(2010):16.

রাজ্যগুলোর বিষয়ে তিনি যেভাবে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে একটি সমঝোতায় রাজী করিয়েছিলেন এক্সক্লুডেড এরিয়াগুলোর ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ কিছু একটা সমাধান সূত্র দিতে পারতেন সে যোগ্যতা তাঁর ছিল। তা করা গেলে স্বাধীনতার পর পর ভারত তার উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে যে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যার সম্মুখীন হয় তা বহুলাংশে এড়ানো যেত। কিন্তু তিনি তা এড়িয়ে যান, শুধু তিনি কেন কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমলে নিয়েছে বলে মনে হয় না। মাউন্টব্যাটেন হিন্দু ও মুসলিম এই ধর্মীয় বিভাজনের সরল সূত্রের মাধ্যমে উপজাতি ও এক্সক্লুডেড এরিয়া বিষয়টি ফয়সালা হয়ে গেছে বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু একজন সীমানা বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ‘‘Religion was not the sole determinant of the final border, nor of the borders proposed by the Congress and the League.[১৮৮] পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে সীমানা নির্ধারণের সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাদানটির চেয়ে ধর্মের সংশ্লেষবিহীন উপাদানগুলি বেশি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করলেও পৃথক শাসন প্রণালীর অধীন এ অঞ্চলগুলো মোটেই বিবেচনায় আনা হয়নি। অথচ গোটা ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যের স্বার্থে দেশীয় রাজ্যগুলোর মতো এই অঞ্চলগুলোতে পৃথক শাসনব্যবস্থা প্রচলন করেছিল। সত্যিকার অর্থে তাদের রাখা হয়েছিল, জেড এ আহমেদের মতে,

> This is one of the manifold aspects of the imperialist policy of curbing systematically the material and moral progress of the country. Nearly 15 million inhabitants of India have been preserved in a state of semi-barbarism, denied {adequate} education, medical facilities and other amenities of civilized life so that they may never develop a consciousness of their political and economic rights and learn to struggles in an organised and systematic manner against their (British) innumerable wrongs. Who could be an easier victim of imperialist designs than these backward people, helpless before the physical prowess of their foreign ruler? British Imperialist divides and rule. It has not only attempted to foster and perpetuate communal differences but has also divided the entire terriotory of the country in such a way as to confine the operation of democratic forces within as narrow limits as possible. [১৮৯]

আলোচ্য পার্বত্য চট্টগ্রামও তেমনতর একটি জেলা যেখানে জনসংখ্যার ৯৭ ভাগ অমুসলিম জাতিসত্তার এবং ৮৭ ভাগ বৌদ্ধ। যারা তাদের আরোপিত কঠোর বাধা নিষেধ, ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্গমতা, ব্যবসায়বিমুখ মনোবৃত্তি নানা কারণে রাজনৈতিক ও

---

[১৮৮] Hannah Jaenicke, ‘‘Lines in the Sand: Deconstructing the Construction of the Indo-Pakistani Border,’’ A project of Haverford College, 23rd April, 2010.

[১৮৯] Z. A Ahmed, *Excluded Areas*, 1937, p. 6.

অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ অবস্থায় ছিল। ব্রিটিশ-ভারতে ব্যাপক অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার নৃগোষ্ঠীদের জন্য ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনে কিছু বিধি বিধান রাখা ছিল ব্রিটিশদের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ এ যাবৎ এরা ব্রিটিশরাজের আজ্ঞাবহ সুবোধ প্রজা হিসেবেই শান্তভাবে বসবাস করে আসছিল। রাজানুগত ও সুবোধ খাজনা পরিশোধকারী প্রজা হিসেবে শেষ বিদায়ের দিনে একটু সহানুভুতি তারা তাদের বিদায়ী প্রভু ব্রিটিশদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করতেই পারে। কিন্তু এটি বড়ই নির্বুদ্ধিতার বিষয় যে, পার্বত্য নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ রাজপুরুষদের (যাদের জন্য তারা রাজভক্তি প্রদর্শন করেছেন সেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে, ১৮৭২ সালের লুসাই অভিযানে, ১৯১৪-১৮ এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, ১৯৩০-৩১ এর আইন অমান্য আন্দোলন দমনে সহযোগিতা দিয়ে) কাছে ধর্ণা না দিয়ে সেই কংগ্রেসের নিকট ধর্ণা দিলেন যে-দলের কোনো আন্দোলন সংগ্রামে তারা সামিল হননি। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো তারা অন্তিম মুহুর্তে সেই কংগ্রেসকেই বেছে নিলেন। অথচ তারা এতকাল কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতকে শক্তিশালী করে এসেছেন। সুতরাং কংগ্রেস তাদের দাবি দাওয়া আমলে নেবেন কোন দুঃখে? গান্ধী তাই বলেছিলেন, ‘‘ভারতে কানা, খোঁড়া, অন্ধ অনেক মানুষ আছে, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে কটা লোক আছে যে আমাদের তা প্রয়োজনীয়।’’[১৯০] পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্তি আন্দোলনের মুখ্য নেতা স্নেহকুমার চাকমা লিখেছেন, ‘‘তার আইনজীবী, অপুর্ববর্ধন মুখোপাধ্যায় যখন দিল্লিতে গান্ধীর নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন তখন গান্ধীজী তাকে সে বিষয়ে কথা বলতেই বারণ করেছিলেন।’’[১৯১]

সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব বাংলায় সংযুক্তি

৩ জুনের সরকারি বিবৃতি মোতাবেক বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের হিন্দু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের ৩০ জুন বাউন্ডারি কমিশন গঠিত হয়।[১৯২] ভারত বিষয়ে বিশেষভাবে অনভিজ্ঞ বিশিষ্ট আইনবিদ স্যার সিরিল র‌্যাডক্লিফকে করা হয় সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান যিনি এই দায়িত্ব নেয়ার আগ পর্যন্ত কখনই ভারতে আসেন নি। বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনে কংগ্রেস মনোনীত দুই এবং মুসলিম লীগ মনোনীত দুই সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁরা হলেন-বিচারপতি বিজন কুমার মুখার্জী, বিচারপতি সি সি বিশ্বাস, বিচারপতি আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম এবং বিচারপতি এস এ রহমান।

[১৯০] স্নেহাশীষ ঘোষ, *বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদ, বিশেষভাবে উল্লেখ্য চাকমা প্রসঙ্গ*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস (যাদরপুর: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদুবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ৪৫।

[১৯১] D. K Chakma (ed.) *The Partition and The Chakmas:* p. 7 ``My Lawyer in the Commission, Shri Apurbadhan Mukhopadhyaya, also visited Delhi with the same Mission but Ghandhiji plucked out the word ‘‘CHT’’ from his lips.’’

[১৯২] H. V. Hodson, *The Great Divide: Britain-India-Pakistan* (Karachi: 1985), p. 347.

গভর্নর-জেনারেলের ঘোষণায় সীমানা নির্ধারণের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালায় (টার্ম অব রেফারেন্স) নির্ধারিত ছিল:

> The boundary Commission is instructed to demarcate the boundaries of the two parts of Bengal on the basis of ascertaining the contiguous areas of Muslims and Non-Muslims. In doing so, it will also take into account other facts.[১৯৩]

প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কমিশন বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলোর কাছ থেকে প্রতিনিধি এবং স্মারকলিপি আহ্বান করে। ১৯৪৭ এর ৪ এপ্রিলে কংগ্রেস কর্তৃক রাঙামাটিতে প্রেরিত বহির্ভূত এলাকা বিষয়ক উপ-কমিটির কোঅপ্ট সদস্য হিসেবে স্নেহকুমার চাকমা কংগ্রেসের স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতভুক্তির প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন এবং তিনি তার জন্য আক্ষেপের সুরে স্বীকার করেছেন এভাবে,

> Unfortunately enough while the Muslim League leaders were madly interested in the 5138 sqr. miles of resourceful lands of Chittagong Hill Tracts inspite of the alien inhabitants therein, the leaders of the Indian National Congress and the Hindu Mahasabha appeared to have been badly prejudiced against these Buddhist minority ethnic groups and their area.[১৯৪]

অন্যদিকে প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভাও তাদের কমিশনে পেশকৃত স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি শব্দও সন্নিবেশ করেনি। হিন্দুরা যে মনে প্রাণে চায় না পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের সাথে থাকুক তা উপলব্ধির জন্য এ অনিহা কি যথেষ্ট নয়? কংগ্রেস তার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পৃথক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দাবিকে জোরালো করার জন্য উল্টো পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের সাথে রেখে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। এ বিষয়টি সমসাময়িক একটি ইংরেজি পত্রিকা *ইন্ডিয়ান নিউজ ক্রনিকল* গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছিল। পত্রিকাটি লিখেছিল:

> Bitter resentment is expressed by representatives of the Chittagong Hill Tracts area against the decision over to that territory to East Bengal. The resentment is not so much against Sir Cyril Radcliffe as against the Congress, which in its memorandum presented the Boundary Commission took the initiative in making the offer of the area to Pakistan.[১৯৫]

---

[১৯৩] D. K Chakma (ed.) *op., cit.*, 231.
[১৯৪] ঐ, পৃ. p.286.
[১৯৫] *Indian News Chronicles*, New Delhi, Sunday, 24 August 1947.

তবুও পরে বিফল মনোরথে ৪ জুলাই তারিখে স্নেহকুমার পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির পক্ষে নিজে একটি স্মারকলিপি বাউন্ডারি কমিশনে পেশ করেন।[১৯৬] অতপর ১৯৪৭ এর ১৬ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত কোলকাতার বেলভেডিয়ার প্রাসাদে কমিশনের শুনানি শুরু হয়। কিন্তু চেয়ারম্যান শুনানিতে অনুপস্থিত থাকেন। ১৯ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ নিয়ে শুনানি হয় এবং এতে মুসলিম লীগ সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব বাংলার সাথে রাখার জন্য জোড়ালো যুক্তি উপস্থাপন করে। বিচারপতি বি কে মুখার্জী ও বিচারপতি সি সি বিশ্বাস কর্তৃক ২৯ জুলাই পেশকৃত বেঙ্গল (প্রিপার্টিশন) *বাউন্ডারি কমিশন রিপোর্ট অব নন-মুসলিম মেম্বারস প্রতিবেদন* ও পরবর্তীকালে *সানডে* পত্রিকার মতে মুসলিম লীগের উপস্থাপিত যুক্তিগুলো নিম্নরূপ[১৯৭]:

- The CHT form an economic and geographical unit with the Chittagong district, and its separation would hamper the interest of the both.
- The inclusion of the CHT is essential for the proper maintenance of the port Chittagong.
- The channels of communication of CHT with the outside world are through the Chittagong district.
- The CHT is a deficit district and dependent on Chittagong for food supply.
- As Chittagong has no coal, a hydro-electric project at the falls of river Karnaphuli is necessary for the power supply of the whole region.

উপরোক্ত বিষয়গুলো বাদেও প্রশাসনিক ব্যাপারটি যদি খতিয়ে দেখা হয় তাহলে দেখা যায় ১৭৭২ সাল থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত প্রশাসনিক কাজ চট্টগ্রাম কালেক্টরেট থেকেই পরিচালিত হতো। ১৮৭৪ সালে আসাম বাংলা থেকে আলাদা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কার্যক্রম একদিনের জন্যও আসাম সরকারের নিয়ন্ত্রণে যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুপারিনটেন্ডেন্ট ১৮৬০ সালে জেলা গঠনের পর থেকেই (১৮৬০ সালের ২২ আইন মোতাবেক) চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের অধীন ছিলেন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারি নথিপত্রের আদান প্রদান চলতো চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে। প্রশাসনিক রুট ছিল নিম্নরূপ: সুপারিনটেন্ডেন্ট/ ডেপুটি কমিশনার– বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম– চিফ সেক্রেটারি/রাজস্ব, রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগ, কলকাতা। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ছিল না পূর্ববঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৯৮]

---

[১৯৬] D. K Chakma (ed.) *op., cit.*, p. 28.
[১৯৭] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ* (কলকাতা: দেশ পাবলিশিং, ২০১৪), পরিশিষ্ট । আরও দ্রষ্টব্য- ‘‘Blessing in Disguise” *Sunday*, June 18, 2006.
[১৯৮] R. H. S Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts, District Gazetteer*, 1909. p. 98.

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে পূর্বের রুটেই চলতে থাকে প্রশাসনিক কার্যক্রম। তাছাড়া মুঘল আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সমস্ত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আদান প্রদান ছিল চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের সাথে–এটি তৎকালীন বাংলার গভর্নর ফ্রেডরিখ বারোজ বা মাউন্টব্যাটেনের যুক্তি নয় বরং ঐতিহাসিক সত্য এবং বাস্তবতা। পার্বত্য চট্টগ্রামে উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো কলেজ ছিল না তাই চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়ার আশুতোষ কলেজ এবং চট্টগ্রাম কলেজ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্রদের আশ্রয়স্থল ও উচ্চশিক্ষার প্রধানকেন্দ্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দারা চট্টগ্রাম হয়েই কলকাতাসহ বহির্জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করত কর্ণফুলী নদীর নৌপথে লঞ্চের মাধ্যমে। সুতরাং পূর্ব বাংলার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত একেবারে অবাস্তব ও যুক্তিহীন ছিল না। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রবীণ বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী ড. মানিক লাল দেওয়ান তাঁর ‘‘আমি ও আমার পৃথিবী” শীর্ষক আত্মজীবনীতে ১৯৪৭ এর পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব বাংলায় অন্তর্ভুক্তিকে ‘‘শাপে বর” (Blessing in Disguise) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১৯৯] সুতরাং অমুসলিম পরিচয়কে সচেতনভাবে অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করে এ মীমাংসিত ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করাই নিবুর্দ্ধিতার পরিচায়ক। এজন্য একসময় ভারতে অন্তর্ভুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কামিনী দেওয়ান স্বীকার করেছেন,

> যাহা হউক এইক্ষণ আমি বুঝিতে পারিতেছি যে হিন্দুস্তানভুক্ত হইতে না পারায় এই জেলাবাসীর পক্ষে এক প্রকার মঙ্গলই হইয়াছিল। হিন্দুস্তানভুক্ত হইলে আমরা অপর সহস্র অসুবিধার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইতাম। এই জেলা হিন্দুস্তানভুক্ত হইলে পাকিস্তানের ভিতর দিয়া ভিন্ন বহির্জগতবাসীর সঙ্গে মিশিবার রাস্তাও আমাদের নাই। ... ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য করিয়া থাকেন।[২০০]

হয়ত এসব বিষয়ই সীমানা কমিশনকে প্রভাবিত করেছে। যাহোক র‌্যাডক্লিফ ১২ আগস্ট মাউন্টব্যাটেনকে জানান ১৩ আগস্টের দুপুরের মধ্যেই এ্যাওয়ার্ড চুড়ান্ত হবে। এটা জানাজানি হয়ে যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সর্দার প্যাটেল প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে যুক্ত করা হবে বলে মাউন্টব্যাটেনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেন।[২০১] এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গটি সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় হয়ে ওঠে। ফলে ভি.পি মেননের পরামর্শে মাউন্টব্যাটেন এ্যাওয়ার্ড ঘোষণা ১৫ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত রাখেন এবং ১৬ আগস্ট দিল্লিতে এ্যাওয়ার্ড ঘোষণা ও এর খুঁটিনাটি

[১৯৯] ড.মানিক লাল দেওয়ান, *আমি ও আমার পৃথিবী*, পৃ. ১৯৮। কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত হল: কলমের আঁচড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের অংশ না হয়ে ভারত রাষ্ট্রের অংশ হলেও যে জুম্ম জনজাতির মানুষ সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতেন এমন মনে করার কোনো কারণ নাই। দেবযানী দত্ত ও অনসূয়া বসু রায় চৌধুরী, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম* (কলকাতা: সাউথ এশিয়া ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস, ১৯৯৬), পৃ. ৫৫।

[২০০] কামিনী দেওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

[২০১] H. V. Hodson, *The Great Divide: Britain-India- Pakistan* (Karachi: OpL, 1985), p. 350.

বিষয় খোলাসা করার বিষয়ে সভা আহ্বান করেন।[২০২] উক্ত সভায় নেহরু পার্বত্য চট্টগ্রাম এক্সক্লুডেড এরিয়া হওয়াতে এবং বঙ্গীয় কাউন্সিল ও আইনসভায় তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এবং জেলার ৯৭ ভাগ জনসংখ্যা অমুসলিম হওয়ায় জেলা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার র‍্যাডক্লিফ কমিশনের নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেন, এক্সক্লুডেড এরিয়া প্রসঙ্গে বাউন্ডারি কমিশনের এখতিয়ারের মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে র‍্যাডক্লিফের পক্ষে যুক্তি দেন যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম জেলার অর্থনৈতিকভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা' ও চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান নদী কর্ণফুলীর প্রাকৃতিক নির্ভরশীলতা বিবেচনা করে র‍্যাডক্লিফ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগে দেন। অন্তবর্তীকালীন সরকারের অর্থমন্ত্রী মুসলিম লীগের প্রতিনিধি লিয়াকত আলী খান বিষয়টিকে একটিমাত্র পৃথক বিষয় বা শুধু বাংলার বিষয় হিসেবে না দেখে সমগ্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত করেন। এভাবে প্রবল যুক্তিতর্কের পরও এটি অমীমাংসিত রেখে আলোচনা সভা শেষ হয়। পরদিন ১৭ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে পড়েছে বলে বেতারে ঘোষণা করা হয়। মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি দেখানো হয় লাল চিহ্নিত লাইনটি দ্রষ্টব্য যা পার্বত্য চট্টগ্রামকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।(দ্রষ্টব্য: ম্যাপ-২) জনৈক গবেষকের মূল্যায়নটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

> The allocation of the Chittagong Hill Tracts to either India or Pakistan was particularly contentious. A meeting between Congress, League and British political leaders that took place the day after India and Pakistan's Indipendence from Britain demonstrates the complicated relationship between religion and the construction of the Indo-Pakistani border, as well as the importance to both India and Pakistan of gaining and maintaining as much territory as possible. The tracts had a large non-Muslim majority, with only 7,270 Muslims out of a population of 247,053. The decision to site the tracts within Pakistan rather than India shows that non-religious factors often dominated in the awards of the most contentious areas to either India or Pakistan.[২০৩]

---

[২০২] Nicholas Mansergh and Penderel Moon, (ed.) *The Transfer of Power 1942-7,* vols XII, (London: Her Majesty's Stationery Office, 1983), p. 737-740.

[২০৩] Hannah Jaenicke, ''Lines in the Sand: Deconstructing the Construction of the Indo-Pakistani Border,'' A project of Haverford College, 23rd April, 2010.

মানচিত্র-২

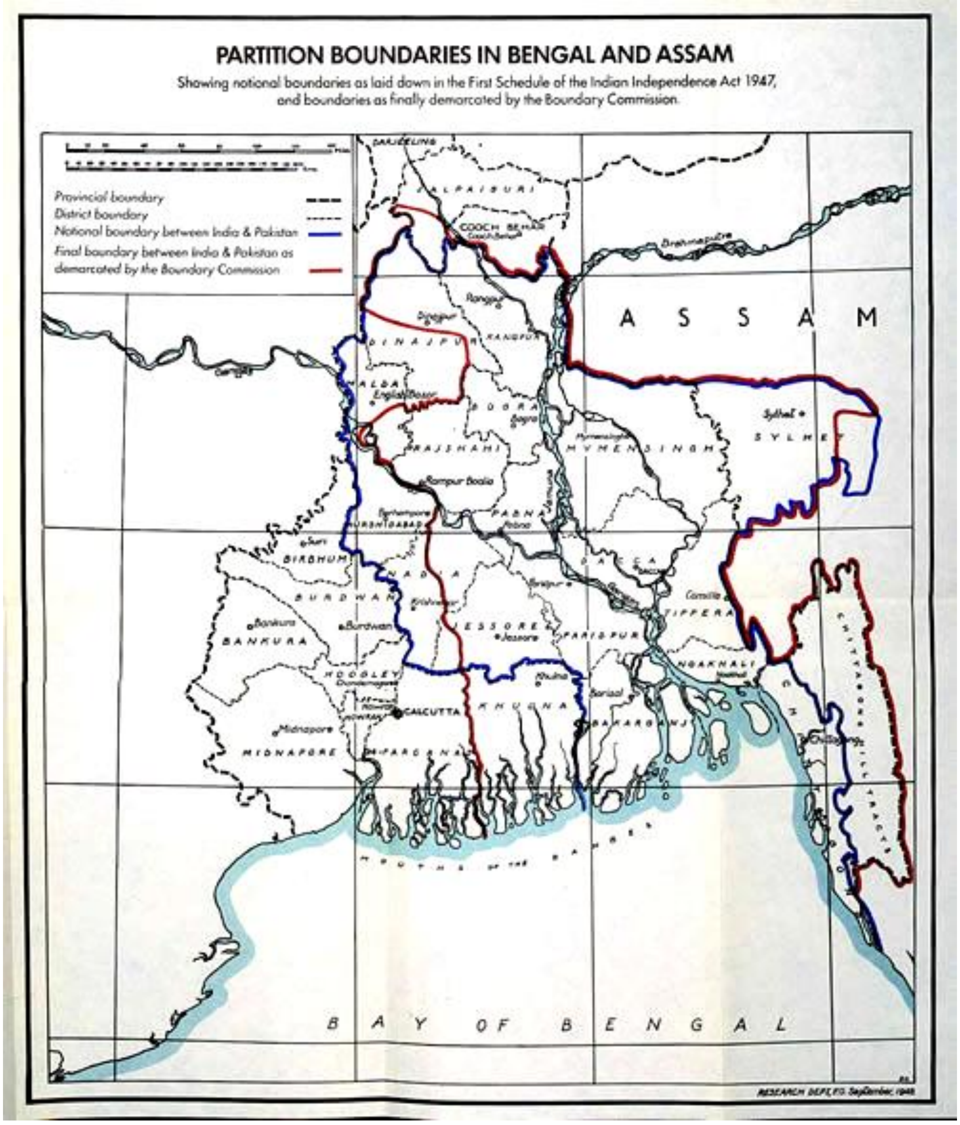

Map 2: Partition boundaries in Bengal and Assam

উৎস:http://www.bl.uk/reshelp/findhelpregion/asia/india/indianindependence/map2/index.html

বর্তমান অধ্যায়ে উপরোক্ত আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের বহির্ভূতকরণ নীতির অন্তরালে সেখানকার অধিবাসীদের ভালমন্দ অপেক্ষা ঔপনিবেশিক স্বার্থই মুখ্য ছিল। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে তিনভাগে বিভক্ত করে ভিন্ন নীতি ও পদ্ধতিতে শাসন ও শোষণ করেছিল যথা- প্রথম ভাগে ব্রিটিশ-ভারতীয় ১১টি প্রদেশ, দ্বিতীয়ভাগে ছিল ৫০০ শতাধিক দেশীয় রাজ্য এবং তৃতীয়ভাগে ছিল ৩৬টি সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত অঞ্চল– এক্সক্লুডেড এরিয়া। পৃথক জেলা হিসেবে সৃষ্টি করে *তফসিলি জেলা*, ১৯০০ সালের রেগুলেশন দিয়ে *নন-রেগুলেটেট জেলা*, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন দিয়ে *অনগ্রসর*

অঞ্চল, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দিয়ে *এক্সক্লুডেড এরিয়া'* এসব ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রতিবেশি বা স্বদেশীয়দের জন্য করা হয় নিষিদ্ধ জনপদ। তাদের ভালমন্দের বিধাতা ব্রিটিশ প্রশাসকগণ। এ নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকার পর্যন্ত আইন দিয়ে নিষেধ করা হয়। ১৯০০ সালের হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল বা পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে পার্বত্য এলাকায় বহিরাগতদের চলাচলের ওপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। এলাকায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় সংঘটিত স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনসহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো পর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অংশগ্রহণ ছিল না। এতে দলীয় বা গণআন্দোলনের রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করা অধরা থেকে যায়। এমনি তাদের প্রতিনিধি পার্বত্য রাজাদেরও বাংলা ও ভারতীয় কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংযোগ স্থাপন ও সম্পৃক্ত হওয়ার উদযোগ ছিল না। পার্বত্য জনগণের ভোটাধিকার এবং বঙ্গীয় আইনসভায় কোনো আসন বা প্রতিনিধিত্ব না থাকাতে স্বাভাবিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলো তাদের ব্যাপারে কোনো আগ্রহবোধ করেনি। পার্বত্য জনগণের এই বিচ্ছিন্নতা ও রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা বি-উপনিবেশিকীকরণের চরম সন্ধিক্ষণে তাদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনেনি।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানে এক্সক্লুডেড এরিয়া হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ কী হবে এবং তারা কোন অংশে যোগ দিবে এ সম্বন্ধে ৩ জুনের পরিকল্পনা, ১৮ জুলাইয়ের ভারত স্বাধীনতা আইন এবং বাউন্ডারি কমিশনের 'টার্মস অব রেফারেন্স' কোনো আইনেই কোনো শব্দ যুক্ত করা হয়নি। এটি ছিল মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন ফর্মূলার বড় ত্রুটি। অন্যদিকে টার্মস অব রেফারেন্সে লিখিত 'আদার ফ্যাক্টস' বা 'অন্যান্য নির্ণায়ক উপাদান' কী তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় বাউন্ডারি কমিশন, গভর্নর-জেনারেল, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা চালায়। এমতাবস্থায় 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের দোলাচলে ঘূর্ণায়মান থাকে। শেষ পর্যন্ত ভাগাভাগি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সামগ্রিতে পরিণত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম।

সুদীর্ঘকালব্যাপী মূল ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক উন্নয়নের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা আলাদা থাকার প্রবণতা গেড়ে বসে বা সেটাকেই তারা স্বাভাবিক বলে জেনে এসেছে। ফলে দেশভাগ ও সীমানা নির্ধারণের মতো উদ্ভূত কঠিন সংকটাপন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সাক্ষর রাখতে পারেনি। তাছাড়া হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যাটা প্রধানত মূল-ভারতের সমস্যা এটি কোনো কালেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ছিল না বা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে মাথাচাড়া দেয়নি। বলা

বাহুল্য হিন্দু-ভারত ও মুসলিম-পাকিস্তান এদুটির মধ্যে হিন্দু-ভারতকে অতিমাত্রায় প্রাধিকার দিতে গিয়ে পার্বত্য নেতাদের আশাহত হতে হয়। কংগ্রেসের মতো বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি, বলা যায় শীর্ষ স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের বাকসর্বস্ব আশার বাণী তাদেরকে অতিমাত্রায় আশাবাদী করে তোলে। কিন্তু চরম মূহুর্তে কংগ্রেস নেতৃত্বের উদাসীনতা ও অসহায়ত্বে পার্বত্য চট্টগামের ভাগ্য নির্ধারিত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। চুড়ান্ত বিচারে এটা বলা অতিকথন হবে না যে, বিপুল এবং অবাস্তব প্রত্যাশা বাস্তবের জমিতে আছড়ে পড়লে যা হয় তাই যেন ঘটে গেল পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যে। এভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম। মন্দের ভাল দিক হল সীমানা ভাগাভাগির জটিলতায় পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীকে ছিটমহলবাসীদের মতো রাষ্ট্রহীন, নাগরিক অধিকারহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়নি। তারা স্বাধীন দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে। স্বাধীন পাকিস্তানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আর রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেনি। পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তকরণ নীতি গ্রহণ করে (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

৩য় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের নমনীয় ভূমি রাজস্ব নীতি ও পাহাড়ি জীবনে এর প্রভাব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর্যালোচনায় ঔপনিবেশিক স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলা তথা ব্রিটিশ-ভারতের মূলধারার শাসনব্যবস্থা থেকে বহির্ভূত রাখার ব্রিটিশ নীতি, কৌশল ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। সাম্রাজ্যের স্বার্থ ও সময়ের সাথে তাল রেখে ব্রিটিশরা 'তফসিলি জেলা (১৮৭৪), 'অনগ্রসর অঞ্চল' (১৯২১) এবং 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' (১৯৩৫) নানা নামে-শিরোনামে বিশেষ ব্যবস্থায় শাসন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে। এ বিশেষ শাসনের দোহাই দিয়ে ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার পদ্ধতি (Local Autonomous Self-government) প্রবর্তন করেনি। ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত জমিদারদের সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন কোনোটাই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রয়োগ করেনি। গোটা ব্রিটিশ আমলে (১৮৬০-১৯৪৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংস্থার প্রশাসনে অংশগ্রহণ করে নিজেদের জন্য কিছু করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ তাদের নিকট প্রতিবেশী জেলা চট্টগ্রামের মানুষ সে-অধিকার ও সুবিধা ভোগ করেছে। এছাড়া বাংলার সম্প্রসারণশীল বঙ্গীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের কোনো প্রকার সুবিধা– সেটা মনোনীত হোক আর নির্বাচিত হোক কোনোটাই– দেওয়া হয়নি পার্বত্য চট্টগ্রামকে। কিন্তু ট্রাইবস হওয়া সত্ত্বেও আসামের জনজাতিদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালে বাংলার প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে বাংলার ১৪ ভাগ (সংখ্যায় ৬,৬৯৫,৪৮৩ জন) লোক ভোটাধিকার প্রয়োগ করে স্ব স্ব ক্যাটেগরির, এলাকার, সম্প্রদায়ের ও স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি।

কিন্তু এটা বড় শ্লেষপূর্ণ যে, এতসব বঞ্চনা, অবহেলা সত্ত্বেও পুরো ব্রিটিশ আমলে (১৮৬০-১৯৪৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো স্তরের জনগণই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু কেন? পার্বত্য জনগণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাংলা ও ভারতের মূলধারার জনগণের সাথে আন্দোলন করা প্রয়োজন মনে করেনি কেন? তাহলে কি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রবর্তিত 'বহির্ভূত শাসন নীতির' অনুকূলে প্রবর্তিত ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষিত ছিল? পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ রাজস্ব নীতি পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই উক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে। কারণ ৮৭ বছরের প্রত্যক্ষ শাসনামলে পার্বত্য রাজন্যবর্গ এবং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী উভয়ের নিকট রাজস্বই ছিল মূখ্য বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক সকল সিদ্ধান্ত বা নীতি গৃহীত হতো এই রাজস্বকে কেন্দ্র করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যেসব নিয়মকানুন, আইন ও রেগুলেশন জারি হয়েছে তার

পশ্চাতে ছিল, বনজ সম্পদ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানের মতে, 'রাজস্ব আহরণ অবারিতকরণ ও সর্বোচ্চকরণ'।[২০৪] পার্বত্য জনগণের 'কথিত কণ্ঠস্বর' (Voice of people) স্থানীয় রাজাদেরও ক্ষমতার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল অধীনস্ত প্রজাদের নিকট থেকে সংগৃহীত ভূমি রাজস্ব ও বিবিধ কর। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে স্থানীয়দের সম্পর্কের মাত্রা নির্ভর করত রাজস্ব আদায় ও পরিশোধ নিয়ে। একজন সমাজতত্ত্ববিদ যেমন উল্লেখ করেছেন, ''The economic ties of the colonial state with the Tribal Hill Tracts was primarily revenue centered."[২০৫] সুতরাং রাজস্বনীতির স্বরূপ পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের চিন্তা-চেতনার ধারা এবং রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুধাবন করা সম্ভব। অধিকন্তু ঔপনিবেশিক বহির্ভূতকরণ নীতির আর্থ-সামাজিক চরিত্রটিও উন্মোচিত হবে রাজস্ব সংক্রান্ত আলোচনায়।

৩.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার

১৮৬০ সালে ১ আগস্ট তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার পার্বত্য অঞ্চল পৃথক করে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনিক মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে নতুন একটি জেলার অভ্যুদয় ঘটে। চট্টগ্রামের সঙ্গে নবসৃষ্ট জেলার সড়ক যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই চট্টগ্রাম থেকে ৮০ মাইল উজানে কর্ণফুলীর তীরবর্তী চন্দ্রঘোনা নামক স্থানে স্থাপিত হয় জেলার প্রথম কার্যালয়। প্রথম ছয়টি বছর চন্দ্রঘোনা থেকেই পরিচালিত হয় জেলায় ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাজ ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারগুলো দেখভাল করা। রাজস্ব প্রশাসনটি চট্টগ্রাম কালেক্টরেট থেকেই পরিচালিত হতে থাকে। কার্পাস মহল খাজনা আদায়ের দায়িত্বে থাকা চট্টগ্রাম কালেক্টরেট অফিসের নথিপত্রে স্থানীয় রাজাদের অনুসৃত রাজস্ব আদায় পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো বিস্তারিত তথ্য ছিল না। রাজা বা চিফরা নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব কালেক্টরেট অফিসে জমা করত। কিন্তু তারা প্রজাদের কাছ থেকে কিভাবে এবং কত হারে আদায় করতেন সে ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার অজ্ঞাত ছিল। এতে করে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিটিশ প্রশাসকদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্ব ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনতে হিমশিম খেতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিমত হলো রাজস্ব সংগ্রহের যে-ব্যবস্থা এযাবৎ

---

[২০৪] Niaz Ahmed Khan, ''A Probe into the Historical Trends in Forest Resources use in Bangladesh with Special Reference to Chittagong: The British Period (1757-1947)" in *ইতিহাস পত্রিকা*, ইতিহাস বিভাগ, চ. বি. ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০০৫ পৃ. ৫২-৬৯।

[২০৫] Hasanuzzaman Chowdhury, ''Modern Politics and the Tribal Question: A Review of the Developments in the Chittagong Hill Tracts'' in Manis Kumar Raha and Iar Ali Khan, (ed.) *Polity, Political Process and Social Control in South Asia* (New Delhi: Gyan Publishing House, 1993) p.19-42.

স্থানীয় চিফরা অনুসরণ করে এসেছেন সেটাকে কোনো নিয়মের পর্যায়ভুক্ত বলা যায় না বা 'রাজস্ব ব্যবস্থা'র পর্যায়েই পড়ে না।[২০৬]

এ মন্তব্যে অতিকথন এবং পার্বত্য রাজাদের রাজস্ব ব্যবস্থার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের সুর নিহিত। এসব বাচনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা তাদের সংস্কার বা আধুনিকায়নকে যৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করেছিল। এটা ঠিক যে কোনো সুসংবদ্ধ আইন বা বিধি দ্বারা পার্বত্য রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালিত হতো না। কিন্তু যেটা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর অজ্ঞাত ছিল। লুইন বলছেন:

> The Chittagong Hill Tracts was at first a political charge merely, all the revenue work, settlements, collections, &c., being carried on by the Collector of Chittagong. Dark ignorance of the densest kind reigned over the collectorate procedings in all that related to the hills and their people, giving rise to the major part of the present existing difficulties in our revenue system. As the Superintendent of Hill Tribes (not then a Deputy Commissioner) gained experience of the district, it was found expedient to transact much of the revenue duties through him; and so, little by little, the whole revenue administration lapsed into his hands, and the district finally became entirely separated from the Chittagong collectorate in revenue matters, as it had been before politically and judically.[২০৭]

প্রকৃত অর্থেই মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত ব্রিটিশ প্রশাসকরা পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ১৮৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের তৎকালীন কমিশনার লর্ড এইচ ইউলিক ব্রাউন বর্ণিত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থার স্বরূপটি এক নজর দেখে নেয়া যায়:

> A capitation tax is the principal source of the incomes of the hill chiefs and others who receive it, though during the last six years the three chiefs have received a considerable increase from river tolls on timber, bamboos, &c., which have been farmed out to them. In addition to these sources of income, they are entitled to the first fruits of cultivation and to a few days' labour in the year from all who pay them capitation tax. ... But the tax itself is ... their principal item of recipt, and carries with it influence and authority over the tax payers. ... it is paid by the rest of the tribe to their chief; it is paid by each head of a family, and varies in amount sometimes according to the number of the family and sometimes on other considerations; the amount further varies under the same condition

---

২০৬ T. H. Lewin, ''Report on the Capitation tax revenue settlements of th Chittagong Hil Tracts, Chandraghona,'' the 10th October 1867 in *Selections (1929)*, p.18.

২০৭ *Selections from the Records of the Government of Bengal, Correspondence on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts,* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1887) p.15 [hereafter *Selections (1887)*]

under different chiefs. Bachelors are exempted, and so are spinisters and bed-ridden people, and sometimes also persons who are devoted to religion.

The paying of the tax gives right to cultivate land, but it is important to remember that it is not paid as rent of land, but as the tribute of what may be called a serf to his chief; the same amount is paid to the chief, be the quantity of land cultivated what it may, whether the cultivation is at the door of the joomeah's chief, or 150 miles away at the door of another chief, or even if no land is cultivated at all.

It is a well-known principle in the system that no man can transfer his allegiance and tax from one chief to another, and that, go where he will, and do what he may, he must continue to pay tax to his own chief. ... The collection of the tax and the exercise of the chief's authority over their joomeahs is chiefly carried out through dewans and headmen of villages called roajas. The latter receives percentage for collecting the tax at rates fixed and carry out orders, the dewans being often placed over the roajas again in the matter of collection as in other matters. The custom is for the village to nominate their own roaja but the approval of the nomination rests with the chief. The roaja is bound to be always with the village wherever it goes, and is their immediate superior and mouthpiece.[২০৮]

এ বিবরণের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডেপুটি কমিশনার লুইনের ১৮৭২ সালের একটি পর্যবেক্ষণ একত্র করলে প্রাক-ব্রিটিশ যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের রাজস্ব পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

In the first instance undoubtedly their rights only extended to the men of their own clan; but as their position became assured and their power consolidated, they collected from other and weaker tribes and village until, at the present time, the extent of their authority is well represented by easily definable natural boundaries.[২০৯]

ব্রাউনের চমৎকার বর্ণনার একটি অংশ হলো ''বিদ্যমান রাজস্ব ব্যবস্থার একটি সুবিদিত নীতি এই যে, কোনো লোকই স্বগোত্রীয় চিফ ব্যতীত অন্য কোনো চিফের প্রতি আনুগত্য দেখাতে পারতো না এবং তাকে একই চিফকেই কর দিতে হতো সে যেখানেই খুশি যাক বা যা-ইচ্ছা করুক না কেন।'' এমন ব্যবস্থা সমতলে প্রচলিত আধুনিক ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য অনুকূল নয়। কারণ চিফরা স্বীয় গোত্রের লোক দেশের যে প্রান্তেই চাষাবাদ বা বসবাস করুক না কেন তার কাছ থেকে কর আদায়ের লোকাচার-সম্মত ক্ষমতা (Prescriptive rights) প্রয়োগ করে হাউজ ট্যাক্স বা গৃহকর আদায় করতেন। পাহাড়ি অধিবাসীদের কাছ থেকে আদায়কৃত এ করই চিফদের কর্তৃত্বের 'বাহ্যিক চিহ্ন এবং অভ্যন্তরীণ শাসনের ভিত্তি'। ব্রিটিশ শাসন শুরুর পূর্ব পর্যন্ত তারা সব ক্ষমতা, মুনাফা এবং তথ্যাদি নিজেদের হাতে রেখে সমস্ত পাহাড়ি এলাকা জুড়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এসেছেন। কোনো লিখিত আইন বা নিয়ম কানুন নয় গোত্রতান্ত্রিক আনুগত্য, রীতি ও প্রথা হল চিফদের ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতার (Legitimacy)

[২০৮] *Selections (1887),* p. 1-2.

[২০৯] *Ibid,* p. 15.

মাপকাঠি। চট্টগ্রাম বিভাগের তৎকালীন কমিশনার যথার্থই বলেছেন যে, ‘‘These three were originally chiefs over all the old inhabitants of the Hill Tracts: but before the constitution of the Hill Tracts into a separate district, scarcely anything was known by the collector of Chittagong regarding hill affairs and customs.’’[২১০]

১৮৬৪ সালে নবগঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন সুপারিনটেন্ডেন্ট জি. ম্যাকগিল সর্বপ্রথম পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশ ছিল প্রথমত, অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার ওপর একটি শুমারি পরিচালনা করা; দ্বিতীয়ত, খাজনার হার অনুসারে প্রত্যেক গৃহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা; তৃতীয়ত, এভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দেওয়ার শর্তে তিন প্রধান গোত্রপতির সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্দোবস্ত সম্পাদন করা; ও চতুর্থত, চিফদেরকে সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত জুমিয়া পরিবারগুলোর কাছ থেকে জুমকর আদায়ের কর্তৃত্ব দেওয়া।[২১১]

কিন্তু কলকাতা কর্তৃপক্ষ রাতারাতি কোনো সংস্কার কাজে হাত দিতে নিস্পৃহ ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম গহীন জঙ্গলাকীর্ণ স্বল্প ও বিক্ষিপ্ত জনবসতি এলাকা। রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক উভয়বিধ বাস্তবতায় এখানে সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়। কারণ স্বাধীনচেতা লুসাইদের আক্রমণের ভয়ে গ্রামগুলোর সামাজিক পরিবেশ তখনো অশান্ত ও অস্থিতিশীল। জেলার জুমিয়া জনসংখ্যা, তাদের ভাষা, চাষপদ্ধতি, রাজাদের সাথে তাদের সম্বন্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রশাসকদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং প্রশাসনে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন বা সংস্কারে চিফদের সহযোগিতা অপরিহার্য। কারণ তাঁরা তাদের ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকারে যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপে ভীষণ সন্দেহ প্রবণ এবং ঈর্ষাকাতর।[২১২] চিফদেরকে অসন্তুষ্ট করে কোনো সংস্কার আনতে গেলে সাঁওতাল পরগণার মতো বিদ্রোহপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ারও আশংকা ছিল। রাজস্ব আদায়ের যে-পদ্ধতি বিদ্যমান তাতে আধুনিক আইনসিদ্ধ প্রশাসন বা বিধিবিধান প্রয়োগ করে শাসন পরিচালনাও সহজসাধ্য নয়। এছাড়া রাজস্ব ব্যবস্থায় যেকোনো সংস্কার সরাসরি চিফদের ক্ষমতা, প্রভাব ও স্বার্থে আঘাত করবে। কিন্তু এই স্থানীয় রাজাদের সহযোগিতা ছাড়া ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার ছক তৈরিও সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বসে থাকার পাত্র নয়।

১৮৬৬ সালের ১ মে রাজস্ব বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিনটেন্ডেন্টের হাতে হস্তান্তর করা হয় এবং ১৮৬৭ সালে জেলার প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার পদবি ‘সুপারিনটেন্ডেন্ট’ থেকে ‘ডেপুটি কমিশনারে’ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই জেলার প্রশাসন পুরোদমে শুরু হয়। সেই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজস্ব প্রশাসন নিয়ে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৬৬-৬৭ অর্থবছর থেকেই। আরো সুস্পষ্টভাবে বললে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে ক্যাপ্টেন টমাস হার্বার্ট লুইনের পদায়নের পর থেকে।

---

[২১০] *Selections*, 1887, p. 2.

[২১১] *Selections*, 1887, p. 15

[২১২] Lt. Col. T. H Lewin, *A Fly on the Wheel*, p. 211.

১৯১৯ সালে মুখ্য সচিবের ‘Note on the Administration of the Chittagong Hill Tracts’ শীর্ষক নথিতেও এটি পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:

> In 1860, a British officer was, for the first time, appointed Superintendent of the Hill Tracts. His functions and control over the Chiefs were at first vague and undefined, but in 1866, his status was raised to that of a Deputy Commissioner, and he was made responsible for collecting the Government share of the jum tax from the Chiefs. He began to interfere in other directions.[২১৩]

ব্রিটিশ প্রশাসকরা শুরু থেকেই খাজনার নতুন নতুন খাত অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। পাশাপাশি বিদ্যমান রাজস্ব ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণে ক্যাপ্টেন লুইন ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ৩.১ সারণির দিকে দৃষ্টিপাত করলে রাজস্ব সংগ্রহ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কর্ম পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

সারণি ৩.১

বিবিধ রাজস্বের উৎস

ক্রমিক নং	রাজস্বের উৎস	১৮৬২ (টাকায়)	১৮৬৩ (টাকায়)	১৮৬৪ (টাকায়)	১৮৬৫ (টাকায়)	১৮৬৬-৬৭ (টাকায়)	১৮৬৭-৬৮ (টাকায়)	১৮৬৮-৬৯ (টাকায়)	১৮৬৯-৭০(টাকায়)	১৮৭০-৭১ (টাকায়)	১৮৭১-৭২ (টাকায়)
১	ক্যাপিটেশন ট্যাক্স	---	----	----	---	৮,৬১৭	৬,৬৬৮	১০,০৯০	১২,১৪৭	৭,৯২১	৯,২০০
২	ভূমি রাজস্ব	----	-----	-----	----	---	----	১৯১	১,৯০৯	৫,৫৫৯	৫,৬৭০
৩	গ্রাস ল্যান্ড খাজনা	---	---	-----	----	১২৬	২৭৮	৪৭৩	৪৬৪	৪৬৪	৪৬৪
৪	বনভূমি	---	----	-----	-----	-----	৯৯৫	৩,০৩১	৩,৪৩১	৫,১০২	৮,৭৩৩
৫	নদী টোল	১০,২৫৩	১২,১৬৯	১৩,৩৩৮	১১,৭৭৯	১০,৭৯৭	১০,৩৪৬	১০,৮৯৫	১০,৬৬৪	১৩,৩৭০	৬৮৭
৬	পতিত জমি বিক্রি	---	১৪১	১৪,৮২৭	১২,২৪১	১৪,১০২	১৩,৬৬০	১৬০০	২০০০	৩,১৭৭	১৩,৯০৫
৭	জরিপ ফি	---	২,৮৩২	১৭৮৯৮	১,৮৯০	---	৩৬১	---	১৬৩	---	-----
৮	মৎস্য	-----	-----	-----	-----	------	৫৪	৮৩	১৩৪	৯০	৯০
৯	হাতি শিকার	----	----	-------	----	৩০০	---	----	---	----	-----
১০	জরিমানা, মাশুল	---	----	-----	-----	----	১,১৭৮	৩৬২	৪৬৩	২৪৮	২,৭৬৫
	মোট	১০,২৫৩	১৫,১৪২	৪৬,০৬৩	২৫,৯১০	৩৩,৯৪২	৩৩,৫৬০	২৬,৭২৫	৩১,৩৭৫	৩৫,৯৩১	৪১,৫১৪

উৎস: *সিলেকশনস ফ্রম দি করেসপনডেন্স অন দি রেভিনিউ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ১৮৬২-১৯২৭* (কলকাতা: বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস, ১৯২৯), পৃ. ৪৮।

ক্যাপ্টেন লুইনের নিরলস প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্ব সংগ্রহের খাত ও পরিমাণ দুটোই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৬৬-৬৭ সাল থেকে সরকারি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রথমবারের মতো

---

[২১৩] *Selections*, 1929, p. 432.

অর্থবছর চালু হয়। অর্থাৎ প্রতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে পরবর্তী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৎসর গণনা করে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।[২১৪]

উপরের সারণির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় ১৮৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব খাত থেকে সরকারি কোষাগারে কোনো জমা নেই। তার কারণ তখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে হালকৃষি পদ্ধতি এবং ভূমি রাজস্ব কোনোটার প্রচলন ছিল না। সকল পাহাড়ি অধিবাসিই ছিল জুম কৃষিজীবি। ক্যাপ্টেন লুইন স্বয়ং বলেছেন, ''সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের কোনোখানে এমন কোনো পাহাড়ি লোকের সন্ধান আমি পাইনি যে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে। প্রকৃতপক্ষে জুমচাষ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে এমন ব্যক্তি কদাচিৎ দেখা যায়।''[২১৫] পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে হালকৃষি প্রবর্তন ও ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

তার আগে নদী টোল যে খাত থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয় সেটা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার অবকাশ আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান নদী কর্ণফুলী, সাংগু, মাতামুহুরী, ফেনী প্রভৃতি নদী প্রবাহ দিয়ে প্রচুর বনজ দ্রব্য যেমন বাঁশ, শন, বেত, কাঠ, নৌকা, গোল পাতা, মাদুর পাতা প্রভৃতি পরিবহন করে নিয়ে আসা হয়। ব্রিটিশদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিগ্রহণের আগে এসব নদীর শুল্ক আদায় করতেন চাকমা ও বোমাং রাজারা। বুকানন সেই ১৭৯৮ সালেও চাকমা রাজা টব্বর খাঁ কর্ণফুলী নদীর তীরে চৌকি বা কাস্টম বসিয়ে ট্যাক্স আদায় করতেন বলে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[২১৬] কিন্তু ১৮৬০ সালে জেলা গঠনের পরপরই ব্রিটিশ সরকার ১৮৬২, ১৮৬৩ ও ১৮৬৪ সালে নদী টোল আদায় সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। শতকরা ৫ ভাগ হিসেবে নদীশুল্ক আদায় শুরু করে।[২১৭] এরপর কয়েক বছরের জন্য রাজনৈতিক কারণে নদী টোল আদায়ের কাজটি পার্বত্য রাজাদের নিকট দিয়ে ইজারা দেয়। যেমন ১৮৬৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বাৎসরিক সর্বসাকুল্যে ৭,৫৬৬ টাকায় কর্ণফুলী নদীর টোল সংগ্রহের ইজারা দেওয়া হয় কালিন্দী রানিকে। কিন্তু সরকার ১৮৭১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ফেনী বাদে সকল নদী টোল আদায়ের দায়িত্ব নব প্রতিষ্ঠিত সরকারি বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়।[২১৮] এতে রানি কালিন্দী অসন্তুষ্ট হন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করেন।

কিন্তু সারণির ১ নং কলামে বর্ণিত ক্যাপিটেশন ট্যাক্সের ক্ষেত্রে সরকার ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করে। পরের অনুচ্ছেদসমূহে এ ট্যাক্সকে কেন্দ্র করে প্রবর্তিত সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হবে।

---

[২১৪] R. H. S Hutchison, *An Account of Chittagong Hill Tracts*, p. 32-33.

[২১৫] Capt. T. H. Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong and Dwellers therein*, pp.13-14.

[২১৬] সালাহউদ্দীন আইয়ুব (অনু) *দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮)*, পৃ. ১২৬।

[২১৭] Proceedings of the Hon'ble Lt. Governor of Bengal, During June, Proc. No. 76-78 (From W. G. Young, officiating Commissioner to Secy to the Govt. of Bengal.

[২১৮] *Selections*, 1887, p. 21. ; Capt. T. H. Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong*, pp. 13-14.

৩.২ 'উপজাতীয়' রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সার্কেল ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন

পার্বত্য জেলায় ব্রিটিশ রাজস্ব নীতির সবচেয়ে টেকসই ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল সার্কেলভিত্তিক কর ব্যবস্থার প্রবর্তন। আপাতদৃষ্টিতে এটি অভিনব হলেও বিষয়টি তা নয়। ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রাম জেলার দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৭৭৩-৭৪ সালে সমগ্র জেলাকে নয়টি রাজস্ব *চাকলা*য় ভাগ করেছিল। তারও আগে আঠারো শতকের গোড়ায় মুর্শিদ কুলি খান রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য সমগ্র বাংলাকে ১৩টি *চাকলা*য় বিভক্ত করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্কেল ব্যবস্থা অনেকটা চট্টগ্রাম জেলার সেই *চাকলা* ব্যবস্থার আদলেই প্রবর্তন করা হয়। প্রথমত, ক্যাপিটেশন ট্যাক্স বা মাথা প্রতি কর আদায়ের সুবিধার্থে এ পদক্ষেপ নেওয়া হলেও উনিশ শতকের আশির দশক থেকে ভূমি রাজস্বও সার্কেল ভিত্তিতে উসুল করা হয়। সার্কেল ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে মহলভিত্তিক বন্দোবস্ত চালু ছিল। কার্পাস মহল বন্দোবস্ত অনুযায়ী ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন রাজা ভিন্ন ভিন্ন অংকে ক্যাপিটেশন ট্যাক্স আদায় করতেন যা ছিল জেলার রাজস্বের প্রধান উৎস। যথা:

১। বোমাং রাজা ২,৯১৮ টাকা, (১৮৪৭ খ্রি. থেকে); ২) চাকমা রানি কালিন্দী ২,২২৪ টাকা, (১৮৪৪ খ্রি. থেকে) ও ৩। মং রাজা ১,০২১ টাকা, (১৮৪৮ খ্রি. থেকে)। এ তিনজন চিফ ছাড়া অনেক অখ্যাত ব্যক্তি চট্টগ্রাম কালেক্টরেট অফিসে ভূয়া হেডম্যান সেজে বন্দোবস্ত করতেন। কিন্তু রাজস্ব অনাদায়ে তাদের কোনো হদিশ পাওয়া যেত না। এতে ক্যাপ্টেন লুইন সমস্ত রাজস্ব ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নিচের অভিমত ব্যক্ত করেন।

> In the first place I regard it as absolutely necessary that their (chief's) jurisdiction should be clearly defined, that is, that certain definite and fixed boundaries should be fixed within which they should severely collect their capitation tax, further the amount to be collected from each hillman should also be fixed with due regard to old customs throughout the hills. At present also I think the chiefs feel themselves insecure in their position and authority over their tribes owing to their having no sunnads or other letter of appointment from government.[২১৯]

চিফদের ক্যাপিটেশন ট্যাক্স সংগ্রহের অধিকারের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে নিয়োগপত্র দিয়ে চিফদের অনিরাপত্তা দূর করার কথা বললেও এর দ্বারা লুইন স্থানীয় রাজাদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির ও প্রচার করতেই বেশি উৎসুক ছিলেন। তবে ক্যাপিটেশন ট্যাক্স নিয়ে যে হযবরল অবস্থা চলছিল তা দ্রুত নিরসনের জন্য তিনি পরিবার প্রতি ৪ টাকা ধার্য করার প্রস্তাব

---

[২১৯] *Selections*, 1929, p. 22.

করেন। লুইনের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে কমিশনার পার্বত্য জেলা চারটি ভাগে বিভক্তির নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা বেঙ্গল সরকারের নিকট পেশ করেন। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদের প্রস্তাবনায় জুমচাষ ও ক্যাপিটেশন ট্যাক্স সংগ্রহের চিরাচরিত প্রথা পরিবর্তনের সুপারিশমালায় চিফদের সম্ভাব্য ক্ষতিপুরণ ব্যাপারে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় রাজস্ব বোর্ড এতে ঘোরতর আপত্তি জানায়।[২২০] শুধু তাই নয় স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের সংস্কার কার্যক্রম তথা ১৮৬৬ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত চিফদের অনুসৃত রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত সকল সরকারি উদ্যোগ চাকমা রানি কালিন্দীর ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। স্থানীয় কর্মকর্তারা চিফদের রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারের আওতা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার উদ্যোগ নিলে রানি তাতে আপত্তি তুলেন।[২২১] এছাড়া ১৮৭৪ সালে আসাম প্রদেশ গঠনের প্রসঙ্গটি সামনে আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আসামের সাথে জুড়ে দেয়া যায় কিনা বা কারো কারো মতে কিছু অংশ বার্মার সাথে যুক্ত করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব পায়। সবদিক বিবেচনায় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বিদ্যমান কর ব্যবস্থা সংস্কারে পিছু হটে। বাংলার তৎকালীন লে. গভর্নর অনেকটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করেন:

> The scheme devised by the Commissioner for localising the jurisdiction of the chiefs, and of improving the position both of them and of the unattached joomeah of the district, has for the present been postponed. The Lieutenant Governor is however, fully sensible of the importance of the measure, and the minds of the chiefs should be gradually led to see its advantages. When public feeling is ripe, or nearly ripe, for change, Government will not hesitate to give the required final impulse; *but all great social revolutions must in such a country be slowly and carefully introduced, after due preparation of the minds of the people for such changes.*[২২২]

এভাবে বেঙ্গল সরকার চিফদের এখতিয়ারের সীমা নির্ধারণ পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত করে দিলেও রোয়াজা ও দেওয়ানদের ব্রিটিশ প্রশাসনের ‘‘অবিচ্ছেদ্য অংশ’ অভিহিত করে রাজস্ব আদায়ে বিদ্যমান গ্রামভিত্তিক রোয়াজা বা দেওয়ান নিয়োগ প্রথা অনুমোদন করেন। তবে রানির এহেন বিরুদ্ধাচরণে ক্ষুদ্ধ

---

[২২০] The first consideration which suggests itself to the Board is that the commissioner’s plan deprives the chiefs of right more or less valuable, and gives them nothing in exchange. It does not appear to the Board that the consent of the chiefs, if obtained, to the commissioners system would be a sufficient reason for disregarding these objections. The chiefs are ignorant men who, though they might now agree to that of which they do not forsee the ultimate consequences, would be dissatisfied and complain when these consequences become felt. *Selections* , 1887, p. 8

[২২১] ‘With reference to the proposed revenue divisions, there is, I think, no reason to fear any opposition on the part of either the Bohmang or the Mong Narabadi. The Ranee, however, will certainly be averse to and oppose it, as she has systematically opposed every order that has issued from the district authorities since the first constitution of the Hill Tracts.’ *Selections,* 1887, p. 18.

[২২২] *Selections,* 1887, p. 24.

হয়ে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের লে. গভর্নর রানিকে কড়া ভাষায় সর্তক করে দেন।[২২৩] অন্যদিকে ক্যাপ্টেন লুইন দক্ষিণের বোমাং এর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়ার উদ্যোগ নেন। এতে ব্যর্থ হয়ে তিনি বোমাং এর রাজবাড়িতে হানা দেন এবং রাষ্ট্রীয় গোপন চিঠিপত্র ফাঁস করার অপরাধে তাকে আটক করেন এবং একটি সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে চিফকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন চিফ নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর *A Fly On The Wheel* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> Presently we came to an agreement. ... the chief himself being an old man, would resign the administration of affairs into the hands of his brother, and seek the rest and repose he so much needed in a religious life. ... so I completed my chain of evidence, and the overthrow of my enemy was complete. The new Boh…mong was loyal to me, as he owed me his kingdom and feared to lose it like his brother if he offended. Thus matters were peaceably settled in the south.[২২৪]

অন্যদিকে চাকমা রানির শাসনাধীন চাকমা মহলের উত্তরকুল (ফেনী উপত্যকা) এলাকায় বসবাসরত মারমাদের পালেইংসা গোত্রের দলপতি ক্যাঅজ সাইনও বরাবরই ব্রিটিশদের সুনজর লাভ করেন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন।

চাকমা রানি ও সরকারের মধ্যে যখন সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল তখন পূর্ব সীমান্তে স্বাধীন লুসাইরা বিদ্রোহ করে। ফলে ১৮৭১-৭২ সালের লুসাই অভিযানের ঘটনা চাকমা চিফ ও ব্রিটিশ সরকারকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। এ অভিযানের মাঝপথে প্রায় ৫০০ আতংকগ্রস্থ চাকমা সেচ্ছাসেবক পশ্চাদপসরণে সিদ্ধান্ত নিলে অভিযান পরিচালনায় মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সামরিক অফিসারদের সাথে রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত ক্যাপ্টেন লুইনও তাদের পশ্চাদপসরণ ঠেকাতে ব্যর্থ হন। এতে সরকার বাধ্য হয়ে রানির সহযোগিতা কামনা করে, এমনকি লুইনের সাথে তাঁর দ্বন্দ্বের কথা ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও। রানি কালিন্দী ব্রিটিশদের বিপদে পাশে দাঁড়ান। তিনি তাঁর নাতি এবং পরবর্তী উত্তরাধিকারী হরিশ্চন্দ্রকে সহযোগিতার জন্য প্রেরণ করেন। সরকার বড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। এতে ভারত সরকার রানি কালিন্দী ও তাঁর নাতি দুজনকেই পুরস্কৃত করেন। এছাড়া মং রাজা নরবদিও চাহিদামত সেচ্ছাসেবক

---

[২২৩] ‘‘I am to state that the Lieutenant Governor regrets to find the Ranee in such constant opposition to the local authorities. She must be given to understand that a continuance of this attitude on her part will necessarily compel the Lieutenant Governor to doubt whether she can be permitted to retain her present position consistantly with a due regard to the public interests, and unless His honor sees a manifest improvement in the manner in which the administration of the Hill Tracts and the estates confided to her charge is carried on, she will be summarily removed from her surbarakarship.’’ (Extract from letter No. 270, dated Fort William, the 23rd January 1869, From The Hon’ble Ashley Eden, Secy to the Govt. of Bengal, To The Commissioner of Ctg. in *Selections*, 1887, p. 7)

[২২৪] Lt. CoL. T. H. Lewin, *A Fly On The Wheel*, p. 216.

পাঠিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সুদৃষ্টি লাভ করেন। কিন্তু বোমাং রাজার কর্মকাণ্ডে সরকার অসন্তুষ্ট হন। হরিশ্চন্দ্রের কৃতিত্ব নিয়ে সরকারি মহলে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং ভারত সরকার হরিশ্চন্দ্রকে 'রায় বাহাদুর খেতাবে' ভূষিত করে এবং রানির নদী টোল হাতছাড়া জনিত ক্ষতিপুরণ দাবিটিও সরকার অনুমোদন দেয়। ১৮৭২ সাল থেকে রানি কালিন্দী নদী টোল জনিত ক্ষতিপুরণ এবং 'সদাচরণের পুরস্কার' হিসেবে বাৎসরিক প্রদেয় রাজস্ব জমা থেকে ১,১৪৩ টাকা রেয়াত লাভ করেন। অন্যদিকে মং রাজাও একই কারণে ১৫৩ টাকা কর রেয়াত লাভ করেন। ভারত সরকার এসব ঘোষণা সম্বলিত নিচের ঐতিহাসিক পত্রটি বেঙ্গল সরকারকে প্রেরণ করেন। পত্রে বলা হয়েছে:

> In reply to your letter No. 4217, dated 17 July, 1872, I am directed to state that the Viceroy and Governor-General in Council is pleased to sanction the grant of compensation for loss of Forest Revenue to the Kalindee Ranee, at the rate of Rs. 1,143 per annum and to the Mong Raja at the rate of Rs. 153 per annum, as a favour which the Government of India is pleased to grant in recognition of the services rendered by them during the Lushai Expedition. His Excellency is further pleased to approve of the presentation of a gold watch and chain of the value of 100 to Baboo Hurish Chunder and to confer upon him the title of Rai Bahadur as a reward for his exertions during the same expedition. A Sanad confering the above title for presentation to Baboo Hurish Chunder, together with a copy thereof, and of the notification publishing the conferment of the honour in the *Gazette of India*, are herewith forwarded.[২২৫]

এ 'সদাচরণের পুরস্কার' খ্যাত জুমকর রেয়াত সুবিধা পরবর্তী চাকমা ও মং রাজাগণ বংশ পরম্পরায় ভোগ করেন। এরপর ঔপনিবেশিক শাসকদের সাথে স্থানীয় রাজাদের সম্পর্ক নতুন মোড় নেয়। এরকম কিছু যে ঘটে যাচ্ছে তার ইঙ্গিত চট্টগ্রাম বিভাগের তৎকালীন (১৮৭১ খ্রি) কমিশনার Mr. Hankey র চিফদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে নীতি নির্ধারণীমূলক বক্তব্য থেকেই পাওয়া যায়। তাঁর দুরদর্শী বক্তব্য: 'The whole system of our administration is based on maintaining the status of the Chiefs, working through them and drawing them by closer ties towards ourselves.'[২২৬] অতঃপর ডেপুটি কমিশনার লুইনও বাস্তবতা মেনে নিয়ে স্বীকার করেন: ''They are on the spot, and have enormous local influence, and in my humble opinion they are the legitimate instruments of rule placed ready to our hand. I would subordinate them in every way to our authority. Let them be guided or checked as need be, but within their own limits I would have their authority

[২২৫] Letter No. 1937-P, From the Under-Secy to the Govt. of India, Foreign Dept, To The Offg. Secy to the Govt. of Bengal, Judl. Dept. Dated Simla, the 12th September 1872 in *List of Correspondence*, p. 28.

[২২৬] Mr. Hankey, Commissioner of Chittagong. Letter No. 377, October 14, 1871.

paramount.''[২২৭] এভাবে ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রথমত, গোটা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব ভারতের দুর্ধর্ষ লুসাই দমন অভিযান পরিচালনার বাফার স্টেট হিসেবে নির্বিঘ্নে ব্যবহারের জন্য; দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক মুনাফা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিফদেরকে তোষণ, পুরস্কৃতকরণ, সুবিধা প্রদান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তিসহ নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করে। ব্রিটিশ শাসকদের চোখে 'an element of mischief in the hills'[২২৮] 'the ever-truculent and irreconcilable'[২২৯] ও 'a thorn in the side of the Government'[২৩০] নানা নেতিবাচক বিশেষণে আখ্যাত রানি কালিন্দীর ১৮৭৩ সালে মৃত্যুর পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়। তাঁর পরবর্তী রাজা হরিশচন্দ্র ২২২৪-৪-৯ টাকা জমার শর্তে চাকমা মহলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক স্বার্থের খাতিরে নতুন রাজা হরিশচন্দ্রকে নিয়ে বেশ উচ্চকিত হয়। ১৮৭৪ সালে সরকার চাকমা মহলের নতুন নৃপতি হরিশচন্দ্রকে (১৮৭৩-১৮৮৫) রাজা উপাধি প্রদান করা স্থির করেন। লুইন এমনকি রানির জীবিতাবস্থায় হরিশচন্দ্রকে চাকমা মহলের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। বেঙ্গল সরকারের নথিপত্রে হরিশচন্দ্রের 'রাজা' উপাধি প্রদানকে বর্ণনা করা হয়েছে :

> In 1874 the government decided to confer on the new Chakma chief, Harish Chandra (ruled 1873-1885), the title of 'Raja' in order to underline his dependence on 'the pleasure of the paramount authority.' But it was not deemed 'desirable that any representative of Government should take part in the ceremonies incident on installation to the guddi (throne); that would ... be assigning undue importance to the matter.' In the event, the Deputy Commissioner at Rangamati presented the Chakma chief with a *sanad* (deed of grant) and *khilat* (dress of investiture) in return for a *nazar* (ceremonial present), but did not take part in further ceremonies. The sanad read: `Fort William 24-3-1874--- In recognition of your position as the head of the Chukma tribe in the Chittagong Hill Tracts, I hereby confer upon you the title of ''Raja'' for your life. -- Northbrook.'[২৩১]

এখাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সবচেয়ে অগ্রসর চাকমা জাতির নৃপতিকে খেতাব দিয়ে ঔপনিবেশিক তোষণ নীতি শুরু হয়। কিন্তু হরিশচন্দ্রের অভিষেকের পর ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি রাজস্ব সার্কেলে বিভক্ত করার পুরাতন প্রস্তাবটি আবার উত্থাপন করে। যেই

---

২২৭ *Selections*, 1887, p. 17 Letter No. 1937-P

২২৮ Lord H. Ulik Brown, Letter No. 421, dated Chittagong, the 12th Nov. 1868.

২২৯ Lt. Connel Lewin, *A Fly on the Wheel*, 1912 p. 207.

২৩০ R. H. Snyed Hutchinson, *An Account*, 1906 p. 94.

২৩১ Government of Bengal, Judicial Department, Political Branch, *Proceedings*, 15-17 (February 1874) and Proceedings 3 (April 1874) Proceedings are available in West Bengal State Archives.

হরিশচন্দ্র তাতে আপত্তি তুললেন সেই তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি উর্ধ্বতন মহলে বিষোদ্গার ও কুৎসা রটনা শুরু হয়। এমনকি তাঁকে পূর্ব পুরুষের রাজধানী রাঙ্গুনীয়ার রাজানগর ছেড়ে রাঙামাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসে বাধ্য করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্ব ব্যবস্থা গোত্রগত আনুগত্য ভিত্তিক। সরকার বিদ্যমান 'ক্ল্যান ভিত্তিক' ব্যবস্থাকে 'টেরিটরিয়াল' বা ভূখণ্ডভিত্তিক করার জন্যই 'সার্কেল পদ্ধতি' প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি এবং রাজস্ব সংগ্রহ নিয়মিতকরণ মুখ্য বিবেচনায় ছিল। উল্লেখ্য ভূমি ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য সারা ব্রিটিশ-ভারতে প্রদেশভেদে জমিদারি, রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৭৩ সালে ক্যাপ্টেন লুইন সমগ্র জেলাকে নয়টি সার্কেলে বিভক্তির প্রস্তাব করেন। ১৮৭৫ সালে ঐ প্রস্তাবটি কিছুটা সংশোধন করে তাঁর উত্তরসুরী ডেপুটি কমিশনার এ ডব্লিউ পাউয়ার ৭টি রাজস্ব সার্কেলের বিস্তারিত প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁর পরিকল্পিত রাজস্ব সার্কেল কাঠামো সারণিতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২

রাজস্ব সার্কেল (প্রস্তাবিত) পার্বত্য চট্টগ্রাম

সার্কেল নম্বর ও নাম	সার্কেলের ভৌগোলিক সীমানা	প্রাক্কলিত		মন্তব্য
		আয়তন	জনসংখ্যা	
১.রাজা হরিশচন্দ্র রায় বাহাদুরের অধীন সদর সাবডিভিশন (চাকমাসার্কেল)	**উঃ** বরকলের পাহাড় থেকে মাইনী সংরক্ষিত বনের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত পশ্চিম ও পূর্বমুখী সীমারেখা যা শিষক, কাচালং, গাইন্ধাছড়ি, কেঙ্গলছড়ি হয়ে নাভাঙ্গাছড়া স্পর্শ করবে এবং সেখান থেকে নালা বরাবর সোজা দ্রুং খাল পর্যন্ত **পঃ** পাবত্য চট্টগ্রাম জেলার পশ্চিম সীমা **দঃ** কর্ণফুলী নদী, কাপ্তাই ও রাইংখ্যাং এর জলাশয় নিচে ফারু তং পাহাড় পর্যন্ত; সেখান থেকে দুবরি খ্যাং ও সাইচল পর্যন্ত **পূঃ** বরকল ও সাইচল পাহাড় শ্রেণি।	৯৮৬ বর্গ. মাইল	চাকমা- ২২,০০০ বার্মিজ - ১,১০০ টিপেরা---- ৩০০ কুকি ----- ১৫০ বাঙালি --- ৮০০ মোট -- ২৪,৩৫০	লাল চিহ্নিতগুলো মূলত অস্থায়ী বসবাসকারী
২.মং রাজা নরবদি অধীন সদর সাব ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত মং সার্কেল	**উঃ** পার্বত্য ত্রিপুরা দক্ষিণ সীমা; **পঃ** ফেনি নদী ও পার্বত্য জেলার সীমা; **দঃ** ১ নং সার্কেলের উত্তর সীমা; **পূঃ** মাইনি সংরক্ষিত বন	৫৪৪ বর্গ মাইল	মঘ প্রায় -- ৩০০০ তিপেরা --- ৭৫০০ চাকমা------ ৩০০০ বাঙালি--- ৬০০ মোট --- ১৪,১০০	নুন্যতম হিসাবে রিয়াং সহ
৩. খাস মহল (ডেপুটি কমিশনারের অধীন সদর সাবডিভিশন)	**উঃ** পার্বত্য ত্রিপুরার দ. সীমা; **পঃ** মাইনি স. বন ও ১ নং সার্কেলের পূ. সীমা; **দঃ** দুবরি থেকে ঠেগা খাল পর্যন্ত; **পূঃ** লুসাই সীমান্ত	প্রায় ১,০০৭ বর্গ মাইল	তিপেরা ---১৫০ কুকি--- ১৫০ চাকমা -- ৫০ মোট ----- ৩৫০	রতন পুইয়ার অধীন লুসাই ও সাইলুরা এর অন্তর্ভুক্ত
৪. সহকারী কমিশনারের অধীন সাঙ্গু সাবডিভিশন খাস মহল	**উঃ** ৩ নং সার্কেলে দ. সীমা **পঃ** পারং তং থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে রেইংখ্যং জলাশয় বগা পাহাড় হয়ে লক্ষিতং পর্যন্ত; সেখান থেকে নিম্মুখে পুর্দা খ্যাং মারেখ্যাং ও ইয়ারাহ তং পর্যন্ত **দঃ** ইয়ারাহ জলাশয় থেকে সাংগু মাতাহমহুরী ও আরকান সীমা **পূঃ** লুসাই পাহাড় ও আরাকান হিল পর্যন্ত।	প্রায় ৫২৬ বর্গ মাইল	খুমি -- ১২১০	
৫. বোমাং এর অধীন বান্দরবান সার্কেল	**উঃ** ১ নং সার্কেলের দ. সীমা; **পঃ** পার্বত্য জেলার পশ্চিম সীমা; **দঃ** ম্রা কিয়ং এর আড়াআড় থাখিয়ং হয়ে সাঙ্গুর সাইকুলা পর্যন্ত এবং পাইন্ড । **পূ.** ৪ নং সার্কেলের পূর্ব সীমা	৫৭৫ বর্গ মাইল	মগ-(প্রায়)-: ৭,৫১০ তিপেরা..... ৮০০ বনযোগি ...... .৮০০ খিয়াং .... ১২০ ম্রো.......... ২৪০ খুমি .... ৭০ চাকমা ...... ৬০ বাঙালি..... ৩০০ মোট .. ৯,৯০০	
৬.বোমাং পরিবারের সদস্যের অধীন রুমা সার্কেল, সাঙ্গু সাবডিভিশন।	**উঃ** ৫ নং সার্কেলের **দ.** সীমা; দ. ও দ-প:ইয়ামবং তং বা সাঙ্গু ও মাতামুহুরীর জলধারা ইয়ারাহ পর্যন্ত; **দ ও পূঃ** ৪ নং সার্কেলের পশ্চিম সীমার অংশবিশেষ	২৫৪ বর্গ মাইল	মগ-- ৩, ৯০০ ম্রো -- ৬০০ খুমি .... ৩২০ মোট ৪,২০০	

৭. বোমাং পরিবারের সদস্যের অধীন মাতামুহুরী সার্কেল, সা. সাব ডিভিশন।	উ: ৫ নং সার্কেলের দ. সীমা; প. পার্বত্য জেলা সীমা; দ: আরাকান সীমা ও মাতামুহুরী সংরক্ষিত বন; পূ: ৫ ও ৪ নং সার্কেলের পশ্চিম সীমা এবং মাতামুহুরী সংরক্ষিত বন।	৫৯৪ বর্গ মাইল	মগ .... ৩,৯০০ ম্রো .... ১,৯০০ তিপেরা ... ৬০০ বাঙালি .... ৫,০০০ মোট ১১,৪০০	কক্সবাজার সা. ডিভিশন সহ

উৎস : *সিলেকশনস*, ১৮৮৭, পৃ. ৩৮

উপরে প্রস্তাবিত রাজস্ব সার্কেল বিভক্তি বাস্তবায়নে কিছু বাস্তব সমস্যা দেখা দেয়। কেননা ১৮৭০ সালের একটি সরকারি আদেশে চিফদেরকে স্ব স্ব জাতীয় লোকদের নিকট থেকে পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে ক্যাপিটেশন ট্যাক্স বা মাথা গুনতি খাজনা আদায়ের প্রচলিত ক্ষমতা বহাল রাখা হয়েছিল। তাই বর্তমানে সীমানা ভিত্তিক কর আদায় প্রস্তাবটি সরকারের ঐ আদেশের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাছাড়া প্রস্তাবিত ২ নং সার্কেলে জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সার্কেলটি যার অধীনে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মং রাজা নরবদির স্বগোত্রীয় জনসংখ্যার তুলনায় অন্য জাতিগোষ্ঠীর (চাকমা ও ত্রিপুরা) সংখ্যা যথাক্রমে সমান এবং দ্বিগুণ। তাছাড়া ফেনী উপত্যকায় চাকমাদের প্রভাবশালী দেওয়ান গিরিশ চন্দ্র বহুকাল যাবৎ চাকমা রাজার পক্ষে কর আদায় করে আসছেন এবং প্রস্তাবিত মং সার্কেল প্রধানের চেয়ে তাঁর সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিপত্তি ঢের বেশি। মি. পাউয়ার যেমন বলেছেন যে, দুজনের মর্যাদা ও প্রভাব এতই সমানে সমান যে, গিরিশ চন্দ্র দেওয়ানের পক্ষে মং প্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন অকল্পনীয় ব্যাপার।[২৩২] এছাড়া চাকমা সার্কেলভুক্ত হয়েছেন স্বতন্ত্র বন্দোবস্তধারী (যারা কোনো চিফের মাধ্যমে কর না দিয়ে সরাসরি কালেক্টর অফিসে জমা করেন) মঘদের পালেংসা গোত্রীয় প্রধান কেওজা প্রুর ছেলে। ১৮৬৩ সালে ক্যাপ্টেন গ্রাহাম জেলা গঠনের শুরুতে এরকম স্বতন্ত্র বন্দোবস্তধারী মঘ রোয়াজাদের বন্দোবস্ত ক্যওজ সাইনের অধীনে বন্দোবস্ত দিয়ে দেয়। এতে কেওজা প্রু ও ক্যওজ সাইনের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা চলে এবং বিচারে কেওজা প্রু চৌধুরী তাঁর স্বতন্ত্র মর্যাদা ফিরে পান। সুতরাং নতুন ব্যবস্থায় তাঁর ছেলে চাকমা সার্কেলের প্রধান চাকমা রাজার অধীনে কর দিতে সম্মত হবেন না বলেই আশংকা ব্যক্ত করেন ডেপুটি কমিশনার। অন্যদিকে ৪, ৫ ও ৬ নং সার্কেল নিয়ে আপত্তি তুলেন বান্দরবনের বোমাং রাজা। তিনি যুক্তি হিসেবে বলেন ১৮৪৭ সালের বিখ্যাত 'রিকেটস সেটেলমেন্ট'[২৩৩] থেকেই বোমাং রাজারা বনযোগি ও খুমিদের নিকট থেকে কর আদায় করে আসছিলেন। নতুন ব্যবস্থায় খুমিদের নিয়ে এসিস্ট্যান্ট কমিশনারের অধীনে একটি সার্কেলের (৪ নং) প্রস্তাব করা হয়েছে এতে খুমিরা বোমাংদের

---

২৩২ *Selections*, ১৮৮৭, পৃ. ৪৪।

২৩৩ ১৮৪০ এর দশকে বোমাং রাজপরিবারে উদ্ভূত উত্তরাধিকার সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার হেনরি রিকেটসের সরেজমিন তদন্ত সাপেক্ষে বন্দোবস্ত রিকেটস সেটেলমেন্ট নামে পরিচিত। বিস্তারিত দেখুন- *Henry Rickets, œReport on the Forays of the wild tribes of Chittagong Frontier in 1847"*

প্রতি আনুগত্য তুলে নিবে। তাই তিনি পূর্বের মতো খুমিদেরকে বোমাংদের অধীনে রেখে দেওয়ার দাবি জানান।

চাকমা রাজা হরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং তাঁর অধীনস্ত দেওয়ানরা টেরিটরিয়াল সার্কেল পদ্ধতির বিরুদ্ধে সরকারের নিকট পিটিশন দাখিল করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, ১৮৭০ সালে সরকারি আদেশে চিফদেরকে স্বগোত্রীয় লোকদের ওপর খাজনা আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ১৮৭৪ সালে তাঁকে রাজা উপাধি প্রদান ও অভিষেকের সময় প্রদত্ত সনদে 'চাকমা উপজাতির প্রধান' বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সে-নীতি অনুযায়ী মং সার্কেলের ভাগে পড়া ৩০০০ চাকমার ওপর তিনি কর আদায়ের আইনগত, প্রথাগত ও নীতিগত অধিকার সংরক্ষণ করেন। তাঁর অভিযোগ প্রস্তাবিত সার্কেল ব্যবস্থার মাধ্যমে চাকমা জাতিকে চার টুকরা করা হয়েছে। যথা- বরকলের উপরে চিহ্নিত খাসমহলবাসী চাকমা; ২) মাইনি রিজার্ভ ফরেস্টের সীমানায় বসবাসরত চাকমা; ৩) মং সার্কেলের ভাগেপড়া চাকমা এবং চাকমা সার্কেলভুক্ত চাকমা। সুতরাং এহেন খণ্ডিতকরণ রহিত করে সার্কেল সীমা পুনর্বিবেচনার জোর দাবি উত্থাপন করেন।[২৩৪] এরপর বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ১৮৭৬ সালে কয়েকটি যুক্তির ভিত্তিতে 'সার্কেল পদ্ধতি'র নীতিগত অনুমোদন দেয়। যুক্তিগুলো হচ্ছে–

> But as the fiscal right was tribal, that is, was excersied by the chiefs over certain sorts of men, with reference to clan and family, and without reference to place, the practice grew up whereby each chief has been authorised to collect dues from his people wherever they might be. This practice has however, for some time past, been found to be an obstacle to good government and to the improvement and gradual settlement of the country. ... Again, the practice is destructive of any fixed jurisdiction and any definite territorial responsibility, without which, as all experience shows, proper administration is impossible. ... the consequence was that no chief had full and entire jurisdiction within any area. But in as much as the chiefs are the natural instruments of government in these Hill Tracts, it becomes important that they should have fixed limits, and from no others. As might be expected, some of the chiefs would prefer the continuance of the irregular practice, especially the Chukma chief, whose objections I have carefully considered; and some of the local authorities advocate futher delay. But, after weighing these objections, I think that nothing but harm can ensue from further delay in notifying these several jurisdictions.[২৩৫]

---

[২৩৪] *Pettition of Harish Chandra Roy Bahadur' Selections*, 1887, p. ৪৮-৪৯.

[২৩৫] *Territorial and Fiscal Jurisdiction of the Hill Chiefs of Chittagong*, Minute by the Lt. Governor of Bengal, dated 5th July 1876 in *Selections*, 1887, p. 50.

উপরের আলোচনায় দেখা যায় স্থানীয় পার্বত্য রাজাদের প্রথাগত রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারে ব্রিটিশ সরকার সোচ্চার। কিন্তু বেঙ্গল সরকারের এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেন রাজা হরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর ও স্বতন্ত্র বন্দোবস্তধারীগণ। তাঁদের আপিলের প্রেক্ষিতে সরকার সার্কেল পদ্ধতি বাস্তবায়ন স্থগিত করে এবং একইসাথে পার্বত্য জনগণকে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে ব্যবস্থাটির সাথে মানিয়ে চলার পরামর্শ দেয়া হয়।[২৩৬] এরপর নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন এ ই গর্ডন প্রস্তাবিত সার্কেল পদ্ধতির কিছু দুর্বলতা এবং সরকারের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে বিশেষ নথি প্রেরণ করেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট। তিনি চিফদেরকে না চটিয়ে বরং সাথে নিয়ে পার্বত্য জেলার প্রশাসন পরিচালনার পূর্বের নীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন পার্বত্য জেলার সরকারের জনবল এখনো অত স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়নি যে, চিফদের একপাশে সরিয়ে রেখে পার্বত্য প্রদেশ শাসন করা যাবে; তাছাড়া গোত্রভিত্তিক আনুগত্য এখনো এত দৃঢ় যে চাইলেই ভিন্ন গোত্রীয় রাজার প্রতি তারা আনুগত্য প্রদর্শন করবে এমন ভাবা নিরর্থক। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেন,

> . . . the proposal is, practically, to allow each individual hill man to elect his own chief, irrespective of clan -- to elect the chief to whom he will pay his joom tax, in whose circle he will live, and to whom he will give the customary begar labour during the year, as well as such dues as, by immemorial custom, such chief may be entitled to levy -- if this be the proposal, my opinion is that the result can only be endless confusion and complication. The principle will be, to both chiefs and people, a highly anomalous one.[২৩৭]

এর পরিবর্তে তিনি প্রস্তাবিত সীমানায় পরিবর্তন এনে চাকমাদেরকে চাকমা চিফের সাথে, মারমাদেরকে স্ব স্ব চিফদের চতুরপাশে জোড়ো করার প্রস্তাব দেন। বাকীরা স্বেচ্ছায় খাসমহলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে তবে এর জন্য কোনো প্রলোভন বা জোর জবরদস্তি করা যাবে না। ক্যাপ্টেন গর্ডনের অনুধাবনমূলক নোটের প্রেক্ষিতে সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আঞ্চলিক সীমানা বিভক্তির বিধি প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রথমত, প্রত্যেক উপজাতিকে তার চিফের আশেপাশে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করা; দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক চিফের জন্য তাঁর যথাযথ শাসনাধীন এলাকা হিসেবে একটা নির্দিষ্ট এলাকা (ভৌগোলিক সীমানা) চিহ্নিত করে দেওয়া; তৃতীয়ত, তাদের স্বজাতি চিফের শাসনাধীন এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়ি কর্তৃক তাঁকে (চিফকে) জুম খাজনা পরিশোধ করা, তাঁকে বেগার দেওয়া, স্থানীয় প্রথাদি মেনে চলা এবং বিনা অনুমতিতে কোনো পাহাড়ি কর্তৃক গ্রাম অথবা তার নিজ উপজাতির এলাকা ত্যাগ না করার ব্যবস্থা রাখা। চতুর্থত, খাস মহলটা অত্যাচারিতদের একটা আশ্রয়স্থল হিসেবে রাখা। তবে খেয়ালখুশি মতো স্থান ত্যাগ নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে খাজনাটা উপজাতি সার্কেলের জন্য নির্ধারিত

---

[২৩৬] *Selections*, 1887, পৃ. ৫০-৫১.
[২৩৭] *Selections*, 1887, পৃ. ৫৫।

খাজনা থেকে বেশি ধার্য করা ও পঞ্চমত, তাঁদের নিজেদের প্রজাদেরকে হালচাষ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য চিফদের আর্থিক স্বার্থ নিশ্চিত করা।

এসব বিষয়সহ জেলার কয়েকটা বিশেষ এলাকাকে বনভূমি হিসেবে সংরক্ষণ করার জন্য বন বিভাগের প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে চট্টগ্রামের কমিশনার জন বিমস ১৮৭৯ সার্কেল সংখ্যা ৭টি থেকে ৫টিতে কমিয়ে সার্কেল বিভাজনের বিধির খসড়া প্রণয়ন করেন। কেননা স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বোমাং পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যদের অধীনে দেওয়া সার্কেলগুলিতে চরম অব্যবস্থাপনা বিরাজ করে এবং সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তরুণ বোমাংরা উসুলকৃত রাজস্ব থেকে চিফকে তথা সরকারের কোষাগারে প্রেরণ না করে আত্মসাৎ করা শুরু করে দেয়। বিশেষ করে রুমা সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোমাং এর বিরুদ্ধে অলসতা, ঔদ্ধত্য, অসততা এবং অকর্মণ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৩৮] এতে সাঙ্গু সাবডিভিশনের মধ্যে বোমাং এর তিনটি সার্কেল রহিত করে একটিতে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে প্রস্তাবিত চাকমা সার্কেলের অন্তর্গত কাচালং, কাপ্তাই, রেইংখ্যাং ও সুভলং উপত্যকাসমূহে সরকারিভাবে বন সংরক্ষণ জারি করায় এবং বান্দরবনের বোমাং সার্কেলের সীমায় অনুরূপভাবে (সাঙ্গু, মাতামুহুরী) নামে সংরক্ষিত বন ঘোষণা[২৩৯] করায় উভয় সার্কেলে জুমচাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। এতে সার্কেল সীমা পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া সরকার অনুধাবন করে যে, সার্কেল পদ্ধতির মাধ্যমে ‘টেরিটরিয়াল জুরিসডিকশন’ বা সীমানাভিত্তিক অধিক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় চিফদের বিরোধিতার প্রধান কারণ জুমকর পরিশোধকারী জনসংখ্যা কমে যাওয়ার আশংকা; কেননা এর ফলে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং হালচাষের বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় চিফদের কোনো ভূমিকা না থাকায় সেখান থেকে তাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে লাভবান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এসব বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে সরকার ১৮৮১ সালে ‘Rules for Territorial Circles in the Chittagong Hill Tracts’ শিরোনামে বিধিমালা প্রণয়ন করে। এভাবে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সার্কেল পদ্ধতি প্রবর্তন করে। ঐ বিধিমালায় ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং পার্বত্য চিফদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।[২৪০]

---

[২৩৮] *Selections*, 1887, p. ৬৭।

[২৩৯] Letter No. 265C., Dated 15th February 1875 from the Conservator of Forests, Bengal, to the Commissioner of Chittagong. Printed in *Selections*, 1929, p. 202-206, চিঠিতে প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে বনাঞ্চল সংরক্ষণের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি বনাঞ্চলকে 'রিজার্ভ' ও 'ডিস্ট্রিক্ট'-- এ দুভাগে শ্রেণিবিভাগ করে প্রথমটিকে বন বিভাগের এখতিয়ারাধীন এবং দ্বিতীয়টি ডেপুটি কমিশনার তথা সিভিল প্রশাসনের অধীনে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। উক্ত চিঠিতে তিনি মাইনি ও কর্ণফুলী নদীতে দুটি এলাকাকে রিজার্ভ ঘোষণার প্রস্তাব করেন। পরবর্তী ধারাবাহিকভাবে বন সংরক্ষণের ঘোষণা আসে। যথা: মাতামুহুরী সংরক্ষিত বন, ২৫১ বর্গ মাইল, (১ ডিসেম্বর ১৮৮০) কাচালং রি. ফরেস্ট ৭৩৬ (১ মার্চ ১৮৮১) সাঙ্গু রি. ফরেস্ট ১৪৫ বর্গ মাইল (৬ মে ১৮৮১) রেইংখ্যাং রি. ফরেস্ট ২১৩ বর্গ মাইল (১৫ মার্চ ১৮৮২) সীতা পাহাড় ১১ বর্গ মাইল (১ এপ্রিল ১৮৮৩) এভাবে মোট ১৩৫৬ বর্গমাইল এলাকা যা জেলার মোট আয়তনের ৩৫ ভাগ সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয় যেখানে জুম চাষ নিষিদ্ধ করা হয়।

[২৪০] পত্র নং ১৯৮৫-৭৯৭ এল আর, তারিখ- কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ ইং

কিন্তু এ বিধিমালায় চিফদের আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত হলেও পাহাড়ি জুমিয়াদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এক কথায় এ বিধি মোটেই জুমিয়া বা রায়তবান্ধব ছিল না। জুমিয়াদেরকে শুধু করের জালে আটকানো হয়নি সাথে সাথে *বেগার* বা বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম প্রদানকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়ায় তাদেরকে চিফদের এবং সরকারি দাসত্বের শৃংখল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে চিফদের সন্তুষ্ট রাখতে সামন্ততান্ত্রিক পাহাড়ি প্রথাকে গুরুত্ব প্রদান, অন্যদিকে গোত্রভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে আধুনিক ভূখণ্ডভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থায় উত্তরণের তাগিদ এ দুই বৈপরিত্যের সমন্বয় করতে গিয়ে 'বলির পাঠা' করা হয় সাধারণ জুমিয়াদের। তবে ত্রুটি, দূর্বলতা সত্ত্বেও 'সার্কেল পদ্ধতি' প্রণয়ন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজস্ব ব্যবস্থা আধুনিকায়নের পথে একটি বড় সাফল্য। অতঃপর এ ব্যবস্থা সাধারণ প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

৩.৩ মৌজা ভিত্তিক কর ব্যবস্থা প্রবর্তন ও হেডম্যান পদ সৃজন

ব্রিটিশ আমলে জনগণের সবচেয়ে নিকটতম সরকারি প্রশাসনিক অফিস ছিল মৌজা প্রধান হেডম্যানের কার্যালয়। নবগঠিত তিন সার্কেলে তিনজন ট্রাইবেল চিফকে সার্কেল চিফ হিসেবে সংস্থাপনের পর ব্রিটিশ সরকার রাজস্ব প্রশাসনকে আরো বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নেয়। এর পরের ধাপে অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে খাজনা উত্তোলনে নিয়োজিত দেওয়ান ও রোয়াজাদেরকে উপজাতীয় ব্যবস্থা থেকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় নিযুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়। এজন্য পূর্বে গঠিত প্রত্যেকটা সার্কেলের অধীনে মৌজা গঠনের জন্য সরকারি মহলে আলোচনা শুরু হয়।

উল্লেখ্য ১৮৮১ সালে রাজস্ব সার্কেল গঠন করা হয়। এর পরবর্তী দশ বছরে জেলার জনসংখ্যার আকারও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে দুটি বৃহৎ সার্কেল যথা চাকমা ও বোমাং সার্কেলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ। ১৮৯১ সালের আদম শুমারী বা সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ১৮৮১ সাল থেকে চাকমা সার্কেলের জনসংখ্যা ২৬,৮৪৩ জন থেকে ৪১,৬৩৩ জন; অন্যদিকে বোমাং সার্কেলে বৃদ্ধি পায় ১৯,৫১১ থেকে ৩৭,৭২৪ জনে।

কিন্তু সরকারি খাসমহল যেগুলো ব্রিটিশ সরকার মনে করতো অত্যাচারিত ও নিপীড়িত কৃষকদের আশ্রয়স্থল সেগুলোতে জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়।[২৪১] এতে সরকার খাসমহল বহাল রাখার আবশ্যকতা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে Mr. Forbes এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ''The object for which they were constituted as refuges for oppressed tribes has been found to

[২৪১] *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া*, ১৮৯১ ভলিউম ৩, পৃ. ৮২।

have no real foundation.'[২৪২] আবার পূর্বোল্লিখিত বিধিতে হালচাষ প্রকল্পে চিফদের এবং হালচাষে উদ্যোক্তা হেডম্যানদের বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকায় হালচাষের আওতাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ১৮৯২ সালে পূর্ব দিকের লুসাই আক্রমণ দমিত হলে জননিরাপত্তাও নিশ্চিত হয় এতদিন যা ছিল স্থায়ী গ্রামে বসবাসের পেছনে হুমকি স্বরূপ। জননিরাপত্তা, বর্ধিত জনসংখ্যা এবং হালচাষ প্রসারের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে মৌজা ব্যবস্থা প্রর্বতনের চিন্তাভাবনা জোরদার হয়। উনিশ শতকের ৯০-এর দশক জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিভাবে সুষ্ঠু আঞ্চলিক অধিকার ক্ষেত্র (টেরিটরিয়াল জুরিসডিকশন) বাস্তবায়ন করা যায়– সেই চিন্তায় হয়ে দাঁড়ায় প্রধান।

১৮৯১ এর দিকে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট পূর্বদিকের লুসাই পাহাড় নিয়ন্ত্রণে আনার সফলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। ১৮৯২ সালের ১ এপ্রিল থেকে লুসাই পাহাড় আসামের জুড়ে দেওয়া হলে বাফার স্টেট হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার গুরুত্ব হ্রাস পায়। তার প্রেক্ষিতে সরকার তিনটি বিষয়ে তথ্য ও মতামত চেয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আধা সরকারি পত্র দেয়। তিনটি বিষয় হল : ১) পার্বত্য চট্টগ্রামে হালচাষ সম্প্রসারণ সম্পর্কিত হাল নাগাদ প্রতিবেদন ; ২) প্রশাসনিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মর্যাদা অবনমন করে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের অধীনে একটি বিশেষ সাব ডিভিশনে পরিণত করার বিষয় এবং ৩) স্বল্প সরকারি জনবল দিয়ে সাঁওতাল পরগণার মডেলের মতো প্রশাসন পার্বত্য জেলায় প্রর্বতনের উপযোগিতা যাচাই। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ছিল হালচাষ প্রসঙ্গটি। হালচাষ সম্প্রসারণের গতি আরও স্ফীত করে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনা হিসেবে মৌজা গঠনের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় আসে। মৌজা গঠন করে প্রত্যেক মৌজায় একজন করে মৌজা প্রশাসক বা হেডম্যান নিয়োগ করে জুমকর আদায় ও হালচাষ বিস্তার এবং প্রশাসনকে আরো গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক করার প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়। ১৮৭০-এর দশকে দেওয়ান ও রোয়াজাদেরকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাদের ভৌগোলিক অধিকার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়নি এই ভেবে যে, গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ গঠন এবং স্থানান্তর কৃষিতে (জুমচাষ) অভ্যস্ত পাহাড়িদের জীবনধারাকে আমূল পরিবর্তন করে ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার সময় তখনো পরিপক্ক হয়নি। কিন্তু স্থানীয় শাসকরা তখন ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন যদিও তা গ্রাহ্য হয়নি। ১৮৭৯ সালে তৎকালীন কমিশনার জন বিমস হেডম্যানদের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর সোজা বক্তব্য হেডম্যানদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিয়ে রাজস্ব ব্যবস্থার অসঙ্গতি দূর করা সম্ভব নয় বরং জটিল থেকে জটিলতর হবে। তাঁর যুক্তি ছিল:

[২৪২] Letter No. 1136 H.T. Dated 19 August 1891 W. B Oldham, Commissioner of Chittagong Division to Chief Secy, Govt. of Bengal.

> Unless we establish and support the Roaja or village headman in his authority, the people will scatter themselves more and more. The Roaja will infact not know where his villagers are, for they will have settled themselves all over the country in isolated jooms, and he will have great difficulty in collecting them, to render the begar and other services, on which so much of the organisation of the district depends, or in realizing the rents due to the chief.[২৪৩]

অতপর ১৮৮১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডেপুটি কমিশনার এল আর ফোর্বস পার্বত্য জেলার ব্রিটিশ প্রশাসনে হেডম্যানদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন, পার্বত্য জেলার মতো বিক্ষিপ্ত বসতিসম্পন্ন দুর্গম জেলায় হেডম্যানদের 'পার্সন্যাল গর্ভনমেন্ট' বা 'ব্যক্তিগত সরকার' ই সব। দায়িত্ব কর্তব্যের খাতিরে তাদের গুরুত্ব চিফদের তুলনায়ও বৃহত্তর বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কারণ হেডম্যান একাধারে :

> realizes the joom tax, decides petty cases, executes the orders of the local officers, and is held responsible for keeping the peace and and reporting all heinous cases, unnatural deaths, & c., & c., occuring in his village, to the nearest police station.[২৪৪]

এসব অভিমতের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের কমিশনার ডব্লিউ বি ওল্ডহাম প্রত্যেকটি সার্কেলের অধীনে হালচাষের বিস্তার ঘটানো এবং প্রশাসনকে আরো গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষে ১৮৯১ সালে মৌজা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পার্বত্য জেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করে তিনি মৌজা ব্যবস্থা গঠনের যৌক্তিকতা অনুধাবন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সরকারকে লিখেন:

> We have the larger divisions, we have the headmen agency. All that we want are the smaller local units, the mauzas. But wherever there is plough cultivation or wherever, without it, there is a group of settled habitations, a mauza can be formed, and this is proved by the history of Mr. Pantet's settlement of the Damai-ni-ko. When I explained this idea at the first conference, both the manager of the Mong and Chakma Circles and the Sangu officer at once said that they severally had in their minds two or three and three or four such areas which could be defined as mauzas at once. I asked that they might be so defined, and I have therefore, provided for the gradual formation of mauzas and for the settlement of the arable lands in them by the agency of the headman and on a jamabandi which is to be annually examined and except as regards rates, revised.[২৪৫]

---

[২৪৩] *Selections*, 1887, p. 58.

[২৪৪] *Selections,* 1887, p. 71.

[২৪৫] Letter No. 1136 H.T. Dated 19 August 1891 W. B Oldham, Commissioner of Chittagong Division to Chief Secy, Govt. of Bengal.

সার্কেল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে চিফদের মান, মর্যাদা ও ব্রিটিশ প্রশাসনে তাদের অত্যাবশ্যকতা নিয়ে ব্যাপক গুণকীর্তন করা হয়েছিল। এখন চিফদের অনুগত কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে প্রভাবশালী হেডম্যান বন্দনা শুরু হয়। কেননা পরিকল্পিত মৌজা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সফলতা হেডম্যানদের অগ্রণী ভূমিকার ওপর নির্ভর করবে এবং সেটা সম্ভব তাদেরকে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় নিযুক্তির মধ্য দিয়ে। ডব্লিউ বি ওল্ডহাম জেলার শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম একক হিসেবে গঠিতব্য মৌজা প্রশাসনে হেডম্যানদেরকে আরো উচ্চ মর্যাদায় দেখতে চান বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মন্তব্যটি বিশ্লেষণের দাবি রাখে,

> As regards the headmen whose commonest title is Roaja though there are several others, it will be observed that I proposed to considerably increase their remuneration. But this is the first definite attempt I find in the papers to put the headmen on a fixed footing. They only began to be restored in 1870. Those whom I have seen are very superior in status to any village headmen in Bengal, and seemed even higher than the Patel, Raddis or Gandas of the Ceded Districts. They are in fact petty chiefs, and we wish to make them Magistrates. Moreover, in not a few cases in which the householders who now pay them joom-tax are very widely scatttered, something like compensation will be necessay for the changes which a mauzahwar system will make, and the remuneration I have provided would be full compensation.[২৪৬]

অতএব ওল্ডহাম পুর্বোক্ত ১৮৮১ ও ৮৪ সালের ভৌগোলিক সীমা সংক্রান্ত বিধি পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ১৭টি বিধি সম্বলিত ‘Rules for the administration of the Chittagong Hill Tracts’ শিরোনামে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৮৯২ এর খসড়া সরকারের নিকট পেশ করেন। এ বিধিমালার অভিনব কিছু বৈশিষ্ট্য হলো: ১। পূর্বের ২ টি খাসমহল বাতিল করে তাদের স্ব অবস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া; ২। মৌজা ব্যবস্থা প্রর্বতন (হালচাষ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে); ৩। তালুক-দেওয়ান পদ সৃজন; ৪। হালচাষ খাজনায় চিফ ও হেডম্যানদের কমিশন ধার্যকরণ; ৫। চিফ ও তালুক দেওয়ান ও হেডম্যানদের জন্য খাস মৌজার সুবিধা ও ৬। হেডম্যান, কার্বারীদের জন্য প্রতি মৌজায় ৫০ একর করে নিষ্কর উৎকৃষ্ট চাষযোগ্য জমি সংরক্ষণ।

বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কিছু সদর্থক পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনী আকারে ১৮৯২ সালের ৫ জুলাই উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করে। সরকার কমিশনারের সাথে একমত প্রকাশ করে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ দেয়:

---

[২৪৬] *Selections,* 1929, p. 219-220; W. Hunter in 1876 wrote: the headship of a clan among the Chakmas, or of a village among the khyoungtha, was an office of great importance, and care was taken that no man unfit for the post should be appointed. ... it was also ruled by Government, in 1873, that the head-men are to bee nominated by the chiefs, and appointed by the Deputy Commissioner, and that they must be chosen from among the jumias, must not be outsiders. *A Statitistical Account of Bengal,* Vol. VI, pp. 90-91.

The advantages of insisting on geographical limits of jurisdiction are manifold, and having before him the unanimous testimony of experienced local officers in favour of the measure, the Lieutenant-Governor has no hesitation in directing the introduction of your scheme, which appears to have been carefully considered and to be well calculated to attain its object.[২৪৭]

শুধু তাই নয় সরকার আরো নির্দেশ দেয়: ''The word 'Tribal' before 'Chief' should be omitted, in order to emphasise the fact that all the arrangements will in future be geographical and not tribal.''[২৪৮] উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভৌগোলিক সীমানাভিত্তিক মৌজা ব্যবস্থা প্রণয়নে সরকারের অবস্থান দৃঢ় ও অনমনীয়।

এরপর শুরু হয় মৌজা গঠনের কাজ। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে মৌজা ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি একটি বিরাট পরিবর্তনও বটে।

চিফদের বিরোধিতা

তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেল চিফ কয়েকজন দেওয়ান ও রোয়াজা সমভিব্যহারে এই মৌজা ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক কুফল জানিয়ে সরকারের সমীপে দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করেন। বাংলার লে. গভর্নরের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিতে[২৪৯] তারা অভিযোগ করেন: ১। প্রস্তাবিত তালুক এবং মৌজা বিভাগ পাহাড়িদেরকে স্মরণাতীত কাল পুরোনো সমাজ ও প্রশাসনিক ভিত্তি গ্রোত্র ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে সম্পূর্ণ অকেজো করে ফেলবে। ২। জমির বর্গা, হস্তান্তর এবং ভাগ বন্টনের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা হালচাষে উপকারের পরিবর্তে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর প্রমাণিত হচ্ছে; ৩। এখন থেকে চিফের পরিবর্তে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কর্তৃক দেওয়ান ও হেডম্যান নিয়োগে দেওয়ান ও হেডম্যানগণের মর্যাদা তাঁদের জনগণের কাছে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন করছে; ৪। হালচাষে (জমির) ওপর নির্ধারিত কমিশন অপর্যাপ্ত। কিন্তু সরকার চিফদের স্মারকলিপি পেশ করা সত্ত্বেও স্বীয় অবস্থানে অনড় থাকে। নিচের সরকারি পত্রে তার প্রতিফলন ঘটে:

Clan Jurisdiction has been condemned for the past 30 years by officers thoroughly acquainted with the Hill Tracts and the Government, and the Lieutenant-Governor has no doubt that the substitution of the system of strictly territorial jurisdiction is essential to the efficient administration and development of the tracts. The formation of mauzas is also indispensable both for the proper collection of the jum tax and the plough rent, and for other administrative purposes . . . The formation

---

[২৪৭] From H.J.S. Cotton, Esq., Offig. Chief Secretary to the Government of Bengal, To the Commissioner of the Chittagong Division, Dated Calcutta, the 26th February 1892, *List of Correspondence*, p. 53.

[২৪৮] *Ibid.*

[২৪৯] *The Humble Memorial of Bohmang, Raja Bhuban Mohan Ray, the Chief of Chakmas, and the Mong Raja Nephrusyne and the undersigned Dewans and Roajas of the Chittagong Hill Tracts*, 28th Feb, Rangamati, 1898 in *Selections*, 1929, pp. 259-265.

of the mauzas undoubtedly tends to confine the people to permanent residence within fixed limits and also to abandon jum for plough cultivation.[২৫০]

১৯০০ সালের রেগুলেশনের পর মৌজা ব্যবস্থার অগ্রগতি

১৮৯৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের ১৮৪৪ পি নং সরকারি পত্র থেকে জানা যায় সার্কেল চিফগণ বেলভেদিয়ার ভবনে লে. গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের আপত্তি উপস্থাপন করেন। এর ফলশ্রুতিতে লে. গভর্নর ভারত সরকারের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরিত ১৯০০ সালের হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশনে চিফদের ভূমিরাজস্ব থেকে বিদ্যমান কমিশন বৃদ্ধির দাবি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভবিষ্যতে গঠিতব্য মৌজাগুলো একই তালুকের মধ্যে রাখার নির্দেশনা ছাড়া অন্যান্য দাবি যেমন– পুরনো উপজাতীয় ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন, চিফদের দেওয়ান ও হেডম্যান নিয়োগ ক্ষমতা প্রভৃতি বিধিতে কোনো পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়ে দেন। এরপর ১৮৬০ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত সকল বিধি রহিত করে ১৯০০ সালের ১ মে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন জারি হয়।

১৮৯২ সালের শাসন বিধি ছিল ১৯০০ সালের বিখ্যাত রেগুলেশনের ড্রেস রিহার্সেল। কারণ ১৮৯২ সালেই অঞ্চলভিত্তিক শাসনের সব আয়োজন সম্পন্ন হয়। উক্ত রেগুলেশনের অধীনে প্রণীত বিধিনাবলির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিগত ৪০ বছর ধরে জুমকর ও ভূমিরাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নানা তর্ক বির্তক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্থায়ী রূপ লাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সকল রিজার্ভ ফরেস্ট নিয়ে একটি সার্কেলসহ ৪টি রাজস্ব সার্কেলে বিভাজন স্থায়ী রূপ লাভ করে। তালুক-বিভাগ মৌজা গঠন ও পরবর্তী আদম শুমারীর সুবিধার্থে বহাল রাখা হলেও ১৯২৫ সালে মৌজা গঠনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হলে তা পুরোপুরি বাতিল করা হয়।[২৫১] ১৯২৬ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম *ভূমি রেকর্ডস ও সার্ভে রিপোর্ট* অনুযায়ী তিন সার্কেলে মোট ৩৭৩টি মৌজা গঠিত হয়। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ৩৭৬টি মৌজা গঠিত হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে মৌজার সংখ্যা ৩৭৬ টি (চাকমা সার্কেলে ১৭৮টি; বোমাং সার্কেলে ১০৯ টি এবং মং সার্কেলে ৮৯টি)। সার্কেলভিত্তিতে গঠিত মৌজার একটি পরিসংখ্যান অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল:[২৫২]

---

[২৫০] Letter No. 543 P-D C W Bolton Chief Secy to Commissioner of Chittagong dated 7th of October 1898.

[২৫১] Raja Devasish Roy, ‘‘The System of Traditional Administration in the Chittagong Hill Tracts’’ in Mrittika Chakma et all (ed.), *Chakma Rajpunyah 2003: Commemorative Edition* (Rangamati: Chakma Rajpunya Celebration Committee, 2009), pp.79-107.

[২৫২] *Final Report on the Settlement and Survery Operations undertaken in the CHT between 1909-1926,* Government of Bengal, p. 43-44.

সারণি ৩.৩

সার্কেলের নাম	আয়তন (বর্গ মাইল)	মৌজার সংখ্যা
রিজার্ভ ফরেস্ট	১৪২১	১৮
মাইনি ভ্যালি	২৬৯	২৬
চাকমা সার্কেল	১,২২১	১৩৪
বোমাং সার্কেল	১৪০৪	১০৭
মং সার্কেল	৭০৩	৮৮
মোট	৫০১৮ বর্গ মাইল	৩৭৩ টি মৌজা।

১৯০০ সালের পর তিন সার্কেল চিফ স্ব স্ব সার্কেল শাসনে মনোনিবেশ করেন। সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবার, বাজারের ব্যাপারি (অস্থায়ী বাঙালি) ও দোকানদার, মৎস্য ও গর্জন খোলার পাট্টা গ্রহীতাগণ ব্যতীত সার্কেলের মধ্যে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এলাকাধীন চিফের প্রজা এবং ঠিক একইভাবে ঐ ব্যতিক্রম ছাড়া মৌজার মধ্যে বসবাসকারী সবাই হেডম্যানের প্রজা বলে পরিগণিত হয়। স্থানীয় রীতি অনুসারে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই মৌজা হেডম্যানের মাধ্যমে চিফকে খাজনা পরিশোধ করবে; চিফ তার অংশ কেটে রেখে সরকারি অংশ কোষাগারে জমা করার প্রক্রিয়াটি স্থায়ী নিয়মে প্রণীত হল। চিফদের এক বা একাধিক খাস মৌজা জায়গিরের মতো ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়। একইভাবে হেডম্যানদের জন্য ২৫ একর পর্যন্ত হালচাষে উপযুক্ত জমি করমুক্ত বা সার্ভিসল্যান্ড হিসেবে ব্যবহারের বিধান রাখা হয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এ ব্যবস্থাটি উত্তম মনে হলেও বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো পর্বতশংকুল এলাকায় সে ধরনের উপযুক্ত জমি একেবারে অপ্রতুল। ১৯২৭ সালের সার্ভে রিপোর্টেও বলা হয়েছে অনেক হেডম্যানকে দরখাস্ত করা সত্ত্বেও বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এভাবে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব সার্কেল প্রধান ও তাদের অনুগত এজেন্সিদের হাতে এবং খাজনার হার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-আধুনিক ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বিশ শতকের একদম শুরুতে প্রবর্তিত এই নতুন ব্যবস্থায় চিফ ও হেডম্যানদেরকে ব্রিটিশ সরকারের জুমকর ও ভুমি রাজস্ব আদায়ের এজেন্সিতে রূপান্তরের পরিকল্পনা পূর্ণ হয়। এক কথায় ১৯০০ সালের বিখ্যাত রেগুলেশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের ট্রাইবেল নীতি, ভূমি ও রাজস্বনীতি পূর্ণতা পায়। প্রথাগত ও আইনত চিফ ও হেডম্যানগণ বিবিধ কমিশনভোগীতে পরিণত হন। একদিকে রাষ্ট্রীয় সকল প্রয়োজনে হেডম্যানরা পরিণত হয় মৌজাবাসীদের মুখপাত্র বা প্রতিনিধিতে। অন্যদিকে মৌজা পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধি হয়ে সকল আদেশ নির্দেশ কার্যকরের দায়িত্ব বর্তায় তার ওপর। যেমনটি সার্কেল পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন বংশানুক্রমিক সার্কেল চিফগণ। এ রেগুলেশন শতাব্দী প্রাচীন উপজাতীয় রাজাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি মৌজা হেডম্যানদের স্বার্থ ও মর্যাদা বৃদ্ধি

করে। ১৯০১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে স্থানীয় উপজাতিদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারাই ছিলেন একমাত্র যোগাযোগের সূত্র। তবে অন্যান্য দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হলেও তাদের কর্মের অধিক্ষেত্র হিসেবে বরাবরই প্রধান্য পেতো জুমকর ও ভূমি রাজস্ব –পার্বত্য চট্টগ্রামে 'প্লাউরেন্ট' বলে পরিচিত– আদায়, পরিশোধ ও কমিশন বা লভ্যাংশ প্রাপ্তি। পরবর্তী অংশে এ দুটি রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও তাদের নিযুক্ত স্থানীয় উপজাতীয় এজেন্সির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথমে আলোচনা করা যাক রাষ্ট্র ও পাহাড়িদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জুমকরের ভূমিকা নিয়ে।

৩.৪ জুমকর: *ঔপনিবেশিক তোষণ নীতির হাতিয়ার*

ব্রিটিশদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিগ্রহণের বহু পূর্ব থেকেই পার্বত্য রাজারা তাদের লোকাচার-সম্মত অধিকার প্রয়োগ করে প্রজাদের নিকট থেকে 'ঘরপ্রতি কর' ও নানাবিধ দ্রব্য আদায় করতেন। পাহাড়িদের উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদিত পণ্যের ধরন অনুসারে মুঘল আমল থেকে কার্পাসে সেই 'ঘরপ্রতি কর' আদায় করা হত। ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপে ১৭৮৯ সাল থেকে কার্পাস তুলার বদলে টাকায় রাজস্ব আদায়ের নিয়ম চালু হয়। পার্বত্য রাজারা চট্টগ্রামের কালেক্টরেটের সাথে ১০ বছর মেয়াদে নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমার চুক্তিতে স্ব স্ব মহলের রাজস্ব আদায়ের অবাধ ক্ষমতা ভোগ করতেন। তাঁরা ব্যক্তি, আত্মীয়, গোত্র, মহল ও প্রথানুসারে কম বেশি হারে কর আদায় করতেন। ১৯২৯ সালে চিফদের পেশকরা প্রতিবেদনে তারা তাদের বিবিধ আয় সম্পর্কে লিখেছেন:

> Besides jum tax, the chiefs are entitled by ancient customs to some other forms of tribute which are quite different from revenue or tax, such as first fruit, leg of game, contributions for exceptional social and religious functions, such as marriage, installation of Chief, etc., payment of nazar to the Chief while visiting him etc &., etc.[২৫৩]

এছাড়া রাজা, দেওয়ান ও রোয়াজারা তাদের গোত্রীয় লোকদের কাছ থেকে পরিবার প্রতি বছরে ১৫ দিন *বেগার* বা বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম লাভ করতেন।

১৮৬০ সালে ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শাসনভার নেওয়ার পর পার্বত্য রাজাদের ঘরপ্রতি আদায়কৃত করকে 'ক্যাপিটেশন ট্যাক্স' নাম দেন যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রথম কয়েক বছর যাবৎ এ ক্যাপিটেশন ট্যাক্সই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা থেকে ব্রিটিশদের একমাত্র রাজস্ব আয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তারা এ কর আদায় নিয়ে নানাবিধ অসংগতি লক্ষ্য করেন যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল

---

[২৫৩] *Joint Reply of the three Chiefs to J. P. Mill's Report.* 1929 p. 4.

করের হার। তারা করের হার সুনির্দিষ্ট হারে নির্ধারণের উদযোগ নেন। ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন ১৮৬৭ সালে এ খাজনা আদায়ের প্রথাগত ব্যবস্থা অটুট রেখে প্রত্যেক পরিবারকে কর আদায়ের সর্বনিম্ন ইউনিট ধরে পরিবার প্রতি বাৎসরিক ৪ টাকা ক্যাপিটেশন ট্যাক্স বা জুমকর হিসেবে নির্ধারণ করতে বাংলা সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন।

> It should be clearly laid down that what amount is lawfully due from each hillmen as capitation tax at present the procedure of the Chiefs on this point is extremely arbitrary, in some places 3 rupees a year is taken varying in others upto Rs. 6 a house besides oferings of the first fruits of crops, unpaid labour, etc., all these points should be cleary defined. I consider that Rs. 4 per annum is fair amount to be paid by each man, that is, that the courts should be authorised to decree suits for arrears at that rate.[২৫৪]

তাঁর সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৮৭০ সালে বাংলা সরকার কেবল জুমচাষি পরিবারসমূহের ওপর ক্যাপিটেশন ট্যাক্স ধার্য করার নির্দেশ দেয় এবং গ্রামভিত্তিক হেডম্যান প্রথা চালু ও সংহত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ নির্দেশনানুসারে লুইন 'ক্যাপিটেশন ট্যাক্স' নামটি পরিবর্তন করে 'জুম ট্যাক্স' বা জুমকর নামকরণ করেন।[২৫৫] পার্বত্য চট্টগ্রামের জীবন-জীবিকা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে 'জুমকর' সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যথার্থ বলে বিবেচিত হয়। জুমকর হলো পার্বত্য রাজাদের প্রধান আয়ের উৎস এবং জনগণের চোখে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক এবং ক্রমবর্ধমান অর্থ-বিত্তের মূল চালিকা শক্তি। ব্রিটিশ সরকার ১৮৬০ সাল পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট অংকের থোক পাওনা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু জেলার শাসনভার চিফদের হাত থেকে সরাসরি গ্রহণের পর জুমকরের ওপর সরকার ভাগ বসায়। লুইন ১৮৭১ সালে ঘরপ্রতি প্রস্তাবিত ৪ টাকা জুমকরকে চিফ, দেওয়ান/রোয়াজা ও সরকারের মধ্যে বন্টনের সুপারিশ করেন। চিফ তাঁর পদমর্যাদার জন্য পাবে ১ টাকা, কর আদায়ের পারিশ্রমিক হিসেবে আদায়কারী দেওয়ান বা রোয়াজা পাবেন ১ টাকা এবং অবশিষ্ট ২ টাকা যাবে সরকারের কোষাগারে। ১৮৭৩ সালে ২১ আগস্টের সরকারি আদেশে ৪ টাকা ন্যায্য হার হিসেবে অনুমোদিত হয়। কিন্তু লুইনের প্রস্তাব সংশোধন করে সরকার ১৮৭৪ সালে ২১ জানুয়ারির ১৫৪ নং পত্রে তিন পক্ষের মধ্যে কর পুনর্নির্ধারণ করে দেয়। যেমন রোয়াজা/দেওয়ানরা

---

[২৫৪] *Selections,* 1929, p. 24.

[২৫৫] The term capitation tax is a misnomer derived from Arakan; it is wrong in as far as it leads one to suppose that this is a poll tax levied upon each adult male of the hill population. This is not the case, or rather was not the case, for in certain comparatively recent revisions of settlement, the Government has directed that the basis of settlement should be a poll-tax. On this point I shall speak more fully hereafter: it suffices at present to point out that the old hill mode of raising revenue was by a house-tax varying individually in amount, but levied only from the head of each household or family who cultivated by ''joom'' in the hills. in *Selections,* 1887, p. 15.

পরিবার প্রতি ৪ টাকা আদায় করে ১ টাকা কমিশন রেখে অবশিষ্ট ৩ টাকা স্ব স্ব চিফকে জমা দিবেন। চিফরা ২ টাকা রেখে অবশিষ্ট ১ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিবেন।[২৫৬] সরকার আদায়কৃত জুমকরের শুধুমাত্র শতকরা ২৫ ভাগ সরকারি রাজস্ব হিসেবে দাবি করে। চিফদেরকে শতকরা ৫০ ভাগ দেওয়ার মধ্যেই সরকারের চিফদের প্রতি নীতির স্বরূপ স্পষ্ট হয়। সরকার চেয়েছিলঃ ''In 1871 it was recognised that the Chief must be able to live up to his position as a Chief.''[২৫৭] সরকারের এ নীতির আলোকে পর্যায়ক্রমে তিন সার্কেলে জুমকর বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা করা হল।

চাকমা সার্কেল (২,৪২১ বর্গ মাইল)

আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে চাকমা সার্কেল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সবচেয়ে বৃহত্তম রাজস্ব সার্কেল। ১৭৬১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধান হ্যারি ভেরেলস্ট ঘোষিত চাকমা রাজ্যকে নিয়েই চাকমা সার্কেল গঠন করা হয়।[২৫৮] তবে উত্তর অংশটি কেটে মং সার্কেল নামে আরেকটি সার্কেল বানানো হয়। ১৮৬৯ সালে চাকমা রানি কালিন্দী ও বোমাং রাজা মম প্রুর মধ্যে সম্পাদিত সীমানা চুক্তিকে ভিত্তি ধরেই ব্রিটিশ সরকার এ সার্কেল সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে। ঐ চুক্তি অনুসারে সাঙ্গু নদীর উত্তরে বসবাসকারী জুমিয়াদের রানির অধীনস্ত থাকার নির্দেশ মেনে নিতে হয়। অন্যদিকে সাঙ্গু নদীর দক্ষিণে যে-জুম কৃষকরা ছিল তারা বোমাং রাজাকে কর দেবে– এ সিদ্ধান্ত হয়।[২৫৯] রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় (১৮৭৪-১৮৮৪ খ্রি.) এ সার্কেল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৮৭৪ সালে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সাথে চাকমা মহলের জুমকর বন্দোবস্ত সম্পাদনের সময় সর্বপ্রথম জুমকর বন্টনের নিয়ম কার্যকর হয়। কিন্তু এ বন্দোবস্তের সাথে আরো অন্যান্য বিষয় সম্পৃক্ত ছিল। কালিন্দী রানি ১৮৭২ সালে চাকমা মহলে 'মনুষ্য তালুক প্রথা' চালু করে ১২৫ জন দেওয়ানকে পাট্টা জারি করেন যা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হুবহু নকল। জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন লুইনের পীড়াপীড়িতে এদের মধ্যে ১০৮ জন তালুকদার সরকারি দপ্তরে নাম নথিভুক্ত করেন। তালিকাভুক্ত ১০৮ জনের দাখিলকৃত জুম বন্দোবস্ত দলিলে মোট ৫,৩৭০ ঘর জুমিয়া দেখানো হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কালিন্দী রানি এসকল তালুকদারদের মাধ্যমে তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে শুধু জুমকর আদায় করতেন বছরে ৫,০০০ টাকা। কিন্তু সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন ২,২২৪ টাকা।

---

[২৫৬] *Selections*, ১৮৮৭, পৃ. ৭১; হাটকিনসন, ১৯০৬ঃ পৃ. ৩৩-৩৪।

[২৫৭] *Selections*, 1929, p. 320.

[২৫৮] Mr. Henry Velelst, the first Chief of the Chittagong Council, by a proclamation dated 6th Shravan, 1170 MS(1763) states the local jurisdiction of Raja Shermust Khan to be, `` all the hills from the Pheni river to the Sangu and from Nizampur Road to the hills of the Kuki Raja,'' Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts Dist. Gazetteer*, p. 24.

[২৫৯] *List Correspondence*, p. 64, C. W. Bolton, Letter No. 543P.ÍD, Dated Darjeeling, 7th October 1898.

লুসাই অভিযানে তাঁর সহযোগিতা এবং নদী শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা বন বিভাগের হস্তে অর্পণজনিত ক্ষতিপূরণ দিক বিবেচনা করে সরকার ১৮৭২ থেকে তাঁকে চুক্তিবদ্ধ জুমকর থেকে ১,১৪৩ টাকা মওকুফ করে দেয় তাতে রানিকে পরিশোধ করতে হতো মাত্র ১,০৮১ টাকা। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ও সেই সুবিধা অব্যাহত থাকে।

১৮৮১ সালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হরিশ্চন্দ্রের জুমকর খাতে জমা ঐ বছরের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত ৫,০১১টি জুমিয়া পরিবারের সংখ্যানুপাতে ১০৮১ টাকা থেকে ৫,০৯২ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করে। কিন্তু বাংলা সরকার এ আকস্মিক বৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি। ফলে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত, যখন নতুন বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয়, চাকমা সার্কেল চিফকে পরিশোধ করতে হয় মাত্র ১,০৮১ টাকা। যদিও জুমকর আদায় হতো তার থেকে ৬ গুণ বেশি। ১৮৯৫ সালেই চাকমা সার্কেলের সাথে সর্বপ্রথম তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জুমকর আদায়ের চিত্র পাওয়া যায়:

সারণি- ৩.৪

চাকমা সার্কেল জুম খাজনা বন্দোবস্ত[২৬০]

চাকমা সার্কেলে বাড়ির সংখ্যা (খাসমহল থেকে অন্তর্ভুক্ত বাড়িসহ)	৫,৪৫৮
বর্তমান করমুক্ত বাড়িসমূহ বিয়োগ করে	৯৩৩
মোট বাড়ি	= ৪,৫২৫
চিফ কর্তৃক উত্তোলনযোগ্য খাজনা (বাড়ি প্রতি ৩/- হারে ৪,৫২৫ x ৩)	= ১৩,৫৭৫/-
৫% (-) করে (পরিত্যাগকারী, মৃত্যু, পারিবারিক একত্রীকরণও উত্তোলন খরচ	= ৬৭৮-- ১২
সংগ্রহযোগ্য নীট খাজনা	= ১২,৮৯৬-- ৪--০
চিফের কমিশন (দুই তৃতীয়াংশ) বিয়োগ করে	= ৮,৫৯৭--৮--০
সরকারকে প্রদেয় খাজনার পরিমাণ	= ৪,২৯৮ -- ১২--০
আবার কালিন্দী রানির আমলে প্রদত্ত কর রেয়াত (−) করে	= ১,১৪৩ -- ০ --
পূর্বের জমা ১০৮১/- বিপরীতে সরকারকে প্রদেয় নীট খাজনার পরিমাণ	= ৩,১৫৫--১২-- ০

১৮৭৪ থেকে ১৮৯৫ দীর্ঘ একুশ বছর যাবৎ চাকমা চিফকে তার সংগৃহীত জুম খাজনা থেকে অল্পই পরিশোধ করতে হয়েছে। ১৮৯৫ থেকে চাকমা চিফের বাৎসরিক জুমকর প্রাপ্তি থেকে আয় হয় ৮,৫৯৭ টাকা। এর সাথে মোট সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত কর রেয়াত সুবিধা বাবদ ১,১৪৩ টাকা যোগ করলে দাঁড়ায় ৯,৭৪১ টাকা যা ১০ বৎসরে দাঁড়ায় ৯৭,৪১০/- (সাতানব্বই হাজার চারশত দশ) টাকায়। এ আয় পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো একটা অনগ্রসর জেলায় নিঃসন্দেহে বড় অংকের আয়। এ পরিসংখ্যান তাঁর আয় বৃদ্ধির তথ্য দেয়। ১৮৭২ সাল থেকে চাকমা চিফ বিরতিহীনভাবে যে খাজনা মওকুফ সুবিধা প্রাপ্ত হন সরকারি হিসাব মতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত সেই কর রেয়াত সুবিধার আর্থিক পরিমাণ ৩২ বছরে ৩৬,৫৭৬

[২৬০] পত্র নং ৩১৪ পি., তারিখ কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি 1895, *Selections*, 1929, p. 258.

টাকা।[২৬১] এজন্য সরকারি পত্রে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে 'ধনী লোক' বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২৬২] জুমকর খাতে চিফের আয় হতো সবচেয়ে বেশি। আবার ১৮৭২ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত চাকমা মহলের করযোগ্য জুমিয়া পরিবার সংখ্যাও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ঐ বর্ধিত খাজনা থেকে সরকার কোনো লভ্যাংশ নেয়নি। সুতরাং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সুবিধাগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

মং সার্কেল (৬৫৩ বর্গ মাইল)

চাকমা রাজা ও বোমাং এর তুলনায় মং রাজা ও মং সার্কেলের ইতিহাস সাম্প্রতিককালের। ব্রিটিশরা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় বিশাল চাকমা মহলকে ভেঙ্গে এর উত্তর অংশ নিয়ে 'মং সার্কেল' নামে নতুন সার্কেল সৃষ্টি করে। কারণ মং নামে কোনো উপজাতিও নেই। জে. পি. মিল উল্লেখ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশের ফেনী উপত্যকায় ত্রিপুরাদের সংখ্যাধিক্য থাকায় তাদের নিয়ে পৃথক সার্কেল করার চিন্তা সরকারি মহলে ছিল কিন্তু যাকে সম্ভাব্য সার্কেল চিফ করার কথাবার্তা চলে সেই ত্রিপুরা হেডম্যানের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিকল্পনাটি বাতিল হয়। তাই মং সার্কেল হল একটা ঔপনিবেশিক নির্মিতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলের মধ্যে এটি ক্ষুদ্রতম সার্কেল। ব্রিটিশদের রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ১৮৬০ সালের পূর্বে মং রাজার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ১৮৯৮ সালের ৩১ শে মার্চের ব্রিটিশ নথিপত্র থেকে আরো জানা যায়:

> After the formation of the Hill Tracts in 1860, their northern section was found to be a mere detached portion of Hill Tippera in which there was no head and referee. It was nominally Chakma land, but the Chakma Chieftainess lived too far away to control it. The respectable and substantial inhabitant was Mong Raja Keoja Sain, a Magh who held a zamindari in the adjoining plains, and he was chosen as referee, and for the sake of administrative convenience, was considerably aggrandized by the authorities, and his nickname of Raja made use of till he became the sarbarakar for a considerable portion of the tract. [২৬৩]

একই পত্রে আরো উল্লেখ আছে: 'In the case of our own creation, the Mong Chief, his position and prestige have been enhanced full twenty-fold, and his income full-five-fold.[২৬৪] সুতরাং উপরে উদ্ধৃতাংশ থেকে বুঝতে বাকী থাকে না যে, মং সার্কেল ও মং চিফ কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে

---

[২৬১] *Selections,* 1929, p.319.
[২৬২] *Selections,* 1929, p.130.
[২৬৩] *Selections,* 1929, p. 273-274;. & ''Family History of the Mong Raja,'' *The Calcutta Gazettee,* May 14, 1936.
[২৬৪] *ibid*

আবির্ভাব ঘটল। সরকারি রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র থেকে মং সার্কেলের জুমকর বন্দোবস্তের প্রাক-ইতিহাস সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। সূত্রমতে, ১৮৪৮ সালে পালেংসা গোত্রীয় মারমাদের একটি অংশ নিয়ে মং মহল বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয় বাৎসরিক ১,০২১ টাকায় যেটি সর্বপ্রথম 'মং' নামে রাজস্ব নথিতে নাম জারি হয়। ১৮৫৭ সালে ঐ বন্দোবস্ত ১ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এরপর উক্ত বন্দোবস্তের মেয়াদ পুনরায় ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের জন্য একই জমায় বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৬৯ সালে সেটি পুনরায় ১ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। ঐ সময়ে মং প্রধান ছিলেন কেওজ সাইন।[২৬৫] তিনি ব্রিটিশ শাসনের একদম গোড়াতে (১৮৬৯ খ্রি.) কুকি অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। এতে সরকার বাহাদুর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নামে চট্টগ্রাম কালেক্টরেটের আরো ৯টি মেয়াদ উত্তীর্ণ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত লিখে দেয়। ১৮৭০ সালে কেওজ সাইন মারা গেলে তাঁর মহলের দেখভালের দায়িত্ব নেন তাঁরই জ্যেষ্ঠ ছেলে (লুইনের কাছে লেখাপড়ায় শিক্ষিত করে দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল) নরবদি। ১৮৭১ সালে সব মহল মিলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁর বাৎসরিক জমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,১৮৭ টাকায়। ঐ বছর রানি কালিন্দীর মতো লুসাই অভিযানে ব্রিটিশদের সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে ১৮৭২ সাল থেকে বাৎসরিক প্রদেয় জুমকর থেকে ১৫৩ টাকা কর রেয়াত দেওয়া হয়। ফলে তাঁর জমার অংক হয় ৩,০৩৪ টাকা। নরবদি ১৮৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করলে তার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ছোটভাই কেওজা প্রু। তাঁর সময় জুমকর বন্দোবস্ত বিষয়টি উত্থাপিত হলে ১৮৭৯ সালে সরকারি আদেশে হ্রাসকৃত হারে জমার অংক বহাল রাখা হয়। ১৮৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে তাঁর সার্কেলে অন্তর্ভুক্ত ১,০৫৮ ঘর চাকমার জুমকর মওকুফ করে দিলে তাঁর জমার পরিমাণ আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২,৩১৪ টাকায়।[২৬৬]

১৮৯২ সালে মং সার্কেলের জমা পুনর্বিবেচনা ও পুনর্নির্ধারণের জন্য স্থানীয় সরকার থেকে প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কিছু প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্যের অভাবে বিষয়টি স্থগিত রাখার আদেশ দেয়। ইতিমধ্যে ১৮৮৩ সালে মং রাজা কেওজা প্রু পরলোক গমন করেন। এরপর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মং সার্কেল সরকারি প্রতিপাল্যের (কোর্ট অব ওয়ার্ডস) অধীনে চলে যায় দীর্ঘ ১০ বছরের জন্য (১৮৯৩)। এক কথায়, মং সার্কেলের জুমকর বাবদ জমা ১৮৮১ সাল থেকে ১৯০৫ সালের আগ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং মং চিফও কর রেয়াত সুবিধার পাশাপাশি জুমিয়া সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত লভ্যাংশ ভোগ করেন। সরকারের অনুগ্রহে তাঁর আয় রোজগার, সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

---

[২৬৫] Lettter No. 805G., dated Rangamati, the 26th September 1904, *Selections,* 1929, p. 322.

[২৬৬] পত্র নং ১৯৮৫-৭৯৭ এল আর, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৮১, *Selections,* ১৮৮৭, পৃ. ৭৪

বোমাং সার্কেল (২০৬৪ বর্গ মাইল)

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে কংহ্লা প্রু (১৭৭৪-১৮০১) ছিলেন বান্দরবানের বোমাং রাজ পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠতা। কংহ্লা প্রু ১৭৫৪ সালের দিকে আরাকানে চলে যান আর তথায় প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ১৭৭৪ সালে জ্ঞাতিবর্গসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আশ্রয়ে চলে আসেন। অতপর ১৭৯০ সালের মধ্যে সুয়ালক এলাকায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৯০ সালের কার্পাস মহল বন্দোবস্ত তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী সাতাং প্রুর নামে সম্পাদন করেন। জন ম্যাকরে ১৮০১ সালে কংহ্লা প্রুকে ``a mug chief, commonly known by the name of the Comlaphore Raja, who is settled among the hills in the southern parts of this district.''[২৬৭] বলে বর্ণনা করেছেন। যাহোক অংশত, কোম্পানি প্রবর্তিত নীতির বদৌলতে এবং অংশত তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলি দিয়ে কংহ্লা প্রু বান্দরবানে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেন। হেনরি রিকেটসের প্রত্যক্ষ বিবরণ এমনটিই তুলে ধরে।

> I now proceed with mention of the family and possessions of Kumla Phroo only, which are more immediately concerned in the matter referred to me. The Chieftainship of all the tribes and families between the æKurrumfoolee" or Chittagong river, and the Naaf, is considered to be vested in the family whose residence is ... at æBindabun" in the forest, 32 to miles E.S.E from the town of Chittagong.[২৬৮]

এভাবে পরবর্তীকালে বান্দরবানই হয়ে ওঠে বোমাং রাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার, রাজস্ব ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু। বোমাংদের অবস্থান আরাকানের সীমান্তবর্তী হওয়ায় সেখান থেকে আসা খুমি, বনযোগি ও সেন্দুদের আক্রমণ ঠেকাতে বোমাংদের সহযোগিতা ছিল ব্রিটিশদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণে রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকার বোমাংদের জুমকর সবসময় কম হারে নির্ধারণ করে। অন্য কথায় বোমাংদেরকে হ্রাসকৃত হারে জুমকর ধার্য করার মাধ্যমে ব্রিটিশরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুটো উদ্দেশ্য হাসিল করেছিল। ১৮৪৭ সালের 'রিকেটস সেটেলমেন্ট'[২৬৯] এর মাধ্যমে বোমাং রাজারা ধার্যকৃত মোট জুমকর ৪,৫৬৪ টাকা থেকে ১৬৪৬ টাকা মওকুফ পান। তৎকালীন বিবেচনায় রাজস্বের এ-রেয়াত খুব একটা কম নয়। বাংলার সমতল এলাকায় যেখানে ব্রিটিশরা ভূমি রাজস্ব ক্রমশ বৃদ্ধি করত সেখানে পাহাড়ি রাজাদেরকে কম জমায় বন্দোবস্ত প্রদান করতো। কিন্তু বোমাংরা 'রিকেটস সেটেলমেন্ট' এর শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সরকার ১৮৭৩ সালে জুমকর মওকুফ সুবিধা বাতিল করে দেয়। অর্থাৎ বোমাংদেরকে

---

[২৬৭] John Macrae, ''Account of the Kookies or Luntas" *Asiatic Researches* 7(1801), p. 183-98. cited by Lorenz G Loffler ''A Note of the History of the Marma Chiefs of Banderban" in *Journal of the Asiatic Society of Pakistan* 13.2(1968):189-201.

[২৬৮] Henry Rickets, *Report on Forays.*

পুর্বের ৪,৫৬৪ টাকা জমায় জুমকর দিতে হয়। ১৮৭৫ সালে বোমাং মং প্রু মারা যান এবং তাঁর অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনায় মহলটির দেনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। বোমাং রাজাদের প্রায় দেউলিয়া হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমতাবস্থায় ১৮৭৯ সালে কমিশনার জন বিমস্ বোমাংদের জুমকর ৪,৫৬৪ টাকা থেকে ২,৯১৮ টাকায় কমানোর প্রস্তাব করলে ভারত সরকার তা মঞ্জুর করে।[২৭০] নতুন বোমাং রাজা সাক হ্নাই ঞ্রো (১৮৭৫-১৯০১) দক্ষ পরিচালনায় বোমাং সার্কেলের জুমকর আদায় নিয়মিত হয় এবং রাজ পরিবারের বিবিধ দেনাও পরিশোধ করা সম্ভব হয়। এতে জুমকর পুনর্নির্ধারণের সঠিক সময় বিবেচনা করে ১৮৮১ সালে জেলা প্রশাসক এল. আর. ফোর্বস বোমাংদের জুমকর বাৎসরিক ৪,২৮১ টাকা ধার্য করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু নতুন বোমাং রাজার অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে অন্তরায় সৃষ্টি হবে বিবেচনা করে বাংলা সরকার সে প্রস্তাবে সায় দেয়নি।[২৭১] ফলে ১৮৭৯ সাল থেকে বোমাং রাজার প্রদেয় জুমকর ২,৯১৮ টাকায় রয়ে যায়। ১৯০৫ সালে আগের সেই জমার অংক আর পুনর্নির্ধারণ করা হয়নি। এবং সরকারের উদার সিদ্ধান্তের কারণে বোমাং রাজা বছরের পর বছর হ্রাসকৃত হারে জুমকর পরিশোধ সুবিধা উপভোগ করেন। এ প্রসঙ্গে ১৯০৪ সালে তৎকালীন সুপারিনটেন্ডেন্ট কবডেন-রামসের মন্তব্য দেখা যেতে পারেঃ

> The Bomang for years has been in enjoyment of an assessment exceedingly light and in which Government had every right to participate. He has been drawing *jum tax* for many years from a very large number of families, and Government has not received a pice of its due share in the revenue derived. I can find no reason why the Bohmang should be differently treated from the Chakma and Mong Chiefs.[২৭২]

উপরে যে-চিত্র আমরা দেখলাম তাতে চিফদের প্রতি ব্রিটিশদের ভিন্ন ভাবমূর্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি দৃশ্যমান। দৃষ্টিভঙ্গিটি চিফ থেকে চিফ যেমন পার্থক্য করতো তেমনি সার্বিকভাবে বাংলার সমগ্র প্রদেশ থেকেই ভিন্ন হতো। বাংলার অন্যান্য জেলায় ভূমি রাজস্ব আদায়ের বেলায় যে কড়াকড়ি ব্যবস্থা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের ব্রিটিশ ভূমি ও রাজস্ব নীতি পার্বত্য এলাকায় বিরাজমান। উনিশ শতক পর্যন্ত এক এক সার্কেল চিফের সাথে এক এক মেয়াদে বন্দোবস্ত হয়েছে। কোনো চিফের বন্দোবস্ত বিশ বছর আবার কোনো চিফের বন্দোবস্ত ২৫ বছর যাবৎ একই জমায় অপরিবর্তনীয় ভাবে চলতে থাকে। রাজাদের মনোভাব, সার্কেলের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, সার্কেল চিফদের পারিবারিক সামর্থ্য এবং পূর্বের কুকি লুসাই অঞ্চল

---

[২৭০] পত্র নং ১৩৫৪ ই পি তারিখ ৬ মে ১৮৭৯।

[২৭১] বোমাংদের প্রতি সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ মিলে এ বক্তব্যেঃ The Political Department of this office has been consulted on this matter, and is of opinion that it would be unfair to raise the jumma of the present Bohmang merely on the ground that he had by good management cleared the debts incurred by his predecessor. in *Selections*, 1887, p. 74.

[২৭২] L. F. B Cobden-Ramsay, Letter No. 963G., Dated Rangamati, the 9th November 1904. *Selections*, 1929, p. 329.

ঔপনিবেশিক কব্জায় আনার প্রতি সরকারের প্রাধিকার প্রভৃতি বিবেচনা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হারে জুমকর বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয়েছে। বলা যায় সমগ্র ব্যবস্থাটি একটি প্রস্তুতিকালীন সময় পার করেছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার H. Lusion এর মূল্যায়নটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়।

> The revenue history of the Chittagong Hill Tracts under our administration is recent. It dates practically from 1860, when these tracts were formed into a district separate from the Collectorate of Chittagong. The arrangements with the chiefs have no yet assumed a definite shape. The development of plough cultivation is still in its infancy. And the danger of raids from wild tribes on the eastern frontier has only been entirely removed since 1892. Thus the revenue system is still in a period of transition and consolidation.[২৭৩]

এভাবে অন্তবর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়কালে জুমকর খাতে সরকারের আয় খুব একটা বেশি ছিল না। সরকার ঔপনিবেশিক স্বার্থেই চিফদের ওপর অতিরিক্ত জুমকরের বোঝা চাপিয়ে দেয়নি কেননা চূড়ান্ত বিচারে তা জনগণের ওপরই বর্তাবে। এখানে এটা স্মরণ করা ভাল যে, জুমকর খাত সরকারের রাজস্বের একমাত্র উৎস নয়। তাই এটা মনে করা ঠিক নয় যে সরকার রাজস্ব ঘাটতিতে ছিল। কারণ নদীশুল্ক, বনজ সম্পদ রপ্তানি, পতিত জমি ইজারা ও বিবিধ উৎস থেকে সরকারের আয় বেশ উর্ধ্বমূখী ছিল। যা ঘাটতি হতো সেটা সামরিক কারণে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব-সীমান্ত পাহাড়ায় নিযুক্ত পুলিশ বাহিনীর ব্যয় মিটানোর কারণে। সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের ওপর ১৮৭৬ সালে হান্টার তাঁর পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন যে, নদী শুল্ক বা বন শুল্কের কারণে জেলার রাজস্ব বরং উদ্বৃত্ত থাকত।[২৭৪]

১৮৮১ সালে জুমকর খাত থেকে সমগ্র জেলা থেকে সরকার যে রাজস্ব সংগ্রহ করতো তার একটি পরিসংখ্যান দেখলে বুঝা যায় সরকারের এ খাত থেকে আয় হতো যৎ সামান্য।

---

২৭৩ H. Lusion, Letter No. 37H., dated Camp Rangamati, the 31st January 1905, in *Selections,* 1929, p. 307.

২৭৪ On the 1st April 1871, the collection of river tolls in the Hill Tracts was made over to the Forest Department, and since then (mainly on account of the increased amount derived from these tolls) the revenue of the Hill Tracts has increased three fold; while the total expenditure, including that on the police force, has only increased by one-third, and has decreased by one-eight if the expenditure on the police force is excluded. *A Statitistical Account of Bengal*, Vol. VI, p. 95 The amount realised by Forest Department at its nineteen toll stations in 1874-75, was 11,161-16s-8d., and the expenditure incurred during the year was only 1,439- 19s-10d., giving profit on the years transactions of 9,721-16s-10d.s p. 30) এটা ঠিক আধা-সামরিক বাহিনীর জন্য বিশাল অংকের টাকা সরকারকে খরচ করতে হয়েছিল এবং তা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আসত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তে নিরন্তর উত্তেজনা এবং লুসাই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সামরিক চৌকি স্থাপন করতে হয়। সেসময় কাসালং, রাঙামাটি, কুমিল্লা, মানিকছড়ি, গোলাবাড়ি, সামরিক চৌকিসহ চাকমা ও বোমাং সার্কেলে আরো ১০ টি পোস্ট বসানো হয়। ভক্ষ গাং মে, ১৯৯৬, পৃ. ৭২-৭৩।

সারণি ৩.৫[২৭৫]

সার্কেল	জুমকর জমার পরিমাণ (টাকায়)
১। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সার্কেল ----------------	১০৯৭ টাকা
২। মং রাজার সার্কেল ---------------------	৩০৩৪-১২ টাকা
৩। বোমাং সার্কেল ---------------------	২৯১৮ টাকা
৪। হেড কোয়ার্টার খাসমহল -------	৪৪৮ টাকা
৫। সাঙ্গু খাস মহল --------------	৬৪২ টাকা
৬। স্বতন্ত্র বন্দোবস্তধারী (যারা কোন না কোন চিফের সার্কেলে বাস করে) -------	১০০২ টাকা
মোট ---	৯,১৪১ টাকা --- ১২ আনা

১৮৯৫ সালেও এ খাতে সরকারের প্রাপ্য খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি বরং কিছুটা হ্রাস পেয়েছে সরকারের উদারনীতির কারণে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জুমকর বন্দোবস্ত হালনাগাদ করার প্রস্তাব দিলেও জনসংখ্যা, জুমকরের আওতাভুক্ত পরিবারের সংখ্যা, প্রথানুসারে জুমকর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পরিবার সংখ্যার হিসাব, গ্রোত্র ও এলাকাভিত্তিক জুমকরের হার, চিফদের সাথে দেওয়ান ও রোয়াজাদের সম্পর্কের গভীরতা প্রভৃতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত না হওয়ায় সরকার সেই প্রস্তাব পুনর্বার স্থগিত করে দেয়। ফলে সেবছর জুমকর থেকে সরকারের আয় হয় মাত্র ৮,৩৮৭ টাকা।

১৯০০ সালের রেগুলেশন পরবর্তী জুমকর বন্দোবস্ত ব্যবস্থা

১৯০০ সালের ১ নং রেগুলেশন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন পদ্ধতি একটি সুস্পষ্ট এবং সুসংজ্ঞায়িত ভিত্তি লাভ করে। এ রেগুলেশনের ৪২ বিধিতে প্রত্যেকটা সার্কেলে জুমকর বন্দোবস্তের জন্য জুম রেজিষ্টার বা জুম তৌজি তৈরির নিয়ম চালু হয় যেখানে প্রত্যেকটা মৌজায় জুমিয়ার সংখ্যা এবং জুমকরের হার পৃথক পৃথক ভাবে লিপিবদ্ধ হয়। ঐ বছরের ২১ সেপ্টেম্বর তিন চিফকে জুম তৌজি (জুম বুক) প্রস্তুত করে ডেপুটি কমিশনারের কাছে দাখিল করার আদেশ জারি হয়। চিফরা প্রায় তিন বছর পর স্ব স্ব সার্কেলের জুমবুক প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন করে ১৯০৪ সালের অগাস্টের মধ্যে তা সরকারের কাছে দাখিল করে। জুম বইতে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে জুমকর বন্দোবস্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু নির্ভুল বন্দোবস্ত সম্পাদনের স্বার্থে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিষ্পত্তির প্রয়োজন পড়ে। যেমন- প্রথমত, পাহাড়ি প্রথা অনুসারে শতকরা কত পরিবারকে জুমকরের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হবে।

দ্বিতীয়ত, বিগত বন্দোবস্তে মঞ্জুরিকৃত শতকরা ৫ ভাগ রেয়াত বাতিল বা বহাল রাখা; তৃতীয়ত, চাকমা ও মং সার্কেলে এ যাবৎ প্রদত্ত ‘সদাচরণ ভাতা’ পুনর্বিবেচনা; বোমাংদের জন্য মওকুফ করা ১,৬৪৬ টাকা কর রেয়াত অর্ধেকে কমিয়ে আনা, চতুর্থত, উপরোক্ত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির মাধ্যমে সরকারকে প্রদেয় জমা নির্ধারণ ও বন্দোবস্তের মেয়াদহ্রাস বৃদ্ধি প্রসঙ্গ বিবেচনা।

[২৭৫] পত্র নং ৫৯৫ জি, তারিখ রাঙামাটি ৩ জুন ১৮৮১

১৯০৫ সালের বন্দোবস্তে সরকার উপরের চারটি বিষয় উদারতার সাথে বিবেচনা করে। চাকমা ও মং চিফদের লুসাই অভিযানের যথোপযুক্ত সহায়তার জন্য প্রদত্ত কর রেয়াতকে ‘Good Conduct allowance’ বা ‘সদাচরণ ভাতা’ আখ্যায়িত করে স্থায়ী ভাতা হিসেবে সিদ্ধান্ত প্রদান করে। বোমাংদের রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রদত্ত ১,৬৪৬ টাকা কর রেয়াত ভারত সরকারের পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়। জুমকর কালেকশন চার্জবাবদ রেয়াত মং চিফের জন্য শতকরা ৫ ভাগ করা হয়। কিন্তু বোমাং চিফকে কোনো কালেকশন চার্জজনিত রেয়াত দেওয়া হয়নি। সমুদয় দিক বিবেচনা করে নিম্নোক্ত হারে ১৯০৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৯১৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১০ বছরের জন্য তিন চিফের সাথে জুমকর বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয়।[২৭৬] নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে জুমকরের সার্কেলভিত্তিক জমা।

সারণি-৩.৬

জুম কর থেকে সরকার ও চিফদের আয় বিবরণী[২৭৭]

সার্কেল	সরকারকে প্রদেয় খাজনা (বছর প্রতি)	চিফের প্রাপ্য (বছর প্রতি)
বোমাং সার্কেল	৫,৭৭২ টাকা	১৪,০১৩ টাকা
চাকমা সার্কেল	৪,৫৫৩ টাকা	১২,৫৩৫ টাকা
মং সার্কেল	৩,৪৭৮ টাকা	৭,৪১৭ টাকা
মোট =	১৩,৮০৩ টাকা	

উপরের আয় বিবরণী থেকে এটা স্পষ্ট যে, জুমকর বাবদ সরকারের সমগ্র জেলার আয় থেকে বোমাং চিফের আয় বেশি। এছাড়া ১৯০০ সালের রেগুলেশন এর ৪৭ বিধিতে প্রত্যেক চিফদেরকে খাস মৌজা রাখার সুবিধা দেওয়া হয়। চিফরা উক্ত খাস মৌজা থেকে একজন হেডম্যানের প্রাপ্য কমিশনের সমপরিমাণ জুমকর কমিশন লাভ করতেন। অর্থাৎ ঐসব মৌজার জুমকর থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ আয়ই চিফদের পকেটে চলে যেত। চাকমা চিফ ১,৪৩৭ জুমিয়া পরিবার নিয়ে গঠিত ১৩টি খাস মৌজার হেডম্যান কমিশন পেতেন। মং চিফকেও ১৩ টি খাস মৌজা মঞ্জুর করা হয় যেখানে ১,৪৫৬ জুমিয়া পরিবার বাস করত। এছাড়া বোমাং চিফের অনুমোদিত খাস মৌজা ছিল ৬টি যেগুলোর অধীনে ৫৬৯ জুমিয়া পরিবার কর প্রদান করত। পরবর্তী সময়ে চিফদের খাস মৌজা রাখার অনুমোদন বাতিল করা হয় এবং একইসাথে খাস মৌজা বাতিলজনিত ক্ষতিপূরণও প্রদান করা হয়। চাকমা চিফকে ৫,০০০ টাকা, মং চিফকে ৩,০০০ এবং বোমাং চিফকে ২,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। ব্রিটিশ নীতির একটি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও প্রশংসনীয় নীতি হল সরকারের কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে চিফরা আর্থিকভাবে

[২৭৬] পত্র নং ৩৭ এইচ, তারিখ রাংগামাটি ক্যাম্প ৩১ জানুয়ারি ১৯০৫, *সিলেকশন*, ১৯২৯, পৃ. ৩০৪

[২৭৭] জুমকর থেকে হেডম্যান গণ ১ টাকা হারে কমিশন লাভ করতেন। মৌজায় যত পরিবার জুম করত তাদের থেকে ১ টাকা করে হেডম্যান কমিশন হিসেবে রেখে দিতেন।

ক্ষতির সম্মুখীন হলে সে অনুপাতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তা পুষিয়ে দেওয়া। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি চিফদের অশেষ আনুগত্য পোষণের একটি বড় কারণ চিফদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা ও সংবেদনশীলতা। ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে তারা কোনো সুবিধাই অযাচিতভাবে বা জবরদস্তি করে কেড়ে নেয়নি।

১৯০৫ সালের পর থেকে জুমকর বন্দোবস্ত প্রতি দশ বছর পর পর নিয়মিতভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হয়। তবে বিস্ময়কার ব্যাপার হলো বিগত ৩৫ বছরে করের হার ৪ টাকা থেকে বৃদ্ধি করা হয়নি। এটি জুমিয়া কৃষকদের প্রতি সরকারের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। আরো আশ্চর্যের বিষয় বাংলার এমনকি ভারতের কিছু কিছু জেলায় অতিমাত্রায় কর আরোপের প্রতিবাদে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। করের বোঝা বহন করতে না পেরে অনেক জমিদার ধ্বংসও হয়েছে। ঐসব ক্ষেত্রে উচ্চহারে খাজনা বৃদ্ধি করেছে স্বয়ং সরকারই। কিন্তু এ গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিন্ন চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানে স্বয়ং চিফদের তরফ থেকে সরকারের কাছে জুমকর বাড়ানোর দাবি জানানো হয়। এক্ষেত্রে চাকমা চিফ মূখ্য ভূমিকায় ছিলেন। ১০ বছর পর ১৯১৫ সালে জুমকর বন্দোবস্ত নবায়নের সময় ঘনিয়ে আসলে চিফরা এ-দাবি উত্থাপন করেন। সুপারিনটেন্ডেন্টের নিকট চাকমা চিফ জুমকর বৃদ্ধির জন্য যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেন তা নিন্মরূপ,

> The only one of the Chiefs however who advances any arguments in favour of the rise in the Chakma Raja who points out that, though the outturn is less owing to the poverty of the soil, higher prices are now obtainable for *jhum* products that those which ruled a few years ago. He points out cotton as one instance of this; owing to the war the prices are at present low (about Rs. 4 per maund) but under normal conditions it has been about Rs. 10 to Rs. 11 per maund during the last few years against Rs. 2 to Rs. 3 obtainable several years ago. He adds that even vegetables which were priviously given away are now a source of considerable profit. ... the Chief informs me further that , as there was a suggestion at the time of the last assessment that the rate of the capitation tax would be revised, he has often discussed the matter with his headmen and people, and he assures me that they are prepared for a higher rate and would raise no objection to it. They expect a considerable rise in the rate, and will find the rise of Re. 1 makes no difference whatever in their condition. He is of opinion moreover that if the rate is not raised at this settlement, the people would regard the rate at Re. 1 as a permanent one, and any change in future would meet with the strongest protest and resentement.[২৭৮]

জুমকর বাড়ানোর জন্য উপস্থাপিত যুক্তিগুলি দুর্বল ও খেয়ালি। যেমন চিফের ভাষ্যমতে, ‘জনগণ বাড়তি কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং কোনো আপত্তি করবে না’ বক্তব্যটি ছিল কৃত্রিম ও জনবিদ্বেষী। কারণ

---

[২৭৮] Owen Mawson, Letter no 260 G. dated Chittagong Hill Tracts m 10/11th March 1915 to Commissioner, Ctg. div. *Selections*, 1929, p. 340.

সাধারণ জনগণ কখনো সরকারকে বাড়তি কর দেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে না। আর এখন কর হার না বাড়ালে পরে জনগণ প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হবে- এমন যুক্তিও বোধগম্য নয়। বিগত ৪৫ বছর ধরে ৪ টাকা হার বিদ্যমান ছিল। সুতরাং আর ১০ বছর একই হার থাকলে জনগণের বরং লাভ কেননা তাদেরকে বাড়তি করের বোঝা টানতে হচ্ছে না। এভাবে সহজ সরল জুমিয়াদের ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন লোভনীয় প্রস্তাবে সরকার চুপ থাকেনি। ১৯১৫ সাল থেকে জুমকরের হার ৪ টাকা থেকে ৫ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়[২৭৯] এবং সরকার, চিফ ও হেডম্যানের মধ্যে পূর্বের নিয়মে ভাগাভাগি হয় পক্ষান্তরে জুমিয়া কৃষকরা বহন করতে থাকে বাড়তি করের বোঝা। আর ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ সালে এসে চিফদের আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবে সরকার প্রাপ্য দাঁড়ায় ২৪,৫২১ টাকায়। আর চাকমা, বোমাং ও মং চিফের আয় উন্নীত হয় যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা, ২১,০০০ টাকা ও ৮,০০০ টাকায়। এভাবে বছরের পর বছর জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁদের আয়ও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। ১৯২৫ সালে জুমকর বন্দোবস্তে চাকমা চিফের প্রাপ্য দাঁড়ায় ২৩,০০০ টাকায় যেখানে বোমাং ও মং চিফের পাওনা হয় ২০,০০০ ও ১০,০০০ টাকায়। চিফদের এ আয় ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। ঐ বন্দোবস্তে সরকার খাজনা পায় ২৩,৮২৪ টাকায়। ১৯৫০-৫১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিষয়ক প্রতিবেদনে দেখা যায় বোমাং সার্কেলে উত্তোলনযোগ্য জুমকরের পরিমাণ নির্ধারণ হয় ৬৬,০৯৩ টাকা, চাকমা সার্কেলে ৭৯,৪৩১ টাকা এবং মং সার্কেলে ৬৬,৫৫২ টাকা। এ নির্ধারিত কর থেকে চিফদের সদাচরণ ভাতা, ভূমি রাজস্ব কমিশন বাদ দিয়ে সরকারকে জমা দিতে হতো যথাক্রমে ১১,২৮৯ টাকা, ৯,৭৭৫ টাকা ও মং সার্কেল এ ৬,৭৯৯ টাকা।[২৮০] অবশিষ্ট টাকা পূর্বোক্ত নিয়মে চিফ ও হেডম্যানদের আয় হিসেবে থাকত। জুমকর সংক্রান্ত ব্রিটিশ উদার নীতির সুবাদে গোটা ঔপনিবেশিক শাসনামলে চিফ ও হেডম্যানরা জুমকর থেকে আর্থিক সুবিধা লাভ করেন আর সাধারণ জুমিয়ারা অপেক্ষাকৃত নিম্নহারে জুমকর পরিশোধের সুযোগ ভোগ করেন।

জুমকর থেকে প্রাপ্ত আয় ব্যতীত চিফ এবং হেডম্যানগণ ভূমি রাজস্ব এবং *সায়ের* বা আবওয়াব থেকেও প্রচুর আর্থিক সুবিধা লাভ করতেন। পরের আলোচনা সেটিকে কেন্দ্র করে।

---

[২৭৯] ব্রিটিশ শাসনের পরবর্তী ৩২ বছরে আর জুমকরের হার বৃদ্ধি পায়নি। স্বাধীনতার পর ৫ টাকা থেকে ৬ টাকায় বৃদ্ধি করা হয় এবং উক্ত ৬ টাকা থেকে চিফ এর প্রাপ্য ২.৫০ টাকা, হেডম্যান ২.২৫ টাকা এবং সরকার ১.২৫ টাকা। দ্রষ্টব্য- Md. Ishaq (ed.), *Bangladesh District Gazetteer: Chittagong Hill Tracts*, p.135.

[২৮০] Government of East Pakistan, *Report on the Administration of the Chittagong Hill Tracts for the year 1950-51*(Dacca: East Pakistan Government Press, 1959) p. 4.

৩.৫ ব্রিটিশদের হালচাষ ও ভূমি রাজস্ব প্রবর্তন: চিফদের কমিশন প্রাপ্তি

পার্বত্য চট্টগ্রামে হালচাষের অবস্থা সম্পর্কে ১৯৬০-এর দশকে ডেভিড ই সোফারের একটি মূল্যায়ন দিয়েই শুরু করা যাক।

> A century ago, the distinguishing criterion could be stated simply: hillmen were exclusively swidden cultivators, locally known as *jhumias*. Lewin, writing of conditions in 1860-65, when he became the first Deputy Commissioner of the Hill Tracts, is quite unequivocal in asserting this. Since then, plow agriculture has been taken up by large numbers of hillmen, and the criterion has lost its validity, since hillmen may now be swidden cultivators or plow farmers. In the Hill Tracts, it should be noted, the plow is used chiefly, but not exclusively, in wet-rice cultivation.[২৮১]

সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক জীবনে ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রবর্তিত হালচাষ পদ্ধতির উৎপাদন ব্যবস্থা। হালচাষ প্রবর্তন শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে দেখা দেয়। সর্বোপরি ব্রিটিশদের বহির্ভূতকরণ শাসন অব্যাহত রাখতেও এটির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন সরাসরি হস্তগত করার পর ব্রিটিশ সরকার রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। বাংলার সমতল জেলাসমূহে থেকে সরকারের আয়ের প্রধানতম উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। পার্বত্য জেলায়ও তারা ভূমি রাজস্বকে প্রধান উৎসে পরিণত করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয়।

> The jum tax should not be regarded as a possible source of profit to us, but, on the contrary, should be regarded as an illegitimate and injurious source of revenue, which by every means in our power we should endeavour to eliminate from our revenue-roll. Our object should be to put a stop to joom culture and induce the people to settle and cultivate by the plough, making land revenue the basis of our district settlements.[২৮২]

---

[২৮১] David E. Sopher, ''The Swidden/wet-rice Transition Zone in the Chittagong Hills'' in *Annals of the Association of American Geographers,* 54. 1 (1964):107-126.

[২৮২] Letter no 532, dated Rangamattie, 1st July 1872 Captain T. H. Lewin, Deputy Commissioner, Chittagong Hill Tracts, To The Commissioner of Chittagong in *Selections,* 1887, p. 17.

জেলায় হালচাষ প্রবর্তনের এটি ছিল অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তবে একমাত্র নয়। সরকার এর বহুমাত্রিক উপযোগিতা খুঁজে বের করে। প্রথমত, পার্বত্যবাসীদের অগ্রসর সভ্যতার আলোয় নিয়ে আসা ও স্থায়ীভাবে বসবাসে উদ্বুদ্ধ করা। জুমভূমির ঘাটতিজনিত অসুবিধা বা সংকট দূর করা। হালচাষ দ্বারা অভিবাসনকারীদের দ্বারা শোষিত হওয়ার ভয় দূরীভুত করা। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চল পরিষ্কার হবে ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কাছে উন্মুক্ত হবে। তৃতীয়ত, সরকার এমন এক জনবসতি পাবে, যারা পূর্বাঞ্চলের বন্য উপজাতিদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করবে। চতুর্থত, আগামী দশ বা পনেরো বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র এখান থেকে যথেষ্ট রাজস্ব আদায় করতে পারবে। পঞ্চমত, জঙ্গল পরিষ্কারের ফলে এই জেলা স্বাস্থ্যকর হবে।[২৮৩]

এটা ঠিক ধীর গতিতে হলেও ১৮৬৮ সাল থেকে ব্রিটিশদের উদ্যোগে পার্বত্য জেলায় লাঙ্গল চাষ চালু হতে থাকলে জেলার পাহাড়িদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন সুচিত হয়। পাহাড়িরা জুমচাষের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কিন্তু তাতে একেক সময় একেক জায়গায় গিয়ে অবস্থান ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বসতি পরিবর্তন করতে হতো ফলে সমতলের মতো স্থায়ী সমাজজীবন এখানে গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশরা অস্থায়ী ও সতত সঞ্চরণশীল পাহাড়িদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাসে অভ্যস্তকরণ, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, বনজ সম্পদ রক্ষা ও পার্বত্য অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন সুসংহত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পার্বত্য জেলার নদী উপত্যকা সংলগ্ন সমতল জলা-জঙ্গলা ভূমিতে পাহাড়ি জুমিয়াদের হালচাষে প্রবৃত্ত করার জন্য তারা সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকার হালচাষ প্রবর্তনকে আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ ও পরিচালনা করেছিল।[২৮৪]

সরকার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৮৬৮ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত পাহাড়িদের হালচাষে প্রবৃত্ত করার জন্য সমন্বিতভাবে জোর প্রচেষ্টা চালায়। যেমন পাহাড়িরা যাতে হালচাষের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও হালের বলদ ক্রয় করতে পারে সেজন্য স্থানীয় প্রশাসন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ১৮৬৯ সালে ৩৮,১০০ টাকা মঞ্জুর করে। ঐ অর্থ হালচাষে আগ্রহীদের মধ্যে অগ্রিম বিতরণ করা হয়। বাংলা সরকারও উদ্যোগটিকে 'ভাল প্রয়াস' বলে মত দেয় এবং আশা প্রকাশ করে উদ্যোগটি সফল হলে সমগ্র জেলার সম্পূর্ণ উৎপাদন পদ্ধতিই অবশ্যম্ভাবীরূপে বদলে দেবে এবং বদলে যাবে পাহাড়িদের জীবনযাত্রা প্রণালী। কিন্তু হালচাষ প্রবতর্নের গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল হালকৃষির মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে পাহাড়িদের নৈকট্য বৃদ্ধি এবং চিফদের ক্ষমতা ও প্রভাব খর্ব করে ব্রিটিশদের প্রভুত্ব বিস্তার করা।

---

[২৮৩] গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, ল্যান্ড রেভিনিউ ব্রাঞ্চ, প্রসিডিং ৫৪ (মে, ১৮৭২) এ ডব্লিউ কক্রেল লিখিত পত্র উদ্ধৃত- ভেলাম ভান সেন্দেল, ''জুম্মদের আবিষ্করণ; দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংগঠন ও জাতিগোষ্ঠীর রূপায়নের আলেখ্য'' *বাংলার বহুজাতি*, পৃ. ১৪০।

[২৮৪] W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, p. 78.

> The original object of the plough cultivation scheme was to wean the hill men from their migratory habits (which are a necessary consequence of their peculiar method of cultivation by jooming) and to settle them down in fixed habitations. Another object was to open out a refuge for those who had reason to be discontented with the treatment they recieved at the hands of their headmen, such persons having the choice of continuing the old system of jooming, and migrating to the Government khas mehal, or of setting up as Government ryots and cultivating with the plough. It was hoped that by these means not only would the condition of the hill men themselves be vastly improved, but the country would become settled, its resources increased, and an ever-expanding land revenue derived therefrom, in place of the present inelastic family tax, which, from the very nature of it, is incapable of expansion beyond minute limits.[২৮৫]

কিন্তু পাহাড়িদের অনুসৃত জুমচাষ আর সরকারের গৃহীত হালচাষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে যোজন যোজন ব্যবধান। সুতরাং উৎপাদন পদ্ধতি প্রতিস্থাপনের জন্য দরকার পড়ে সমন্বিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং পাহাড়িদের নিকট এই উৎপাদন পদ্ধতির সুবিধা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। সর্বোপরি দরকার মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ও সামাজিক আন্দোলন। তবে এ স্থানে এটিও মনে রাখা উচিত জুমচাষ ও হালচাষ পরস্পর বিরোধী নয়।

জুমিয়াদেরকে জুমচাষ থেকে নিবৃত্ত করে হালচাষে আকৃষ্ট করার প্রথম কৌশল ছিল হালচাষ গ্রহণে আগ্রহীদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান এবং দ্বিতীয় কৌশল ছিল বন সংরক্ষণের মাধ্যমে জুমভূমির ক্ষেত্র গণ্ডিবদ্ধ ও সংকুচিত করে দেওয়া। সর্বশেষ কৌশল হল নামমাত্র হারে খাজনা ধার্যকরণ। মজার ব্যাপার হলো জুমচাষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চিন্তাও আসে লুইনের মাথা থেকে: "I trust this will be a large additional source of income to us, and it is more especially valuable as an administrative measure, encouraging settled cultivation, the acquisition of property, and amenability to law. One fault, however, we have thrown no obstacles in the way of joom cultivation, either directly or indirectly."[২৮৬] এ প্রতিবন্ধকতা হলো বন সংরক্ষণ ঘোষণা করে সেখানে জুমচাষ নিষিদ্ধ করে দেওয়া। ১৮৭১-৭২ সালের বার্ষিক রিপোর্টে লুইন জানাচ্ছেন: "The Plough-cultivation movement now going on arose ... 'in consequence of the introduction of the Forest Conservancy rules into the District, by which juming operations were hampered and circumscribed.[২৮৭] সরকার হালচাষ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্যাকেজ কর্মসূচি ঘোষণা করে।

---

[২৮৫] *Selections*, 1887, p. 95.

[২৮৬] *Selections*, 1887, p. 19.

[২৮৭] *Annual Report of Deputy Commissioner* for 1871-72. Cited in Hunter's *A Statistical*

সরকার হালচাষে আগ্রহী প্রতি জুমিয়া পরিবারকে ৩০ টাকা করে বার্ষিক ৫% হার সুদে ৫ বছরের জন্য অগ্রিম ঋণ প্রদান করে এবং হালচাষে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে দরখাস্তকারীকে 'সরকারি প্রজা' বা 'গভর্নমেন্ট রায়ত' ঘোষণা দেয়। সরকারি প্রজা হওয়ার সুবাদে হালচাষিরা স্ব স্ব চিফ ও দেওয়ান তালুকদারকে প্রদেয় জুমকর থেকে অব্যাহতি পাবে। হালচাষ গ্রহীতাদের মধ্য থেকে একজন তালুকদার বা হেডম্যান নির্বাচিত হবে। প্রথম পাঁচ বছর কোনো খাজনা দিতে হবে না। এবং এরপর ধার্যকৃত খাজনা খাসমহলের তালুকদার সরাসরি ডেপুটি কমিশনারকে জমা করবে।

ঔপনিবেশিক শাসকদের ঘোষিত হালচাষ কর্মসূচি একটি যুগান্তকারী ও সভ্যতা-দিশারী উদ্যোগ। কিন্তু হালচাষ প্রবর্তনের লক্ষে ঘোষিত উপর্যুক্ত শর্তাবলি দেখে যে কারো মনে হবে যে, সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও উদ্দেশ্য হাসিলের পথটি বড্ড একতরফা। কেউ হালচাষ গ্রহণ করলে তাকে তার গোত্রীয় চিফ ও দেওয়ান তথা সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে একদম সরকারি খাস মহলে বাস করতে হবে এবং জুমকর থেকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া হবে এমন শর্ত আরোপ করায়– প্রতীয়মান হয় যে এতে চিফদের পাশ কাটানোর ফন্দি আছে। তাছাড়া জুমকরের ক্ষেত্রে সরকার যেভাবে পার্বত্য চিফদের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে শাসননীতি গ্রহণ করেছিল হালচাষের ক্ষেত্রে মনে হয় চিফদেরকে পাশ কাটিয়ে তারা সফলতার চমৎকারিত্ব জাহির করতে উৎসুক ছিল। তথাপি ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে চাকমাদের মধ্যে মাত্র ৭-৫১ জন জুমিয়া হালচাষের ইজারা গ্রহণ করে আর মারমাদের মধ্য থেকে ৬ টি ইজারার অধীনে ৪৮ জন চাষি চুক্তিবদ্ধ হয়। এদের মধ্যে মং রাজা নরবদিও ছিলেন।

প্রত্যেকটা সংস্কার কাজেই রক্ষণশীল বিরোধিপক্ষ থাকে। এছাড়া থাকে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বাধা। পার্বত্য চট্টগ্রামে হালচাষ প্রক্রিয়া প্রচলন করতেও ব্রিটিশদেরকে নানা বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়। এক্ষেত্রে প্রধান বাধা আসে চাকমা রাজা ও তাঁর দেওয়ানদের পক্ষ থেকে। তাদের প্রধান আপত্তির কারণ এই যে, হালচাষিরা জুমকর থেকে রেহাই পেলে চিফ ও দেওয়ানদের আয় কমে যাবে। তাছাড়া হালচাষিরা সরকারি খাস মহলে ডেপুটি কমিশনারের অধীনে বসবাস করলে তাদের প্রতি আনুগত্য হারিয়ে ফেলবে। উপজাতীয় গোত্রব্যবস্থায় চির ধরবে এবং চিফদের আর্থিক প্রভাবের সাথে সাথে সামাজিক নেতৃত্বের বা শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্নটুকুও মুছে যাবে। এসব হালচাষী হালচাষ শুরু করতে না করতেই চিফ ও দেওয়ানরা এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। ফলে একদম শুরু থেকেই এ উদ্‌যোগ চিফদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। হান্টার জানাচ্ছেন:

> The Chiefs and headmen energetically opposed the change at the first attempt to introduce it, and some of them even applied for leases of large tracts of land with

---

Account, p. 78.

> no other object than to prevent any other hillmen obtaining the lands. All the immediate pecuniary interests of the chiefs and headmen are opposed to the introduction of plough cultivation: every man who ceases to jum, and settles as a permanent cultivator, is released from paying capitation tax to the chiefs, and deprives him of a subject.[২৮৮]

এতে চিফ ও দেওয়ানরা হালচাষ থেকে ইজারা গ্রহীতাদের বিরত রাখার জন্য নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন করে। এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, মাত্র ৫০ বছর আগেই যে চাকমা চিফ রাঙামাটি বিলে নোয়াবাদ বন্দোবস্ত নিয়ে হালচাষ শুরুর উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁর উত্তরসুরীরা শুধু স্বার্থের বশবর্তী হয়ে স্বজাতির লোকদের হালচাষ গ্রহণে বাধা প্রদান করছে। দেওয়ানদের এমন আচরণের হেতু প্রসঙ্গে লুইনের মন্তব্যঃ

> The Dewans and headmen wish to keep their people in their present position, because they thus gain more and have a greater control over them, while, on the otherhand, there is springing up a strong feeling among the Chakmas that their own interest is preferable to, and to be sought before, that of the dewans.[২৮৯]

চাকমা চিফ ও দেওয়ানদের চরম বিরোধিতা দেখে মনে হয় এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ, সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদা রক্ষার ইস্যুতে রূপ নিয়েছিল। হালচাষ সম্বন্ধে চাকমা রাজাদের অতীত ইতিহাস দেখলে তাদের বর্তমান হালচাষ বিরোধী অবস্থান মেলানো কঠিন। তাদের এ বিরোধিতার উদ্দেশ্য যতটা না আর্থিক তার চেয়ে ঢেড় বেশি আত্মসম্মান ও মর্যাদা রক্ষার। ফলে তারা তাদের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ১৮৭৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এক সরকারি পত্রে ডেপুটি কমিশনার চাকমা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরোধিতা প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করেন :

> Now the mere fact of giving the Chakmas a place of refuge, and protection therein, strikes a death-blow at the position of absolute authority which Hurish Chunder has set up, while the secession of each family that moves into the Government Khas mehal or plough cultivation grants diminishes *pro tanto* the revenue payable to him ... Hurish Chunder thus finds his power and his revenue slipping from him, so he and the dewan under him, who are equally interested in the question with himself, have determind to leave nothing undone to retard the movement, and if possible, regain the ground they have lost ... The mode of operations persued by Hurish Chunder and his dewans is shortly this. Holding as they do, enormous influence over the Chakmahs, they alternately threaten and bribe the men who have entered into engagements to plough, threatening them with all sorts of pains and penalties if they do not break their contracts, and bribing them with promises of paying all damages that may be decreed.[২৯০]

---

[২৮৮] W W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* vol. VI, p. 92.
[২৮৯] *Selections,* 1887, p. 19.
[২৯০] *Selections,* 1887, p. 95.

হালচাষ প্রবর্তনের সূচনাতে উপর্যুক্ত বাধা-বিপত্তি ছাড়াও প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বাধাও ছিল ভয়াবহ। যেমন হালচাষীদের ঋণের টাকায় কেনা বলদ জোড়াগুলো এক থাবায় খেয়ে ফেলত ক্ষুধার্ত ব্যগ্র ও অন্যান্য ভয়ংকর মাংসাশি জন্তুগুলো। আর কষ্টে সৃষ্টে ফলানো ফসলে ভাগ বসাতো বন্য পশুপক্ষীকুল। অধিকন্তু জঙ্গলগুলো এত নিবিড় ও গহীন ছিল যে, একটি পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য পর্যাপ্ত জমি আয়ত্বে আনা সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্ভব হতো না। ফলে তাদেরকে উচ্চ মজুরি দিয়ে বাঙালি শ্রমিক নিয়োগ করতে হতো। এমতাবস্থায় স্বজাতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রবল চাপের মুখে চুক্তিবদ্ধ অনেক জুমিয়া চুক্তি বাতিল করে পূর্বের জুমিয়া জীবনে ফিরে যেতে আবেদন দাখিল করে সরকারের কাছে। এছাড়া জুমচাষের প্রতি তাদের অতীত অন্ধ সংস্কারপ্রিয়তা তাদেরকে নতুন কঠিন শ্রমসাধ্য চাষপদ্ধতির সাথে খাপ খেয়ে নিতে রীতিমত মানসিকভাবে চিন্তাগ্রস্ত করে। এমন প্রতিকূল মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে তাদের সকল দেনা শোধ করে দেওয়ার দেওয়ানদের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে হালচাষ ছেড়ে দিতে প্রলুদ্ধ করে। বহু আকাঙ্ক্ষিত হালচাষ প্রকল্পের এমন মুমূর্ষু অবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে কমিশনার ককরেলের মন্তব্যে: ''The sheme is now in a most precarious condition, and requires most delicate management to prevent a complete collapse.''[২৯১] তিনি এহেন করুণ অবস্থা থেকে সরকারকে নমনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে লিখেন:

> I do not see how we can hope for any thing but the most strenuous opposition to the extension of plough cultivation from every hill chief, when the direct result of each new engagement made for its extension is an immediate loss to the chief, not only of the revenue derived from the capitation tax, which he is only allowed to collect from joomeahs, but also of the power and influence which the transfer of every family to the Government Grants undoubtedly diminishes. ... I am of opinion, try and devise some sheme for its extension, which is not so entirely antagonistic to the interest of the chiefs. Either inducement must be held out which may incline them to introduce it themselves, or adequate compensation must be paid them by Government. ... our plough cultivation tracts should remain as models, which may be gradually followed by some of the more advanced chieftains, who may, it is to be hoped, be not unwilling to adopt improved methods of agriculture, provided they themselves reap the advantages to be derived from doing so.[২৯২]

কিন্তু কট্টরপন্থী লে. গভর্নর রিচার্ড টেম্পলের আমলে সরকার কঠোর অবস্থান থেকে সরে আসেনি। ফলে হালচাষ নিয়ে সরকার ও চিফ-দেওয়ানরা বিপরীত শিবিরে অবস্থান নেয়। ১৮৭৫ সালে সরকার চিফদের

---

[২৯১] *Seletions*, 1887, p. 97.
[২৯২] *Selection*, 1887, p. 99.

বিষয়টাকে আমলে না নিয়ে হালচাষের পূর্বতন শর্তগুলি[২৯৩] শিথিল করে জুমিয়াদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালায়। এতেও অচলবস্থা কাটেনি। এ অচলাবস্থা নিরসন কল্পে সরকার ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন এ. ই. গর্ডনকে আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে তাঁর সুচিন্তিত, বাস্তবভিত্তিক ও নিষ্পত্তিমূলক মন্তব্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়। ক্যাপ্টেন গর্ডন তাঁর প্রতিবেদনে লিখেন:

> The Government administrative machinery is not, at present, strong enough to admit of the chiefs being set aside. ... The former plan of enticing the hill men to take to the plough, and of giving the chief no compensation, was a most unfair one, being based upon the unsound assumption that every man who took to the plough did so because of the oppressions of his chief. ... The chiefs openly, and I think with good reason, opposed the measure; and to this fact may be chiefly attributed the great failure which attended the experiment as hitherto tried.[২৯৪]

ইতিপূর্বে কমিশনার এইচ. এ. ককরেলও হালচাষ আন্দোলনে চিফদেরকে সম্মানজনক ভাবে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতামত উপেক্ষিত হয় এবং উল্টো সরকারের তরফ থেকে জেলা প্রশাসককে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে রাজা হরিশচন্দ্রকে আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। অন্য কথায় হালচাষের পাট্টার আবেদন, আবাদি জমির পরিমাণ ও ভূমি রাজস্ব কোনটাই বৃদ্ধি পায়নি। সত্যি বলতে কি ১৮৭৫ সালে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র কয়েকশ টাকা। হান্টার জানাচ্ছেন:

> Upto present date (June 1875) only twenty six settlements have been made for the purpose of plough cultivation; these have been made with headmen and others on behalf of 460 families of cultivators; the total amount of land leased is 4,250 acres, and the advances given for the purchase of cattle and agricultural implements amount to 3,274 pound. Of the twenty six settlements that have been made, twenty-five were granted in 1872, and one in 1873. Since then there has

---

[২৯৩] শর্তগুলি হল: ১) কোনো পাহাড়ি পরিবারকে ৮ পাউন্ড বা ৮০ টাকার বেশি অর্থ অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হবে না; ২) পাঁচ বছরের মধ্যে অগ্রিম টাকার সুদছাড়া শোধ করতে হবে; ৩) এক সময়ে একটির বেশি ফসল চাষ করা চলবে না; ৪) পরিবার প্রতি ১০ একরের বেশি জমি দেওয়া হবে না; ৫) প্রথম ৫ বৎসর কোন খাজনা দিতে হবে না; ষষ্ঠ ও সপ্তম বৎসরে প্রতি একরে সোয়া ২ পেনি; অষ্টম ও নবম বছরে সাড়ে ৪ পেনি; দশম ও একাদশ বৎসরে পৌনে ৭ পেনি; পরবর্তী ১৯ বৎসর ৯ পেনি করে খাজনা দিতে হবে; ৬) সকল হালচাষি তাদের স্ব স্ব চিফদেরকে মাথা পিছু কর থেকে অব্যাহতি পাবে। প্রতি পরিবার অন্ততপক্ষে ১ একরের দুই-তৃতীয়াংশ জমি প্রথম বৎসর এবং তারপর থেকে আরও দুই-তৃতীয়াংশের বেশি করে প্রত্যেক বছর চাষের অধীনে আনবে। যতদিন না প্রদত্ত পুরো জমি চাষের আওতায় আসে, ততদিন এভাবে চলবে; ৮) পাট্টা বা ইজারার মেয়াদ হবে ৩০ বছর এবং ৯) কেবল প্রথম বছর পাট্টাধারী কৃষকরা তাদের আশপাশের পর্বতে জুমচাষ করতে পারবে। দ্রষ্টব্য-W W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, P. 79.

[২৯৪] *Note by* Captain A. E. Gordon, *in reply to a demi-official from* Mr. A. Mackenzie, regarding the division of the Chittagong Hill Tracts into Revenue Circles in *Selections*, 1887, P. 54.

been a great falling–off in the plough cultivation movement and many even of those who have recieved advances wish to give up the plough and live again by *juming*.[২৯৫]

যাহোক ক্যাপ্টেন গর্ডনের দূরদর্শী মন্তব্যে সরকার পরিস্থিতির বিরূপতা উপলব্ধি করে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হয় হালচাষ আন্দোলন পরিত্যাগ করতে হবে নতুবা চিফদের আস্থায় আনতে হবে। স্মরণ করা দরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ নৃ-গোষ্ঠী হল চাকমা যারা জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৪.৫৬ ভাগ। আর তাদের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামের ঔপনিবেশিক হেডকোয়ার্টার রাঙামাটিতে। সুতরাং চাকমা চিফ ও তাদের দেওয়ানদের বিরোধিতা আমলে না নিয়ে হালচাষে সফলতা লাভ করা অলীক স্বপ্ন মাত্র। অন্যদিকে সরকার এ যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাৎসরিক মোট রাজস্ব আয় থেকে অধিক অর্থ ৩৮,১০০ টাকা কৃষকদের ঋণ বাবদ বিনিয়োগ করেছে। সুতরাং মাঝপথে ফিরে আসা মানে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি। অবশেষে সরকার সমঝোতার পথ বেছে নেয়। অতপর ১৮৭৮ সালে লে. গভর্নর এশলি ইডেন হালচাষ ব্যবস্থায় চিফদের সম্পৃক্ত করার সবরকম উদ্যোগ গ্রহণের জন্য স্থানীয় শাসকদের আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়ঃ

Recognising the fact that localisation of the tribes will in course of time reduce the area of fresh joom lands withing each circle, the Lieutenant Governor would wish to do all that is possible to encourage the development of plough cultivation, and he thinks that this can only be by making it for the pecuniary interest of the chiefs to induce their joomeahs to settle down this. The chiefs must in short have a fair share of the rent from plough cultivators which, under present arrangements, goes entirely to Government. It will not be necessary to admit the chiefs to any right or share in the soil; but they may be put in the position of a superior class of tehsildar, and their allowances in that capacity should be so adjusted as to give them more profit for each family taking to the plough than they would get from the same family cultivating as joomeahs. The local officers should consider how to effect this. The details, when settled and approved by Government, should be fully explained to the chiefs, who should be encouraged to take settlements themselves on favourable terms, and to get their joomeahs to settle in the way proposed.[২৯৬]

উপরে উদ্ধৃত আদেশে সরকারের নমনীয় অবস্থান দৃশ্যমান। আরো একটি বিষয় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ যে, সরকার চিফদেরকে হালচাষের ক্ষেত্রেও কেবল উচ্চ শ্রেণির তহসিলদার হিসেবে দেখতে চায় ভূমির মালিক হিসেবে নয়। তবে সরকার হালচাষ থেকে চিফদের আর্থিক মুনাফার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছে যে, চিফরা একজন জুমিয়া পরিবার থেকে যে-কর (প্রতি পরিবার ২ টাকা) লাভ করে প্রতি হালচাষি থেকে তার থেকে যেন বেশি মুনাফা পায় সে-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের এ আদেশের প্রেক্ষিতে ১৮৭৯

[২৯৫] W W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, P. 79-80.

[২৯৬] Letter No. 1581, dated Darjeeling, the 24th July 1878, *Selections* 1887, p. 54.

সালে কমিশনার জন বিমস্ 'Rules for the Territorial Circles in the Chittagong Hill Tracts' শিরোনামে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করেন। ঐ বিধিমালার ১২, ১৩ ও ১৪ নং বিধি সংযুক্তির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে কমিশনার বলেন, 'বিধিগুলোর আর্থিক দিক বিশেষত: চিফদের আর্থিক সুবিধার বিষয়টার সাথে সংশ্লিষ্ট। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের লক্ষ্য হল হালচাষ ব্যবস্থা বাস্ত-বায়নে চিফদের জন্য কিছু আর্থিক সুবিধা সৃষ্টি করা। ... এবং একদিকে রায়তদেরকে বিনা খাজনায় তিন বছর জুমচাষ করার অনুমতি দিয়ে যে-সময়কালে সে সম্ভবত হালচাষের জমির জন্য কোনো কিছুই পরিশোধ করবে না, আমরা চিফদের কাছ থেকে সেই মেয়াদের সব খাজনা নিয়ে নিচ্ছি। তাই তাদের এইসব ক্ষতি যাতে পুষিয়ে নেয়, তাদের সেই পরিমাণ খাজনা মওকুফ করা আমাদের অবশ্যই উচিত হবে বলে মনে হয়।'[২৯৭]

এতে চিফদের আন্দোলন প্রশমিত হয় বটে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো গহীন জঙ্গলা ভূমি মাত্র দুই বছরের মধ্যে আবাদ উপযোগী করা চাট্টিখানি কথা নয়। বন্যজন্তুর আক্রমণমুক্ত এবং সেচ সুবিধাযুক্ত সহজ আবাদী জমি পাওয়া ছিল খুব দুষ্কর। আবার এজন্য প্রচুর পুঁজি প্রয়োজন। কেননা হালচাষ পদ্ধতি পাহাড়ি জুমিয়াদের কাছে একটি নতুন পদ্ধতি হওয়ায় এটি সঠিকভাবে রপ্ত করতেও সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়া পাশ্ববর্তী জেলা থেকে বাঙালি *হাল্যা* চাষি এনে এই উন্নত প্রযুক্তি শিখতে হয় এবং তাদেরকে পুরো মৌসুম মজুরী দিয়ে রাখতে হয় হালচাষ পদ্ধতির প্রত্যেকটা ধাপ আয়ত্বে আনার জন্য। জন বিমস তাঁর *Memoirs of a Bengal Civilian*, গ্রন্থে বাঙালি হালচাষিদের দ্বারা মঘ (মারমাদের) হালচাষ শেখানোর মজাদার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন:

> We represented to the Government that ploughing, like all other arts, requires to be learnt, so we give permission to engage a few Bengalis to teach the Mughs. When I visiting the spot with Gordon, we found the Bengalis laboriously ploughing and sowing in the swampy land, and the Mughs, whom they were supposed to be teaching, sitting happily on a rising ground with their backs to the teaching Bengalis, smoking and joking together! ... so long as I was in the Chittagong Division, it got no further than Bengalis ploughing and Mughs looking on and cracking jokes.[২৯৮]

জন বিমস জলা-ভূমিতে পরিশ্রমি বাঙালি চাষিদের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। বাঙালি চাষিরা যে পরিশ্রমি এবং হালচাষ প্রযুক্তিতে দক্ষ এ রকম চিত্র আসামেও দেখা গেছে।[২৯৯]

---

[২৯৭] পত্র নং ২১ এইচ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯; জন বিমস্ প্রাপক সচিব, রাজস্ব বিভাগ, গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল।

[২৯৮] ''Visit of a Commissioner to Chittagong Hill Tracts in 1878.''-- John Beams, নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পা.) *পার্বত্য চট্টগ্রাম : বন-পাহাড়ের সাত সতের* (ঢাকা: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১৪) পৃ. 161-165.

[২৯৯] পতিত ও বনভূমি আবাদ করে ময়মনসিংহ ও গোয়ালাপাড়ার চাষিরা আসামকে খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল।

হালচাষে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় ১৮৮৪ সালে ইজারার শর্তাবলীতে কিছু সংশোধনী এনে সহজতর করা হয়। নুতন নিয়ম অনুসারে খাজনার হার ও নিষ্করের সময়কালে পরিবর্তন আনা হয়। যেমন- ১। প্রথম পাঁচ বছর খাজনা মুক্ত; ২) পরবর্তী পাঁচ বছর একর প্রতি ৪ আনা; ৩) এর পরবর্তী দশ বছর একর প্রতি ৮ আনা এবং সর্বশেষ দশ বছর একর প্রতি ১/- টাকা করে খাজনা দিতে হবে। আর খাজনা পরিশোধের জন্য চার কিস্তি নির্দিষ্ট করা হয়। যথা- প্রথম কিস্তি ১৫ জুন, দ্বিতীয়টি ১৫ সেপ্টেম্বর, তৃতীয়টি ১৫ ডিসেম্বর এবং শেষ কিস্তি ১৫ মার্চ। এ প্রথম ত্রিশ বছর শেষ হলে আবার পরবর্তী ত্রিশ বছরের জন্য ইজারা নবায়ন করা যাবে। ইজারাপ্রাপ্ত জমি উত্তরাধিকারযোগ্য এবং হস্তান্তর করা যাবে তবে তা ইজারায় বর্ণিত সম্পূর্ণ অংশ, কোনো খণ্ডিতাংশ নয়।[৩০০]

এরপর উক্ত শর্তাধীনে প্রভাবশালী চাকমা দেওয়ান বৃহৎ পরিমাণ জমি হালচাষের জন্য ইজারা গ্রহণ করে। ১৮৯১ সালের ১৯ আগস্ট এর ১১৩৬ এইচ টি/ছয় পত্র থেকে জানা যায় ত্রিলোচন দেওয়ান ও রাজচন্দ্র দেওয়ান হালচাষের জন্য যথাক্রমে ৬০৭ একর ও ১৩০ একর মিলে মোট ৭৩৭ একরের ১৯ টি ইজারা বন্দোবস্ত সম্পাদন করেন। এছাড়া বড়াদমে নীলচন্দ্র দেওয়ানের ছিল ৩০৩ একর। সমাজের উচ্চতর শ্রেণির বিশাল হারে হালচাষ ইজারা গ্রহণ সাধারণদের জন্য একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তা সত্ত্বেও ১৮৬৫ থেকে ১৮৯২ সালে মৌজা ব্যবস্থা প্রবর্তনের–যেটি মূলত হালচাষ সম্প্রসারণের জন্য প্রবর্তিত হয়– আগ পর্যন্ত ৩০ বছরে ইজারা হোল্ডিং এর সংখ্যা ১২৩১ টি এবং এ খাত থেকে সরকারি রাজস্ব খতিয়ানে খাজনা আসে মাত্র ৩২৭৭ টাকা।

বস্তুত হালচাষকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষে ১৮৯২ সালে নতুন বিধিমালা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত বিধিমালায় হালচাষের খাজনা চিফদের মাধ্যমে আদায় এবং আদায়কৃত রাজস্ব থেকে চিফদেরকে ষোলভাগের একভাগ অর্থাৎ প্রতি টাকায় এক আনা এবং হেডম্যানদেরকে এক অষ্টমাংশ বা ২ আনা কমিশনের ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৯০০ সাল থেকে চিফ ও হেডম্যানদের ভুমি রাজস্ব কমিশন ২ আনা ও ৩ আনায় বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৮৪ সালের জমি লিজের শর্তাবলীতে আবার সংশোধন আনা হয় এবং পুর্বের ৫ বছর নিষ্করের বদলে নিষ্কর সময়কাল ৩ বছরে কমিয়ে আনা হয়। ইজারা ব্যবস্থার পূর্বে হালচাষীরা জুমকর থেকে অব্যাহতি পেতেন নুতন বিধিমালায় সেই সুবিধা বাতিল করা হয়। এছাড়া গেজেটভুক্ত সরকারি কর্মকর্তা, চিফ, তালুক দেওয়ান ও হেডম্যানদেরকে যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট জমি লিজ বা *আমলনামা* অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। তারা লিজপ্রাপ্ত চাষিদের ওপর তিন বছর পর ১৬ আনা বা ১ টাকা

ঔপনিবেশিক শাসকরা ‘‘Grow more food’’ – এর ধারণাকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন।

[৩০০] পত্র নং ৫৯০ জি তারিখ রাঙামাটি ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪

হারে খাজনা নির্ধারণ করে। আদায়কৃত খাজনা থেকে সরকার পেত ১১ আনা, সার্কেল চিফ ২ আনা এবং আদায়কারী হেডম্যান পেত ৩ আনা। লিজপ্রাপ্ত চাষিরা হেডম্যানের জমাবন্দিতে নিবন্ধিত হতো এবং হেডম্যানকেই খাজনা পরিশোধ করত। পরে জমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, চাষির মনোভাব এবং জমির উর্বরতা শক্তি দেখে তিন বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এজন্য যে-ব্যবস্থা করা হয় সেটাই *আমলনামা* নামে পরিচিত। হাটকিনসন অল্প কথায় রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাটি তুলে ধরেছেন :

> The plough rents are collected through the agency of the Circle Chief and mauza headman, who prepare the jamabandis or rent-rolls of their respective circles and mauzas. These rent-rolls are checked and approved by the Superintendent, and then returned to the chief for collection; the rent collections are divided in the following proportion: Government 11 annas, Circle Chief 2 annas, Headman 3 annas.[৩০১]

১৮৯২ সালে মৌজা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর এবং হালচাষে চিফ ও হেডম্যানদের জন্য কমিশনের ব্যবস্থা রাখায় ব্রিটিশদের হালচাষ নিয়ে বিগত ৩৫ বছর ধরে চলমান পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি আপাত সমাপ্তি ঘটে। এরপর ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনে জুমচাষের পাশাপাশি হালচাষ বিশেষ স্থান দখল করে। সরকারের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন– বাংলার অন্যান্য জেলার মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও ভূমি রাজস্ব হবে সরকারের প্রধান রাজস্বের উৎস– বাস্তবে রূপায়িত হতে শুরু করে।

হালচাষের সম্প্রসারণ এবং সেখান থেকে সরকার, চিফ ও হেডম্যানদের রাজস্ব কমিশন প্রাপ্তির দশ বছরের খতিয়ান (১৮৯৪-১৮৯৫- ১৯০৩-৪) লক্ষ্য করলে হালচাষ প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যায়। চাকমা সার্কেলে ১৮৯৪-৯৫ সালে মোট খাজনা আদায় হয় ২,৬২০ টাকা যেখানে চিফ ও হেডম্যানদের কমিশন ছিল ১৬৩ ও ৫৩৯ টাকা। দশ বছর পর ১৯০৩-০৪ সালে মোট রাজস্ব আদায় হয় ৪২,৩২০ টাকা এবং চিফ ও হেডম্যানদের কমিশন বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৪,০৬২ ও ৬,৮৫৬ টাকায়। একইভাবে মং সার্কেলে ১৮৯৪-৯৫ সালে মোট ভূমি রাজস্ব আদায় হয়েছিল ২,১২০ টাকা যেখানে সার্কেল চিফ ও হেডম্যানের কমিশন ছিল যথাক্রমে ১৩২ ও ৪৭২ টাকা।[৩০২] দশ বছর পর ১৯০৩-০৪ সালে মোট রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৮,৭৮৮ টাকা আর চিফ ও হেডম্যানের কমিশন বেড়ে হয় যথাক্রমে ৩,৬৯২ ও ৬,২৪৯ টাকা।[৩০৩] বোমাং সার্কেলে ১৮৯৪-৯৫ সালে মোট ভূমি রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৪,৭৪৮ টাকা যেখানে সার্কেল চিফ ও হেডম্যানের কমিশন ছিল যথাক্রমে ২৯৬ ও ৫৮১ টাকা।[৩০৪] দশ বছর পর ১৯০৩-০৪

---

[৩০১] R. H S Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer*, 1909, p. 94-95.
[৩০২] পত্র নং ৮০৪ জি., তারিখ রাঙামাটি, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৪
[৩০৩] পত্র নং ৮০৫ জি., তারিখ রাঙামাটি, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৪
[৩০৪] পত্র নং ৮০৪ জি., তারিখ রাঙামাটি, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৪

সালে মোট রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৮,৩৪৮ টাকা সেখানে চিফ ও হেডম্যানের কমিশন বেড়ে হয় যথাক্রমে ৫,৪৩৫ ও ৮,৯২৭ টাকা।[৩০৫]

এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভূমি রাজস্ব সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। চিফ ও দেওয়ানরা হালচাষে স্ব স্ব মৌজাবাসী ও সার্কেলবাসী পাহাড়িদেরকে হয় উদ্বুদ্ধ করে নতুবা পূর্বের মতো আগ্রহী হালচাষিদের ইজারা গ্রহণে বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকে। বিশ শতকের গোড়া থেকে হালচাষ সম্প্রসারণের উক্ত আশাব্যঞ্জক চিত্র ব্যাপকহারে পাহাড়িদের হালচাষ পদ্ধতি আয়ত্বকরণের ইঙ্গিতবাহী। তাছাড়া পাহাড়িদের জীবনের অপরিবর্তনশীলতা, প্রথাকে আকঁড়ে থাকার মানসিকতাকে ঝেড়ে ফেলে পাহাড়িরা হালচাষের মাধ্যমে আধুনিকতাকে হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে। হালচাষের এ সফলতা প্রমাণ করে তারা প্রগতিবিমূখ নয়। উপযুক্ত সুযোগ পেলে তারাও উন্নয়নে অবদান রাখতে প্রস্তুত। পাহাড়ি কৃষকদের হালচাষ গ্রহণের সমকালীন চিত্র পাওয়া যায় হাটকিনসনের বর্ণনায়:

> It must be remembered that the people have become thoroughly accustomed to the plough, and now work it themselves. In former years plainsmen were engaged at a high monthly wage to plough, plant, and harvest, and as recently as ten years ago it was rare to see a hill-man doing his own work, while now it is the exeption to see a foreigner working in their fields.[৩০৬]

উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ১৮৯২ সালের পর চিফ ও হেডম্যানরা প্রথমবারের মতো প্লাউরেন্ট কমিশন বা হাল খাজনার অংশীদার হয়। হালচাষ খাজনা থেকে চিফ ও হেডম্যানদের কমিশন লাভ তাদের আর্থিক ও মর্যাদাগত অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। উপজাতীয়দের হালচাষের মাধ্যমে স্থায়ী গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত করে ব্রিটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার ঔপনিবেশিক নীতি ফলপ্রসু হতে শুরু করে। অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান হালচাষ খাজনা থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের ন্যুন্যতম একটা অংশ অর্থাৎ একরপ্রতি ধার্যকৃত ১৬ আনা থেকে মাত্র ৫ আনা যা শতকরা ৩১ শতাংশ চিফ ও হেডম্যানদের কমিশন হিসেবে দিয়ে তাদেরকে আয়ত্বে আনে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রণীত নীতি বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় ছিল দুই চিফ (মং চিফ ব্রিটিশদের হাতে গড়া)। সুতরাং তাঁদের এবং হেডম্যানদের আর্থিক, মর্যাদাগত সুবিধা, যেখানে প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ ও প্রণোদনা দিয়ে ব্রিটিশানুগত সহযোগী শ্রেণিতে পরিণত করা হয়।

---

[৩০৫] পত্র নং ৯৬৩ জি., তারিখ রাঙামাটি, ৯ নভেম্বর ১৯০৪

[৩০৬] Hutchinson, *An Account of Chittagong Hill Tracts,* পৃ-৩৭.

মৌজা জরিপ নিয়ে চিফ ও সরকারের টানাপোড়েন

এদিকে ১৮৯২ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত হালচাষ ও ভূমি রাজস্ব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯১০ সাল থেকে পরিচালিত মৌজাভিত্তিক ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম। ইতিপূর্বে মৌজার হেডম্যানগণ হালচাষের *আমলনামা* জমা দিতেন এবং কিঞ্চিৎ মাঠ পরিদর্শন ও ক্ষেত্র সমীক্ষার পর ডেপুটি কমিশার তাতে অনুমোদন দিতেন। কিন্তু লিজপ্রাপ্ত সকল জমির হালহকিত যথা প্রকৃত ইজারাদার বা বন্দোবস্তকারী, মাঠখসড়া, খতিয়ান, জমির প্রকৃত আয়তন ও অবস্থান, প্রকৃতি চাষি ও লিজ গ্রহীতার সম্পর্ক ও তাদের খাজনার হার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হতো না। তার প্রতিকার হিসেবে দীর্ঘ মেয়াদী ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভের উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯১৬ সালের মধ্যে সার্ভের আওতায় আসা মৌজাগুলোতে *আমলনামায়* উল্লিখিত জমির পরিমাণ ও ধার্যকৃত খাজনার মধ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত সার্ভে রিপোর্টে[৩০৭] ১৯১৪-১৫ সালের ১০টি মৌজার জরিপে উঠে আসে জমাবন্দিতে লিপিবদ্ধ জমির তুলনায় ১৫০০ একর জমি উদ্বৃত্ত আছে। উক্ত জমিসহ বৎসরান্তে মোট জমি থেকে খাজনা উসুল হওয়ার কথা ৬৯,৪৩৩ টাকা। একইভাবে ১৯১৫-১৬ সালের ৭টি মৌজার জরিপে বর্ধিত খাজনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫,১৮৫ টাকায়।[৩০৮] ৩ নং মানচিত্র মৌজা জরিপ ফলাফলের স্পষ্ট ধারণা দেয়।

[৩০৭] মৌজাভিত্তিক জরিপ অব্যাহত থাকে এবং জরিপের আওতাধীন মৌজার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উঠে আসে বর্ধিত খাজনার হার যা পূর্বের ধার্যকৃত রাজস্বের হারকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। ১৯২৫-২৬ মৌজা জরিপ কাজ সম্পন্ন হয় এবং ২৬৯টি মৌজা জরিপের আওতায় আসে। জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ২১,৫৬০ একর এবং সেখান থেকে খাজনা বৃদ্ধি পায় ২৫,৭৭৯ টাকা। মানচিত্রে যা দেখানো হবে যথাস্থানে।

[৩০৮] গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, *চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল উইথ সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট* (ক্যালকাটা: বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস, ১৯২৭), পৃ. ৯০। পরিশিষ্ট (পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)

মানচিত্র নং - ৩

উৎস:- *চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল উইথ সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট* (পরিশিষ্ট)

১৯০৯-১৯২৬ সালব্যাপী পরিচালিত ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভের মধ্য দিয়ে জমাবন্দিত উল্লিখিত জমি ও ধার্যকৃত জমির খাজনার চিত্র পাল্টে যেতে থাকে। ফলে বিদ্যমান ব্যবস্থা নিয়ে সরকার ও খাজনা আদায়কারী চিফ/হেডম্যান উভয় মহলে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৯১৬ সালের জুলাইতে চিফ ও হেডম্যানরা হালচাষ খাজনা বন্দোবস্ত, খাজনা আদায়ের বিদ্যমান অবস্থা উল্লেখ করে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। ঐ স্মারকলিপিতে চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলে গঠিত মোট ৩৭১ টি মৌজার জমাবন্দি মাত্র মাত্র চারজন আমিনের পক্ষে সঠিক সময়ে যাচাই বাছাই করা সম্ভবপর নয় বলে উল্লেখ করা

হয়। এছাড়া খাজনার হার পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট না থাকায় এবং খাজনা পরিশোধে কিস্তির ব্যবস্থাসহ দাখিলের সুনির্দিষ্ট তারিখ না থাকায় চাষিরা ঠিক সময়ে খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হন বলে অভিযোগ করা হয়। অন্যদিকে ১৮৯২ সালের ১০নং বিধিতে *আমলনামা* অনুমোদনের এখতিয়ার, সরকারি কর্মকর্তা, চিফ ও হেডম্যানদের দেওয়ায় একই জমিতে উপরি *আমলনামা* জারি হয়। এর ফলে ১৯১৩-১৪ ও ১৯১৪-১৫ পরপর দুই অর্থবছরে তিন সার্কেলে বিশাল অংকের ভূমি রাজস্ব বকেয়া পড়ে থাকে। এমন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য চিফরা নিম্নোক্ত প্রস্তাব সরকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।[৩০৯]

স্মারকলিপির মূল তাৎপর্য হল চিফরা বিদ্যমান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট নন এবং বিদ্যমান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা হালচাষ সম্প্রসারণের জন্য অনুকুল নয় বলে তাদের অভিমত। চিফ ও হেডম্যানদের স্মারকলিপির প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার কে সি ডে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর প্রতিবেদন পেশ করেন বাংলা সরকারের নিকট। হালচাষ সম্প্রসারণ ও খাজনা আদায়ের কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য তিনি তার প্রতিবেদনে চিফদের ১০বছর মেয়াদী হালচাষ বন্দোবস্তের পক্ষে মত দেন। তাঁর বক্তব্যটি ছিল:

> All the Chiefs and headmen are convinced at heart that the salvation of the hill tracts lies in plough cultivation, but immediate pecuniary interests are in the way of their encouraging it. The decennial settlement of the plough rent of settled mouzah which I have recommended recently will, if sanctioned, give them pecuniary interest in extending plough cultivation.[৩১০]

কিন্তু সরকার তাৎক্ষনিকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান রাজস্ব ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং এর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য ঢাকার প্রাক্তন স্বনামধন্য সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা এফ. ডি. এস্কলিকে তিন মাসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করে। মি. এসকলি ১৯১৮ সালে *'রিপোর্ট অন দ্য রেভিনিউ এডমিনিস্ট্রেশন অব চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস'* শিরোনামে তাঁর প্রতিবেদন জমা দেন। তিনি চিফদের ক্ষমতা অবনমন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সার্কেল ব্যবস্থার সমান্তরালে তিনটি

---

[৩০৯] *The humble memorial of the Chiefs, headmen and inhabitants of the Chittagong Hill Tracts*. 23rd July 1916, To the Hon'ble the Commissioner of the Chittagong Division in *Selections*, 1929, pp. 351-357. ১। জুমকর বন্দোবস্তের মতো এ যাবৎ ক্যাডেস্ট্রাল জরিপের অধীনে আসা মৌজা গুলোর হালচাষ খাজনা চিফদের সাথে পরীক্ষামূলকভাবে দশ বৎসর মেয়াদী বন্দোবস্ত সম্পাদন করা; ২। হালচাষ খাজনা থেকে চিফদের বর্তমান কমিশন টাকায় ২ আনা থেকে ৪ আনায় ও হেডম্যানদের কমিশন ৩ আনা থেকে ৪ আনায় বৃদ্ধি করা; ৩। ভুমি রাজস্ব পরিশোধের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করা। যেমন- প্রতি বছর চিফদের নিকট জমা দিবে ১৫ ডিসেম্বর এর মধ্যে অর্ধেক এবং অবশিষ্ট অর্ধেক জমা দিবে ১ লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে আর হেডম্যানদের নিকট প্রথম কিস্তি জমা দিবে ১ ডিসেম্বরের মধ্যে এবং শেষ কিস্তি জমা দিবে ১লা ফেব্রুয়ারির মধেও ৪। চিফ ও হেডম্যানদের খাজনা আদায়ের সমন জারির ক্ষমতা থাকবে ।

[৩১০] *Selections*, 1929, p. 366.

সাবডিভিশন গঠন করে তথায় এসডিও নিয়োগ করে রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার সুপারিশ পেশ করেন। এছাড়া হেডম্যানদেরকে সরাসরি নিয়োগ না করে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করে হেডম্যান ও কার্বারী নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। তার প্রতিবেদনের আরেকটি বিশেষ দিক ছিল *বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্ট, ১৮৮৫*'র মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষিদের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা। তাঁর প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনটির ওপর তৎকালীন জেলা প্রশাসক গঠনমূলক মন্তব্য সরকারের নিকট দাখিল করেন। এতে বাংলার সরকার তাৎক্ষণিকভাবে এস্কলির সুপারিশ বাস্তবায়নে বিরত থাকে। তবে চিফদের দশ বছর মেয়াদী বন্দোবস্ত দাবিও নাকচ করে দেয় এই বলে যে:

> We shall be in danger of repeating the mistake which Lord Cornwallis made in confering proprietary rights on the tax collectors of the Moghul Empire. We are not likely to repeat the mistake of a permanent settlement, but to grant even a temporary settlement to the chiefs would involve the recognition of rights to which they have no legal or moral claim and which could not be granted without serious detriment to the actual cultivators of the soil.[৩১১]

শুধু এটা নয়, সরকার ১৯১৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের এক সিদ্ধান্তে হালচাষের জমি ইজারা সংক্রান্ত *আমলনামা* দেওয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র ডেপুটি কমিশনারের হস্তে অর্পণ করে। উল্লেখ্য পূর্বে চিফ, তালুক-দেওয়ান ও হেডম্যানদেরও *আমলনামা* দেওয়ার এখতিয়ার ছিল। চিফদের কমিশন বৃদ্ধি এবং দশ বছর মেয়াদী বন্দোবস্তের দাবি উপেক্ষিত থাকায় তাঁরা ভূমি রাজস্ব আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। রাজস্ব সংগ্রহের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২৪-২৫ সাল পর্যন্ত মোট ৬ বছরের হালচাষ সম্প্রাসরণ ও রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ১৯১৯-২০ রাজস্ব বছরে যেখানে ভূমি রাজস্ব বকেয়া দাবি ছিল ১২৬২৫১ টাকা সেখানে উসুল হতো মাত্র ৫৫,২২৬ টাকা। ১৯২৫-২৬ সালে রাজস্ব বকেয়া দাবি কমে হয় ৭৪,৬৮৩ টাকা অন্যদিকে উসুলের পরিমাণ কমে হয় ৪৪,২২৬ টাকা।[৩১২] এ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় বিগত পাঁচ অর্থ বৎসরে ভূমি রাজস্ব বকেয়া ও উসুল দুটোই হ্রাস পায়। বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পেছনে দৌড়াতে গিয়ে চলতি সংগ্রহের গতিতে প্রভাব পড়েছে অনবরত। যেমন ১৯২৫-২৬ অর্থবছরে চলতি রাজস্ব দাবি ছিল ১,১১,৮৬৯ টাকা সে বিপরীতে আদায় হয় মাত্র ৮০,৬৩৪ টাকা। রাজস্ব সংগ্রহের এ অবনতির জন্য চিফ ও হেডম্যানদের অদক্ষতা, উদাসীনতা ও অর্থলোভকে দায়ী করা হয়। তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার সি. জি. বি. স্টিভেন ১৯২৪ সালে কমিশনারকে

---

[৩১১] Secretariat Note on the Administration of Chittagong Hill Tracts, on 12^{th} June 1919 in *Selections*, 1929, p. 433.

[৩১২] *ফাইনাল সার্ভে রিপোর্ট*, ১৯২৭, পৃ. ৯১।

লেখা এক পত্রে জানান ১৯২২-২৩ সালে হেডম্যানদের রাজস্ব হিসাবে ৪০ হাজার টাকা এবং চিফদের হিসাবে ৩০ হাজার টাকা গড়মিল ধরা পড়ে যা তারা আত্মসাৎ করেছেন। উপরন্তু ১৯১৯ সালের সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে চিফরা যেহেতু ভূমি রাজস্ব আদায়ে সরকারের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ তাই তিনি রাজস্ব প্রশাসনের সরকারি তহশিলদার বা এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী চিফদেরকে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ করেন এবং মহকুমা প্রশাসকদের অধীনে হেডম্যানদের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব সংগ্রহ এবং যেসব মৌজায় হেডম্যানের পদশূন্য সেখানে চাষিদেরকে সরাসরি সরকারি ট্রেজারিতে রাজস্ব জমাদানের নিয়ম চালু করার সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার চিফদেরকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বাংলা সরকারের নিকট জোরালো মত দেয়:

> I am, therefore, strongly in favour of eliminating the chiefs from the collecting agency ... I think headmen will be glad to be able to deal direct with the treasury. I think we have reached a point where the plea of prestige can no longer bring concessions and the perpetuation of a procedure which is wasteful, ineffective and not even popular.[৩১৩]

স্থানীয় শাসকদের জোরালো মতামত ও সুপারিশ যার সাথে সরকারের আর্থিক স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাতে সরকার নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। ১৯২৪ সালে বাংলার গর্ভনর লর্ড লিটন রাঙামাটি সফরে এসে প্রদত্ত ভাষণে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।

> We want to keep the land in the possession of the hillmen, each family having enough to maintain it, but no more than it can cultivate itself, and we wish to deal direct with the cultivator and eliminate the middlemen who merely exploits the land for his own benifit; we must therefore control transfer and subleases in such a way as to prevent the land falling into the hands of such middlemen. The rule about subletting has been framed with this object, and while it aims at safegaurding the rights of the actual cultivators it will not, I think cause any hardship, as it provides that subleases granted prior to 1920 and still in existence are to be reorganized as valid.[৩১৪]

অতঃপর বাংলা সরকার ১৯২৫ সালের ১৩ মে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রথম কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ করে অর্থাৎ চিফদেরকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করে। সরকার নির্দেশ দেয় :

> His Excellency in Council therefore accepts your recommendation that the three chiefs should be relieved of their duties and responsibilities in connection with the

---

[৩১৩] Letter No. 1310 RÍVI-42, dated Chittagong, the 5th July 1924. in *Selections*, 1929: 469

[৩১৪] *Report on Survey and Settement*, p. 31.

collection of the plough rents, and directs that with effect from the current year plough rents collected by the headmen shall be paid direct into the treasury.[৩১৫]

তবে এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো চিফদের প্রতি সরকারের এমন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পরও দৃশ্যত চিফরা কোনো প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি। কারণ তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলেও এতে জনগণের হারানোর কিছু ছিল না এবং কোনো প্রতিবাদে জনগণকে কাছে পাওয়ার সুযোগও চিফদের ছিল না। তবে চিফরা বিনম্রভাবে ক্ষতিপুরণের আর্জি জানালে সরকার চিফদের ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বচ্যুতিজনিত ক্ষতি এবং বর্তমান আয় তলিয়ে দেখার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়। তৎকালীন কমিশনার জে এন রায় ১৯২৫-এর জুলাই মাসে চিফদের বিগত দশ বছরের রাজস্ব আয় থেকে প্রাপ্ত কমিশনের গড় হিসাব বের করে চাকমা, বোমাং ও মং চিফের জন্য যথাক্রমে ৪০০০ টাকা, ১৫০০ টাকা ও ২০০০ টাকা 'প্লাউরেন্ট কমিশন' হিসেবে প্রতিবছরের জুমকর জমা থেকে রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করেন। পরবর্তীকালে জুমকর বন্দোবস্তে (১৯৩৫) সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং চিফরা প্রতিবছর প্রদেয় জুমকর থেকে ঐ পরিমাণ টাকা রেয়াত লাভ করেন।[৩১৬]

এ ঘটনা দ্বারা যে কারো এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অসুবিধা হয় না যে, ঔপনিবেশিক সরকার স্থানীয় উপজাতীয় শাসকদের ভাবাবেগ ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। রাজস্ব সংগ্রহ সর্বোচ্চকরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতির অন্যতম চরিত্র হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে তারা নিষ্ঠুর রক্ত শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। তারা স্থানীয় প্রভাবশালী উপজাতীয় শাসকদের নিকট থেকে একের পর এক আর্থিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছে ঠিকই কিন্তু বিনিময়ে ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করে 'প্যাক্স ব্রিটানিকার' মোহনীয় দার্শনিক রূপ ও প্রদর্শন করেছে।

চিফদেরকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের এজেন্সির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে পরবর্তী সময়ে হালচাষ সম্প্রসারণ ও রাজস্ব সংগ্রহে কোনো প্রভাব পড়েনি। ১৯২৮ সালে সরকার কৃষি জমি পাট্টাদার এবং চাষিদেরকে জমিতে স্থায়ী ও উত্তরাধিকারসম্মত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিতে ব্যাক্তিমালিকানা তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের ইতিহাসে এটি একটি মাইলফলক। হালচাষের বহুমূখী ও সুদরপ্রসারী উপযোগিতা সাধারণ জুমিয়ারা উপলব্ধি করে। বলা যায় ঔপনিবেশিক শাসকদের জুমিয়াদেরকে হালচাষে অভ্যস্ত করে স্থায়ী গ্রামীণ সভ্যতায় রূপান্তরের লালিত স্বপ্ন ও নীতি সার্থক হয়। ১৯৫০-৫১ সালের বাৎসরিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত ভূমি রাজস্ব আয়ের পরিসংখ্যান দেখলে প্রতিভাত হয় হালচাষ পদ্ধতি পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে নিয়মিত

---

৩১৫ Letter No. 201 T–R., dated Darjeeling, the 13th May 1925.

৩১৬ GOEP, *Report on the Administration of Chitagong Hill Tracts for the year 1950-51.*

রাজস্ব দাবি ছিল ১,৬১,০২৮ টাকা পক্ষান্তরে আদায় হয় ১,২৭,১৩১ টাকা। ১৯৪৬-৪৭ অর্থবছরে নিয়মিত ভূমি রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,০৬,৭৬৯ টাকা তার বিপরীতে সংগৃহীত হয় ২,০৪,৩৩৫ টাকা।[৩১৭] এই পরিসংখ্যানে দেখাচ্ছে যে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ অর্থবছর নাগাদ ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ দুই লাখ ছাড়িয়ে যায়।

৩.৬ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতির প্রভাব

পাহাড়িদের অর্থনৈতিক জীবনে হালচাষ প্রবর্তনের প্রভাব

অন্যদিকে সাধারণ প্রজাদের নিকট *প্যাক্স ব্রিটানিকা* কে উপযোগী ও গ্রহনযোগ্য করে উপস্থাপনের জন্য গৃহীত হয় নানা উদ্যোগ। এর পেছনে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চিফ ও দেওয়ান/রোয়াজের উপজাতীয় বিচার, আইন আদালত ও নিয়ম নীতি থেকে ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় আইন, আদালত, নিয়ম কানুন তথা সভ্যতামুখীন করে তোলা।

১৮৯২ সালে মৌজা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে জুমিয়াদেরকে গ্রামমুখী করার উদ্যোগ হিসেবে নদীর সংযোগ স্থলে ও জনবসতিপূর্ণ বাঁকসমূহে সরকারি উদ্যোগে বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাজারে জনসাধারণের লেনদেন বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৯ সালে লুইন বলেছিলেন পার্বত্য জেলায় কোনো বাজার নেই। সেখানে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে নতুন নতুন বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি, অযোধ্যা, বান্দরবান, বরকল, কাসালং, লামা, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি, নান্যাচর, রেইংখ্যং, রামগড়, সুবলং ইত্যাদি এলাকায়। এভাবে পরবর্তীকালে বাজারের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। ১৯১৭ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের প্রেরিত এক সরকারি পত্রে জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৮টি বাজার রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[৩১৮] আমরা হালচাষ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রারম্ভেই বলেছি সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন এবং সে পরিবর্তন প্রায় সবটাই নির্ভর করে বাজারের ওপর। উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার-মূল্য সমাজ পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। বাজার-মূল্য ও এর ওঠা নামার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের, যা পরিণামে প্রভাবিত করে সমাজ বিন্যাসকে। সুতরাং জুমভিত্তিক স্থানান্তরী উৎপাদন পদ্ধতি থেকে স্থায়ী হালচাষ কৃষি সম্প্রসারণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয় এবং সামাজিক রূপান্তরের ভিতও প্রোথিত হয়। হালচাষের অনুগামী হিসেবেই বাজারগুলো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যাতে চাষিরা তাদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য সহজে বিপণনের সুযোগ লাভ করে আর তাদের হালচাষের নিত্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি নিকটস্থ বাজার থেকে ক্রয় করতে সক্ষম হয়। ব্যবসা পাহাড়িদের ‘ধাতে

---

[৩১৭] Govt. of East Pakistan, *Report on the Administration of Chitagong Hill Tracts for the year* 1950-51.

[৩১৮] No. 191 T. G. Dated Camp Brahmanbaria, the 12th June 1917. See *Selection* (1929), p. 362.

সয় না' অর্থাৎ পাহাড়িরা ব্যবসা বাণিজ্য উৎসাহী ছিলেন কম। সুতরাং বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য সমতল থেকে বিশেষ করে চট্টগ্রাম জেলা থেকেই বাঙালি দোকানদার ও ভাসান্যা ব্যাপারীরা নানা সামগ্রীর যোগানদার হিসেবে পার্বত্য জেলায় আগমন করে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ নাগাদ ৬৬টি বাজার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাজার ও জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থানা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট তৈরি করা হয়। ১৯০৯ সালের মধ্যে ৮টি পুলিশ স্টেশন বা থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন- চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি, কাসালং, মহালছড়ি, রামগড়, বান্দরবান, রুমা ও লামা। থানা স্থাপন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এসব থানায় যোগাযোগের জন্যও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। এস্থলে কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ রাস্তার বর্ণনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাঙামাটি থেকে রাউজান, চন্দ্রঘোনা, বরকল, মহালছড়ি, আবার চন্দ্রঘোনা থেকে বান্দরবন, বান্দরবন থেকে বাজালিয়া, রেইসা, নানিয়ারচর থেকে মাইনিমুখ, খাগড়াছড়ি থেকে দীঘিনালা, মহালছড়ি থেকে রামগড় উল্লেখযোগ্য।[৩১৯] এ সমুদয় ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি স্থায়ী গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণ সহায়ক হয়। এর পাশাপাশি বিকাশ লাভ করে বাজার অর্থনীতি। এ প্রসঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানী আদিত্য দেওয়ানের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> The colonial system created conditions for a demand for money to pay land revenue, taxes and other levies, to meet expenditures of various kinds, and to buy and sell commodities and other necessities. This led to the penetration of market forces into the subsistence economy of the indigenous population, replaced the traditional barter system by the flow of cash, increased trading and commercial activities associated with the development of trading and marketing centres and brought the subsistence farmers gradually within the operation of the market system.[৩২০]

অর্থাৎ আধুনিক বাজার ভিত্তিক তথা ''বাণিজ্যিক বিপ্লব''-এর হাত ধরে কিছুটা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং এর মানুষ ব্রিটিশ ভারত তথা ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন ঔপনিবেশিক বিশ্ব অর্থনীতির চাকার সাথে যুক্ত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব

ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভার্নাকুলার বা স্থানীয় ভাষায় কিয়াং বা বৌদ্ধ মঠ কেন্দ্রিক পড়ালেখার প্রচলন ছিল। চাকমারা তাদের নিকট নিজস্ব হরফে নিজস্ব ভাষায় পঠন-পাঠন প্রণালী আয়ত্ব করত। মারমারা কিয়াং বা মঠে ভিক্ষুদের নিকট বার্মিজ ভাষা শিখত। ১৭৯৮ সালে ফ্রান্সিস বুকানন বান্দরবানে রাজার মন্দিরে এধরনের চিত্র দেখেছিলেন। তাঁর দেখা মঠের উপাসনালয় ছিল সমতল ছাদ

---

[৩১৯] *সার্ভে রিপোর্ট*, ১৯২৭, পৃ. ৫।

[৩২০] Aditya Kumar Dewan, *Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh*, Ph. D. Diss.(Canada: McGill University, 1990), পৃ-১৬৫।

বিশিষ্ট একটা ঘর, বার্মা রাহানদের মন্দিরের মতো জাঁকালো নয়। একই প্লাটফরমের এখানে তিনটি ঘর; তার একটাতে মঠগুরু ছেলেদের লেখা এবং পড়ার তালিম দিচ্ছিলেন।[৩২১] ব্রিটিশদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি এটাই ছিল পাহাড়িদের শিক্ষার অবস্থা।

ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক উপযোগিতা বিবেচনা করে এ অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য ভিন্ন ভাষী স্থানীয় মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা ছিল আশু করণীয়। ফলে যতদ্রুত সম্ভব সরকারিভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা চালুর উদযোগ গৃহীত হয়। এ তাগিদ থেকেই ১৮৬২ সালে জেলার তৎকালীন সদর দপ্তর চন্দ্রঘোনায় প্রথম বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারি তহবিল থেকে ঐ স্কুলের জন্য প্রথম দুই বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বরাদ্দ দেয়া হয় মাত্র ১২৩ টাকা। কিন্তু প্রথমদিকে শিক্ষা কার্যক্রম আশানুরূপ হয়নি। উপজাতিদের জীবনবোধ, দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিক্ষিপ্ত বসতি, সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা ছিল। সমকালীন সরকারি নথিতে এধরনের প্রতিবন্ধতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

> In the hills there are many difficulties to contend against in the way of educating the people. They are too poor and scattered, and their villages are too small for mofussil schools. They have seen no hill man rise to wealth and eminence through being educated, and they are not eager that their sons should become richer or rise to a higher social position than themselves, nor have they any fear that their sons will sink to a lower social grade for want of learning. They are contend to remain ignorant themselves, and choose that their sons should grow up ignorant rather than that they should suffer the pain of being parted from them for long periods as must be the case if they are to be properly educated at Chandergonah.[৩২২]

কিন্তু সরকার প্রথমে জেলা সদর দপ্তর অর্থাৎ রাঙামাটির নিকটস্ত চাকমা রাজপরিবার এবং সম্ভ্রান্ত দেওয়ানদেরকে আধুনিক শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার জন্য ইংরেজির পাশাপাশি স্কুলের পাঠ্যক্রমে চাকমা ও বার্মিজ ভাষা ক্লাস চালু করা হয়। পরে শুধু ইংরেজি ও বাংলা রাখা হয়। ১৮৬৩ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় প্রথমদিকে পার্বত্য রাজা এবং সম্ভ্রান্তদেওয়ানদের সন্তানরাই চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুলে বিদ্যার্থী হিসেবে ভর্তি হয়। রানি কালিন্দীর নাতি ও পরবর্তী উত্তরাধিকারী হরিশচন্দ্রও ১৮৬৫ পর্যন্ত ঐ স্কুলে পড়াশুনা করেন।[৩২৩] দেওয়ান পরিবার থেকে কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর তিনি

---

[৩২১] ভেলাম ভেন সেন্দেল, *দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুকানন*, পৃ. ১১৫।

[৩২২] *Proceedings of the Govt. of Bengal*. Proc. No. 49-50. June 1866, pp. 31-41.

[৩২৩] *Proceedings of the Govt. of Bengal*. Proc. No. 56. June 1865, pp. 47-57.

চন্দ্রঘোনা স্কুলের প্রথম ব্যাচের প্রথম শিক্ষার্থী ডেপুটি কমিশনারের অফিসে সরকারি চাকরি লাভ করেন।[৩২৪] অতঃপর ত্রিলোচন দেওয়ান, রাজচন্দ্র দেওয়ান চন্দ্রঘোনা স্কুলে পড়ে সরকারি চাকরি লাভ করেন। ১৮৬৯ সালে জেলার সদর দপ্তর রাঙামাটিতে স্থানান্তরিত হলেও বোর্ডিং স্কুলটিও তার অনুগামী হয় এবং রাঙামাটি গভর্নমেন্ট বোর্ডিং স্কুল নাম ধারণ করে। ঐ বোর্ডিং স্কুলে পঞ্চাশ জন পাহাড়ি শিক্ষার্থী আবাসিক ছাত্র হিসেবে সরকারি খরচে পড়াশুনার সুযোগ লাভ করতো তবে তার জন্য স্ব স্ব সার্কেল চিফ ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের যৌথ সুপারিশ প্রয়োজন হতো। শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতি সন্তোষজনক হওয়ায় সরকার রাঙামাটি বোর্ডিং স্কুলটিকে ১৮৭৩ সালে মিডল ইংলিশ বা এম. ই. স্কুলে এবং ১৮৯০ সালে সরকারি হাই ইংলিশ স্কুলে উন্নীত(আগগ্রেড) করে। ১৮৯৩ সালে ঐ স্কুল থেকে ২২ জন ছাত্র এন্ট্রাস (প্রবেশিকা) পাস করে যার মধ্যে ৯জন পাহাড়ি ছাত্র ছিল।[৩২৫] তম্মধ্যে স্বর্গীয় চাকমা রাজা ভূবন মোহন রায়, অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান ও কৈলাশ চন্দ্র শৈল(কুকি) অন্যতম।

এভাবে ১৮১৭ সালে কলকাতায় স্থাপিত হিন্দু কলেজের মতো পরবর্তীকালে রাঙামাটি সরকারি হাই স্কুল হয়ে ওঠে স্থানীয় প্রশাসনে শিক্ষিত জনবল সরবরাহের প্রধান প্রতিষ্ঠান। ১৯৪০ সালে শ্রী মাধবচন্দ্র চাকমা কর্ম্মীর প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়। তিনি শুধুমাত্র চাকমা জাতির শিক্ষার অগ্রগতি ও সরকারি চাকরি লাভের পরিসংখ্যান দিয়েছেন যাতে দেখা যায় ত্রিশের দশক পর্যন্ত ১০ জন চাকমা স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি লাভ করেন। এছাড়া আই, এ পর্যন্ত পড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ১৮ জন। ম্যট্রিক বা প্রবেশিকা পাস করে ভূমি, পুলিশ, শিক্ষা, বনবিভাগ, শুল্ক, কৃষি বিভাগের কর্মে নিযুক্ত হন ৩০ জন চাকমা।[৩২৬] অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোর উপর কোনো পৃথক গবেষণা হয়নি। তবে চাকমাদের তুলনায় মারমা ও ত্রিপুরাদের সংখ্যা এক চতুর্থাংশের কম নয়। মারমাদের মধ্যে মং ও বোমাং রাজপরিবার শিক্ষাদীক্ষায় অনেক অগ্রগতি লাভ করে।

তিনটি সার্কেলের মধ্যে নিম্ন প্রাথমিক, প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়। হাটসিনসন বিশ শতকের প্রথম দশক নাগাদ ৯৫টি প্রাথমিক এবং চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করেছেন যেখানে দেড় হাজারের কাছাকাছি ছেলে মেয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করার সুযোগ লাভ করে। এছাড়া পাহাড়িদের বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছিল ৩০টি শিক্ষাকেন্দ্র।[৩২৭] ১৯৩১ সালের বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার ক্রমোন্নতির চিত্র পাওয়া যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়

---

[৩২৪] সতীশ চন্দ্র ঘোষ, *চাকমা জাতি*, পৃ. ১২৩।

[৩২৫] R. H Snyed Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts,* 1909, পৃ. ১৮।

[৩২৬] শ্রী মাধব চন্দ্র চাকমা কর্ম্মী, *শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা রাজবংশের ইতিহাস*, পৃ. ৮০-৮৫।

[৩২৭] R. H Snyed Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts,* 1909, পৃ. ১৭

২০০টি এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ে ৩৫৮৭ জনে।[৩২৮] এটিই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যে, সরকারের পাশাপাশি পাহাড়িরা স্ব স্ব উদ্যেগে স্কুল প্রতিষ্ঠায় হাত দিয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক সমাজ পরিবর্তনের স্মারক। পার্বত্য চট্টগ্রামের চিফ ও হেডম্যানদের স্মারকলিপিতেও এটি অকপটে স্বীকার করা হয়েছে যে: ‘‘That under the benign care of Government the people are being gradually civilised, and have been adopting the lines of civilised people and taking to plough culitivation.’’[৩২৯]

উপসংহার

পুরো অধায়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সীমান্তবর্তী পার্বত্যবাসীদের বহির্ভূতকরণ শাসননীতি দ্বারা শাসন করলেও জনগণের প্রতিনিধি বা ‘ভয়েস অব পিপলস’ খ্যাত চিফদেরকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেনি (কেননা ব্রিটিশবিরোধী কোনো আন্দোলন সংগঠিত করার বা নেতৃত্ব দেয়ার সম্ভাবনা কেবল এঁদের মধ্যে ছিল)। সার্কেল চিফ ও মৌজা হেডম্যানদের দ্বারা জুমকর ও ভূমি রাজস্ব যা পার্বত্য জেলায় প্লাউরেন্ট নামে পরিচিত ও অন্যান্য রাজস্ব আদায় করেছিল। উপরন্তু জুমকরের ক্ষেত্রে সরকার শতকরা ৭৫ ভাগ ছাড় দিয়েছিল এই চিফ ও হেডম্যানদের অনুকুলে। সরকারকে প্রদেয় ২৫ শতাংশ থেকেও আবার ‘সদাচরণ ভাতা’, ‘প্লাউরেন্ট কমিশন’, সার্ভিস ল্যান্ড ভাতা প্রভৃতি খাতে চিফদেরকে কর রেয়াত সুবিধা দেওয়া হয়। এতে চিফ ও হেডম্যানদের ক্ষেত্রে জুমকর পরিণত হয় বড় স্থায়ী আয়ের উৎসে।

জুমকরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সরকার ১৮৭৩ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত চার দশকের অধিককাল ধরে জুমকরের হার বৃদ্ধি করেনি। ১৯১৫ সালে ৪ টাকা থেকে ৫ টাকায় অর্থাৎ ১ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল তাও আবার সরকারের ইচ্ছায় নয় বরং স্থানীয় চিফদের দাবির প্রেক্ষিতে। বলা বাহুল্য জুমকরের সেই হার ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত আর বৃদ্ধি করা হয়নি। প্রতি জুমিয়া পরিবারের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্য জুমকর ছিল মাত্র ১ টাকা। এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অনগ্রসর পাহাড়িদের ওপর অযাচিতভাবে করের বোঝা চাপিয়ে দেয়নি। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিককার স্থানীয় শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ করে ক্যাপ্টেন লুইন জুমচাষ উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে জোরালো মত দিলেও সরকার সংরক্ষিত বন সৃজন ছাড়া জুমচাষে কোনো কড়াকড়ি আরোপ করেনি। সংরক্ষিত বনভূমি বাদে ২,৪৬৭ বর্গমাইল এলাকা জুমিয়া ও বনজ দ্রব্য সংগ্রহকারীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৯০১ সালের এক পরিসংখ্যান অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মোট জনসংখ্যা ১২৪,৭৬২ জনের মধ্যে ১০৯,৩৬০ জন শুধুমাত্র জুমচাষ

---

[৩২৮] *Bengal District Gazetteer, Chittagong Hill Tracts Statistics*, B Volume, 1921-1922 to 1930-31 (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1933), p.13.

[৩২৯] *The Humble Memorial of the Chiefs, Headmen and inhabitants of the chittagong Hill Tracts* in *Selections*, 1929, pp. 351-357.

করেই জীবিকা নির্বাহ করে।[৩৩০] ১৯২৫ সালের সরকারি রাজস্ব নথিতে দেখা যায় ১৮৭০ সালে যেখানে জুমচাষে নির্ভরশীল পরিবার ছিল ১০,০০০ এর নিচে সেখানে ১৯২৫ সালে জুমচাষি পরিবার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫,০০০-এ।[৩৩১]

ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে হালচাষের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সেখানে আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে যে ১৯৪৭-৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের বছরেও সরকার ভূমি রাজস্ব থেকে দুই লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করছে। চিফরা এ-উদ্যোগে প্রথমদিকে বিরোধিতা করলেও ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে রাজস্ব আয় থেকে আর্থিক কমিশন দিয়ে হালচাষ সম্প্রসারণ কাজ এগিয়ে নেয়। এভাবে ১৯২৫ সালের মধ্যেই দেড় হাজার বর্গমাইল এলাকা হালচাষের আওতায় আসে এবং ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার লোক যা জেলার মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ হালচাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এক্ষেত্রেও জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে ভূমি রাজস্বের হার কম রাখা হয়। ১৯২০ সাল পর্যন্ত একর প্রতি ভূমি রাজস্ব ছিল এক থেকে দুই টাকা। ১৯২১ সালের দিকে পার্বত্য জেলার হালচাষের জমিগুলোকে বন্দোবস্তের ধরণ, জমির অবস্থান, উৎপাদিকা শক্তি, সেচের সুবিধা, প্রভৃতি বিবেচনায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে বিভক্ত করে যথাক্রমে একরপ্রতি বাৎসরিক ৩ টাকা, ২ টাকা ও ১ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। ফলে হালচাষ সম্প্রসারণে এ খাজনা কখনো বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়নি। চাষিদের অসন্তোষের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে হালচাষ পাহাড়িদের জীবনে কতকগুলো ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দেয়। যথা- ১। ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার অধিকার লাভ; ২। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ; ৩। বিক্ষিপ্ত জীবনের বদলে স্থায়ী গ্রামীণ জীবন লাভ; ৪। ব্রিটিশদের সাথে সরাসরি যোগসূত্র না হলেও পাহাড়িদের স্বজাতীয় হেডম্যান বা দলপতির মাধ্যমে একটা সম্পর্ক স্থাপন; ৫। পাহাড়িদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকারী হিসেবে নিযুক্ত হেডম্যানরা সমাজে একটু উচ্চ স্তরে প্রভাব বিস্তার করে যা সমাজে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ সুগম করে; ৬। হালচাষকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের আগমন ও সাহচর্য লাভ পাহাড়িদের সামাজিক ও বস্তুগত সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা করে। এসব কারণে পাহাড়িরা দীর্ঘমেয়াদী ঔপনিবেশিক বহির্ভূত শাসনের অধীনে থেকেও এর তিক্ততা অনুভব করেনি। এর সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রভাবও সম্যকভাবে বুঝে উঠতে পারেনি তারা। ব্রিটিশ সরকার তার রাজনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের উপযোগী করেই পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্ব নীতি বা অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে। এর বড় সুফল হলো ৮৭ বছরের শাসন কালে তারা কোনো বড় ধরনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ বা পাহাড়ি বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়নি।

---

[৩৩০] R. H Sneyd Hutchison, *An Account of Chittagong Hill Tracts*, p. 50.

[৩৩১] Memo. No. 1408 G., dated Rangamati, the 15th May 1925. in *Selections*, 1929, p. 499.

হালচাষের অগ্রগতির চিত্র (মানচিত্র-৩.২)

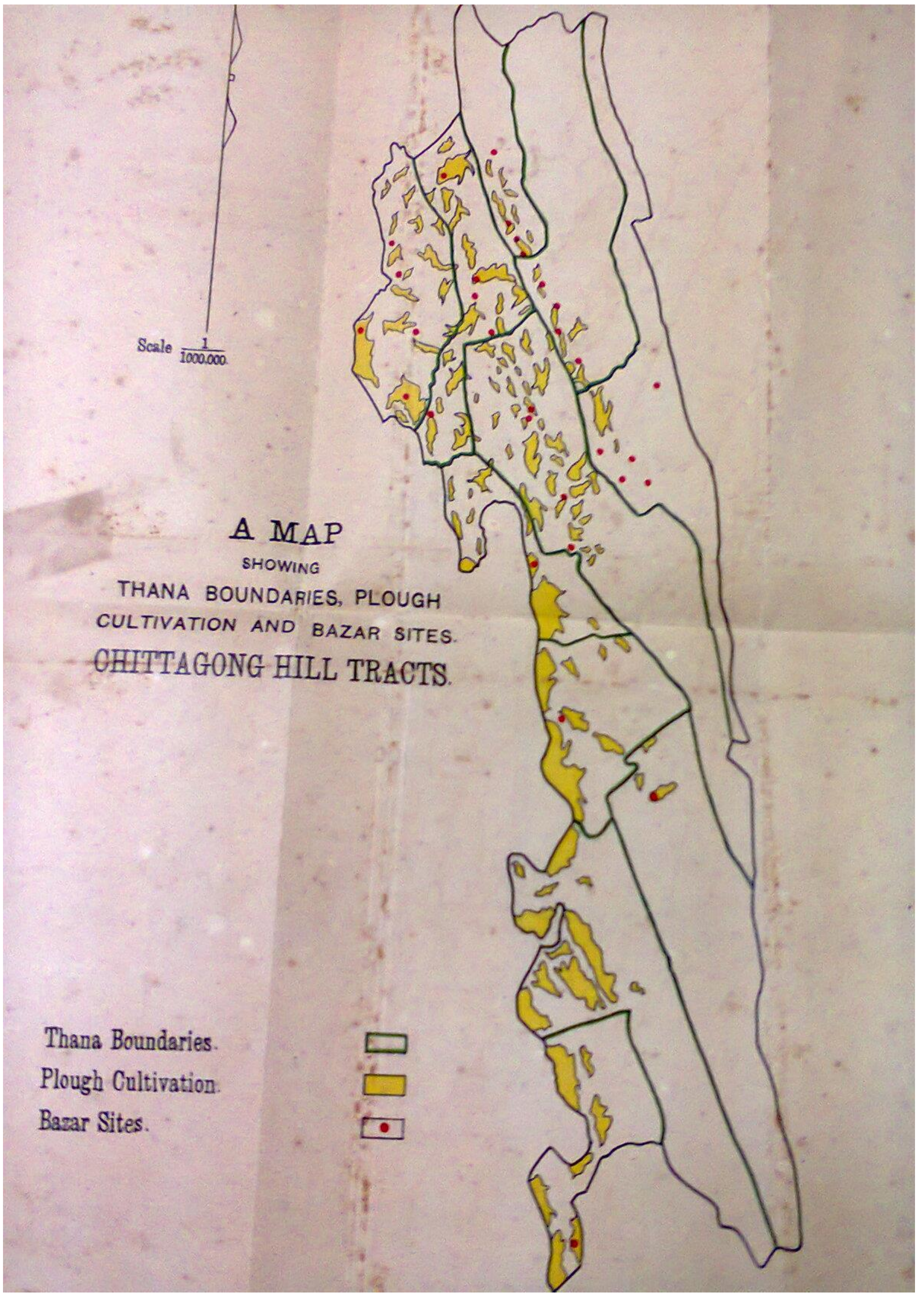

উৎস:- *চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল উইথ সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট* (পরিশিষ্ট)

৪র্থ অধ্যায়

পাকিস্তান সরকারের গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৪৭-১৯৭০

ভূমিকা : পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ছিল বাংলার গভর্নরের সরাসরি শাসনাধীন প্রশাসনিক ইউনিট। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনানুযায়ী এই জেলা ছিল বঙ্গীয় আইনসভার আওতা-বহির্ভূত সম্পূর্ণ পৃথক শাসিত অঞ্চল। এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ছিল 'সিভিল রাইটস' তথা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। সুতরাং বঙ্গীয় আইনসভায় তাদের কোনো প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ ছিল সুদূরপরাহত। একইভাবে বঙ্গীয় আইনসভারও পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনপ্রণালী বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়ন করার এখতিয়ার ছিল না। ফলে বঙ্গীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্বকারী কোনো রাজনৈতিক দলই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি নজর দেয়নি। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পার্বত্যবাসীদের কোনো 'পলিটিক্যাল ওয়েটেজ' বা রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ চিত্র পাল্টে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ সেখানকার জনগণের ভোটাধিকারহীনতা ও আইনসভায় প্রতিনিধিত্বহীনতার বঞ্চনা ঘুচিয়ে দেয়। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনোপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ এবং পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য দুটি আসন বরাদ্দের মধ্য দিয়ে অভিষেক ঘটে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার। অতঃপর পাকিস্তানি শাসনের দ্বিতীয় দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুবাদে ঐ পার্বত্য এলাকার জনগণও গণতন্ত্র এবং আধুনিক রাজনীতির প্রথম পাঠ লাভ করে। সর্বশেষ ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে চট্টগ্রাম জেলা থেকে আলাদা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ৩টি আসন বরাদ্দ করার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় জাতীয় রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া। এ অধ্যায়ে পাকিস্তান সরকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি নীতি কীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার স্থানীয় জনগণের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে সে-ইতিহাস পুনর্গঠন করা হয়েছে মৌলিক তথ্য-উপাত্ত ও দ্বৈতয়িক উৎস-সমর্থিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

৪.২ প্রাক-পাকিস্তানি যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের বিচ্ছিন্নতাবোধ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর্যালোচনায় উঠে এসেছে যে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক স্বার্থের পাশাপাশি স্থানীয় সামন্তবাদী পার্বত্য রাজাদের স্বার্থ এককাতারে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক বিযুক্তকরণকে শাসনতান্ত্রিক প্রপঞ্চ থেকে পাহাড়িদের চেতনাগত প্রপঞ্চে রূপান্তর ঘটিয়েছিল।

শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পক্ষে ব্রিটিশদের চাতুর্য উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। শওকত আরা হোসেন যথার্থই বলেছেন যে ''অত্যন্ত সুকৌশলে উপজাতিদেরকে ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবে উপজাতিরা এই কূটচাল কিছুই বুঝতে সক্ষম হয়নি।''[৩৩২] বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলই একটি সমাজে নতুন ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। কিন্তু বহির্ভূত শাসনাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার যে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিরাজমান ছিল তাতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক কৌশল অনুধাবন করার মতো উপযুক্ত নেতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল প্রধানত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল যেখানে গ্রামীণ সমাজ পরিচালিত হয় পরিবর্তনবিমূখ প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্ব দ্বারা। উপরন্তু এলাকাটি রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ায় জনগণ ছিল একইসাথে ভোটাধিকার বঞ্চিত ও আইনসভায় প্রতিনিধিত্বহীন। এই বঞ্চনা ও প্রতিনিধিত্বহীনতার পরিণামে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ব্রিটিশ-ভারত ও বাংলার রাজনৈতিক হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। তারা যেমন আছে তেমন থাকার মধ্যেই সন্তুষ্ট ছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাগত দিক থেকে আদি স্তরে থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষুদ্রকায় শিক্ষিত ও সচেতন অংশ দেশ ভাগাভাগির সময় আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ রাজ যেহেতু হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি মেনে নিয়েছিল সেহেতু পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ধারণা করেছিল তাদেরও পৃথক ইতিহাস, ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আছে সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য দাবির অধিকার তাদেরও আছে। ১৯৩৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রথম এম.এ ডিগ্রিধারী ব্যক্তির লেখায় এমন চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে:

> ভারতের অন্য প্রদেশে মুসলমান জাতি দাবী করে মুসলমান রাজ্য– হিন্দু দাবী করে হিন্দু রাজ্য – শিখজাতি দাবী করে শিখরাজ্য– দ্রাবিড় জাতি দাবী করে দ্রাবিড় রাজ্য– তবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেও চাকমা জাতি কেন স্বাধীন চাকমা রাজ্য,– বোমাং কেন বোমাং রাজ্য এবং মং কেন মংরাজ্য দাবী করবে না। এই তিনটী জাতি যদি নিজের জাতির গৌরব এবং অতীতের ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতে কামনা করে তবে এমনি তিনটি State রূপে সর্ব্ব প্রথমে নিজেদের শাসনব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। এই তিনটী রাজ্যের পুরাতন ইতিহাস দেখলে বুঝা যায় এরা একদিন স্বাধীন ছিল এবং এই তিনটি জাতি তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পাবে মাত্র। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম একমাত্র বৌদ্ধজাতির দেশ– এদেশে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন ওঠেনা– দু'টী ভিন্নজাতি বা ধর্ম্মের দলাদলি নেই– সুতরাং তিনটী Autonomous Constitutional State করা অতি সহজ।[৩৩৩]

অধিকন্তু ১৮৬০-১৯৪৭ পর্যন্ত ৮৭ বছরের পৃথক শাসনব্যবস্থায় লালিত পালিত হওয়ায় তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ বা বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম ও বিকাশ লাভ করা স্বাভাবিক। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই যুক্তি

---

৩৩২ শওকত আরা হোসেন, ''পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি সমস্যা ও বাংলাদেশ সরকার'' *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* ৮ম খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ১১৮-১৩৭ ।

৩৩৩ কুমার কোকনদাক্ষ রায়, এম.এ "বিপুল সুদূর" *গৈরিকা*, ৯ম বর্ষ ১০ সংখ্যা মাঘ, ১৩৫১, পৃ.৩৫৫-৩৫৮।

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি মাত্র ১০ বছর রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থাকায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয় এবং তারা তাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দাবি করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হারুন-অর-রশিদ দেখিয়েছেন যে বাংলার ১৯৩৭-৪৭ সময়কালের রাজনীতির প্রধান দিক হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ। বাংলায় হিন্দুদের দীর্ঘ সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ১৯৩৭ সাল থেকে কার্যত সরকারের বাইরে থাকায় তাদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়।[৩৩৪] ঐ বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি হিন্দুরা 'পশ্চিমবঙ্গ' নামে ভারত ইউনিয়নে পৃথক প্রদেশ আদায় করতে সক্ষম হয়। জয়া চ্যাটার্জীর গবেষণায় এরূপ অভিমতই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন:

> a large number of Hindus of Bengal, backed up by the provincial branches of the Congress and the Hindu Mahasabha, campaigned intensively in 1947 for the partition of Bengal and for the creation of a seperate Hindu province that would remain inside an Indian Union.[৩৩৫]

কিন্তু পাহাড়িরা তাদের পৃথক অস্তিত্ব ও পৃথক আবাসভূমির স্বপক্ষে কোনো কার্যকর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সেটা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে হোক আর মুসলিম লীগের ছত্রছায়ায় হোক বা স্বতন্ত্রভাবে হোক, কোনো প্রকারেই গড়ে তুলতে পারেনি। যেহেতু জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ কখনো পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেননি এবং পাকিস্তানের জন্মলগ্ন অবধি তার ভাবমূর্তি ছিল, ইতিহাসবিদ আহমেদ কামালের মতে, ''অস্বচ্ছ ও অনিশ্চিত'',[৩৩৬] একইভাবে আবুল মাল আবদুল মুহিতের মতে, 'পাকিস্তান একটি আধুনিক প্রজাতন্ত্র, না ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে, সেটা নিয়ে ছিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা'[৩৩৭] সেহেতু মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাহাড়িরা মুসলিম লীগের আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়নি।[৩৩৮] কিন্তু বিকল্প যে ছিল না, তা নয়। ১৯৩০-এর দশকে 'পূর্ব বাংলার সবচেয়ে অগ্রদর্শী সন্তান'[৩৩৯] এ কে ফজলুল হকের আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁরই নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক ও কৃষকবান্ধব রাজনৈতিক চেতনার ধারক কৃষক প্রজা পার্টির রাজনীতি শক্তিশালী হয়। এ ঘটনাকে ইতিহাসবিদ ও

---

[৩৩৪] হারুন-অর-রশিদ, ''বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা ১৯৩৭-১৯৪৭'' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.),*বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, দ্বিতীয় সংস্করণ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০), পৃ. ২৬৭।

[৩৩৫] Joya Chatterji, *Bengal divided: Hindu communalism and partition*, 1932-1947 (New Delhi: Cambrige University Press. paperback edition, 1996), p. 227.

[৩৩৬] আহমেদ কামাল, ''স্বাধীনতার সময়ে পূর্ব বাংলা'' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৪০৪।

[৩৩৭] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০১), পৃ. ৬৭।

[৩৩৮] ফারুক চৌধুরী, "শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ: বাংলার অশান্ত অগ্নিকোণ (২)" *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৯ মার্চ ১৯৯৭।

[৩৩৯] Lawrence Ziring, ফজলুল হককে আখ্যায়িত করেছেন, ``Fazlul Huq was acknoledged to be East Bengal's most heralded son.'' দেখুন- *Bangladesh: From Sheikh Mujib to Ershad- An Interpretive Study* (Dhaka: University Press Ltd, 1994), p. 11.

জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত সালাহ্উদ্দীন আহমদ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩৪০] পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ যেহেতু সিংহভাগই কৃষক সুতরাং তারা ঐ পার্টির সাথে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে জনমত গঠন করতে পারতেন। কিন্তু এই ধরনের কোনো প্রয়াস তারা নেননি। উপরন্তু কংগ্রেস যেহেতু অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ভারতের কথা বলেছে সেহেতু মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সাথে একাত্ম হওয়ার বিকল্পও উপজাতিদের সামনে ছিল। বাস্তবে এর কোনোটাই ঘটেনি তার মূল কারণ ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি। ভোটাধিকার না থাকার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাহাড়িদের কোনো গুরুত্বই ছিল না। অথচ ঐ একই আইনে বাংলার মফস্বল এলাকায় সাধারণ হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য আইনসভায় সিংহভাগ আসন বরাদ্দ দেওয়ায় পূর্ব বাংলার গ্রামীণ এলাকাগুলোর রাজনৈতিক গুরুত্ব হঠাৎ করেই আকাশচুম্বী হয়। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বা প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভোটাধিকারই এলাকাগুলোর বা এলাকার মানুষগুলোর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে অন্য কিছুর পক্ষে তা সম্ভব নয়। বিষয়টি এমন যে এখানে সরকারি নীতিই শাসিতদের রাজনীতিকে পরিচালিত করে; শাসিতদের রাজনীতি সরকারি নীতিকে নয়। জয়া চ্যাটার্জীর মূল্যায়নও এমনটিই প্রকাশ করে,

> Until the changes introduced by the 1935 Act, the Bengal Congress had paid little heed to the countryside except for the occaisional foray which agitational politics sometimes required. Neither the Non-Cooperation movement nor Civil Disobedience succeeded in penetrating the mofussil. No party had made a serious attempt to create an organisational base in rural Bengal. Now, suddenly, it was rural Bengal that mattered and any party or faction intending to achieve power in the provincial assembly had to win over the countryside. The 1935 Act was followed by a scramble by parties and politicians of all hues to win the mofussil. Muslim politicians were particularly quick to respond to the challenge.[৩৪১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ভোটাধিকার বঞ্চিত থাকাতে এলাকাটি রাজনৈতিকভাবে অগুরুত্বপূর্ণ ও অসংগঠিতই থেকে যায়। ঐক্যবদ্ধ গণশক্তিই দাবি আদায়ের প্রধান সহায়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্তপ্রভু ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যকার চিন্তাধারা ও স্বার্থের পার্থক্য ছিল বিস্তর।

---

[৩৪০] এ এফ সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৮৯।

[৩৪১] Joya Chatterji, *প্রাগুক্ত পৃ.৬৮।* "১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বঙ্গীয় আইনসভায় ২৫০টি আসন স্থির করা হয়। সাধারণ হিন্দুদের জন্য বরাদ্দকৃত ৭৮ টি আসনের মধ্যে কেবলমাত্র ১২টি সিট শহর এলাকার জন্য বরাদ্দ ছিল বাকী ৬৬ টি আসন পল্লি এলাকার জন্য সংরক্ষণ করা হয়। আবার মুসলমানদের জন্য বরাদ্দকৃত ১১৭টি আসনের মধ্যে মফস্বল এলাকার জন্য বরাদ্দ করা হয় ১১১টি আসন। ফলে ১৯৩৫ সালের আইনানুসারে বাংলায় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদরা পল্লি এলাকায় জয়ী হওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে।"

তারা কখনো কোনো ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারেনি বিধায় কোনো ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনও গড়ে তুলতে পারেনি। স্থানীয় পর্যায়ে অসংগঠিত এবং প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মোর্চার সঙ্গে পার্বত্য জনগণের সম্পর্কহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণে দেশ ভাগাভাগির সময় ব্রিটিশ সরকার পাহাড়িদের দাবিগুলোর ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে।[৩৪২]

পাকিস্তানের অভ্যুদয়, সীমানা সমস্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তি

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কিছু উপজাতীয় এলাকা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা যার অন্য অর্থ কট্টর হিন্দু আধিপত্য বিরোধিতা।[৩৪৩] অন্যদিকে কংগ্রেসের একাংশের 'ব্রুট ম্যাজরিটি'র ঔদ্ধত্য ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণও মুসলিম লীগকে পাকিস্তান কায়েমের মতো কঠোর সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে যুক্তভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিগৃহীত হওয়ার ভয় ও শংকা থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্রগঠন অনিবার্য বলে এর নির্মাতারা প্রচারণা চালিয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্বাধীনতা পরবর্তী বক্তব্য থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের মর্মার্থ অনুধাবন করা যায়:

> We demanded Pakistan, we struggled for it; we achieved it, so that physically as well as spiritually we are free to conduct our affairs according to our traditions, and genius. Brotherhood, equality and fraternity of man-- these are the basic points of our religion, culture and civilization. And we fought for Pakistan because there was a danger of denial of these human rights in this sub-continent. We aspired for these great ideals because of centuries of dual domination by the foreign rulers and by a caste-ridden social system.[৩৪৪]

এ ধরনের প্রচারণানির্ভর আন্দোলনে মুসলিম লীগের ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের অবয়বটি প্রতিফলিত হতো। জাতীয়তাবাদের ধারণায় রাষ্ট্রগঠন হচ্ছে মুখ্য উপাদান ও উদ্দেশ্য। সহজ কথায় ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মূল দাবি ছিল মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি ও তাদের জন্য পৃথক

---

[৩৪২] খোদ মুসলিম লীগ বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্তঃকলহে লিপ্ত হয়ে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় মাউন্টব্যাটেন পূর্ব বাংলার সীমানা নির্ধারণে লীগের দাবি অবলীলায় অগ্রাহ্য করেন।

[৩৪৩] Safar A. Akanda, *East Pakistan and Politics of Regionalism*, an unpublished PhD disseration, (Denver: University of Denver, 1970), p. 25.

[৩৪৪] Jamil-ud-Din Ahmed, ''Pakistan: Concept And Practice'' in *Pakistan Oberserver, An Observer Supplement*, October 27, 1967.

আবাসভূমি বা রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা। মুক্ত জাতির স্বপ্ন পূরণের মোহে মুসলিম লীগের প্রচারণায় বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা ব্যাপক সাড়া দিয়েছিল। পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছিল জমিদারি-মহাজনি শাসন ও শোষণমুক্ত মুক্তভূমি অর্জন। তাজ হাশমীর মতে,

> League leaders of all categories-- *ashraf, ulama, jotedars and bhadralok* -- however, put greater emphasis on the attainment of Pakistan as the pre-condition for attaining an exploitation-free society or a ‘‘peasant utopia”. Soon the demand for Pakistan became an integral part of the demands for the abolition of the zamindari-mahajani systems and better job and educational opportunities for the Muslims of the region.[৩৪৫]

১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলমানদের পাকিস্তানের পক্ষে গণরায়ই তার বড় প্রমাণ। ওই নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১২১ টি আসনের মধ্যে ১১৩টি আসন লাভ করে।[৩৪৬] জয়া চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন,‘‘

> The Muslim League attracted 86.7 per cent of total Muslim vote in the election to the central Assembly in contrast to the minuscule number of votes the Congress attracted, a mere 1.3 per cent. In the provinces, the League won 74.7 per cent of all Mulsim votes while the Congress won only 4.67 per cent. [৩৪৭]

নির্বাচনের ফলাফল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিল যে অবিভক্ত বাংলার মুসলমান ভোটদাতারা মুসলিম লীগের পিছনে আছেন। এ নির্বাচনী রায়ের ফলে ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে ভারতের কিছু অংশ আলাদা করে পাকিস্তান গঠন করা সহজতর হয়। অবশেষে পাকিস্তান জন্মলাভ করেছিল ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে। কেননা মুসলীম লীগ তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার কথা বলে এবং ১৯৫০ সালে এর অবসানও হয়। অর্থনৈতিক কারণ যুক্ত হওয়ায় মুসলমান প্রজা ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নমশূদ্র প্রজা এক সাথে রাজনীতি এবং সরকার গঠন করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সর্বভারতীয় পর্যায়ে কথিত দুই জাতির–হিন্দু ও মুসলমান– সমস্যা আপাত সমাধান দিলেও পূর্ব থেকে বিরাজমান স্থানীয় নৃগোষ্ঠীগত সমস্যাগুলো অমীমাংসিত থেকে যায়। পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য দুটি সীমানা কমিশন গঠন করেও জাতিগত সমস্যা নিরসন করা যায়নি। উক্ত দুটি বাউন্ডারি কমিশনের অ্যাওয়ার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পূর্বে দুই

---

[৩৪৫] Taj ul-Islam Hashmi, *Peasant Utopia The communalization of Class Politics in East Bengal, 1920-1947* (Dhaka: The University Press Ltd, 1994), p. 251.
[৩৪৬] Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal 1937-1947* (New Dehli: Impex India, 1976), p. 197-98.
[৩৪৭] Joya Chatterji, *Bengal divided*, p. 223.

দেশের মধ্যকার জাতি ও ধর্মভিত্তিক সীমানা সংক্রান্ত বির্তক ও সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য ১৯৪৭ সালের ১৬ আগস্ট দিল্লিতে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নবসৃষ্ট পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বিস্ময়করভাবে তাদের তথাকথিত দ্বি-জাতি তত্ত্বকে বিদায় জানিয়ে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল পাকিস্তানভুক্ত করার জন্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে প্রবল তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।[৩৪৮] অথচ ধর্ম ও সম্প্রদায় বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কারোর দাবিই প্রতিষ্ঠিত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫,০০৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২,৪৭,০৫৩ জন। মুসলমান জনসংখ্যা ৭,২৭০ জন অর্থাৎ ২.৯৪%। অবশিষ্ট সকলেই অমুসলমান পাহাড়ি জনগোষ্ঠী। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পুরো ভাগাভাগিকে বাংলা বা পাঞ্জাবভিত্তিক খুচরা দরে দরকষাকষি না করে পাইকারিভাবে মীমাংসা করার জোর দাবি জানান। লিয়াকত আলী খানসহ মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দের অনমনীয় অবস্থান ৯৭ ভাগ মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। অমুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে সংযুক্ত করার অভিপ্রায়ে পাকিস্তানি নেতাদের উপস্থাপিত যুক্তিতর্কের প্রতিপাদ্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ছিল না, ছিল কর্ণফুলী নদীর খরস্রোত যা হবে পূর্ব বাংলার জলবিদ্যুতের একমাত্র সম্ভাবনাময় উৎস। শরদিন্দু মুখার্জীর মতে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ নির্মাণ এবং কর্ণফুলী পেপার মিল তৈরির লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানে রাখার *রেইজন ডেটর* (*raison d'être*).[৩৪৯] স্বাধীনতার পর দেখা গেল পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের ১৫ই মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ১৬ মার্চে ঘোষিত স্বাধীনতার পর প্রথম বাজেটে বন্যা নিয়ন্ত্রণ জরিপ ও হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্পের জন্য ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।[৩৫০]

পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের সীমানাভুক্ত করায় একদম গোড়া থেকেই পাকিস্তান আর নিরঙ্কুশভাবে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির চরিত্র ধারণ করতে পারেনি। বলা প্রাসঙ্গিক যে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতো তফসিলি হিন্দুরাসহ নতুন রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হয় অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী। যেমন র‌্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে দেশবিভাগের দ্বারা ময়মনসিংহের গারো সমাজদেহকে দুই টুকরো করে কিছু অংশ পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহে আর কিছু অংশ আসামে রেখে দেওয়া হয়। এতে বুঝতে বাকি রইল না যে ধর্মীয়, জাতিগত, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিবেচনা নতুন

---

৩৪৮ Nicholas Mansergh and Panderel Moon (eds.) *The Transfer of Power 1942-7,* 12 vols. (London: Her Majesy's Stationery Office, 1983), pp. 737-740.

৩৪৯ Saradindu Mukherji, *Subjects, Citizens and Refugees: Tragedy in the Chittagong Hill Tracts (1947-1998*) (New Delhi:Indian Centre for the Study of Forced Migration, 2000), p. 30.

৩৫০ মো. আব্দুল লতিফ ভুঁইয়া, *পূর্ব বাংলার সরকার ও রাজনীতি, ১৯৪৭-১৯৫৪* অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, (রাজশাহী: আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), পৃ. ১৬১।

রাষ্ট্রদ্বয়ের সীমানা নির্ধারণে নিয়ামক ছিল না, এদের বিশেষ রাজনৈতিক ভূ-সীমা নির্ধারিত হয়েছিল বিদায়ী ঔপনিবেশিক শক্তি এবং বিবদমান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের দর কষাকষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক বিবেচনা দ্বারা। লরেন্স জাইরিং এর মন্তব্য এক্ষেত্রে আমলে নেওয়া যায়: ''জনগণের মধ্যকার ঐতিহ্যগত গতিশীলতাকে মন্থর ও সীমাবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক সীমানাসমূহ টানা হয়েছে।''[৩৫১] এসব স্মরণ করে যশোবন্ত সিংহ সখেদে লিখেছেন, ''বিভাজনের অন্তিম লগ্নটা এক নিষ্ঠুর সৌজন্যবর্জিত সংখ্যা বিনিময় হয়ে উঠল– তুমি এইটুক নাও, তার বদলে আমাকে ওইটুক দাও। এভাবেই এই মহান ও প্রাচীন ভূখণ্ডটির সংহতি টুকরো হয়ে গেল।''[৩৫২] তা সত্ত্বেও চূড়ান্ত ভাগাভাগিতে পাইকারিভাবে পাকিস্তান ''বড় ভাইয়ের শক্তির'' কাছে হেরে যায়। মুসলিম লীগের দাবিকৃত কলকাতা[৩৫৩] যেমন পাকিস্তানের ভাগে পড়েনি তেমনি পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার জিরা (৬৫.২ ভাগ মুসলমান) ও ফিরোজপুর (৫৫.২ ভাগ মুসলমান) তহসিল (মহকুমা), বাটালা, জুলুন্দর চলে যায় পূর্ব পাঞ্জাব তথা ভারতের ভাগে। বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ, মালদাহ, নদীয়া জেলা এবং যশোর ও সিলেট জেলার সাড়ে তিনটি থানা আসামকে প্রদান করা হয়। অবিভক্ত বঙ্গদেশের দুটো জেলা গোয়ালাপাড়া ও কাছাড় আসামকে প্রদান করা হয়– যা ১৮৭৪ সালে আসাম প্রদেশ গঠনের বাংলা থেকে কেটে (সিলেটসহ) নতুন প্রদেশে যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তীব্র গাত্রদাহ ও ভীষণ মনোবেদনা সত্ত্বেও জিন্নাহ চূড়ান্তভাবে ভাগে যা পেয়েছিলেন তা নিজে যেমন মেনে নিয়েছিলেন এবং অন্যদেরকেও বিদ্রোহ না করে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৩৫৪] এরপর তিনি দেশ গঠনে মনোনিবেশ করেন।

নতুন রাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য প্রয়োজন ও কাঙ্ক্ষিত ছিল জনগণের দ্বিধাহীন আনুগত্য। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের সংযুক্ত করার প্রতিবাদে কিছু শিক্ষিত চাকমা যুবক কর্তৃক রাঙামাটিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন ও সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা এবং একইভাবে বান্দরবানে মারমাদের

---

[৩৫১] উদ্ধৃত- আহমেদ কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৪।

[৩৫২] যশোবন্ত সিংহ, *জিন্না: ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা*, পৃ. ৪৩৪।

[৩৫৩] শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলার সীমানাকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কলকাতাকে পূর্ব বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন সীমানা কমিশনে হাজির হয়ে। দ্রষ্টব্য- আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব, পৃ. ৬৯।*

[৩৫৪] Jinnah declared the boundary Awards, ''unjust,'' ''incomprehensible'' and even ''perverse.'' He termed them as ''political Awards'' and not judicial one. He also knew that besides many other loses, the award of Calcutta to India would be the most serious blow to Pakistan and it would be economically very difficult for East Bengal to function without that important city. Yet, since he had pledged to accept the Awards of the commission, he said that he and the people of Pakistan would accept the Awards. Jinnah tried to make the people realize that the Boundary Commissions's Awards were final and unalterable and thus they should not react to the decision. He advised his countrymen to bear this misfortune with courage and hope. The people, who had profound respect for Jinnah, accepted his advice and did not agitate against the Award. Farooq Ahmad Dar, ''Boundary Commission Award: The Muslim League Response'' in *Pakistan Journal of History & Culture,* 3.1(2012): 13-34.

বার্মিজ পতাকা উত্তোলন সংক্রান্ত ঘটনাবলি নব্য রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কাঙ্ক্ষিত আনুগত্য নিয়ে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের ভাবিয়ে তোলে। অতএব, এ ভূখণ্ডের জনগণকে পশ্চিমা আদলে একক 'পাকিস্তানি' জাতীয় পরিচিতিভিত্তিক জাতি-রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সংহতকরণ নতুন রাষ্ট্রের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। কলকাতা কেন্দ্রিক গবেষকদল[৩৫৫] মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের সংহতকরণ সমস্যা দক্ষিণ এশিয়ার জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গেও প্রযুক্ত। যেমনটি ভারতের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে NEFA অঞ্চল ও নাগা উপজাতিদেরকে 'ভারতীয়' পরিচিতির মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও জাতীয় সংহতি নীতির সূচনা হয় ।

৪.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে পাকিস্তান জ্ঞাতসারে স্বতন্ত্র জাতি চেতনাসম্পন্ন উপজাতি এলাকা তার সীমানাভুক্ত করে নিয়েছিল যেখানে ঔপনিবেশিক আমল থেকে প্রচলিত ছিল বিশেষ শাসন প্রণালী। পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হিসেবে নিজস্ব রাষ্ট্রের নীতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন করার এখতিয়ার লাভ করে। পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত বহির্ভূত শাসনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে আসে। এর কারণ সহজেই বোধগম্য যেমনটি John H Bodley বলেছেন, "Newly independent nations have been eager to politically incorporate zones that former colonial government had left relatively undisturbed, on the theory that such zones had been deliberately perpetuated in order to create division within the country."[৩৫৬] পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ জেলা থেকে সাধারণ জেলা হিসেবে রূপান্তর করে প্রদেশের সাধারণ আইন ও বিধি বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার নীতি গ্রহণ করে। সরকারের এই প্রাদেশিকরণ নীতি ও তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড ঘোষিত হয়। অল ইন্ডিয়া রেডিও-এর বাংলা ভাষ্যকার বিজন বোস ১৭ আগস্ট খবরে জানান যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।[৩৫৭] অবশ্য এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে

---

[৩৫৫] দেবযানী দত্ত ও অনসূয়া বসু রায় চৌধুরী, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম* (কলকাতা: ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপও সাউথ এশিয়া ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস, ১৯৯৬), পৃ. ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

[৩৫৬] John H Bodley, *Victim of Progress* (Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Fifth Edition, 2008), p. 76.

[৩৫৭] স্নেহাশীষ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

অন্তর্ভুক্তির দাবিতে তৎকালীন রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির সেক্রেটারি স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে কিছু যুবক রাঙামাটিতে জেলা প্রশাসকের অফিসে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে। আর বান্দরবানে বোমাং রাজাদের উদ্যোগে উত্তোলন করা হয় বার্মিজ পতাকা। সাবেক কূটনীতিক ফারুক চৌধুরী পাহাড়িদের এঘটনাকে 'একটি অদূরদর্শী প্রচেষ্টা' হিসেবে গণ্য করেন এবং এর 'অসাফল্যও অবধারিত' বলে ঠাওর করেন।[৩৫৮] পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সেটাই প্রমাণ করে। সরকারিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগে অন্তর্ভুক্ত– এ ঘোষণার পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র রাঙামাটিতে উড্ডীন থাকা ভারতীয় এবং বান্দরবান মহকুমায় উত্তোলিত বার্মিজ পতাকা নামানোর জন্য সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ত্বরিৎ সামরিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। রাষ্ট্রে স্বভাব ধর্ম হচ্ছে নিজের আত্মরক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করা। আর সেই জন্য কোনো একটা রাষ্ট্র একবার বাস্তব-রূপ ধারণ করলে, তার পরিচালকদের প্রথম চেষ্টা হয় দেশের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা করা। পাকিস্তান সেটাই করে দেখাল। এ ঘটনা এটাই ইঙ্গিত করে যে সরকার উপজাতি বা আঞ্চলিক সমস্যা নমনীয় পন্থার চেয়ে সামরিক পন্থায় সমাধান করতে বেশি আগ্রহী। সম্ভবত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় এবং জেলার শিক্ষিত অংশ ভারতে অন্তর্ভুক্তির দাবি করায় স্বাভাবিকভাবে ভারত কর্তৃক জেলাটি দখলে নেওয়ার ঝুঁকি পাকিস্তান সরকার নিতে চায়নি। কারণ ভারত জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে দখল নিয়েছিল। বলা প্রাসঙ্গিক স্নেহকুমার চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে রাখার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে সামরিক হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। এতে পাকিস্তান সরকারের সীমান্তের নিরাপত্তা জোরদার করা আশু করণীয় হয়ে পড়ে। John H Bodley-এর নিচের পর্যবেক্ষণও এমনটাই আভাস দেয়,

> Many newly independent nations followed an active policy of exerting control over the tribal areas in the professed interest of national unity. Economic consideration aside, government authorities see the existence of autonomous tribal populations within the boundaries of the state as a challenge to their authority and a possible invitation to aggression by foreign powers.[৩৫৯]

মিজানুর রহমান শেলীর গবেষণায় দেখা যায় দেশ বিভাগকালীন সন্দেহ, অবিশ্বাস ও তুমুল গোলযোগপূর্ণ দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বিরোধী সব নেতাদের রাজনৈতিকভাবে একঘরে করে রেখেছিল। সিন্ধু প্রদেশের জি এম সাঈদ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমান্ত গান্ধী নামে খ্যাত খান আবদুল গাফফার খানকে পাকিস্তান সৃষ্টির পরই কারারুদ্ধ করা হয়। পূর্ব বাংলার শীর্ষস্থানীয় বাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেমন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান

[৩৫৮] ফারুক চৌধুরী, 'শুক্ল পক্ষ, কৃষ্ণ পক্ষ'
[৩৫৯] John H Bodley, *op., cit.,* p. 77.

ভাসানী, আবুল হাশিম, আবুল মনসুর আহমেদ প্রমুখকে রাজনৈতিকভাবে একঘরে করে রেখেছিল।[৩৬০] সেই বাস্তবতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো এলাকার নেতাদের প্রতি পাকিস্তানের পদক্ষেপ খুব একটা নমনীয় ছিল না এটা আঁচ করা যায়।

এটা অনস্বীকার্য যে, মুঘল আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় রাজাদের অভ্যন্তরীণ শাসনে স্বাধীনতা ছিল। ব্রিটিশ আমলেও বিভিন্ন আধুনিক আইন দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র সাংবিধানিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। ১৮৬০ সালের ২২ নং আইনে পৃথক জেলা, ১৮৭৪ সালের সিডিউল ডিসট্রিক্ট এ্যাক্ট দ্বারা তফসিলি জেলা, ১৯০০ সালের ১ নং রেগুলেশন বলে নন-রেগুলেটেড জেলা, ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইন মোতাবেক 'অনগ্রসর অঞ্চল' এবং সর্বশেষ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে 'সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বরাবরই একটি স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক অস্তিত্ব ছিল ।
ভারত বিভাগের আগে ব্রিটিশ-ভারত সরকার উক্ত আংশিক বহির্ভূত ও 'সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত অঞ্চল' এবং দেশীয় রাজ্যগুলি শাসনের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করেছিল। পাকিস্তান সরকার প্রাথমিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্বেকার আংশিক ও সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত 'রাজ্য ও সীমান্ত অঞ্চল সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়' (মিনিস্ট্রি অব স্টেটস অ্যান্ড ফ্রন্টিয়ার রিজিয়নস্) এর অধীনে ন্যস্ত করে।[৩৬১]
পাকিস্তান একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হলেও একজাতি রাষ্ট্র ছিল না। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে ও আফগানিস্তানের সীমান্ত বরাবর ছিল উপজাতি এলাকা। তবে উপজাতি হলেও এসব অঞ্চলের জনগণ ছিলেন মুসলমান এবং তাদের জন্য স্বায়ত্তশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু অমুসলিম উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীনতম স্বায়ত্তশাসনের রীতি ও ঐতিহ্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হয়নি।[৩৬২] উল্টো ব্রিটিশ আমলে প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক, স্তম্ভ ও রক্ষাকবচগুলো অকার্যকর করে দেয়া হয়। তন্মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনী। এ পুলিশ বাহিনীর আলাদা নিয়মকানুন ছিল। ব্রিটিশ শাসকরা জেলার শান্তি শৃঙ্খলা ও পার্বত্যবাসীর নিরাপত্তার জন্য পাহাড়িদের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করেছিল ১৮৮১ সালের ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন দ্বারা। পাকিস্তান সরকার র‌্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদে উক্ত পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করে থাকতে পারে এমন সন্দেহবশত ঐ রেগুলেশন খারিজ এবং পুলিশ বাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করে। পাকিস্তান সরকারের এমন

---

[৩৬০] Mizanur Rahman Shelley, *Emergence of a New Nation In a Multi-Polar World: Bangladesh* (Dhaka: Academic Press and Publishers Ltd, 2000), p.31.

[৩৬১] Wolfgang Mey (ed.), *Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (Cophenhagen: IWGIA Document 51, 1984) p. 98.

[৩৬২] পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, *'জীবন আমাদের নয়' বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ও মানবাধিকার* (আপডেট ৪, ২০০১), পৃ. ২২। শাহরিয়ার কবির, ''শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম'' *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭।

পদক্ষেপ একদিকে নব্য রাষ্ট্রের প্রতি প্রান্তবর্তী জনগণের মানসপটে ভীতি ও আশংকার উদ্রেক করে। অন্যদিকে জেলাটিকে সাধারণ জেলার মতো প্রাদেশিক পুলিশি কাঠামোর মধ্যে আনার দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়াকে একধাপ এগিয়ে দেয়। তৎকালীন পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে রাজা ত্রিদিব রায় লিখেছেন, ‘‘The Hill Tracts police was a separate police force recruited from within the Tracts and under the direct control of the Deputy Commissioner, or the Superintendant, from 1860 on. Now it was disbanded and the Bengali provincial police took over.’’[৩৬৩]

এটাও উল্লেখযোগ্য যে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় পুলিশ প্রশাসনে ২,৫০০ লোকবলের ঘাটতি ছিল। স্বরাষ্ট্র বিভাগে খালি ছিল ৩০০ অফিসারের পদ। পুলিশ বিভাগের উক্ত ঘাটতি মোকাবেলার উদ্দেশ্যে পার্বত্য জেলার বিশেষ পুলিশ বাহিনীকে আত্মীকরণ করার সম্ভাবনাও অমূলক নয়। এছাড়া পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনের আইনি ভিত্তি ও প্রতীক ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৩৮ নং বিধি লংঘন করে একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে *মোহাজের* পুনর্বাসন করে। ১৯৪৯-৫০ সালের সরকারি প্রশাসনিক রিপোর্টে এ জেলায় পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মোহাজের পুনর্বাসনের বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত জেলা প্রশাসক মেজর এল এইচ নিবলেট লিখছেন,

> Of the refugees who came to East Pakistan for shelter owing to communal disturbances in West Bengal and Assam, Government decided to rehabilitate 2,000 of them in this district. Huts have been constructed in the Sadar and Banderban Subdivisions for them. Arrangements are complete for their rehabilitation. Lands have been earmarked and reclaimed for cultivation by them.[৩৬৪]

এঁরা সেই ব্রিটিশ প্রশাসক যারা একসময় পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ছাড়া অন্যজাতিদের প্রবেশে কঠোর নিষেধাজ্ঞার নীতি চালু করেছেন তারাই এখন খোলচ পাল্টে রাষ্ট্রের ‘অনুগত চাকর’ হিসেবে বহিরাগতদের বসবাসের সকল ধরনের সরকারি সুবিধার বড় ব্যবস্থাপক। ১৯৫০-৫১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত প্রশাসনিক প্রতিবেদনে শরণার্থী পুনর্বাসনের তথ্য পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে:

> 370 huts were constructed in 8 different centres in the Sadar and the Bandarban Subdivisions of the district during the year under report for accommodation of 2,000 agriculturist refugees coming from West Bengal and Assam as a result of the communal disturbances there in 1950. In all 2111 refugees, upto March, 1951, were recieved in this district and out of them 748 left for Bharat and 120 died.

[৩৬৩] Tridiv Roy, *The Departed Melody* (Islamabad: PPA Publications, 2003), p. 148.

[৩৬৪] Government of East Pakistan, Board of Revenue, *Report on the Administration of the Chittagong Hill Tracts for the Year 1949-50* (Dacca: East Pakistan Govt. Press, 1959), p.10.

> There were 1243 refugees in different camps of the district upto the end of the year.[৩৬৫]

সরকার এ শরণার্থীদের পুনর্বাসনের পিছনে জেলার বরাদ্দের উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে; ১৯৫০-৫১ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,২০,০০০ টাকা। এছাড়া শরণার্থীদের প্রতি পরিবারকে ৫০ টাকাসহ ব্যবসা ও গৃহ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা করে নগদ বিতরণ করা হয়।[৩৬৬] শুধু তাই নয় *মোহাজেররা* যাতে অন্য জেলায় চলে না যায় সেজন্য যথাযথ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে গঠন করা হয় *মোহাজেরিন উপনিবেশ সমিতি*, চিকিৎসা সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় হাসপাতাল।[৩৬৭] এখানে এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে ভারতে ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদের কারণে সামাজিক সহাবস্থান সম্ভব হয়নি বিধায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে সরকার সত্যিকার অর্থে দাঙ্গা এড়াতে সদিচ্ছুক হলে এবং নতুন রাষ্ট্রে সুস্থ সামাজিক সহাবস্থানকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে এসব মুসলিম *মোহাজেরদের*কে আরও কম রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করে পূর্ব বাংলার বহু মুসলিম অধ্যুষিত জেলার অন্য যেকোনো একটিতে পুনর্বাসন করতে পারতো যেভাবে করা হয়েছিল বিহারীদের। কিন্তু সেটা না করে ৯৮ ভাগ অমুসলিম অধ্যুষিত দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন? পশ্চিম পাকিস্তানের এমন অনেক অঞ্চল ছিল যেখানে জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ২ জনেরও কম (মানচিত্র ৪)। এখানে সরকারের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি ছিল। এভাবে ক্রমাগত শরণার্থীর চাপে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর রাঙামাটির জনসংখ্যা মাত্র ৬ বছরে ১০ গুণ বৃদ্ধি পায় বলে ১৯৫৩-৫৪ সালের জেলার প্রশাসনিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়ঃ ‘‘The population of the town has been increased about 10 times after partition.’’[৩৬৮] ১৯৬১ সালের পাকিস্তান পপুলেশন সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫,৩২২ জনে; ১৮৭৬ এ যেখানে এঁদের সংখ্যা ছিল ৩৮১ জন, আর ১৯৪৭ সালে ছিল মাত্র ৭২৭০ জন।[৩৬৯] এতে স্থানীয় পাহাড়ি অধিবাসীরা উদ্বিগ্ন ও আতংকিত হয়ে পড়ে।

---

[৩৬৫] Government of East Pakistan, Board of Revenue, *Report on the Administration of the Chittagong Hill Tracts for the Year 1950-51* (Dacca: East Pakistan Govt. Press, 1959), p.13.

[৩৬৬] Ibid.

[৩৬৭] Govt. of East Pakistan, Board of Revenue, *Report on the Administration of the Chittagong Hill Tracts for the Year 1953-54* (Dacca: East Pakistan Govt. Press, 1959), p. 13.

[৩৬৮] Govt. of East Pakistan, *Report on the Admn of the CHT for the year 1953-54*, p. 2.

[৩৬৯] Govt. of East Pakistan. *Population Census of Pakistan 1961: Final Tables of Population, Census Bulletin- 2;* Sex, Urban-Rural, Religion (Karachi: Ministry of Home Affairs, 1961), p. 130.

মানচিত্র ৪.১

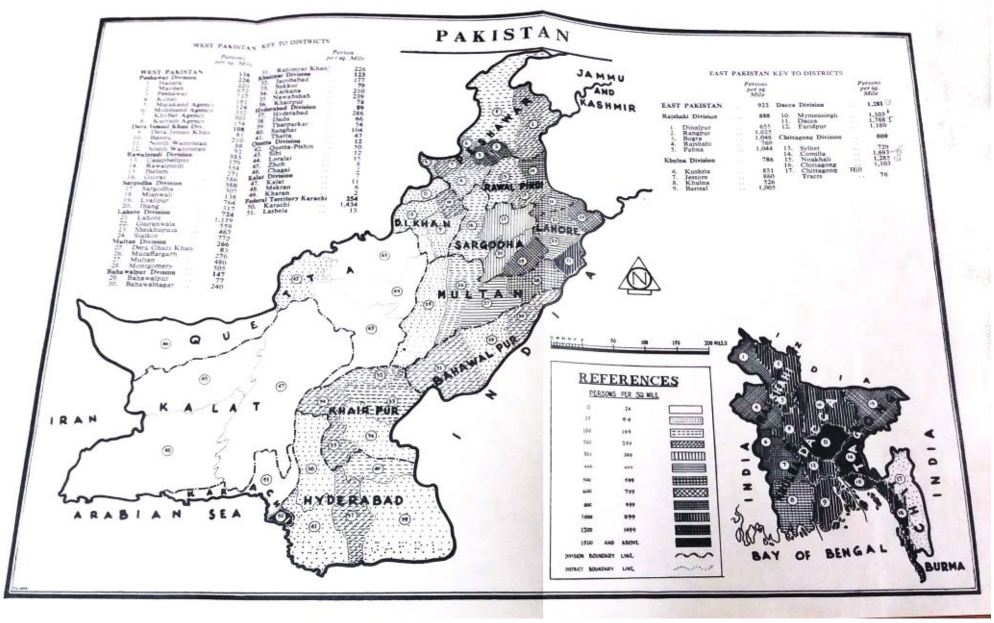

উৎস: *Population Census of Pakistan 1961: Final Tables of Population, Census Bulletin- 2;* Sex, Urban-Rural, Religion (Karachi: Ministry of Home Affairs, 1961),

সরকার উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রশাসন পরিচালনার মতো স্বদেশী যোগ্য ও দক্ষ লোকের অভাব ছিল প্রকট। ফলে পাকিস্তান সরকার ঔপনিবেশিক আমলের ব্রিটিশ কর্মকর্তাদেরকে স্ব স্ব পদে অথবা কেন্দ্র ও প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে পদায়ন করে। তারই অংশ হিসেবে নবগঠিত পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন প্রাক্তন ঔপনিবেশিক গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক ব্রেবোর্ন। দেশবিভাগের পর পরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডিসি হয়ে যোগ দিলেন আরেক ব্রিটিশ নাগরিক মেজর এল এইচ নিবলেট। যেহেতু পার্বত্য জনগণের নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে খাপ খাওয়াতে সময়ের দরকার সেহেতু পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত সুবিবেচনার ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এই স্পর্শকাতর অঞ্চলে প্রথমত ব্রিটিশ প্রশাসক নিয়োগ দেন।[৩৭০]

আমলাতন্ত্রে একটি কথা আছে ''আমলাতন্ত্র সর্বদা পরবর্তী সরকারের সেবা করে।'' সুতরাং ঔপনিবেশিক আমলের আমলারা নতুন রাষ্ট্র ও সরকারের আজ্ঞাবাহী হবে বা নতুন সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে এটা জানা কথা। স্যার ফ্রেডারিক ব্রেবোর্ন দায়িত্বভার গ্রহণের পর উত্তেজনাপূর্ণ রাঙামাটি পরিদর্শনে আসেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বাউন্ডারি কমিশনের অ্যাওয়ার্ড অনুসারে পাকিস্তানভুক্তিকে মেনে নেওয়ার পরামর্শ দেন। এর দ্বারা তিনি পাকিস্তানের গৃহীত পদক্ষেপের পক্ষে অবস্থান নেন এবং গতায়ু ব্রিটিশ শাসকদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে গ্রাহ্য বলে

[৩৭০] ড. মানিক লাল দেওয়ান, *আমি ও আমার পৃথিবী* (রাঙামাটি: প্রকাশক দীপিকা দেওয়ান, ২০১৩), পৃ. ৩৫।

প্রতিপন্ন করেন। গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী কামিনী মোহন দেওয়ান তাঁর আত্মজীবনীতে গভর্নরের বক্তব্য তুলে ধরেন, বক্তব্যটি ছিল: ‘‘হিন্দুস্থান ভুক্তির চেষ্টা পরিহার করুন; অন্যথা শুধু শক্তির অপব্যবহার করা হইবে এমন নহে, ইহাতে তোমরা বিশেষ কষ্টে পতিত হইবে।’’[৩৭১] যাহোক গভর্নরের আগমনে রাঙামাটির রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত মোড় ঘুরে যায়। চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় দেশ বিভাগের আগে দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা দাবি করলেও স্বাধীনতার পর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তাঁর সার্কেলের গণ্যমান্য হেডম্যানদের সমভিব্যাহারে গভর্নর বাহাদুরের নিকট পাকিস্তানভুক্তি মেনে নেন।[৩৭২] একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থে প্রিয়জিত দেবসরকার দাবি করেন,

> The Chakma Raja Nalinaksha Roy’s inclination to join Pakistan can be best understood through the Raja’s understanding of his royal position and privileges. Although primary historical sources are dificult to come by, it is reasonable to argue that the Raja’s inclination to protect and preserve the institutional structure of his royalty and privileges associated with it would have outweighed all other considerations as regards his decision to align with the Muslim League at that point in time.[৩৭৩]

যাহোক রাজার এই সিদ্ধান্তে জিন্নাহর পাকিস্তান সরকারও কিছুটা স্বস্তি পায়। পরবর্তী ঘটনাবলিও তার সমর্থন দেয়। ১৯৪৮ সালের মার্চে পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদ-ই আজম এম এ জিন্নাহ জীবনের প্রথম ও শেষবারের মতো চট্টগ্রাম সফরে আসেন। উক্ত সফরে তিনি তিন পার্বত্য রাজাকে চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানান। চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় ও বোমাং রাজা ক্যাঅজ সাইন রাজকীয় পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে ২৫-এ মার্চ চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে কায়েদে আজমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অত্যন্তসৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে উভয় পক্ষের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। উক্ত সাক্ষাতের কথা জানা যায় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের লেখায়ও। তিনি স্মরণ করেন, “আমার মনে আছে, যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ চট্টগ্রামে প্রথম পদার্পন করেন তখন চাকমা রাজা এবং অন্যান্য রাজারা তার নিকট প্রথাগতভাবে আনুগত্য স্বীকার করেন এবং কিছু উপঢৌকন প্রদান করেন।”[৩৭৪] সাক্ষাতের সময় তিন রাজার পক্ষ থেকে পাকিস্তানের ‘সীমাহীন ক্ষমতাসম্পন্ন’ প্রথম গভর্নর-জেনারেল ও রূপকারের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তিন পার্বত্য রাজা

---

[৩৭১] কামিনী মোহন দেওয়ান, *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী* (রাঙামাটি: সরোজ আর্ট প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ২৬৯।

[৩৭২] *ঐ।*

[৩৭৩] Priyajit Debsarkar, *The Last Raja of West Pakistan* (Kolkata: Quintus, 2015), p.29.

[৩৭৪] অধ্যাপক ড. সৈয়দ আলী আহসান, “পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা” এম এ বাশার খান ও এ আর হাওলাদার (সম্পা.), *পার্বত্য শান্তিচুক্তি: সংবিধান, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডিজ ফোরাম, ১৯৯৮), পৃ. ৪১-৪৩।

স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অধীনে পার্বত্য উপজাতিদের স্বতন্ত্র পরিচিতি ও জেলার বিশেষ মর্যাদা সহানুভূতির সাথে বিবেচনার জন্য আকুতি জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়:

> Your Excellency will appreciate our apprehension with regard to merging our simple people into the body politic of a far more advanced country like that of plain districts and our fears with regard to becoming involved in the complexities of the laws and regulations of regulated districts which would be quite unsuited to our simple social structure and needs, exposing us to exploitation which we could not withstand. Owing to the fact that we are still a simple and credulous people we view with great apprehension our inclusion as an ordinary regulated district.[৩৭৫]

এম এ জিন্নাহ তিন চিফকে তাঁদের জনগণ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদাকে সংরক্ষণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। জিন্নাহর প্রতিশ্রুতির কিঞ্চিৎ বাস্তবায়ন হয়েছিল। ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় জমিদারি প্রথা বিলোপ করা হলেও পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় রাজাদের ঐতিহ্যবাহী সার্কেল প্রশাসন বহাল রাখে। শুধু তাই নয় পাকিস্তান সরকার উপজাতীয় রাজাদের রাজকীয় দরবার অনুষ্ঠানে ঔপনিবেশিক আমলের রেওয়াজ মেনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে চাকমা ও বোমাং রাজাদের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার রীতি চালু রাখে।[৩৭৬]

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতিও পাকিস্তান সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে ঝুঁকে পড়তে ভূমিকা রাখে। পার্বত্য রাজাদের সাথে সাক্ষাতের পর মাত্র ছয় মাসের মাথায় ১৯৪৮-এর ১১ সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা জিন্নাহর পরলোকগমন এবং ১৯৫১ সালে তাঁর ভাবশিষ্য ও ডানহাত হিসেবে খ্যাত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আততায়ীর হাতে নিহতের পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হয় গভীর এক শূন্যতা ও অনিশ্চয়তা। মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং নেতারা নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।[৩৭৭] সেই সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনার ধরন-ধারণ সব ওলট পালট হয়ে যায়।

অথচ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতেন এই দু'নেতাই।[৩৭৮] গুনার মিরডাল সমকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন:

---

[৩৭৫] Tridiv Roy, *The Departed Melody*, pp. 111-112.

[৩৭৬] Willem van Schendel et al., *The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland* (Dhaka: The University Press Ltd, 2001), p. 71.

[৩৭৭] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০।

[৩৭৮] Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath* (Dhaka: UPL, 2003), p. 5.

> The intellectual vacuity of the League went hand in hand with the cult of the Great Leader [Quaid-i-Azam.] Once the authoritarian leadership of Jinnah and that of [his disciple] [Liaquat] Ali Khan came to an end, [by their untimley death,] the League quickly fell prey to squabbling and personal intrigues.[৩৭৯]

'ষড়যন্ত্রের আখড়ায়' রূপান্তরিত ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের একপেশে ভাষানীতির কারণে পঞ্চাশের দশকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার রাজনীতি অশান্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে কোরিয় যুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থব্যবস্থার মেরুকরণও স্পষ্ট হয়। একদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট শিবির, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লক। পাকিস্তানের নীতির ওপর সমসাময়িক দ্বিখণ্ডিত বিশ্ব রাজনীতিও যথেষ্ট ছাপ ফেলে। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তৎকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের অবস্থান প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানকে একটা ব্লকের দিকে নিয়ে গেলেন। দুনিয়া তখন দুইটা ব্লকে ভাগ হয়ে পড়েছে। একটা রাশিয়ান ব্লক বা সমাজতান্ত্রিক ব্লক। আর একটা হল আমেরিকান ব্লক যাকে ডেমোক্রেটিক ব্লক বা ধনতন্ত্রবাধী ব্লক বলা যেতে পারে– যদিও মরহুম লিয়াকত আলীর সময় থেকেই পাকিস্তান আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ১৯৫৪ সালের মে মাসে পাকিস্তান-আমেরিকা মিলিটারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরে পাকিস্তান সিয়াটো ও সেন্টো বা বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে পুরাপুরি আমেরিকার হাতের মুঠোয় চলে যায়।[৩৮০]

এছাড়া ছিল জোট নিরপেক্ষ বলয়ও। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত ছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার রাষ্ট্র। এসময় তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহকে স্ব স্ব বলয়ে ভিড়ানোর জন্য দুই পরাশক্তির ছিল নানা প্রলোভন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জোট নিরপেক্ষ অবস্থানকে ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় তার দ্বিতীয় পছন্দের দেশ পাকিস্তানকে নিজের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে।[৩৮১] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শেলী যথার্থই বলেছেন যে, ''the United States' policy toward the noncommited nations of the Third World was relatively more demanding. It said that any one not with the United States was against it. From 1953 to 1957, there was relentless presure for Third World nations to join American alliance systems.''[৩৮২] উপমহাদেশে আমেরিকান

---

[৩৭৯] Gunnar Myrdal, *Asian Drama*: *An Inquiry into the Poverty of Nations*, vol. I, Pelican book ser. A981, (Middlesex: Penguin books, 1968), p. 325.

[৩৮০] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০১২), পৃ. ২৭৯।

[৩৮১] এ. এফ এম শামসুর রহমান, ''১৯৫০-এর দশকে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতিতে মার্কিন প্রভাব এবং পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়া: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ'' মো. মাহবুবুর রহমান (সম্পা.), *বিশ শতকে বাংলা*, *সেমিনার খণ্ড* (রাজশাহী: আইবিএস, ২০১০), পৃ. ৭৭-১০৬।

[৩৮২] Mizanur Rahman Shelley, *Emergence of a New Nation,* p. 18.

পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মাহমুদুল হকে মতে, ‘‘The break of the Korean War in June 1950 also played some role in bringing Washington and Karachi closer.’’[৩৮৩] তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত নীতিতে পশ্চিম এশিয়ার সাথে ভূ-রাজনৈতিকভাবে সন্নিহিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক শামসুর রহমানও লিখেছেন, ‘‘পাকিস্তান একটা ইসলামী দেশ যা কোনো ক্রমেই কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বা সাম্যবাদকে ভাল চোখে দেখেনি। এমতাবস্থায় দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদের সম্প্রসারণ প্রতিরোধ করতে্ স্নায়ুযুদ্ধের শুরুতে মার্কিন নেতারা পাকিস্তানকে বেছে নেয়।’’[৩৮৪] এভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের পারস্পরিক উষ্ণ সম্পর্ক পরবর্তীকালে পাকিস্তানে মার্কিন অর্থ সহায়তার পথ সুগম করে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকার আর্থিক সাহায্য হয়ে ওঠে বড় নিয়ামক শক্তি।

পঞ্চাশের দশকে বিশ্বব্যাপী তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো স্ব স্ব অর্থনীতি মজুবুত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। অর্থনীতি মজবুত করতে হলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিটা শক্ত হওয়া চায়। দরকার জাতীয় ঐক্যের নামে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান সরকারও দেশ গঠনকে একক জাতীয় পরিচিতি নির্মাণ ও আধুনিকায়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের একক সত্ত্বা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন সমগ্র দেশকে একই গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করা।

৪.৫ পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব বাংলার মধ্যে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সীমান্তবর্তী অঞ্চল। পূর্ব বাংলার অর্থনীতির পরিপুষ্টি সাধন করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের বিকল্প নেই। কিন্তু এলাকাটি ১১টি ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত হওয়ায় এবং আইনগতভাবে বিশেষ রেগুলেশন দ্বারা শাসিত হয়ে আসায় এলাকার জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রমুখীন বা জাতীয় স্বার্থমুখীন নয় বরং স্থানিক এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক ভিত্তিক। বাংলার গণতান্ত্রিক আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত থাকায় সংগঠন বা দলীয় রাজনীতির শিকড় গজায়নি এই পার্বত্যভূমিতে। বাংলার কোনো মতাদর্শের রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদদের পদধূলি যেমনি এ এলাকায় পড়েনি তেমনি এলাকার জনগণও তাদের ব্যক্তি স্বার্থ বা গোষ্ঠী স্বার্থের জন্য হোক কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ভোট এবং

---

[৩৮৩] Mahmudul Huque, *From Autonomy to Independence: The United States, Pakistan and the Emergence of Bangladesh*, (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd, 2014), p. 23.

[৩৮৪] এ এফ এম শামসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*,

ভোটাধিকার কী জিনিস সেটি দেখেনি। এমন বাস্তবতায় এ প্রত্যন্ত এলাকাটিকে পাকিস্তানি জাতীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ কাজটি সহজ ছিল না। বাংলাদেশি পণ্ডিতগণ বিষয়টিকে চিত্রিত করেছেন এভাবে:

> Until 1930, there was least of external interference from the outside authorities in the tribal affairs. The British colonial power even treated the CHTs as 'special area,' the reason being that these ethnic minorities had a distinctive way of their lives ruled by traditional tribal political norms. In a situation like that, the leaders developed from within. In the subsequent period during Pakistani rule to till now efforts were taken by the central political authority to incorporate these ethnic groups to the broader national framework.[৩৮৫]

পাকিস্তান সরকার প্রথমে প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়েই পার্বত্য চট্টগামে 'পলিসি অব ডেমোক্রেটিক ইনক্লুজন' বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি নীতি বাস্তবায়ন শুরু করে। পাকিস্তান সরকার এই কাজটি করেছে জাতীয় সংহতি বা তাগিদ থেকে। প্রকৃত অর্থে এটা কতটুকু ''ইনক্লুজন'' ছিল সে বির্তক অবশ্য রয়ে যায়। যাহোক পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ১৯৩৫ সালের আইনের অধীনে প্রণীত 'বেঙ্গল ইলেক্টোরাল অর্ডার অ্যান্ড রুলস' এর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তফসিল সংশোধন করা। কারণ সর্বজনীন ভোটাধিকার সংক্রান্ত ৬ষ্ঠ তফসিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি; ৫ম তফসিলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলার আইনসভায় কোনো ক্যাটেগরিতে (ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী) প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়নি। এসব বিষয়কে সক্রিয় বিবেচনায় নিয়ে ১৯৫৩ সালে পূর্ব বাংলায় নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা প্রণীত হয়। ১৯৫৩ সালের ইলেক্টোরাল (কনডাক্ট অব ইলেকশনস) রুলস '৫৩ এর ৪ নং বিধির ২ নং উপবিধিতে অর্পিত ক্ষমতাবলে পূর্ব বাংলার গভর্নর পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক আইনসভার অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করেন। এ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রথমবারের মতো প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল। পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক অধিকার বঞ্চিত জনগণ ভোটের অধিকার পেল। প্রাদেশিক আইনসভায় নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পেল পার্বত্য জনগণ। কিন্তু প্রশ্ন হল বিষয়টি একতরফাভাবে করা হয়েছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ আসন থেকে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি কামিনী মোহন দেওয়ান (এমএলএ) লিখিত আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে ১৯৫০ সালের দিকে পূর্ব বাংলার আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে

---

[৩৮৫] R. I. Chowdhury et al., *Tribal Leadership and Politicall Integration: A Case Study of Chakma and Mong Tribes of Chittagong Hill Tracts* (Chittagong: University of Chittagong, 1979), p. 99.

প্রতিনিধি চেয়ে জেলা প্রশাসক বরাবরে চিঠি পাঠানো হয় এবং তদনুসারে কামিনী মোহন দেওয়ান ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার এল এইচ নিবলেট তাঁর প্রতি বিরাগবশত তাঁর নামটি ঢাকায় পাঠাননি। ফলে জনগণ উক্ত আইনে মতামত প্রদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কামিনী দেওয়ান আক্ষেপের সুরে লিখেছেন,

> মি. নিবলেট সাহেব বাহাদুরের (১৯৪৮-৫০) এই জেলার কার্যভার গ্রহণের পর পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট শাসন বিধি প্রণয়নকল্পে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উপজাতিগণের পক্ষে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া প্রেরণের জন্য ডি, সি, বাহাদুর উর্দ্ধতন কর্তপক্ষের নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া হেডম্যানগণকে ডাকাইয়া একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিলেন। ... ভোট গ্রহণের পর দেখা গেল কুমার বিরূপাক্ষ রায় ও আমার দুইজনের নামেই ভোট পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে আমি সঙখ্যাধিক্যতা লাভ করাতে শ্রীযুক্ত নিবলেট বাহাদুরের ইহা মনোনীত হইল না। ... এবং তিনি এই বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া প্রতিনিধি প্রেরণই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।[৩৮৬]

যাহোক পূর্ব বাংলার এ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে ঔপনিবেশিক আমল থেকে বাংলার প্রাদেশিক আইনসভা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ সারা বাংলার মানুষের সাথে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সামিল হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে জনগণের ভোটাধিকার প্রাপ্তির ঘটনাটি একটি বাঁকবদলকারী ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হয়।

৪.৬ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতন্ত্রের অভিষেক

১৯৪৭-৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে উল্লেখ করেছি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিল সংশোধন করে প্রাদেশিক পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৩০৯ স্থির করা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী ২৩৭টি আসন মুসলমানদের জন্য। ৩১টি সাধারণ আসন নিম্নবর্ণ বহির্ভূত সাধারণ হিন্দদের জন্য, ২৬টি আসন তফসিলি হিন্দুদের জন্য, ১টি পাকিস্তানি খ্রিস্টানদের জন্য এবং ২টি আসন বৌদ্ধদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।[৩৮৭] হিন্দু ও বৌদ্ধ আসনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের জন্য ১টি এবং হিন্দু (মূলত ত্রিপুরা উপজাতি) দের ১টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু এই আসন সংরক্ষণটি মোটেই জনসংখ্যার গুরুত্ব অনুপাতে করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জনসংখ্যা ছিল জেলার মোট জনসংখ্যার আশি ভাগ আর অন্য ধর্মের ছিল বিশ ভাগ। ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী চাকমা, মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যা মিলে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ২,১৫,০০০ যা জেলার মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগ। আর বাকী ২০ ভাগের অর্ধেকের কিছু বেশি ছিল কাস্ট হিন্দু বা বর্ণহিন্দু হিসেবে

---

[৩৮৬] কামিনী মোহন দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯-২৭০।

[৩৮৭] কামাল উদ্দিন আহমেদ, ''স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে'' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৪৭১।

তালিকাভুক্ত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী– ৩৪,২৫৪ জন। আর মুসলমান ছিল ১৮,০৭০ জন।[৩৮৮] তবে এটা প্রতীয়মান হয় যে প্রাথমিকভাবে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে দুটি আসন বরাদ্দ দিয়ে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া পরখ করে দেখেছিল এতে পার্বত্যবাসীরা কীভাবে সাড়া দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ২টি আসন বরাদ্দ দেওয়ার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক আইনসভার আওতায় আনা প্রসঙ্গে তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের মনোভাব ছিল কিছুটা রক্ষণশীল। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> East Pakistan was going to have elections to the provincial legislature for the first time in 1954. The government decided to let the Tracts also send representatives to the provincial legislature. Constitutionally this could not be done because the Tracts was a Wholly Exclued Area and outside the purview of central and provincial legislatures but nevertheless the government went through with their plan of aggrandizement under the smokescreen of granting people the benifits of democracy. It meant that the provincial assembly could interfere in the affairs of the Hill Tracts. We were afraid that under the guise of democracy the government would take away the already attenuated safeguards the hillmen enjoyed, . . . we knew that one or two members in a legislature manned by politicians who knew next to nothing about the Tracts and some of whom were intent on exploiting us could certainly not safeguard our interests.[৩৮৯]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়ে শুরুর দিকে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নেতাদের মনস্তাত্ত্বিক দোটানা ছিল। কিন্তু পরে সে দোদুল্যমানতা কেটে যায়। কামিনী মোহন দেওয়ানের উপলব্ধি থেকে এটা আঁচ করা যায়। তিনি লিখেছেন–

> বৃটিশ গভর্ণমেন্ট শাসনকালে এই জিলাবাসীকে বহিরাগত লোক হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রাদেশিক আইনসভার বহির্ভূত এলাকা (এক্সক্লুডেড এরিয়া) স্বরূপ কতিপয় আইনের বলে আমাদের যে সুবিধা ও সুযোগ রাখা হইয়াছিল উহা অপসারিত হওয়ার ফলে বর্তমানে এই পার্ব্বত্য জিলা আইন পরিষদভুক্ত হওয়াতে উন্নত ও কৌশলী জাতির সহিত সমতালে চলার পথে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু আমরা যেই সব অসুবিধার বিষয় কল্পনা করিয়া চিন্তান্বিত হইয়াছিলাম কার্য্যত তাহার কোনো কারণ দেখা যায় নাই। আমরা পরিষদভুক্ত হইলেও কিন্তু এখনও পূর্ববৎ সমস্ত সুবিধা সমূহ অব্যাহত রহিয়াছে এবং কালেক্টরী এলেকার যে সব আইন বা নীতিসমূহ আমাদের পক্ষে অসুবিধার তাহা এখনও এইখানে কার্যকরী করা হয় নাই। [৩৯০]

---

[৩৮৮] *সেন্সাস অব পাকিস্তান*, সেন্সাস বুলেটিন নং ২, পপুলেশন একর্ডিং টু রিলিজিয়ন ট্যাবল-৬, (করাচি: গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান, মিনিস্ট্রি অব দ্য ইন্টেরিয়র, অক্টোবর, ১৯৫১), পৃ. ৩, ৭।

[৩৮৯] Tridiv Roy, *The Departed Melody*, p. 148.
[৩৯০] কামিনী মোহন দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১১।

তবে পাকিস্তান সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি ছিল সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। সরকার পার্বত্য জেলায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়েছিল ১৯৫২ সালের জানুয়ারি থেকে। সরকারিভাবে তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলভী খন্দকার মো. আবদুর রবকে প্রধান করে জেলার সর্বপ্রথম নির্বাচন শাখা অফিস ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের ভিতরেই চালু করা হয়। আবদুর রব ১৯৫২ সালের ২৫ এপ্রিল নির্বাচন অফিসের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং মূলত তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।[৩৯১] জেলার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের পহেলা অক্টোবর এবং সংশোধন সাপেক্ষে চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হয় একই বছরের ২৪ ডিসেম্বর। পার্বত্য চট্টগ্রামের আসন দুটির নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৯৫৪ সালের ৮ ও ১০ মার্চ। সাধারণ হিন্দু আসন ও বৌদ্ধ আসনটির ভোট গণনা হয় যথাক্রমে ১৯৫৪ সালের ২১ মার্চ ও ২২ মার্চ।[৩৯২] ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ওপর তৈরি প্রতিবেদন অনুসারে পার্বত্য জেলায় ভোট পড়েছিল শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ।[৩৯৩] পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত জেলার প্রথম নির্বাচন হিসেবে ভোট প্রদানের এ হার সন্তোষজনক বলা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ছিল না। দেশবিভাগের পূর্বে গঠিত একমাত্র রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতিকে স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ করে।[৩৯৪] ফলে দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিবেশ সেখানে গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু ধর্মীয় ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ করায় এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়ায় এখানে সমতলের রাজনৈতিক দলগুলোর আগমনের সুযোগও ছিল না। যুক্তফ্রন্টের (আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই ইসলাম ও বামপন্থী গণতন্ত্রী দল সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম লীগ বিরোধী নির্বাচনী মোর্চা) নির্বাচনী ইশতেহার ও ২১ দফা কর্মসূচি ছিল সমতলের ভোটারদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে তৈরি। আর মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল নিতান্তই মুসলমানদের ধর্মীয় স্বার্থকেন্দ্রিক– 'ইসলাম বিপন্ন, পাকিস্তান বিপন্ন'।[৩৯৫] সুতরাং মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি ও কর্মসূচির সাথে শতভাগ একাত্ম হওয়ার সুযোগ পার্বত্য জাতিসত্ত্বাগুলোর ছিল না। ঠিক তেমনি ধর্মভিত্তিক পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বহাল থাকায় ভোটার হিসেবে পার্বত্য এলাকার বৌদ্ধ ও হিন্দু ভোটাররাও জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে

---

৩৯১ Government of East Pakistan, Board of Revenue: *Report on the Administration of the Chittagong Hill Tracts for the Year 1953-54* (Dacca: East Pakistan Government Press, 1959), p. 17-18.

৩৯২ Government of East Pakistan, Board of Revenue: *Report on the Administration,* p. 18.

৩৯৩ কামালউদ্দিন আহমেদ, '' 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচন: স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ'' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস,* পৃ. ৪৭৫।

৩৯৪ কামিনী মোহন দেওয়ান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৭৫।

৩৯৫ ঐ, পৃ. ৩৭৩।

ছিল গুরুত্বহীন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচনী রাজনীতি ও প্রচারণা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় এগুতে থাকে। নির্বাচনী রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ এবং নির্দলীয় পাহাড়ি প্রার্থীদের কর্মসুচি এবং প্রচারণা কৌশলও গোত্রকেন্দ্রিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। তবে সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয়দের স্বার্থ, বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাই ছিল স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনী কর্মসূচির দাবি।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের আরও একটি বিশেষ দিক ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান ভোটারদের ভাগাভাগি। জেলার ১৮,০৭৪ মুসলমান ভোটারদেরকে চট্টগ্রামের মুসলিম আসনগুলোর সাথে অদ্ভূতভাবে জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন চট্টগ্রাম সদর-পূর্ব-কাম রাংগামাটি মুসলিম আসন, চট্টগ্রাম সদর উত্তর-পূর্ব কাম রামগড় মুসলিম আসন, চট্টগ্রাম সদর-দক্ষিণ-পূর্ব-কাম-বান্দরবান মুসলিম আসন। এছাড়া তফসিলি হিন্দুদেরকে জুড়ে দেওয়া হয় চট্টগ্রাম-কাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম-কাম-নোয়াখালী তফসিলি জাতির জন্য নির্ধারিত আসনের সাথে।

তবে মূল আর্কষণ ছিল সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ আসনটির নির্বাচনী লড়াই। এ দুটি আসনে নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত হয়। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার তোড় জোড় দেখে মনে হয় তারা এতদিন এ মাহেন্দ্রক্ষণটির প্রতীক্ষায় ছিল। শুধু বৌদ্ধ আসনটির জন্য পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ে। এরা হলেন *হিল ট্র্যাক্টস পিপলস্ অর্গানাইজেশন* এর সভাপতি কামিনী মোহন দেওয়ান। এখানে কামিনী দেওয়ানের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক মনে হয়। কামিনী মোহন দেওয়ান ১৮৯০ সালে ৮ মার্চ রাঙামাটির বড়াদম মৌজাস্থ সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ত্রিলোচন দেওয়ান ছিলেন উনিশ শতকে চাকমা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। কামিনী দেওয়ান ১৯০৯ সালে এন্ট্রাস পরীক্ষা দিয়েও অকৃতকার্য হন। ১৯১৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন যা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম আধা-রাজনৈতিক ও আধা-সামাজিক সংগঠন। ভারত বিভাগের প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির জন্য তিনি কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই ঘুরে ঘুরে কংগ্রেসের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কিন্তু তাঁর মনস্কামনা অপূর্ণই থেকে যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালের ১৯ ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন *হিল ট্র্যাক্টস পিপলস অর্গানাইজেশন*।[৩৯৬]

অন্য প্রার্থীদের মধ্যে চাকমা রাজ পরিবার থেকে দুইজন ছিলেন যথা তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের চাচা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম এম. এ. ডিগ্রিধারী কুমার কোকনদাক্ষ রায় ও তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র চিরঞ্জীব রায় বি. এ.। এছাড়া সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত কৃষিবিদ সুশীল জীবন চাকমা ও বান্দরবানের বোমাং

---

[৩৯৬] কামিনী মোহন দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪।

সার্কেল থেকে মংথ্যেও চৌধুরী প্রার্থী হন।[১৪] পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ হিন্দু আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা (বি কে রোয়াজা) বি. এ. ও নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা বি. এ.। বি. কে. রোয়াজা নির্বাচনী কৌশল হিসেবে ভোটারদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে নামের শেষে *রোয়াজা* উপাধি পরিবর্তন করে লিখেন *ত্রিপুরা*। এ প্রসঙ্গে রাজা ত্রিদিব রায় লিখেছেন, ''Some month after the 1954 elections, the Hindu member Birendra Kishore Tripura came to see me. Just before the elections, he had changed his name from Roaza to Tripura so as to appear more egalitarian.''[৩৯৭] এ ঘটনা প্রমাণ করে প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিত্বকে প্রার্থীরা বেশ গুরুত্বসহকারে নিয়েছিল এবং নির্বাচনে জেতার জন্য তারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা ১৯১৩ সালে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত ঠাকুরছড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রাস পাস, ১৯৩৪ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। বি. এ. পাস করার পর তিনি রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। একজন শিক্ষানুরাগী ও সৎ মানুষ হিসেবে এলাকায় তাঁর বেশ নাম-ডাক ও জনপ্রিয়তা ছিল যা তাঁর নির্বাচনে জয় লাভে সহায়ক হয়।[৩৯৮]

নির্বাচন উপলক্ষে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। প্রার্থীরা রাঙামাটি, বান্দরবান, দিঘিনালা, কাচালংসহ গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, বনজঙ্গল বেষ্টিত পর্বতময় বন্ধুর পথ অতিক্রম করে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে পড়ে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কুমার কোকনদাক্ষ রায়ের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তৎকালীন রাঙামাটিস্থ চাকমা সার্কেল চিফ রাজা ত্রিদিব রায় (১৯৫৩-১৯৭১)। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *The Departed Melody* তে তিনি ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন কীভাবে পার্বত্য জনপদেও বিপুল সাড়া ফেলেছিল তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন:

> Later, against my better judgement I allowed myself to be persuaded to support my uncle [Kokonodaksha Roy]. Having declared my support I campaigned for him and held many public meetings. He avoided holding public meetings, though when he did he spoke spiritedly and went down well with the audience. . . . In all the public meetings none of the candidates or their supporters maligned each other, nor did they play dirty. It was clean campaigning. For me this meant journeying over mountains and valleys on foot, by elephant and by dugout canoe. It was an altogether invigorating experience. . . . All candidates had basically the same objective-- autonomy for the Hill Tracts, for the preservation of our cultural

---

[৩৯৭] Raja Tridiv Roy, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।

[৩৯৮] *খাগড়াছড়িস্থ* বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা *জাবারাং কল্যাণ সমিতি স্মরণিকা*, প্রকাশের সন ও পৃ. পাওয়া যায়নি।

> and ethnic identity, and for emancipation from the exploitation of the plainsmen. Through sheer inertia my uncle lost to Kamini Mohan Dewan by a narrow margin of less than two hundred votes.[৩৯৯]

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কামিনী মোহন দেওয়ানও জোর প্রচারণা চালান। তিনি একটি নির্বাচনী জনসভার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে:

> মাইয়ুনীমুখে আমি যেদিন সভার অনুষ্ঠান করার দিন সাব্যস্ত করিয়াছিলাম ঠিক সেই দিন একই জায়গায় রাজ কুমারের পক্ষীয় শ্রী অবনি রঞ্জন দেওয়ানও তথায় সভার আয়োজন করিয়াছিল। কাজেই উভয় পক্ষই পর পর সভায় বতৃতা করিয়াছিলাম। প্রথমে অবনী বাবু তৎপর আমি বতৃতা করিব এইরূপ সাব্যস্ত হওয়াতে আমার পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল যেহেতু শ্রীযুত অবনী বাবু আমার বিপক্ষে মেম্বরপদে নিযুক্ত হওয়া সম্পর্কে যেই সব প্রতিকুল কারণ ও অবস্থার বর্ণনা দিয়াছিল তাহা অবগত হইয়া উহা যথোচিত যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা খণ্ডন করার সুযোগ ঘটিয়াছিল।[৪০০]

এখানে লক্ষণীয় যে পাঁচ প্রার্থীই ছিলেন কৃতবিদ্য এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলে হাড্ডাহাড্ডি। শেষ পর্যন্ত *হিল ট্র্যাক্টস পিপলস অর্গানাইজেশনে*'র সভাপতি কামিনী মোহন দেওয়ান (১৮৯০-১৯৭৬ খ্রি.) বিজয়ী হন। অন্যদিকে হিন্দু তফসিলি আসনটিতে দুইজন প্রার্থীর মধ্যেও চলে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে সামান্য ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা। মূল পার্বত্য আসনদ্বয় থেকে উক্ত দুজনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণও সরকারিভাবে নির্বাচিত ও প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন।

সারণি– ৪.১

পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বাচিত ও প্রতিনিধিত্বকারী সমতলের প্রার্থী তালিকা।[৪০১]

নির্বাচিত প্রার্থীর নাম		নির্বাচনী এলাকা
১। বাবু কামিনী মোহন দেওয়ান	---------- ---------	পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ আসন
২। বাবু বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা	-------------------	পার্বত্য চট্টগ্রাম সাধারণ হিন্দু আসন[৪০২]
৩। এ. কে. এম. ফজলুল কাদের চৌধুরী	----	চট্টগ্রাম সদর-পূর্ব-কাম রাংগামাটি মুসলিম আসন
৪। ওবায়দুল আকবর, এম. এ.	-----	চট্টগ্রাম সদর উত্তর-পূর্ব-কাম-রামগড় মুসলিম আসন
৫। মৌলানা মুহাম্মদুর রহমান	------	চট্টগ্রাম সদর-দক্ষিণ-পূর্ব-কাম-বান্দরবান মুসলিম আসন
৬। বাবু সতীশ চন্দ্র জলদাস	---	চট্টগ্রাম-কাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম-কাম-নোয়াখালী তফসিলি হিন্দু আসন

---

৩৯৯ Tridiv Roy, *The Departed Melody*, p. 149.
৪০০ কামিনী মোহন দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭।
৪০১ Govt. of East Pakistan, *Report on the Administration of the CHT for the Year 1953-54*, p. 18.
৪০২ ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ত্রিপুরাদের কাস্ট হিন্দু হিসেবে দেখানো হয় ফলে আসনটি সাধারণ হিন্দু আসন হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।

নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ আসনটিতে প্রভাবশালী চাকমা রাজ পরিবারের গণ্ডির বাইরে থেকে কামিনী দেওয়ানের বিজয়লাভ। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হয় সেটি হল সাংগঠনিক শক্তির বিজয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কামিনী মোহন দেওয়ান *পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির* প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং নির্বাচনের সময়কালে *হিল ট্র্যাক্টস এসোসিয়েনের* সভাপতির পদে আসীন। এসব সাংগঠনিক সম্পৃক্ততার ফলে তাঁর পরিচিতি গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ে যা তাঁর বিজয়ের পশ্চাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> ছেলেরা আমাকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে বলিল, কিন্তু ইহাদের (পূর্বোল্লিখিত প্রার্থীদের) নিকট আমার পরাজয় ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ভাবিয়া প্রথমে এই বিষয়ে অসম্মত হইয়াছিলাম পরে অনেকের আগ্রহাতিশয্যে আমিও উহাতে প্রার্থীক হইয়াছিলাম।[৪০৩]

নির্বাচনের ফলাফল গণনা ও বিজয় লাভ সম্পর্কে তাঁর লেখনী থেকেও তাঁর জনপ্রিয়তার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন:

> ব্যালট বাক্স খুলিয়া ভোট গণনার দিন আমরা সকলেই উপস্থিত। কুমার কোকনদাক্ষ রায়, শ্রীযুক্ত সুশীল জীবন চাকমা এবং আমি এই তিনজনের মধ্যে প্রত্যেকে সমান আশান্বিত এবং বিজয় উৎসবের জন্য সুশীল বাবু বিশেষ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াও জানিতে পারিলাম। সারাদিন ভোট গণনার পর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আমি নির্বাচিত হইয়াছি বলিয়া ঘোষিত হইল। তখন ডি সি বাহাদুর আমাকে অভিনন্দন জানাইলেন। এ ঘোষণা প্রকাশ পাওয়ার পর আমার পক্ষীয় লোকদের আনন্দ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তাহারা প্রত্যেকে যেন একটা রাজ্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। আমাকে লইয়া তাহারা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল।[৪০৪]

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার শুভ সুচনা হয় এবং একইসাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের বিচ্ছিন্নতার বাধা পেরিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক স্রোতধারায় মিলিত হয়। এ নির্বাচন নি:সন্দেহে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পার্বত্য এলাকার পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল রাষ্ট্র কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজনীতির মূলধারার সঙ্গে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রথম সফল পদক্ষেপ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলটি এক নজর দেখলে সরকারি পদক্ষেপের সফলতার চিত্র স্পষ্ট হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা এল এইচ নিবলেট প্রেরিত নির্বাচনী ভোটের হিসাব নিম্নরূপ।

---

৪০৩ কামিনী মোহন দেওয়ান, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৮৮।

৪০৪ ঐ

সারণি- ৪.২

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার নির্বাচনী এলাকা, ভোটারদের অংশগ্রহণ, প্রার্থীদের সংখ্যা[৪০৫]

ক্র. নং	নির্বাচনী এলাকার নাম	রিটার্নিং কর্মকর্তার নাম	ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	বুটের সংখ্যা	মোট ভোটারের সংখ্যা			প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সংখ্যা
					পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ আসন	ডি.সি. হিল ট্র্যাক্টস	৮৯	১২১	৪৭,৮৩০	৪১,৫৯৫	৮৯,৪২৫	৫
২.	পা. চ. সাধারণ হিন্দু আসন	ঐ	৬৮	৭৫	১৫,০৬৩	১২,৫৮২	২৭,৬৪৫	২
৩.	চট্টগ্রামসদর-পূর্ব-কাম রাংগামাটি মুসলিম আসন	কমিশনার, চট্ট. বিভাগ	২১	৩৭	৩,০১৬	১,৪৪৫	৪,৪৬১	৫
৪.	চট্ট সদর উত্তর-পূর্ব-কাম-রামগড় মুসলিম আসন	ঐ	১৫	২২	৪২৭	৪৫	৪৭২	৩
৫.	চট্ট.সদর-দক্ষিণ-পূর্ব-কাম-বান্দরবান মুসলিম আসন	ঐ	৯	১৭	৯০৪	৬৮৯	১,৫৯৩	৬
৭.	পূর্ব বাংলা পাকিস্তানি খ্রিস্টান আসন	কমিশনার, ঢাকা বিভাগ	২৫	২৫	১,০৫০	৮৬৬	১,৯১৬	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উৎসবমুখর নির্বাচনী প্রচারণা, ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান এবং কোনো অভিযোগ ছাড়াই নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়ার ঘটনাবলি প্রমাণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতন্ত্রের অভিষেক পর্বটি ছিল বেশ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক এবং একই সাথে আশাপ্রদও। এ পর্বের তাৎপর্য ছিল পাকিস্তানের প্রাদেশিক পর্যায়ের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু স্থানীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় অগণতান্ত্রিক তথা সামরিক সরকারের শাসনামলে। এখানে বলা সমীচিন যে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ১০৩(১) অনুচ্ছেদ-এ পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বেকার 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' নামমাত্র বহাল রাখা হয়। কেননা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তির মধ্যদিয়ে 'এক্সক্লুডেড এরিয়া'র মৌলিক বৈশিষ্ট্যটির বিলুপ্তি ঘটে। এ ধরনের বৈপরিত্য আমরা সামরিক সরকারসমূহের আমলেও দেখতে পাই। যেমন- ১৯৬২ সালের সংবিধানে ২৪২(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্বোক্ত 'এক্সক্লুডেড এরিয়া'র পরিবর্তে ''ট্রাইবেল এরিয়া'' বলে নামকরণ করা হয়। কিন্তু তার আগেই মৌজাভিত্তিক প্রথাগত পরোক্ষ স্থানীয় প্রশাসনের সমান্তরালে মৌলিক গণতন্ত্র কাঠামোর অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তন করা হয় প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত স্বশাসিত ইউনিয়ন কাউন্সিল ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে নিচের অংশে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

[৪০৫] Govt. of East Pakistan, *Report on the Administration of the CHT, p.* Appendix- C.

যাহোক ঐ ‘‘ট্রাইবেল এরিয়া’’ নামকরণটিও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬৪ সালেই ঐ কথিত নামকরণ সমূলে উৎপাটন করা হয় দ্য কনস্টিটিউশন (ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৬৩ দ্বারা।[৪০৬]

৪.৭ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার প্রাথমিক পর্বটি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। দৃঢ় সংকল্প ও ঐক্য নিয়ে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে ঐক্যে ফাটল ধরে। এ সুযোগে গণতন্ত্রবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার প্রথম গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা অনুযায়ী বরখাস্ত করে।[৪০৭] এভাবে ১৯৫৪-১৯৫৮ মাত্র চার বছরে পূর্ব বাংলায় তিনবার এবং কেন্দ্রে পাঁচবার সরকার পরিবর্তন হয়। এসময়ে পূর্ব বাংলায় ৭টি মন্ত্রিসভা দায়িত্ব পালন করে এবং ৩জন গভর্নর সমাসীন হন।[৪০৮] এর জের ধরে ১৯৫০ এর দশকে পাকিস্তানের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে সামরিক শাসনের সূচনার মধ্য দিয়ে। সামরিক শাসন চালুর পেছনে একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র কাজ করেছিল যার পেছনে ছিলেন ‘মীর জাফরের বংশধর’ হিসেবে কথিত ইস্কান্দার মির্জা।

অনেকের মতে, মির্জার হাতেই জিন্নাহর প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের স্বপ্ন ধুলিসাৎ হল। ইস্কান্দার মির্জার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা সচিব থাকাকালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর তৎকালীন কমান্ডার-ইন-চিফ আইয়ুব খানের চাকরির মেয়াদ ১৯৫৫ সালের জানুয়ারিতে শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগড়ার প্রচণ্ড অমত সত্ত্বেও আরও চার বছরের জন্য অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করেন। ইস্কান্দার মির্জার ছেলে হুমায়ুন মির্জা তাঁর বহুল পঠিত *ফ্রম পলাশি টু পাকিস্তান* গ্রন্থে আইয়ুব খানের এই মেয়াদ বর্ধিতকরণকে পাকিস্তানের জন্য একটি ‘অশুভ সিদ্ধান্ত’ বলে আখ্যায়িত করেন।[৪০৯]

---

[৪০৬] The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1956, 1962 and the Constitution (First Amendment) Act, 1963; পাকিস্তান সংবিধানের প্রাসঙ্গিক ও নির্বাচিত অনুচ্ছেদ ও ধারা, উপধারাসমূহ তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

[৪০৭] আবু মো. দেলওয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১* (ঢাকা: বিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১৬, প্রথম প্রকাশ ২০০৮), পৃ. ২৫০।

[৪০৮] মো. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ৭ম মুদ্রণ ২০১৫; প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯), পৃ. ১৩৬।

[৪০৯] Humayun Mirza wrote: ‘‘Prime Minister Mohammed Ali Bogra was strongly in favor of Ayub retiring when his term ended in January 1955. Through the efforts of the Defence Secretary Mirza, on 17 August 1953, Ayub got a four-year extension as Army Chief, up to 16 January1959. It was an ominous decision that had far reaching repercussions on the history of democracy in Pakistan. And Ayub proved himself to be his benefactor.” Cited in *The Departed Melody*, p. 161.

পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তারা ঐ সংবিধানের আলোকে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনকে দেশের জন্য ভয়াবহ নৈরাজ্য ও জাতীয় সংহতি বিনাশের পূর্বাভাস হিসেবে দেখেছিল। তারা আঁচ করেছিল এ নির্বাচনটি হলে পূর্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রে দেশীয় ভাষিক রাজনীতিক এলিটরা পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসতেন। তাই নির্ধারিত নির্বাচনের পাঁচমাস পূর্বেই সামরিক বাহিনী ইস্কান্দার মির্জাকে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে। সামরিক শাসকরা তাদের সবচেয়ে অপছন্দের জিনিস সংবিধান বাতিল এবং সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এতে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধান পৃথিবীর ইতিহাসে একটি ''most short-lived Constitution of the world''[৪১০]-এ পরিণত হয়। আর প্রকৃত গণতন্ত্র একপ্রকার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দর মির্জা ক্ষমতা গ্রহণের পর অতি শীঘ্রই সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং আরো বলেছিলেন যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করবেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আগেই তাঁরই পছন্দের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান তাঁকে হটিয়ে ২৭ অক্টোবর নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করেন। তবে স্বল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতি মির্জা কয়েকজন বেসামরিক মান্যগণ্য ব্যক্তি ও তিনজন জেনারেলকে নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সামরিক সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, চোরাচালান রোধ এবং সার্বিক নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তনে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৪১১] এরই সাথে আইয়ুবের বাগ্মীতা ও প্রতিশ্রুতির বাক্যবানে তাঁর এই ক্ষমতা দখল ও সামরিক আইন জারি পূর্ব পাকিস্তানে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে বরং অভিনন্দিত হয়েছিল।[৪১২] এজন্য অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, ''রাজনীতির মুখ্য কারক বা প্রাথমিক কারকদের সামান্য স্বার্থ নিয়ে বিভেদ, সমষ্টিগত স্বার্থ দেখতে ব্যর্থতা, ষড়যন্ত্র– সবমিলিয়ে রাজনীতি সম্পর্কে যে মানুষের মনে একটি অনীহার সৃষ্টি হয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই দেখি, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি বা জেনারেল আইয়ুব খান কথিত 'বিপ্লব' মানুষকে যেমন ভীত করে তুলেছিল তেমনি আবার খানিকটা আনন্দিতও করেছিল। ... অর্থাৎ বলা যেতে পারে, সামরিক শাসনকে প্রাথমিকভাবে মানুষ ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচনা করেছিল।[৪১৩] তবে বছর খানেক না-যেতেই তাদের মোহভঙ্গ হতে শুরু হয়। পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা

---

৪১০ Masud-ul-Hasan, *Law and Principles of Basic Democracies* (Lahore: Pakistan Social Service Foundation, June, 1960), p. 9.

৪১১ আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

৪১২ মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ১৬১।

৪১৩ মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ১৯৪৭-১৯৯০* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৪), পৃ. ২৮-২৯।

সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহনকে 'শান্তিপূর্ণ বিপ্লব' বলে প্রচার করে।[৪১৪] সমসাময়িক পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীরাও আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলকে 'বিপ্লব' বলে প্রচার করে।[৪১৫] যদিও তা কোনো অর্থেই বিপ্লব ছিল না কেননা সেনাবাহিনী পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে পরোক্ষভাবে কলকাঠি নেড়ে আসছিল। বরং এতদিন বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সাথে যোগসাজসে পর্দার আড়ালে কলকাঠি নাড়লেও এবার খোলস পাল্টিয়ে তাদের আসল চেহারা জনসমক্ষে প্রকাশ করল।

আইয়ুব খান ১৯৫৬ সালের সংবিধানকে 'হতাশার দলিল' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। শেষ শক্তিশালী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৃষ্টান্ত টেনে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারে বিশ্বাস করতেন। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশের 'সমতা'র স্বীকৃতিকে তিনি জাতীয় সংহতি দৃঢ়করণের চেয়ে সংহতি বিনষ্টের প্রধান কারণ মনে করতেন। তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের জাতীয় সংহতির জন্য নতুন উপায় হিসেবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রকেই বেছে নেন। ২৭ অক্টোবর ক্ষমতা গ্রহণের দুই সপ্তাহের মাথায় আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন, ঢাকা স্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসভায় আইয়ুব খান বতৃতা দেন এবং নব উদ্যোমে জাতি গঠনের (নেশন-বিল্ডিং) কার্যক্রম পুনরারম্ভ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৪১৬] এজন্য বোধহয় ইতিহাসবিদ আলমগীর সিরাজুদ্দীন ব্যঙ্গ করে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান হলেন, 'The most ardent champion of national integration.'[৪১৭]

আইয়ুব খান পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের জন্য অভিনব কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। তাঁর উদ্দেশ্যঃ To make Pakistan ''a sound, solid and cohesive nation'' a new political system would have to be built. This system would have to be a ''home grown plant'' and not an ''imported herb'' it would have to suit ''the genius of the people.''[৪১৮]

পাকিস্তানের এই সামরিক শাসকের মতে, পূর্বের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পাকিস্তানের কাঙ্ক্ষিত জাতীয় সংহতি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। কারণ সেগুলো ছিল একদিকে পশ্চিম থেকে ধার করা এবং পাকিস্তানের দেশজ ঐতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থার ওপর বলপূর্বক আরোপিত। এ লক্ষ্যে আইয়ুব সরকার নতুন নতুন রাজনৈতিক

---

[৪১৪] সম্পাদকীয়, *ডন* (করাচি) অক্টোবর ৭, ১৯৫৮ (বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত)

[৪১৫] Masud-ul-Hasan, *Law and Principles of Basic Democracies*: পৃ.৯।

[৪১৬] Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration* (Dhaka: The University Press Ltd., 2001), p. 62-63.

[৪১৭] Alamgir Mohammad Serajuddin, ``Emergence of Bangladesh: An Overview''in Md. Mahbubur Rahman (ed.), *Twentieth Century Bengal,* Seminar Volume (Rajshahi: IBS, 2010) Pp.621-653.

[৪১৮] Rounaq Jahan, *op., cit.*, pp. 109-110.

প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনির্মাণের (নেশন-বিল্ডিং) পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। পাকিস্তানের মানুষের সাক্ষরতার হার, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রভৃতি বিবেচনা করে দেশীয় মানস প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মাসুদুল-উল-হাসান আইয়ুব সরকারের পুরনো ব্যবস্থা বাতিল করে নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়াকে জাতি গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত নবতর পরীক্ষা হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

> After the Revolution, the new Government of Pakistan has accordingingly embarked on a number of experiments to translate into action the various ideals for the fulfilment of which Pakistan was established in 1947. One of such experiments is the experiments of Basic Democraies.[৪১৯]

পাশাপাশি ক্ষমতা গ্রহণকে বৈধতা (লেজিটিমেসি) দেওয়ার জন্য আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর বাইরে জনসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আইয়ুব সেই জনসমর্থনের জন্য মধ্যবিত্তবহুল শহর এলাকা বাদ দিয়ে নিম্নবিত্তের গ্রামীণ এলাকাকে প্রাধান্য দেন। তাঁর মতে, পূর্ব পাকিস্তানের পল্লি এলাকার জনগণ: ''by nature patriotic and good people'' who are ''tolerant and patient and can rise to great heights when well led.[৪২০] আইয়ুব খান পুরনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিলোপ এবং রাজনীতিবিদদের শায়েস্তা করা এবং জনসমর্থন অর্জনের জন্য গ্রামীণ এলাকায় প্রত্যক্ষ ও সর্বজনীন ভোটাধিকার সম্বলিত ছোট ছোট গণতান্ত্রিক ইউনিটের ওপর নির্ভর করেন। অনেকটা পুরাতন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আদলে গঠিত ইউনিয়নভিত্তিক নির্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি তাঁর আদর্শ গণমানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে গণতন্ত্রচর্চার সুবিধা ও ক্ষেত্র জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে এবং জনগণ গণতন্ত্রের মর্মার্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করে তাকে বাস্তব রূপদান দিতে পারবে যেমনটি তারা তাদের পরিবারের জন্য করে থাকে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এ ব্যবস্থা গ্রামীণ নেতাদের রাজনৈতিক ভাবে প্রশিক্ষিত করে সৃষ্টি করবে এক ঝাঁক (৮০ হাজার) সরকার অনুগত দায়িত্বশীল নেতা যাদের শিকড় পাড়া মহল্লায় হলেও ধীরে ধীরে তারা বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিজেদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। কিন্তু তিনি সচেতনভাবে শহর এলাকায় প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের সুযোগ দেননি। শহুরে মানুষদের তিনি 'বাচাল সংখ্যালঘু' (ভোকাল মাইনরিটি) হিসেবে আখ্যায়িত করেন যারা গ্রামের মানুষদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার ও শোষণ কায়েম করে। এ সমুদয় উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য তাঁর চিন্তাপ্রসূত নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার নামকরণ করেন *বেসিক ডিমোক্রেসি* বা মৌলিক গণতন্ত্র। সে অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে ৩০-এ এপ্রিল ও ১ মে করাচিতে গভর্নরদের সম্মেলন ডেকে মৌলিক গণতন্ত্র কাঠামো প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত

---

[৪১৯] Masud-ul-Hasan, *op., cit.,* p. 9.

[৪২০] Ayub Khan, *Speeches and Statements*, 1, 2 cited in Rounaq Jahan, *op., cit.*, p. 64.

পাকাপোক্ত করেন।[৪২১] জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর তাঁর ক্ষমতা দখলের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 'মৌলিক গণতন্ত্র' আদেশ নামে একটি আইন জারি করে সারা পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালু করেন। ১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রপতির ১৮ নং আদেশ বলে ১৮৭০ সালের গ্রাম চৌকিদার আইন (১৮৭০ সালের ৬ নং আইন) ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন ১৮৮৫ সালের ৩ নং আইন) রহিত করে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি হয়। স্থানীয় সরকারের আদলে তৈরি হলেও এটি পাকিস্তানের দুই অংশে একসাথে কার্যকর করায় জাতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির চরিত্র ধারণ করে। নতুন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে এর উদ্দেশ্য ছিল 'জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ করা'।[৪২২] অর্থাৎ তাঁর প্রত্যাশা ছিল অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো তৃণমূল পর্যায়ে যে-ভূমিকা পালন করে মৌলিক গণতন্ত্রীরা সে-ভূমিকা পালন করবে। এক কথায় তাঁর ভীষণ অপছন্দের রাজনৈতিক দলের বিকল্প হিসেবে মৌলিক গণতন্ত্রীরা কাজ করবে। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত পিরামিড আকৃতির চারস্তর বিশিষ্ট (ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগ) 'মৌলিক গণতন্ত্র' পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রবর্তন করেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামকে জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গীভুত করার এটি দ্বিতীয় বৃহৎ ও সফল পদক্ষেপ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর আই চৌধুরী পার্বত্য চট্টগ্রামকে মৌলিক গণতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনাকে জাতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে 'প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

> . . . that during Pakistan period in 1960 while the institution of Basic Democracy was introduced all over the country, the tribal areas was also included with it. And this was for the first time that the tribal people were incorporated into the broader framework of national political system of the country. They were included in the national electoral process.[৪২৩]

আইয়ুব খান বহুমুখী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মৌলিক গণতন্ত্রী নামে অভিনব স্থানীয় নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করেন যারা খোদ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকেও নির্বাচিত করবে। ইতিপূর্বে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাদেশিক স্তরের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখন ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানব্যাপী প্রবর্তিত মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে

---

[৪২১] Muhammad Ayub Khan, *Friends Not Masters*, সৈয়দ আলী আহসান (অনু.) *প্রভু নয় বন্ধু* (ঢাকা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮), পৃ. ২৬৬।

[৪২২] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৫।

[৪২৩] R I Chowdhury et al., *Tribal Leadership and Political Integration*, p. 5.

পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় পর্যায়েও গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিতর প্রবেশ করল। এখন দেখার বিষয় মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে কেমন সাড়া ফেলেছিল? রাষ্ট্রের সঙ্গে পাহাড়িদের সম্পর্ক ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে এ ব্যবস্থা কী ভূমিকা রেখেছিল?

স্মর্তব্য যে, ব্রিটিশ আমলে শাসনবহির্ভূত অঞ্চল হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। অথচ বাংলার সমতল জেলাগুলোতে ১৮৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয়।[৪২৪] এতে বাংলার সমতলের মানুষ স্থানীয় পর্যায় থেকে রাজনৈতিক পাঠ অর্জন করে। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে লিখেছেন:

> বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রথা, তারপর ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ডিসট্রিক্ট বোর্ড থাকাতে জনগণের মধ্যেও রাজনৈতিক শিক্ষা অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।[৪২৫]

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল ফলে রাজনৈতিক শিক্ষায়ও পিছিয়ে ছিল। সে-বিবেচনায় মৌলিক গণতন্ত্রই পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে প্রথমবারের মতো ৩৯টি ইউনিয়ন পরিষদ[৪২৬] গঠিত হয়। এছাড়া ১১টি থানা কাউন্সিল নিয়ে ২২ সদস্য বিশিষ্ট একটি জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহের মোট ৪০৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৭০ জন ছিল নির্বাচিত এবং ১৩৫ জন ছিল মনোনীত। ১১টি থানা কাউন্সিলে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭ জন যার মধ্যে ২০ জন সরকারি এবং ১৭ জন বেসরকারি সদস্য– এরা সকলেই মনোনীত।[৪২৭] তবে ১৯৬২ সালে মনোনয়ন প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়।

---

[৪২৪] উল্লেখ্য যে, ১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন পাস করা হয়। এ আইনের বিধানমতে, জেলাকে বিভিন্ন 'ইউনিয়নে' ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের আয়তন হয় প্রায় ১০ থেকে ১২ মাইল, যার আওতায় থাকতো কতকগুলি গ্রাম। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের জন্য গঠিত হতো একটি কমিটি যার সদস্য সংখ্যা হতো ৫ এবং এটি পঞ্চায়েত বলে পরিচিত হত। এসব পঞ্চায়েত নিজ নিজ এলাকাধীন গ্রামসমূহে শান্তি রক্ষার জন্য দায়ী থাকতো এবং এ কাজে চৌকিদারদের বা গ্রাম পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করতো। চৌকিদারদের বেতন ভাতা বাবদ প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য এসব পঞ্চায়েতকে কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এর পর ১৮৮৫ সালে পাস হয় বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮৫। এ আইনবলে ত্রিস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় শাসন: জেলাবোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটি প্রবর্তন করা হয়। অতঃপর ১৯১৯ সালে পাস হয় বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট; এর দ্বারা দ্বিস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার চালু হয় যথা– জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড।

[৪২৫] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪০।

[৪২৬] ৩৯টি ইউনিয়ন পরিষদগুলির থানাভিত্তিক পরিচিতি হলো রামগড় থানাধীনে: ১। তবলছড়ি ইউনিয়ন, ২। রামগড়, ৩। মানিকছড়ি, ৪। গুইমারা। মহালছড়ি থানাধীনে: ১। পানছড়ি ইউনিয়ন, ২। ভাইবোনছড়া, ৩। খাগড়াছড়ি, ৪। মহালছড়ি, ৫। লক্ষীছড়ি ; দীঘিনালা থানাধীনে: ১। দীঘিনালা ইউনিয়ন, ২। ছোট মেরুং, ৩। সাজেক ভ্যালি; কোতোয়ালী থানাধীনে: ১। সাবেক্ষ্যং, ২। বুড়িঘাট, ৩। তৈমিদং, ৪। রাঙামাটি, ৫। বালুখালি, ৬। মগবান, ৭। রাইনখং, ৮। রিজার্ভ ফরেস্ট, ৯। চন্দ্রঘোনা, ১০। কলমপটী, ১১। ঘিলাছড়ি; বরকল থানাধীনে: ১। ভুষণছড়া ইউনিয়ন, ২। বরকল, ৩। জুড়াছড়ি; লংগদু থানাধীনে: ১। লংগদু, ২। বড়কাউলী; বান্দরবান থানাধীনে: ১। বান্দরবান, ২। আলীখয়ং, ৩। তারাছা ; রুমা থানাধীনে: ১। রুমা ইউনিয়ন, ২। পানতলা ইউনিয়ন, ৩। থানছি ইউনিয়ন; লামা থানাধীনে: ১। লামা ইউনিয়ন, ২। আলী কদম ইউনিয়ন; নাইক্ষ্যংছড়ি থানাধীনে: ১। নাইক্ষ্যংছড়ি, ২। তমব্রু।

[৪২৭] Mohammad Ishaq, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৯-২৮০।

নির্বাচিত ইউপি সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। পরিষদসমূহের কার্যকাল ছিল পাঁচ বছর। এ ইউনিয়ন পরিষদগুলোর অধীনে ৩৭টি বিভাগের কাজ অর্পণ করা হয়।

সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা জাতি গঠনের (আইয়ুব সরকার দেশ গঠনকে জাতি-গঠনের এবং আধুনিকায়নের হাতিয়ার হিসেবে এবং সংহতিস্থাপক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিল) কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য চালু করা হয় গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচি। তবে আইয়ুব খান তাঁর প্রবর্তিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে 'স্বদেশজাত উদ্ভিদ' (Home-Grown Plant) হিসেবে দাবি করলেও পূর্ত কর্মসূচির ধারণাটি ছিল বহিরাগত– আমেরিকা থেকে ধার করা। পাকিস্তানে যখন খাদ্যাভাব তখন আমেরিকা উদ্বৃত্ত খাদ্যে টুইটুম্বুর।

আইয়ুব খানের ধারণানুসারে মৌলিক গণতন্ত্রীদের যদি সামষ্টিকভাবে উন্নয়ন, নবজাগরণ ও আধুনিকায়নের বাহন ধরা হয় তাহলে ওয়ার্কস প্রোগ্রামকে বলতে হয় এর চাকা। কারণ ওয়ার্কস প্রোগামের ওপর ভর করেই মৌলিক গণতন্ত্রীরা সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে সমর্থ হন। পূর্ত কর্মসূচি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের পর্যবেক্ষণও ইতিবাচক। তিনি লিখেছেন,

> To breathe new life into the Basic Democracies – in fact, to breathe new life into the East Pakistani rural areas as a whole– the regime introduced a vast rural public works program, first as a pilot project in Comilla Thana in 1961-62 and then as province-wide scheme in 1962-63. The works program was mainly economic, it was expected to play a political role as well– a role clearly spelled out in Akter Hameed Khan's memorandum to the President and the members of the Economic Council of the Planning Commission.[৪২৮]

মৌলিক গণতন্ত্রের সারথি হিসেবে চালু হওয়া পূর্ত কর্মসূচির (ওয়ার্কস প্রোগ্রাম) উদ্ভবের প্রেক্ষাপট এখানেই শেষ নয়, এর শিকড় আরও গভীরে; পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি অনুবিভাগ বেসিক ডেমোক্রেসি এন্ড লোকাল গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চার নম্বর সেকশন কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত '*Important Circulars, Instructions, Manuals and Plan of Works Programme issued from 25th September 1962 to 31st December 1967*''-এ ওয়ার্কস কর্মসূচির উদ্ভব সম্পর্কে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়:

> The original idea of a large scale 'Works Programme' was put forth in the background papers used by the Government of Pakistan in negotiating the

---

৪২৮ Rounaq Jahan, *op., cit.,* pp. 113-114.

‘‘expanded PL 80 Agreement’’ which was signed in October 1961 with the Government of the United States of America. The basic philosophy of this programme as well as the intended methods of its administration, were summarized in the Revised second Five Year Plan as presented in November 1961 to the Consortium of countries aiding Pakistan development plan. Here it was stated:

The central idea of the works programme is to put the under-utilized manpower of Pakistan to work on nation-building project by the liberal provisions of basic wage-goods. (i.e., surplus agriculture commodities available under PL 480) Detailed programmes are still being work out, though it may be mentioned that the main sectors benefitting from this programme will be . . . feeder roads, school construction, water supply etc. During the initial stages a major part of the Programme will be mounted through existing administrative organizations in the Provinces and central. However, it is proposed to transfer administrative responsibility as rapidly as feasible to the district and lower levels both to take advantage of the growing strength of the Basic Democracies as well as to provide part of the resources required for their development.[৪২৯]

একই সংকলনে পূর্ত কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট ও সম্পাদনযোগ্য কয়েকটি উদ্দেশ্যে ঠিক করা হয় যার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ হলো:

i) Create general enthusiasm for the development work by providing scope for large scale public participation in planning and execution of development projects and thus induce the people to sacrifice their time, labour and money or land for the common good and build up a spirit of service to the community.

ii) Vitalise the institution under Basic Democracy by providing these with scope to a) serve the people in a manner which would benefit the people in general and b) build up a true partnership between village leaders, councilors and Government servants. Vitalisation of local councils will make the people take keener interest in these effective, public opinion to guide the councils in their work.[৪৩০]

এ কর্মসূচির আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রথমবারের মতো ৩৯টি ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হয়। এ কাউন্সিলের বিশেষ দিক হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পাহাড়িদের ভোটে পাহাড়িরাই চেয়ারম্যান ও মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় এলিট বা শিরোমণি গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

---

[৪২৯] Govt. of East Pakistan, *Important Circulars, Instructions, Manuals and Plan of Works Programme issued from 25th September 1962 to 31st December 1967* (Dacca: East Pakistan Government Press, 1968), p. 28.

[৪৩০] ibid, p. 54.

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক তাৎপর্য হলো নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান এবং সেই সাথে তাদের কর্মপরিধি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা। পণ্ডিতদের মতে,

> Remaining secluded from the broader administrative jurisdiction of the country and being ruled by their own primitive tribal customs for centuries, the area of formal leadership also remained very narrow in scope. The main functions of these formal leaders were to preserve public peace, collect revenues and settle disputes relating to socio-cultural activities. Developmental activities of politico-economic nature were hardly matters of concern for them. It is only with the introduction of the institution of local government that the formal leadership structure and its functions have been expanded and changed to certain extent. Under the new system tribal people were elected as Union Council chairman and members by the tribal people themselves. This system of local self government continued to function even after the abolition of Basic Democracy system.[৪৩১]

১৯৬২-৬৩ সালে প্রবর্তিত পল্লি পূর্ত কর্মসূচিটি তাদের আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জনগণকে তাদের নিজস্ব স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়নধর্মী কাজে গঠনমূলক ও অর্থপূর্ণ অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পল্লি পূর্ত কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়। এ কর্মসূচি ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের ওপর স্থানীয় 'পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এই উভয় দায়িত্ব' অর্পন করে। ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহের বাৎসরিক গড় আয় ছিল ১৩,০০০ টাকা। এর সাথে প্রতিটি ইউনিয়ন কাউন্সিল পূর্ত কর্মসূচির থেকে ৭,০০০ টাকা করে বরাদ্দ পেত। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৬২-৬৭ সময়কালে ইউনিয়ন পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা লক্ষণীয় উন্নয়ন কাজ সম্পাদিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহ বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ওয়ার্কস প্রোগ্রামের বিপরীতে ব্যয় করে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৬২-৬৩ সালে ব্যয় হয় ২,৪৫,৬২৮, ১৯৬৩-৬৪ সালে খরচ করে ২,৩৫,৫৩৯ টাকা, ১৯৬৪-৬৫ সালে বাস্তবায়ন করে ২,৩৬,৬৮৯ টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,১৫,৫৮৬ টাকায়।[৪৩২]

মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে ১৯৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার থানা পর্যায়ে উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ১১টি থানায় সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদ চালু করা হয় যদিও প্রদেশের সমতলের জেলাসমূহে উক্ত পদটি ১৯১৯ সাল থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।[৪৩৩] তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ১১টি

---

[৪৩১] R I Chowdhury et al., *Tribal Leadership,* p. 169.

[৪৩২] *ঐ, পৃ. ২৮০।*

[৪৩৩] Muhammad Ishaq (ed.), *Bangladesh District Gazetters: Chittagong Hill Tracts,* p. 258.

থানায় নিযুক্ত সার্কেল অফিসারদের মধ্যে চারজন পাহাড়িদের মধ্যে থেকে নিয়োগ পান যা শতকরা হিসেবে ৩৬ ভাগ।[৪৩৪] মনে রাখা দরকার, কোনো মহকুমার অধীনে থানা কাউন্সিলসমূহের চেয়ারম্যান হতেন উক্ত মহকুমার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (এসডিও) এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) হতেন ভাইস-চেয়ারম্যান যাকে অর্থনীতিবিদগণ আখ্যায়িত করেছেন থানা কাউন্সিলের 'Nerve Centre'[৪৩৫] হিসেবে। এ কাউন্সিলের ৫০ ভাগ সদস্যপদ পূরণ করা হতো সংশ্লিষ্ট থানার ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যানদের মধ্যে থেকে। ২৫ ভাগ সদস্য মনোনীত হতো আর বাকী ২৫ সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত করা হতো যেমন– থানা কৃষি ও সমবায় কর্মকর্তা, রাজস্ব পরিদর্শক, বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রভৃতি পদাধিকারীরা। মহকুমা কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা উভয়েই পদাধিকারবলে থানা কাউন্সিলের সদস্য থাকতেন। থানা কাউন্সিল প্রধানত সমন্বয়কারী ও পর্যবেক্ষণকারীর ভূমিকা পালন করতো। এক কথায় থানা কাউন্সিলের অধীন সকল ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির কাজকর্ম সমন্বয়ের কাজ ছিল এই থানা কাউন্সিলের।

ষাটের দশকে থানা পর্যায়ে সমস্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থায় গঠিত থানা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়। এক হিসাবে দেখা যায় ১৯৬২-৬৩ সালে থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্যয় হয় ৪,১৩,১২০ টাকা, ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে এ ব্যয় কমে দাঁড়ায় ২,৯০,০২৮ টাকা। আবার ১৯৬৬-৬৭ ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামের বিপরীতে থানা কাউন্সিলের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ৮,৪০,০০০ টাকা।

অতপর ১৯৬৫ সালে রাঙামাটিতে প্রথমবারের মতো ছয় সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত টাউন কমিটিও গঠন করা হয়। সৈয়দ তফাজ্জল হোসেন (এস টি হোসেন) ছিলেন এ কমিটির প্রথম মনোনীত চেয়ারম্যান। ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো পৌর সংস্থা ছিল না। টাউন কমিটিই পার্বত্য চট্টগ্রামের পৌরসংস্থা গঠনের সূত্রপাত ঘটায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এটি রাঙামাটি পৌরসভা হিসেবে যাত্রা করে। ১৯৭৪ সালের প্রথম পৌরসভা নির্বাচনে ডা. অদ্যুৎ কুমার দেওয়ান নামে একজন পাহাড়ি চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন।

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জেলা কাউন্সিল ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ এবং তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সরকারি ও নির্বাচিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হতো। ৫০ ভাগ সদস্য সরকারি কর্মকর্তা, ২৫ ভাগ নিযুক্ত হতো জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে আর অবশিষ্ট ২৫ ভাগ মনোনীত হতো ইউনিয়ন

---

[৪৩৪] পাহাড়ি সার্কেল অফিসাররা হলেন– প্রভাত কুমার চাকমা (সদর সার্কেল), বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা (দিঘীনালা), নগেন্দ্র লাল চাকমা (লংগদু) ও অনিরুদ্ধ চাকমা, বান্দরবান সদর থানা। অনিরুদ্ধ চাকমা, প্রাক্তন নাজির, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, ১৯৬৬-৬৯, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, স্থান: কলেজগেইট, রাঙামাটি, তারিখ : ২২/১০/১৫ কলেজ গেইট।

[৪৩৫] Rehman Sobhan, *Basic Democracies, Works Programme And Rural Development in East Pakistan,* (Dhaka: Oxford University Press, 1968), p. 78.

কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে। গঠনগত দিক থেকেও এটি নির্বাচিত বা প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হতে পারেনি। সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট জেলার অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট জেলা কাউন্সিলের সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি একটু আলাদা ছিল। সেখানে জেলা কাউন্সিলের সদস্যগণ ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।[৪৩৬] ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশবলে ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভিত্তিতে ঐ বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল গঠিত হয়। এ কাউন্সিলে সদস্য ছিল ২২ জন যার মধ্যে ১০ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১২ জন সদস্য ছিল নির্বাচিত। ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হতেন।[৪৩৭] পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলে অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন– মং প্রু সাইন (মং সার্কেল চিফ), বলভদ্র তালুকদার (রাঙামাটি), কল্পরঞ্জন চাকমা (পানছড়ি), তিলক চন্দ্র চাকমা (নানিয়ারচর), নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা (রামগড়), সুধাংশু শেখর চাকমা (রাঙামাটি), নিশাকর কার্বারী (পানছড়ি), অং শৈ প্রু চৌধুরী (বান্দরবান), নিহার বিন্দু চাকমা (দিঘিনালা), বিন্দু কুমার খীসা (মহালছড়ি) ও লাল বিহারী চাকমা (বাঘাইছড়ি) প্রমুখ।[৪৩৮]

পার্বত্য চট্টগ্রাম ডিসট্রিক্ট কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্তরের মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।[৪৩৯] ১৯৬৫-৬৬ সালে জেলা কাউন্সিল ৯,৪৩,৪৭৪ টাকা আয় করে, এর মধ্যে পূর্ত কর্মসূচি থেকে সরকারি বরাদ্দ আসে ৭,১৭,৮২৮ টাকা। তন্মধ্যে সিংহভাগ টাকা যার পরিমাণ ৬,৭৬,০৭৪ টাকা পূর্ত কর্মসূচির পিছনে ব্যয় করা হয়। এছাড়া জেলা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে ১৯৬০-৬১ অর্থবছর থেকে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। উপরোক্ত অর্থ জেলার কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, খাদ্য, সমবায়, সমাজ কল্যাণ, মৎস্যসহ সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। জেলার সার্বিক উন্নয়নের চিত্র পর্যবেক্ষণ করে এ বি রাজপুত লিখেছেন, 'Though the system of Basic Democracies in the Hill Tracts is a new experiment, its achievements in the various spheres of development work are by no means negligible.'[৪৪০]

---

[৪৩৬] ডালেম চন্দ্র বর্মন, ''স্থানীয় সরকার'' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭।

[৪৩৭] Muhammad Ishaq, *Bangladesh District Gazetters*, p. 279.

[৪৩৮] যৌথ আলোচনা ও সাক্ষাৎকার : জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, অনিরুদ্ধ চাকমা, প্রাক্তন নাজির পা. চ. ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও অবসরপ্রাপ্ত সচিব রাঙামাটি পৌরসভা, গ্রুপ সাক্ষাৎকার গ্রহণ ২২/১০/২০১৫ তথ্যদাতার কলেজ গেইটস্থ বাসায়।

[৪৩৯] *ঐ, পৃ.* ৩৫-৪২। রাজপুতের গ্রন্থে মৌলিক গণতন্ত্রের যুগে বাস্তবায়িত বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

[৪৪০] A. B. Rajput, *The Tribes of Chittagong Hill Tracts* (Karachi: Pakistan Publications, 1965), p. 334.

নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নেতৃত্বে এলাকার জনগণ এসব প্রকল্পকাজে অংশগ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ও মারমা জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের (আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক) ওপর পরিচালিত একটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় দেখা গেছে আরোপিত ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্বের (হেডম্যান, কার্বারী) চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিম্নের ছকটি এ তথ্যের সমর্থন দেয়।

সারণি-৪.৩

স্থানীয় সমস্যাদির ব্যাপারে জনগণ কীভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বিষয়ে উপজাতিদের আনুষ্ঠানিক নেতৃবৃন্দের (ফরমাল লিডার) মতামত[৪৪১]

সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যম	চাকমা (৫২ % জন)	মারমা (৪৮ % জন)	মোট (১০০%জন)
স্থানীয় নেতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে	৭৪	৭৬	৭৫
রাজার মাধ্যমে	২৫	৫৮	৪১
পত্রিকায় লেখালেখি ও স্মারকলিপি প্রকাশের মাধ্যম	১৪	১২	১৩

উপরের পরিসংখ্যানানুসারে বলা যায় উপজাতীয় জনগণ তাদের সমস্যাদির উপস্থাপন ও সমাধানের জন্য প্রথাগত নেতৃত্বের চেয়ে সরকারি প্রতিনিধির উপর ঝুঁকে পড়েছে। স্থানীয় সমস্যাদির প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় সেগুলোর ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের বিবিধ পথ ও পন্থা আছে। তন্মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাদের সমস্যাদি তুলে ধরার অধিক জনপ্রিয় ও সহজ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী চাকমা ও মারমাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের আনুষ্ঠানিক নেতাদের মতে শতকরা ৭৫ ভাগ লোকই স্থানীয় সমস্যাদির ব্যাপারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যারা আধুনিক জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ তাদেরকেই বেছে নিচ্ছে। এ চিত্র নিঃসন্দেহে সরকারের গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তকরণ নীতির সফলতার প্রতিফলন। আবার অনানুষ্ঠানিক নেতাদের উত্তরেও মোটামুটি সমরূপ ছবিই ফুটে উঠেছে।

সারণি – ৪.৪

নেতাদের সাথে জনগণের যোগাযোগ প্রশ্নে উত্তরদাতা অনানুষ্ঠানিক নেতাদের মতামত[৪৪২]

নেতা	চাকমা (১৩২ জন)	মারমা (৬৮ জন)	মোট (২০০)
চেয়ারম্যান-মেম্বার	৪৭	৩৮	৪৪
হেডম্যান	৩৭	৪৪	৩৯
কার্বারী	১১	৫	৯
উপজাতীয় রাজা	৫	১৩	৮

[৪৪১] R I Chowdhury et al., *op., cit.*, pp. 99-100.
[৪৪২] R I Chowdhury et al, *op., cit.*, p. 173.

অংশগ্রহণমূলক আনুষ্ঠানিক আলোচনা থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের আলোকে বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো:

> It is quite likely therefore that involvement of the informal leaders[৪৪৩] in development activities has been more among the Chakma leaders and as result they percieve the role and functions of the Union Council Chairman and members to be of much greater utility for the development of their community . . . This reflects in general, of the modernizing attitude of a large number of informal leaders and also indicates of their interest for participating in activities that are administered through government institutions and oriented to national development.[৪৪৪]

আইয়ুব খান প্রবর্তিত ব্যবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিবিধ স্তরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেকেই জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী নেতার আসনে আসীন হন। এঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এমনকি জাতীয় সংসদ সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[৪৪৫] পাহাড়িদের মধ্যে গোত্রকেন্দ্রিক ও ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি আধুনিক রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি আকর্ষণ ও নির্ভরতা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পাহাড়ি নেতাদের কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সখ্যতা, অসখ্যতা অথবা সম্পৃক্ততা না থাকলেও ইউনিয়ন পর্যায়ে চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্য যে-প্রচারাভিযান, জনসংযোগ ও নিরলস প্রচেষ্টা চলেছিল তাতে তাদের প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এভাবে ষাটের দশকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক রাজনৈতিক চেতনা উপজাতি জনমনে সঞ্চারিত হয়। পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র প্রসঙ্গে স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের মূল্যায়নটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য:

> The Basic Democracies . . . brought politics to the rural areas and created a class of rural activities with a role to play in both local and national politics. For the first time political activity was dispersed outward from the cities and spread over

---

[৪৪৩] Formal leaders are those who hold a titled position in formal organization and exercise certain amount of authority by virtue of the position held. In contrast, the informal leadership refers to those who do not hold a titled position but have the ability to influence others's behaviour outside of formally prescribed role relationship (Rogers, 1969: 223).

[৪৪৪] R I Chowdhury et al, *op., cit.*, p. 172.

[৪৪৫] ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল সদস্য কল্প রঞ্জন চাকমা, পরে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী হন। ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল সদস্য তিলক চন্দ্র চাকমা পরে নানিয়ারচর উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। অনিল বিহারী চাকমা, লাল বিহারী চাকমা, মুকন্দলাল চাকমা, ধর্মমোহন কার্বারী প্রভাবশালী ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মং শৈ প্রু চৌধুরী পাকিস্তান আমলেই মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অং শৈ প্রু চৌধুরী ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও মন্ত্রী হন। এ রকম অনেক মৌলিক গণতন্ত্রী পরবর্তী জীবনে সমাজে ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করেন। নিখিল কুমার চাকমা, প্রাক্তন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, সহায়তায়, অরুনেন্দু ত্রিপুরা, পিআরও, রাপাজেপ, তারিখ: (৩০/৯/২০১৪) বকুল চন্দ্র চাকমা, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (২/২/২০১৫), জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রবীণ আইনজীবি ও সাবেক স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য স্থান: কলেজগেইটস্থ বাসা (সাক্ষাৎকার গ্রহণ ২৮/৯/২০১৫)।

countryside. Political participaiton was thus broadened, a new source of support created for the government and a major step made toward creating the institutional link between government and countryside which is the prerequisite of political stability in a modernizing country.[৪৪৬]

কিন্তু বেসিক ডেমোক্রেসি সম্পর্কে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথিতযশা ও শীর্ষ স্থানীয় বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ মৌলিক গণতন্ত্রের সুফল গ্রাম ও শহরের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির নিকট কুক্ষিগত হওয়ায় এ ব্যবস্থাকে অর্থাৎ B. D. কে 'Bourgeois Democracy'[৪৪৭] বলে আখ্যা দেন। ইউনিয়ন ও থানা কাউন্সিলের গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে সমালোচনা[৪৪৮] সত্ত্বেও বলা যায় আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের সুবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়।

আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের মার্চে পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। বাষট্টির সংবিধান অনুসারে জাতীয় পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা আসন বরাদ্দ দেয়া হয়নি। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান ও রাঙ্গুনিয়া থানার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটি আসন নির্ধারণ করা হয়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রাদেশিক পরিষদে একটি আসন বরাদ্দ করা হয়। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় উক্ত আসনে ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন সে-কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পরিষদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই ধারার দুই ব্যক্তিত্ব। একজন প্রথাগত ধারার প্রতিভূ বান্দরবানের বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী অন্যজন শিক্ষিত শ্রেণির সাধারণ ধারার প্রতিভূ যুক্তরাষ্ট্র-ফেরত কৃষিবিদ সুশীল জীবন চাকমা। উপরন্তু সমতল অর্থাৎ চট্টগ্রামের রাউজান থেকে নির্বাচন করেন মুসলিম লীগের হেভিওয়েট প্রার্থী ফজলুল কাদের চৌধুরী। পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে দুজন প্রার্থী হওয়াতে ফজলুল কাদের চৌধুরী সহজে বিজয়ী হন।[৪৪৯]

এভাবে ইউনিয়ন থেকে জাতীয় পরিষদ প্রত্যেক পর্ষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থা স্থাপনকেই নির্দেশ করে। অতঃপর ১৯৬৫ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নির্ধারিত আসনে প্রথমে বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী

---

[৪৪৬] Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, p. 252. cited by Rounaq Jahan, p. 111.

[৪৪৭] Rehman Sobhan, *Basic Democracies*, p. 89.

[৪৪৮] ''Lacking any elective support, they tend to become rubber Stamps of official decision making. In this sense the Thana and Union Council are really part of a heirarchy of administration in the Districts rather than of the institutions of local self-government.''- Rehman Sobhan, *op., cit.*, p. 89.

[৪৪৯] শরদিন্দু শেখর চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের একাল সেকাল* (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ৪৮।

নির্বাচিত হন এবং তিনি মন্ত্রীসভায় যোগ দিলে আসনটি শুন্য হয় কেননা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য থাকতে পারতেন না। ওই শুন্য আসনের উপনির্বাচনে রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন।[৪৫০] প্রথাগত নেতৃবৃন্দও বংশানুক্রমিক ধারা থেকে আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ধারায় অবগাহন করেন। পণ্ডিতদের কথায়,

> The Changing political climate induced the chiefs to search for a more `modern' political role, changing their appearance once again and donning bussiness suits, they sought elected office in Pakistan and preferred to present themselves as modern administrators even their role as local hosts.[৪৫১]

গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির রাজনৈতিক তাৎপর্য

১৯৬০-এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বিপুল সাড়া ফেলেছিল। শতাব্দী প্রাচীন সামন্তবাদী ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নেতৃত্বের বাইরে গণমুখী আধুনিকমনস্ক গণতন্ত্রমনা নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ সুগম হয় মৌলিক গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম নবগঠিত ৩৯টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে পছন্দের যোগ্য ব্যক্তিকে দাঁড় করানো এবং বিজয়ী করার জন্য পাহাড় থেকে পাহাড়ান্তরে দুর্গম যাত্রাপথ অতিক্রম করে জনসংযোগ করেছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বিশেষ করে সরকারি বেসরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়।[৪৫২] মৌলিক গণতন্ত্রের তৃতীয় স্তর ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল গঠিত হয় ১৯৬০ সালে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল স্বাধীনভাবে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করে জমা দিতো এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দও পেতো। এতে করে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উন্নয়নমূলক কাজের সুবাদে জেলা কাউন্সিলে নির্বাচিত পাহাড়ি সদস্যদের এলাকায় সুনাম ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় যা অনেকের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হয়। জেলা কাউন্সিলে দায়িত্বপালনকারী অনেকেই পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিকভাবে উজ্জ্বল ক্যারিয়ার গঠন করেন। জেলা ও বিভাগীয় কাউন্সিল সদস্যদের মতে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে খুবই ফলপ্রসু হয়েছিল এবং এর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল

---

৪৫০ জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ* (রাঙামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩), পৃ. ১১।

৪৫১ Willem van Schendel, Aditya Kumar Dewan and Wolf Gang Mey, *The Chittagong Hill Tracts*, p. 78.

৪৫২ *সাক্ষাৎকার*: শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), পা. চ. আ. পরিষদ চেয়ারম্যান, ১৯৫৯ সালে মেট্রিক পাস করেন এবং গোটা ৬০ দশকব্যাপী মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবন তারিখ: ৯/১০/২০১৫ ।

সুদূরপ্রসারী।[৪৫৩] পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে দুইজন বিভাগীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারা হলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও চিরঞ্জীব রায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির (বয়স ৭৪) মতে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করা হয়।'[৪৫৪] তৎকালীন প্রভাবশালী মৌলিক গণতন্ত্রী ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য রাজা ত্রিদিব রায়ের লেখায়ও মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ ভুলে উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার দৃষ্টান্ত মেলে। এ প্রসঙ্গে তিনি চমৎকার চিত্র উপস্থাপন করেছেন:

> Almost 11 years ago on 2 January 1960, in the first basic democracies elections, it was just and fair to support the Bengali candidate, Syedul Haque, from Puranbasti in Rangamati for the Union Council seat rather than a hill-man. Not only did I urge the hill people to cast their votes for him but insisted that my wife and mother and even my aged grandmother Rani Ramamayee go personally to the polling booth at the Rani Dayamayee School and cast their votes. Syedul Haque had won with a vast majority.[৪৫৫]

মৌলিক গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ধাপ প্রাদেশিক কাউন্সিলেও পাহাড়িরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। তৎকালীন জেলা ও প্রাদেশিক কাউন্সিল সদস্য রাজা ত্রিদিব রায় প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়ে প্রাদেশিক পর্যায়ে তাঁর এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার বিরল সুযোগ লাভ করেন। তিনি নিজেই অকপটে লিখেছেন:

> আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগীতায় গত ১৯৬২ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং ১৯৬৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেলা পরিষদের Vice Chairman পদে নির্ব্বাচিত হই। ১৯৬৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয়বারের জন্য প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে সক্ষম হই।[৪৫৬]

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হিসেবে তিনি এলাকার উন্নয়নে বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলো ১৯৬৫ সালে রাঙামাটিতে কলেজ স্থাপনে তাঁর জোরালো ভূমিকা। তিনি লিখেছেন:

---

[৪৫৩] *সাক্ষাতকার:* কল্প রঞ্জন চাকমা, প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী, স্থান: তবলছড়ি বাসা, তারিখ ২১/২/২০১৫,

[৪৫৪] *সাক্ষাতকার:* কাজী নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল, স্থান: অ্যাডভোকেট প্রতীম রায় পাম্পু চেম্বার, রাঙামাটি, তারিখ: ৩০/৯/২০১৫।

[৪৫৫] Tridiv Roy, *The Departed Melody*, p. 200.

[৪৫৬] ১৯৭০ এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে প্রচারিত ত্রিদিব রায়ের ''পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী ভাই-বোনদের প্রতি বিনীত আবেদন'' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহার, পৃ. ৩।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের ও জেলা কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৬৫ সালে রাঙ্গামাটী কলেজ স্থাপন করা হয়। আমি সরকারের নিকট বহু চেষ্টা করিয়া রাঙ্গামাটীতে একটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করাইতে সক্ষম হই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমি একাধিকবার বক্তৃতার মাধ্যমে এই দাবী পরিষদে উত্থাপন করি।[৪৫৭]

গত শতকের ষাটের দশকের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জার্মান গবেষক লরেন্স জি লোফলার তাঁর ক্ষেত্র সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে লিখিত এক গবেষণা নিবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে নবপ্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের প্রভাব ও ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে ইতিবাচক মন্তব্য উপস্থাপন করেন:

> In 1959, a political institution hitherto unknown was introduced: the universal, equal and secret ballot of local representatives. The results disclose a syncretism of traditional conceptions with new ones. . . . The votes show a strong tendency to uphold the respective cultural identities of voting groups but there are also signs of improvement of understanding between ethnic majorities and minorities. On the whole it seems that this system of basic democracy may well prove itself to be a meaningful and positive contribution.[৪৫৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত সামাজিক নেতা রাজা ত্রিদিব রায় ও বোমাং রাজ পরিবারের সদস্য অং শৈ প্রু চৌধুরীসহ অন্য প্রথাগত নেতাদের মৌলিক গণতন্ত্রে অংশগ্রহণকে জি. লোফলার ‘ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যুগপৎ পথচলার বহিঃপ্রকাশ’ হিসেবে দেখেছেন। কেননা ১৫তম বোমাংগ্রী প্রয়াত অং শৈ প্রু চৌধুরী ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি বান্দরবান সদর ইউনিয়নে প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁর এ বিজয় ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকা রাখার দ্বার খুলে দেয়। চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ‘তঘমায়ে খেদমত’ খেতাবে ভূষিত হন।[৪৫৯] এছাড়া ১৯৬৬ সালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে জেলা কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন।[৪৬০] তাঁর জ্ঞাতিভাই বোমাং রাজা মং শোয়ে প্রু চৌধুরী ১৯৬২ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রাদেশিক পরিষদে নির্ধারিত আসন থেকে সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রাদেশিক পানি, সেচ ও বিজলী মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব

---

[৪৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬

[৪৫৮] Lorenz G. Loffler, *Basic Democracies in den Chittagong Hill Tracts*, Ost Pakistan, 1967, p. 152-171; লরেন্স জি. লোফলারের জার্মান ভাষায় লেখা ২০ পৃষ্ঠার একটি পামপ্লেট জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউট গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। পামপ্লেটের পিছনে ইংরেজিতে সারাংশ দেয়া আছে। উদ্ধৃতিটি তারই অংশ। এ লেখাটির জন্য আমি ভারতের নতুন দিল্লিস্থ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অমিয় প্রসাদ সেন স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বর্তমানে সেখানে ফেলোশিপ নিয়ে গবেষণারত আছেন এবং আমার অনুরোধে ইমেইল এ সারাংশটা পাঠিয়ে দেন।

[৪৫৯] আবদুল মাবুদ খান, *বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায়* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ.১২০।

[৪৬০] মংক্য শোয়েনু নেভী, ‘‘পুণ্যলোকের যাত্রী’’ রেপ্রুচাই (সম্পা.), *মো লাং নীং* (ঢাকা: বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, ২০১২), পৃ. ১২৪।

পালন করেন। শুধু তাই নয় বান্দরবানের নির্বাচিত, মনোনীত মৌলিক গণতন্ত্রীরা তাদের মুখপত্র হিসেবে 'ঝরণা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন **১৯৬৬** সাল থেকে। 'ঝরণা'য় লেখা থাকত : 'ঝরণা' বান্দরবান মহকুমার মৌলিক গণতন্ত্রী: হেডম্যান ও জনসাধারণের একমাত্র মুখপত্র। দেশের জনসাধারণকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসের চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে 'ঝরণা' প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রাথমিক লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য 'ঝরণা' তার স্বকীয় গতিতে চলতেই থাকবে।[৪৬১] উল্লেখ্য, সিলেট জেলার মৌলিক গণতন্ত্রীরাও এ ধরনের প্রকাশনা বের করেছিলেন। পাকিস্তান আমলে রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত মাসিক *পার্বত্য বাণী* পত্রিকায়ও মৌলিক গণতন্ত্রীদের কর্মতৎপরতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পত্রিকাটি **১৯৬৮** সালের মার্চ্চ সংখ্যায় লিখেছিল, ''বর্তমান সরকারের উন্নয়নের দশম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের অন্যান্য জায়গার মত রাঙামাটীতেও ২৩ শে মার্চ্চ হইতে ২৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ''মৌলিক গণতন্ত্র সপ্তাহ'' পালন করা হয়। এই সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণীয় ছিল, সেমিনার বিচিত্রানুষ্ঠান ও জারিগান। এখানকার জনসাধারণ এই সপ্তাহকে যথাযথ মর্য্যাদার সহিত পালন করে।''[৪৬২] মাসুদুল-উল-হাসান মৌলিক গণতন্ত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন:

> ''. . . The Revolution has brought a message of new hope and new life for local bodies. The Basic Democracies experiment which marks the renaissance and resurrection of local bodies aims at assigning the local bodies their rightful place and role in the body politic.[৪৬৩]

উপরে সন্নিবেশিত প্রত্যক্ষ অংশীজনদের মন্তব্য, স্মৃতিচারণ এবং গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণের আলোকে এ কথা বলা যায় যে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং দেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

৪.৯ ১৯৭০ এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি

অবিভক্ত পাকিস্তান ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাসে **১৯৭০** সালের সাধারণ নির্বাচন তাৎপযপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও গণতান্ত্রিক চেতনার উম্মেষ ঘটাতে এ নির্বাচনের তাৎপর্য অনুসন্ধান অতীব প্রয়োজন এবং গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্তির ধারাবাহিক অগ্রগতিও

---

[৪৬১] মি. সুনীতি বিকাশ চাকমা, (সম্পা.) *ঝরণা*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৭।
[৪৬২] *পার্বত্য বাণী*, ১৯৬৮ সালের মার্চ্চ সংখ্যা, পৃ. ৩৯।
[৪৬৩] Masud-ul-Hasan, *op., cit.,* p. 11.

অনুধাবন করা যাবে। কিন্তু তার আগে আইয়ুবের পতন ও ১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রেক্ষাপটটি একবার দেখা দরকার। আইয়ুব পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অধিক উন্নয়ন সাধন করলেও তা তার শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সহায়ক হয়নি। অন্য কথায় বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও তাদের উঠতি প্রজন্মকে আস্থায় আনতে ব্যর্থ হয়। এ ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক হিসাব নিকাশে ভ্রান্তি ছিল বলে অনেকের ধারণা। যেমন আইয়ুব খানের দশকব্যাপী দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য সুসংহত করার পরিবর্তে তাঁর নিজের গদি রক্ষায়ও সহায়ক হয়নি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিজানুর রহমান শেলীর মতে,

> The economic activities of the Ayub regime immensely expanded and strenthened the Bengal Muslim middle classes. Extension of educational facilities resulted in a substantial increase in the number of literate youth. Given the fact that in East Bengal there were many fewer opportunities for formal post-degree training in comparison to West Pakistan, ... these educated young men and women were complelled to add substantially to the ranks of the mobilized, alienated youth. The youth, especially the students, played a significant role in the antiregime and proautonomist movement in East Bengal from 1962 to 1971.
> The Ayub regime perceived the people of Pakistan to be in a perpetual state of nonage. Such a view and the policies and programs based on it had a particularly adverse effect on the growing middle classes of East Bengal. Their participation in the effective ruling institutions of the government was much less than the Bengali numerical majority deserved. They found these institutions inadaquate and unresponsive to their political and economic hopes and aspirations. They gradually came to perceive the central Pakistani establishment under Ayub's ætutorial regime" as a colonial dispensation imposed on them. No wonder, then, that separatist tendencies in East Bengali became stronger than ever before during the decade of Ayub's rule.[৪৬৪]

সীমাহীন অর্থনৈতিক বৈষম্যে বঞ্চিত, ক্রমবর্ধমান বেকারত্বে হতাশাগ্রস্ত, রাজনৈতিক দমন-পীড়নে উৎপীড়িত এবং প্রতিরক্ষাহীনতার শংকায় শঙ্কিত বাঙালি জাতি আইয়ুব সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান শুরু করে। ঠিক এ সময় বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৯-এর গণ অভুত্থানের মাধ্যমে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি কেবল আওয়ামী লীগ নয়, সমগ্র জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভিষেক অনুষ্ঠানে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। দিন যত যেতে থাকে তাঁর বজ্র কণ্ঠস্বরটি অচিরেই সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়।

---

[৪৬৪] Mizanur Rahman Shelly, *Emergence of a New Nation in a Multipolar World,* p. 36.

পরিস্থিতির ভয়াবহতা কিছুটা আঁচ করতে পেরে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য সর্বদলীয় বৈঠক আহবান করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফার কথা সেই বৈঠকে পুনর্ব্যক্ত করেন। কিন্তু আইয়ুব ছয় দফাভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নে অসম্মত হলে ঐ বৈঠক ব্যর্থ হয়, পরিণামে আইয়ুবের বিরুদ্ধে গণরোষ তুঙ্গে উঠে। আইয়ুব পুনরায় সামরিক শাসন জারি করতে চাইলে সেনাবাহিনী তাঁর অধীনে সামরিক শাসন জারিতে অনাস্থা জ্ঞাপন করে। ফলে আইয়ুব বাধ্য হয়ে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ''দেশের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রদান করেন।'' এভাবে আইয়ুব জমানার পতন ঘটে।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন (২৫ মার্চ ১৯৬৯ থেকে)

তৎকালীন সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি করেন। জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সেনাপ্রধান হিসেবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকালে ১৯৬৯ সালের ৩১ মার্চ নিজেকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। আইয়ুব খানের নীতির সাথে তাঁর নীতির লক্ষণীয় পার্থক্য হলো তিনি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ যেমন করেননি তেমনি *এবডোর* মতো কোনো প্রতিবন্ধকতামূলক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিরোধীদলীয় নেতাদের ধরে ধরে জেলখানায় পাঠাননি। ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া প্রথম ভাষণে তাঁর সরকারের ধরনকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আখ্যায়িত করে বলেন তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলোঃ ''creation of conditions conducive to the establishment of constitutional government . . . and smooth transfer of power to the representatives of people elected freely and impartially on the basis of adult franchise''[৪৬৫] উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ব্যবস্থা হিসেবে তিনি ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর তাঁর স্কিম ও পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে অন্যতম হল, স্বায়ত্তশাসনকামী বাঙালি নেতৃত্বের জোরালো দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সাল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের যে এক ইউনিট সত্তা কার্যকর ছিল সেটি বিলোপ করে চারটি প্রদেশ গঠন এবং 'এক ব্যক্তি এক ভোট' – এই নীতিতে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত।[৪৬৬] তিনি একই সাথে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল আসনে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের আদেশ জারি করেন। এভাবে মৌলিক গণতন্ত্রের পরোক্ষ নির্বাচনের যুগ অবসান হয়ে পাকিস্তানে পুনরায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে প্রথমবারের মতো জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়। অতঃপর ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ একতরফাভাবে 'একটি আইনগত কাঠামো আদেশ' জারি

[৪৬৫] Rounaq Jahan, *Pakistan*, p. 187.

[৪৬৬] পাকিস্তান সরকার, পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র, ৫ আগস্ট ১৯৭১ উদ্ধৃত- মো. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০।

করেন যাতে নির্বাচনী বিধি, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের গঠন এবং এদের কার্যাবলী ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৬৭]

জনসংখ্যাগত সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে এক কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২টি আসন বরাদ্দ করা হয় যে-পরিষদ ভবিষ্যতে গণপরিষদ হিসেবে কাজ করবে বলে স্থির হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আইনগত কাঠামো আদেশ মেনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য প্রচারণা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা।

পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য জাতীয় পরিষদে একটি আসন বরাদ্দ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামেও নির্বাচনী হাওয়া বয়ে যায়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক প্রভাব ছিল দুর্বলতর। অন্যদিকে জেলাটির শতকরা ৮৮ ভাগ লোকই হলো উপজাতি যাদের ওপর প্রথাগত উপজাতীয় রাজাদের প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য ও অসীম। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে বরাদ্দকৃত ২টি আসনে আওয়ামী লীগের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধু ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে তিনি পার্বত্য জেলায় আওয়ামী লীগের শুন্যতা পূরণের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের মনোয়ন দাখিলের পূর্বেই তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁর ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসায় আমন্ত্রণ জানান। ত্রিদিব রায়ও যথারীতি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। বঙ্গবন্ধু রাজা ত্রিদিব রায়কে আওয়ামী লীগে যোগদান করার জন্য বারংবার অনুরোধ জানিয়ে দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার আহ্বানও জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বান ছিল সময়োপযোগী এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। উপরন্তু তা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা পাহাড়িদেরকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জাতীয় রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্তিরই সোনালি হাতছানি। কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায় ‘‘We don’t understand party politics too well, Sheikh Sahib’’[৪৬৮] বলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন।

রাজা স্বতন্ত্র বা নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোয়ন পত্র জমা দেন। রাজনীতিতে ‘শেষ কথা’ বা ‘শেষ ঠিকানা’ বলে কোনো কথা নেই। বঙ্গবন্ধু ত্রিদিব রায়কে না পেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামেরই আরেক নেতা চারু বিকাশ চাকমাকে জাতীয় পরিষদের পার্বত্য চট্টগ্রাম আসনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন এবং নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, কোনো কোনো পণ্ডিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি বাঙালি রাজনৈতিক নেতা বা এলিটদের নীতিগত অবস্থান প্রসঙ্গে একপেশে মন্তব্য

---

[৪৬৭] ঐ।

[৪৬৮] Tridiv Roy, *The Departed Melody*, p. 202.

উপস্থাপন করেছেন যা পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পরিবর্তে রাজনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টির উপাদান হিসেবে কাজ করে। তাঁর/তাঁদের মতে, বাঙালি রাজনৈতিক এলিটরা পার্বত্য জনগণ এবং তাদের চিফ বা রাজাদেরকে কখনো কাছে টেনে নেননি, যার কারণে পাহাড়িদের মধ্যে দূরত্ববোধ এবং পর্যায়ক্রমে বিচ্ছিন্নতার চেতনার উন্মেষ ঘটে।[৪৬৯] পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টির বা জাতীয় সংহতি বিনষ্টের জন্য কেবলমাত্র রাজনীতিবিদদের নীতিই দায়ী নয়, যদিও তাদের দায়িত্ব বেশি, কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীর (সুশীল সমাজ) একপেশে লেখনীও পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির দায় এড়াতে পারে না। যাহোক এ পর্যায়ে রাজা ত্রিদিব রায়ের স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত করা যায় আসলে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর কী আলাপ হয়েছিল:

> In 1970, a week or so before the date for filing nomination papers I recieved a telegram from Sheik Mujibur Rahman requesting to see me him in Dhaka. Mujib's Dhanmandi residence, not far from Angus Hume's across the lake, was full of milling political workers and hangers-on. . . . He had got rid of most of the people and only two or three of his cronies were present when I went in. Mujib came forward and greeted me warmly. We had tea and after some exchange of pleasntries he asked about conditions in the Hill Tracts. I told him the economic condition of the people was bad. They had not recovered from the shock of the displacement due to the Kaptai dam. But what they were most concerned about now was their constitutional and administrative safeguards. He said when his party came to power he would develop the area. I repeated, ''We want safeguards in the constitution.''
> ''Progress is what you need, Raja Sahib,'' he cut in.''And development. I promise you I will help you in development.'' Then with a big smile he suddenly said, ''Why don't you join in my party?''... After that I once asked for his views on constittutional safeguards for the Tracts, which he evaded. In turn he made another attempt to get me to take this party nomination, which I politely refused... After some more conversation he said he would not put up any any candidate against me and wished me success. I express my thanks and left.[৪৭০]

উপরের উদ্ধৃতিতে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু ত্রিদিব রায়কে তাঁর সাথে চেয়েছিলেন। আরও প্রতীয়মান হয় যে ত্রিদিব রায় বঙ্গবন্ধুর নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা যা ছয় বছর আগে ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকার বাতিল করে দিয়েছিল তা পুনর্বহালের নিশ্চয়তা চেয়েছিলেন এবং ত্রিদিব রায়ের ভাষ্যমতে বঙ্গবন্ধু

---

[৪৬৯] Amena Mohsin, তাঁর *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh, (*2002) গ্রন্থে লিখেছেন, ''A consequence of this alienation was that the local people in general (including their political bodies), and their chiefs remained indifferent of the cause of Bengali nationalism during Pakistan period. The Bengali political elite also had not taken either the Hill people or their chiefs into confidence.'' p. 47-48. এবং তিনি 53 নং পৃষ্ঠায় কথাটি পুনর্ব্যক্ত করেন এভাবে: ''And more importantly the Awami League had made no attempts to incorporate the Hill People within Bengali Nationalism."

[৪৭০] Tridiv Roy, *The Departed Melody*, p. 202.

সে-প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী চারু বিকাশ চাকমার প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে বিপরীত তথ্যের সন্ধান মিলে। তিনি লিখেছেন:

> এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম বাঙ্গালী ও এক ডজনেরও বেশি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ অঞ্চল। পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পূজারী শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে এক বিশেষ অঞ্চল বা উপজাতি এলকা হিসাবে শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে মর্য্যাদা আয়ুবী শাসনতন্ত্র ১৯৬৩ সনের হঠকারিতা মূলক সংশোধনী প্রস্তাবের মারফৎ (Appendix 1. the constitution 1^{st} amendment act, 1963) আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন।[৪৭১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংবিধানিক মর্যাদা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তার বিচারে ও নেতৃত্বের গুণে অদ্বিতীয় জাতীয় নেতা কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের অপর প্রভাবশালী উপজাতি নেতাকে বাসায় ডেকে কোনোরকম মধ্যস্থতা ছাড়া সরাসরি তাঁর দল তথা আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বানটির তাৎপর্যও অপরিসীম। বঙ্গবন্ধুর উক্ত আহ্বানের বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য হলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোনো জাতীয় পর্যায়ের বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রধান কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামকে দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত করার স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রয়াস। বঙ্গবন্ধু যে সত্যিকার অর্থেই পাহাড়িদের পাশে চেয়েছিলেন সেটা ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবরে পাকিস্তানি গণমাধ্যমে (টিভি ও রেডিও) তাঁর প্রদত্ত নির্বাচনী ভাষণেও স্পষ্ট। ঐ ভাষণে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং পার্বত্যবাসীদের ভাই বলে সম্বোধন করে বলেছিলেন, ‘‘our brothers in the CHT who require special assistance to develop their latest resources, in order to enable them to play their rightful part in our national life.”[৪৭২] বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জাতীয় রাজনীতির সাথে পার্বত্য পাহাড়িদের অন্তর্ভুক্ত করার ১৯৭০ সালের প্রয়াস আংশিক হলেও সফল হয়।[৪৭৩] চারু বিকাশ চাকমার নিচের বক্তব্য থেকে জানা যায়:

> আমি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ৪ লক্ষ আপামর জনসাধারণের পক্ষ হয়ে সমগ্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের উপর গভীর আস্থা রেখে পাকিস্তানের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ গণনায়ক, জাতির কাণ্ডারী শেখ মুজিবুর রহমান কর্ত্তৃক রচিত ১২ কোটি মজলুম পাকিস্তানী জনতার মুক্তির সনদ ৬ দফা বাস্তবায়নের জন্য অর্থাৎ পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের দাবী আদায়ের জন্য জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম নির্ব্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

---

৪৭১ চারু বিকাশ চাকমার নির্বাচনী ইশতেহার *আমার ইস্তেহার* (রাঙ্গামাটী: সরোজ আর্ট প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ১-২।

৪৭২ Ramendu Mazumdar, *Sheik Mujibur Rahman, Selected Speaches and Statements, 28 October to 26 March 1971, (*New Delhi: Orient Longmans, 1972), p. 10. cited by Saradindu Mukherji, *Subjects, Citizens and Refugees: Tragedy in the Chittagong Hill Tracts (1947-1998*) (New Delhi: Indian Centre for the Study of Forced Migration, 2000), p.41.

৪৭৩ ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর পুরোপুরি সফল হয় দুই উপজাতীয় রাজা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তথা বাকশালে যোগদানের মধ্য দিয়ে।

> করতেছি। . . . আমরা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা আজ এই শপথ নেবো যে, সমগ্র পাকিস্তানের ১২ কোটি সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্ম হয়ে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বীর সৈনিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগের বিঘোষিত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবো ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম(ে) এমন এক সুন্দর, সমৃদ্ধ, সুখী ও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করবো যে সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি লোক অভাব মুক্ত ও অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে এক স্বাধীন, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে উন্নত জীবন উপভোগ করতে পারবে।[৪৭৪]

উপর্যুক্ত 'কথামালা' দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন সম্পর্কে পার্বত্য অরণ্যবাসীরাও যথার্থই অবগত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সকল বাঙালির মতো বঙ্গবন্ধুর দল, নেতৃত্ব ও সংগ্রামের প্রতি তাদেরও যে অবিচল আস্থা রয়েছে তা লক্ষণীয়ভাবে প্রতীয়মান। সারা বাংলার মানুষের মতো তাদের চোখে-মুখেও স্বাধীন, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ উন্নত জীবনের স্বপ্ন।

ইয়াহিয়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত রাখার লক্ষে পূর্বসুরী সরকারের অনুসৃত প্রক্রিয়া আরো উদারভাবে অব্যাহত রাখেন। সামরিক সরকার হলেও তাঁর সরকারই অবিভক্ত পাকিস্তানের ইতিহাসে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে তথা সংবিধান পরিষদে প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য এককভাবে একটি আসন বরাদ্দ দেয়। ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম কখনো একক মর্যাদা নিয়ে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়নি। চট্টগ্রামের রাউজানের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুড়ে দেওয়ায় চট্টগ্রামের ধনাঢ্য, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের সাথে পাল্লা দেওয়া রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর এবং দলীয় রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ পার্বত্য উপজাতি প্রার্থীদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হয়নি। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে ফজলুল কাদের চৌধুরীর বিপরীতে দুজন পাহাড়ি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে একজন প্রার্থী নির্বাচন করলে ফলাফল তাদের অনুকূলে যেতো। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্যরা সবাই পাহাড়ি। কিন্তু তারা সে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। এতে ফজলুল কাদের চৌধুরীই বিজয়ী হয়েছে।

এ বিবেচনায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি একক আসন প্রাপ্তির রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। বলা বাহুল্য ইয়াহিয়া সরকারের ঘোষিত আসন্ন সংবিধান পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি আসন বরাদ্দ রাখার সরকারি সিদ্ধান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে সরকারি নীতি যে রাষ্ট্রের ভিতর দুর্বল জাতিসত্তা তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রার্থীরা তাদের অঞ্চলের জন্য এককভাবে আসন বরাদ্দ এবং সে আসনে সঠিক ও যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের

---

[৪৭৪] চারু বিকাশ চাকমার নির্বাচনী প্রচারপত্র *আমার ইস্তেহার*, পৃ. ২।

গুরুত্ব উপলব্ধি সম্যকভাবে করেছিলেন। আর সেটির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবির দেখা মিলে জাতীয় পরিষদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহারে। রাজা ত্রিদিব রায়ের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা তার নমুনা দেখতে পায়। তিনি লিখেছেন:

> পরিকল্পিত জাতীয় পরিষদ, পূর্বের সমস্ত জাতীয় পরিষদ হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই জাতীয় পরিষদের উপরই সমগ্র পাকিস্তানের শাসন প্রণালী (Constitution) গঠনের গুরুদায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছে। . . . দেশের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা কিরূপ হইবে– তথায় এই উপজাতীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের সুখ-সুবিধার কথা কতটুকু স্বীকৃতি লাভ করিবে এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন ব্যবস্থা (Special Status) থাকিবে কিম্বা প্রদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় এই জেলাও Regulated Area হিসাবে শাসিত হইবে এবং তাহাতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের কি কি সুবিধা বা অসুবিধা হইতে পারে– এই সমস্ত জটিল সমস্যা এবং গুরুতর বিষয়াদি উক্ত জাতীয় পরিষদে বিবেচিত হইবে আর সেই পরিষদের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করিবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব কৃষ্টি ও সভ্যতার রক্ষণাবেক্ষণ, সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি, এক কথায় সমস্ত ভবিষ্যৎ। অতএব, এমন একজন প্রতিনিধি আমাদের নির্বাচন করা প্রয়োজন যাঁহাকে আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতে পারি আর যিনি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসীর আশা-আকাঙ্খা সক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করিতে পারিবেন।[৪৭৫]

পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচনী ইতিহাসে প্রার্থীদের দ্বারা নির্বাচনে জয় লাভের জন্য ভোটারদের কাছে প্রচারণার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত আকারে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ ১৯৭০ সালের নির্বাচনেই প্রথম দেখা মেলে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তিনজন প্রার্থী জাতীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তিনজনই ছিলেন পাহাড়ি। এর মধ্যে দুজন প্রথাগত রাজা (চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ও বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী) এবং একজন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী চারু বিকাশ চাকমা। শেষোক্ত প্রার্থীও *আমার ইস্তেহার* শিরোনামে একটি নির্বাচনী প্রচারপত্র ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ইশতেহারে তিনি ভোটারদের নিকট ৩০ দফা দাবি বা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন:

> গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য নিম্নলিখিত গণদাবিগুলি পেশ করতেছি এবং বিশেষ জোর দিয়ে ও অসীম গুরুত্ব সহকারে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছে ও জাতীয় পরিষদে পেশ করবো (যদি আপনারা আমাকে জয়যুক্ত করেন) যাতে আগামী শাসনতন্ত্রে ও আগামী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উক্ত গণদাবিগুলি পূরণ করার জন্য সুনিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।[৪৭৬]

তাঁর ঘোষিত উল্লেখযোগ্য দাবিসমূহ হলো:[৪৭৭]

১। (১ নং দাবি) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে এক বিশেষ অনুন্নত অঞ্চল বা উপজাতি অঞ্চল হিসাবে শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা দিতে হবে এবং উক্ত অঞ্চলের অনুন্নত বাঙ্গালী ও উপজাতীয় অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ রক্ষাকবজের সুনিশ্চিত বিহিতব্যবস্থার যথোপযুক্ত সংবিধান (সংবিধি) আগামী শাসনতন্ত্রে সংযোজিত করতে হবে।

---

৪৭৫ ''পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী ভাই-বোনদের প্রতি বিনীত আবেদন'' পৃ. ১-২।

৪৭৬ চারু বিকাশ চাকমা, *প্রাগুক্ত।*

৪৭৭ ঐ।

২। এই অনুন্নত বিশেষ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করতে হবে এবং উক্ত অঞ্চলের শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য গণভোটে নির্ব্বাচিত পরিকল্পিত গণপ্রতিনিধি সভায় যথেষ্ট সদস্য সংখ্যার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বাঙ্গালী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রত্যেকটি উপজাতি সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করতে পারে। তদপরি এই অঞ্চলের শাসন কর্তৃপক্ষকে সরাসরিভাবে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে যাতে উক্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা এই অঞ্চলের জনগণের সর্বাত্মক উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োগ করা যায় ও জনগণের দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়।

এছাড়া তিনি কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থদের ন্যায্য হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান, স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি চাকরিতে উপজাতিদের ৮০ ভাগ আসন সংরক্ষণ, শিক্ষা বৃত্তি বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করণ, কুটির শিল্পের উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ৩০টি প্রতিশ্রুতির কথা প্রচার করেন।

তিন প্রার্থীই জয়ের জন্য ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা চালান। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভৌগোলিক বিশালায়তন, জনগণের রাজনৈতিক অনগ্রসরতা, জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব প্রভৃতি তুলে ধরে জনগণকে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে স্ব স্ব নির্বাচনী প্রতীকে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তখন সারাদেশে আওয়ামী লীগের ব্যাপক জনসমর্থন। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে যেমন উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সকল মুসলমানরা ‘পাকিস্তানের’ জন্য একাত্মা হয়েছিল ঠিক একইভাবে ১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ‘ছয় দফা’ তথা পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য গণরায় দিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় আসনেও বঙ্গবন্ধু প্রার্থী দিয়েছিলেন। ফলে এখানকার নির্বাচনী প্রচারণা মূলত দুজন নির্দলীয় প্রার্থী ও একজন দলীয় প্রার্থীর দ্বিমুখী লড়াইয়ে পরিণত হয়। জাতীয় পরিষদ প্রার্থী ত্রিদিব রায় তাঁর আত্মজীবনীতে নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছেন এভাবে:

> After a hectic election campaign, involving numerous public meetings and journeys through the length and breadth of the largest constituency in the province, polling took place on 7 December 1970.[৪৭৮] . . . In the final National Assembly elections on the basis of adult franchise, the Jumma people of all the indigenous communities gave their verdict overwhelmingly in my favour against heavy odds, against threats, coercion and intimidation. The combined total of the other two candidates was less than mine by twenty thousands votes.[৪৭৯]

পূর্ব ঘোষিত সময়সূচি অনুসারে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নির্ধারিত ১৬২ নং জাতীয় পরিষদ আসনে রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় তখন মোট ভোটার ছিল ২,১২,০৬৩ জন। ত্রিদিব

---

[৪৭৮] Tridiv Roy, *op., cit.,* p. 203.
[৪৭৯] ঐ, পৃ. ২০৪।

রায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৬৬,৬০২ ভোট পান। আর আওয়ামী লীগের প্রার্থী চারু বিকাশ চাকমা ভোট পান ২৪,৭৯২ জন। তৃতীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মং শৈ প্রু পান ২২,৫৪০ ভোট। ভোট প্রদানের হার ছিল বেশ উচ্চ ৬৫ ভাগ এবং নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হয়েছিল।[৪৮০]

৪.১০ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো আলাদা আসন বরাদ্দ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর অংশের সাথে যুক্ত করে একটি আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়। ফলে স্বল্প জনসংখ্যা অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা অধিবাসীদের পক্ষে পার্শ্ববর্তী জেলার অগ্রসর ভোটারদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সহজ ছিল না। সে বিবেচনায় শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় দুটি আসন বরাদ্দ জনমনে যেমন উৎসাহ সঞ্চার করে তেমনি প্রাদেশিক পরিষদে প্রথমবারের মতো স্থানীয় পাহাড়ি প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করে। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা থেকে দুটি আসন বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা হয়েছিল ধর্মীয় ভিত্তিতে আর ১৯৭০ সালের নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় এক মাথা এক ভোট অর্থাৎ যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ধর্ম, বর্ণ, জাত নিরপেক্ষ সবর্জনীন ভোটাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এক কথায় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমতার পরিবেশ তৈরি করেছিল। এমন রাজনৈতিক বাস্তবতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা শিক্ষিত তরুণ নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার[৪৮১] নেতৃত্বে নির্বাচনে জয় লাভের জন্য মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৬৬ সালে অনন্ত বিহারী খীসা ও জ্যোতিরিন্দ্রি বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি। ভেন সেন্দেল মনে করেন, ‘এই পার্টি আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের পার্বত্য জনগণের

---

[৪৮০] এ এস এম সামসুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন (১৯৭০-২০০১)* (ঢাকা: বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ. ৬৪।

[৪৮১] এম এন লারমা ১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। পরে ১৯৬০ সালে ও ১৯৬৫ সালে যথাক্রমে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আই.এ, ও বি.এ. পাস করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে তিনি প্রথম এলএলবি ডিগ্রিধারী। ১৯৫৬ সাল থেকে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর রাজনীতিতে আগমন। ১৯৬২ সালে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির ঐতিহাসিক সম্মেলনে প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্র থাকাকালেই তিনি কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ ও উদ্বাস্তু চাকমাদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে সরকারি অনিয়ম, অবহেলা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ লিফলেট বিতরণ করার অপরাধে কারারুদ্ধ হন। এ ঘটনা তাঁর জীবনে শাপেবর হয়েছিল। তিনি উদীয়মান তরুণ জাতীয় নেতা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণ ছাত্রসমাজের রাজনৈতিক দিকপাল হিসেবে আবির্ভূত হন।

ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু’।[৪৮২] এ সমিতির উদ্যোগে সত্তরের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। এ কমিটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নির্ধারিত উত্তর আসনের প্রার্থী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালায় এবং জনমত গঠনে কাজ করে। এ পদক্ষেপ পাহাড়ি জনগণের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক মাত্রা লাভ করে। যাহোক নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে তারা ষোলো দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টো প্রচার করে যার মধ্যে অন্যতম প্রধান দফা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন ব্যবস্থার স্বীকৃতি আদায়।[৪৮৩] ১৯৭০ নির্বাচন প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন:

> আমরা জয়যুক্ত হওয়ার আশা নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি নাই। আমরা দুটো কারণে নেমেছিলাম। একটা হলো ১৯৬০ এর দশকের গোড়া থেকে ১৯৭০ এর দশকের শুরু – এই এক দশক আমরা যে কাজটা করলাম, এতে আমরা কতদূর জনগণের কাছে পরিচিতি লাভ করেছি সেটা জানা একটা ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, নির্বাচন যদি করি তবে এটা হবে একটা অভিজ্ঞতা। এর মাধ্যমে পরিচিতি বাড়বে। যদি জয়যুক্ত হতে পারি, তাহলে আমরা নেতৃত্বে গেলাম। নেতৃত্বের জন্যই তো লড়াই করছি। গ্রামে ঢুকতে পারলে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বকে কব্জা করা যাবে। ... নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা দেখলাম অনেক ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছি, জনগণ আমাদের গ্রহণ করেছে।[৪৮৪]

অন্যদিকে মানবেন্দ্র লারমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন চাকমা রাজ পরিবারের সদস্য কোকনদাক্ষ রায় যিনি রাঙামাটিতে কে. কে. রায় নামে সমধিক পরিচিত। তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে লড়েন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদের আসনে রাজা ত্রিদিব রায়কে রাজি করাতে না পারলেও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে তাঁর চাচা কে. কে. রায়কে ঠিকই রাজি করান। কে. কে. রায় ব্যক্তিগতভাবে যোগ্য প্রার্থী ছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সাংবাদিক প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত। কিন্তু রাজনীতি ব্যাপারটাই অন্যরকম। এখানে ভোটের হিসাব নিকাশ, সমীকরণ হয় অন্যভাবে। ব্যক্তিগত গুণাবলির চেয়ে সমকালীন রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি এবং স্থানীয় জনগণের ভাবাবেগ, আশা আকাঙ্ক্ষা ও সমর্থনই জয় পরাজয়ে মুখ্য মাপকাঠি।

---

[৪৮২] ভ্যান সেন্দেল, ‘‘জুম্মদের আবিষ্করণ,” পৃ. ১১৮।

[৪৮৩] Sree Uttaran, লিখেছেন, Tribal Welfare Association contested in the East Pakistan Provincial Assembly election held in 1970 in the name of Parbattya Chattagram Nirbachan Parichalana Committee through which M N Larma contested from the Nortern constituency and was elected with majority votes as member of East Pakistan Provincial Assembly. The election organising committee of CHT had 16 points demand in its election manifesto.’ ‘Autonomy with own legislature for CHT was the main point.’ ‘‘A genesis of the movement for self determination of the Jumma people of Chittagong Hill Tracts and its future.” in পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত *১০ই নভেম্বর ’৮৩ স্মরণে* পুস্তিকা।

[৪৮৪] মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম* অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জুন, ২০১৫, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২০৬।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পক্ষে শিক্ষকসমাজ গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। লারমা ইতিপূর্বে জনগণের পক্ষে কথা বলে কারান্তরীণ থেকে তাঁর স্বজাতির সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়েছিলেন। জেল থেকে বের হবার পর দীঘিনালায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ফলে এমপিএ নির্বাচনে প্রার্থী হলে শিক্ষকসমাজের সমর্থন লাভ সহজতর হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন সমকালীন পর্যবেক্ষক সেই সময়কার পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে বলেন, ''ষাট দশকেই গঠিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি লারমার পাশে এসে দাঁড়ায়। এই সমিতি তখন লারমার রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম স্তম্ভ। তিনি এ সমিতিকে চাঙ্গা এবং আরও সুসংগঠিত করেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি নির্দলীয় প্রার্থী হন।''[৪৮৫] মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনও ছিল গণমুখী। তাঁর এলাকার মানুষের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল পরিবর্তন এনে দেওয়ার। লারমার রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা সম্পর্কে তাঁরই একসময়কার রাজনৈতিক সতীর্থ পঙ্কজ ভট্টাচার্য্যের মূল্যায়ন গভীর তাৎপর্যপূণ। তিলি বলেন:

> আমরা উভয়ে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ছিলাম, রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল সাধারণভাবে অভিন্ন। সেই দিনগুলোতে পাহাড়ী জনগণসহ মেহনতি ও গরীব আপামর জনগণের শোষণমুক্তির স্বপ্নে তিনি অধীর থাকতেন। বিশ্বজুড়ে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সাফল্য, প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ ইউরোপ ও এশিয়ায় উত্তাল হয়ে ওঠা, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্দ্ধিত বিশাল অগ্রগতি ও প্রভাব তার চিন্তা ও ধ্যান ধারণায় গভীরভাবে রেখাপাত করে। ... তিনি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতেন সামন্ত শোষণ-নির্যাতনের জোয়ালে আবদ্ধ পাহাড়ী জনগণের জিম্মিদশা দেখে। পাহাড়ী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অনুন্নয়ন, পিছিয়ে পড়া, অশিক্ষা, ক্ষুদ্র জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা ও সদ্ভাবের অভাব তাকে পীড়িত করতো।[৪৮৬]

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, বোমাং রাজার জ্ঞাতি ভাই অং শৈ প্রু চৌধুরী[৪৮৭] এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী সৈয়দুর রহমানসহ মোট ছয়জন প্রার্থী। বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আস্থা ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ।

কিন্তু নির্বাচনে উত্তর আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কে. কে. রায় আর মানবেন্দ্র লারমার মধ্যে। লারমার পক্ষে প্রচারণাভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অফিস খোলা হয় রাঙামাটি শহরের মাঝির বস্তির ভূবন চন্দ্র চাকমার বাড়ি ভাড়া নিয়ে। এ সময় অনন্তবিহারী খীসা এবং মানবেন্দ্র লারমার অনুজ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়া মানবেন্দ্র লারমাও অনেক পরিশ্রম করে জায়গায় জায়গায় ঘুরে জনসভা, বৈঠক করেন।

---

[৪৮৫] সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রসঙ্গ: পার্বত্য চট্টগ্রাম* (কলিকাতা: নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮৬), পৃ. ৩৭।

[৪৮৬] পঙ্কজ ভট্টাচার্য, "জুম্ম জাতির স্থপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা" দীপায়ন খীসা (সম্পা.) *মাওরুম:* মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিশেষ সংখ্যা, (ঢাকা: সৌম্য প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ.১৩-১৭।

[৪৮৭] অং শৈ প্রু চৌধুরী ১৯১৫ সালে বান্দরবানের জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে চট্টগ্রাম সেন্ট প্ল্যাসিড হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। অতপর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। পরে পুলিশ বিভাগে সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকুরি শুরু করেন। স্বাধীনতার পর চাকরি ছেড়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। জিয়াউর রহমানের আমলে মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

জনসভায়, বৈঠকে তিনি যুগ যুগ ধরে জুম্মদের শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের কারণ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জনগণের ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জাতপাত, পদ-পদবি নির্বিশেষে সকল জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রাদেশিক পরিষদে যোগ্য নেতা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন। একইসাথে পাহাড়ি ছাত্র সমিতিকে উজ্জীবিত করে ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। নির্বাচনী প্রচারণা ও জনগণের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট দানের গুরুত্ব অনুধাবন করাতে ছাত্রসমাজকে কাজে লাগান।[৪৮৮] এতে জনগণের মধ্যে রাজনীতি, ভোট, নির্বাচন, গণতন্ত্র, গণপ্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি নতুন নতুন ধারণা ও চেতনা সঞ্চারিত হয়। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় স্বতন্ত্র প্রার্থী অং শৈ প্রু চৌধুরী ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী সৈয়দুর রহমানের মধ্যে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বিপরীতে সৈয়দুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামকে সারাদেশের অন্য আরও দশটা জেলার মতো সাধারণ জেলা হিসেবে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। নির্বাচনে সৈয়দুর রহমানের ঘোষণা প্রসঙ্গে রাজা ত্রিদিব রায় লিখেছেন:

> Syedur Rahman had declared that when he got into the provincial assembly he would demand the complete merger of the Hill Tracts with the plains as a regulated district. He would advocate annulment of the safeguards of the hillmen and throw open the gates of the Hill Tracts to all citizens, meaning of course fellow plainsmen.[৪৮৯]

নির্বাচনে ভোটারদের সমাগম হয়েছিল ব্যাপক। ভোটারদের লক্ষণীয় উপস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষকে নির্দেশ করে। নিম্নের সারণিতে উপস্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ আসনে ভোটের ফলাফল আমাদেরকে সে বার্তাই প্রদান করে।

সারণি- ৪.৫[৪৯০]

ক্রমিক নং	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা
১.	মি. অং শু প্রু চৌধুরী	১৮,৩৮৩
২.	মি. গোলাম মোস্তফা	৩৭৩
৩.	মি. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা	৫,৯৬২
৪.	মি. কল্প রঞ্জন চাকমা	৩৫৪
৫.	মি. সৈয়দুর রহমান	১০,৭৯০
৬.	মি. সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন	৬,২২৯

---

৪৮৮ স্নেহ কুমার চাকমা, *জীবনালেখ্য: জীবন, সংগ্রাম ও সংঘাতময় দিনগুলির কথা* (রাঙামাটি: মিসেস অনামিকা চাকমা কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১১), পৃ. ১০৯-১১০।

৪৮৯ Tridiv Roy, *The Departed Melody*, p. 201.

৪৯০ তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টে রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে প্রেরিত নির্বাচনী ফলাফলটি সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য আমি ১৯৭০ এর নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ আসনের প্রার্থী শ্রী জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার নিকট কৃতজ্ঞ।

দক্ষিণের আসনে মোট ৪২,০৯১টি ভোট পড়েছে। উত্তরের আসনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেলেও তার প্রকৃত প্রাপ্ত ভোটের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনও পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তিতে ভূমিকা রেখেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে দুটি আসন লাভ করে। এ পদক্ষেপ একদিকে গণতন্ত্রের আবরণে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণকে বেগবান করে অন্যদিকে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়িদেরকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নৈকট্যে নিয়ে আসে। দুই যুগের পাকিস্তানি শাসনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া ইতিবাচক পথে ধাবিত হয়। গবেষকদের তাত্ত্বিক মূল্যায়নেও তেমনটিই প্রতিফলিত হয়েছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী আর আই চৌধুরীর মতে,

> During last two decades, the Chakma and Mong tribes have been exposed to the various political experiments that have been applied to the country as well. The introduction of Basic Democracy in 1960 and parliamentary Election of 1970 and some important measures which have been applied there for political socialization of these tribes [bring positive results]. These measures as well as the extension of other administrative network have resulted in the gradual politicization of the tribal groups. These communities are gradually evolving to accommodate the non-traditional pattern of leadership, in keeping with the main stream of the political process.[৪৯১]

উপসংহার:

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সময়কালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় বিভিন্ন দল ও পদ্ধতির সরকার অধিষ্ঠিত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি তাদের নীতি ছিল কার্যত একই। সেটা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশে প্রচলিত সমরূপ শাসন প্রবর্তন। এজন্য পাকিস্তান সরকারকে তিনটি কাজ করতে হয়েছে। প্রথমত, ঔপনিবেশিক শাসনের স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্নতার স্তম্ভগুলো– ১৮৮১ সালে উপজাতিদের দ্বারা গঠিত ফ্রন্টিয়ার পুলিশবাহিনী, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের বিশেষ ধারা– ভেঙ্গে ফেলা; দ্বিতীয়ত, অন্যদিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষে পুরাতন আইনের সংশোধন ও প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন ও অধ্যাদেশ জারি করে তা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ করা; তৃতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃজন। পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করেছে। ঔপনিবেশিক

[৪৯১] R I Chowdhury et al, 1979, p. 45.

আমলের জেলা প্রশাসনের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত পার্বত্য প্রথাগত রাজাদের কর্তৃত্ব বহাল রাখার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের কিছুটা আঞ্চলিক ঐতিহ্য-সংবেদনশীলতা দৃশ্যমান হলেও চূড়ান্ত বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমগ্র পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার (১৯৫৬-৭১ পূর্ব পাকিস্তান) রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক ও পরে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্তির কাজই প্রাধিকার লাভ করেছে। স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনোপক্ষে ভোটাধিকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অবধি সম্প্রসারণ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আলাদাভাবে আসন বরাদ্দ প্রদান উক্ত এলাকার জনমানসে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। আবার আইয়ুব শাহী আমলে প্রবর্তিত বেসিক ডেমোক্রেসি রূপ স্থানীয় শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তনের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের পল্লি জনপদে প্রচলিত প্রথাগত ক্ষমতা কাঠামোর সমান্তরালে সংযুক্ত করেছে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো। এসব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পাহাড়ি জনগণের রাজনীতির পাঠশালার ভূমিকা পালন করেছে যেখানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাহাড়ি জনপদে গড়ে ওঠে গণমুখী রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমে ভৌগোলিকভাবে দুটি অসন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। জাতিরাষ্ট্র হিসেবে নব সৃষ্ট পাকিস্তানের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ‘পাকিস্তানি’ জাতীয় পরিচিতি, ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এটা সুবিদিত যে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো জাতীয় ঐক্যমূলক উপাদান ছিল না। স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা যখন পূর্ব বাংলার বাঙালিদেরকে রাজনৈতিক ভাবে অবমূল্যায়ন ও দমন পীড়ন, অর্থনৈতিকভাবে শোষণ বঞ্চনা, জাতিগতভাবে অপমান এবং সাংস্কৃতিকভাবে আগ্রাসন চালায় তখন জাতীয় ঐক্যের একমাত্র উপাদান হিসেবে বাঙালিদের কাছে ধর্মের আবেদনও অকার্যকর হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় প্রদেশগুলোতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রে ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সরকার গঠনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণই ছিল পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখার সম্ভাব্য শেষ অবলম্বন। কিন্তু সামরিকবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে সে সম্ভাবনারও অপমৃত্যু ঘটে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তির উপরই জাতীয় সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু ‘অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক’ কায়দায় পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা জাতীয় ঐক্যের সেই মানবিক শর্তগুলোর প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করে। ফলে মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণের ইতিহাসে ঘটে যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের মতে, ‘‘Failure in National Integration.’’ এ বাস্তবতায় রাজনৈতিক ‘ইনক্লুজন’ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা ‘ইউটোপিয়া’ হয়ে অধরাই থেকে যায়।

তবে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, জনমিতি, রাজনীতি, ভূগোল, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সমতল এলাকা থেকে ভিন্নতর। সকল ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমতল এলাকা থেকে প্রায় অর্ধশতক পিছিয়ে ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সেখানে বিশেষ রেগুলেশন নির্ভর পৃথক শাসন ব্যবস্থা কার্যকর থাকায় ভোটাধিকার, নির্বাচন, গণতন্ত্র, স্থানীয় স্বনির্বাচিত শাসন, আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক স্বাধিকার চেতনা – এসব কিছুই ছিল না। অধিকন্তু এই জেলায় সাধারণ প্রশাসনের পাশাপাশি কার্যকর আছে প্রথাগত সার্কেল প্রশাসন যা পূর্ব পাকিস্তানের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

এ অধ্যায়ের পর্যালোচনায় উঠে এসেছে ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয় যে-ব্যবস্থা বাংলার সমতল জেলাগুলোতে ১৮৮৫ সালে লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। যে সার্কেল অফিসার পদবি বাংলায় ১৯১৯ সাল থেকে মহকুমায় প্রবর্তন করা হয় তা পার্বত্য চট্টগ্রামে চালু হয় ১৯৬২ সালে। এভাবে ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বাংলার মফস্বল এলাকার মানুষ (মুসলিম) ১১১টি আসন লাভ করেছিল কিন্তু সেসময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটাধিকারই প্রদান করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম ভোটাধিকার তথা নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি মেলে ১৯৫৪ সালে।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অন্তত ধর্মের দিক দিয়ে মিল ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বেলায় সেটিও ছিল না। সুতরাং এমন একটি অঞ্চলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ উপাদান হিসেবে গণতন্ত্রই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হতে পারে। সেজন্য অত্যাবশ্যক ছিল সমতল জেলার অনুরূপ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রামেও গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে একদিকে পাহাড়িদেরকে সরকারের (রাষ্ট্রের) অংশীদার করা যায় অন্যদিকে প্রচ্ছন্নভাবে তাদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণও নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে মাইক্রো স্তরের সরকারি প্রতিষ্ঠানে অংশীদারিত্ব দিয়ে ম্যাক্রো পর্যায়ে অর্থাৎ জাতীয় রাজনৈতিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। এভাবে একধরনের জাতীয় সংহতিবোধ তৈরি হয়। এটাকে সার্বিক অর্থে ‘ইনক্লুজন’ বলা অত্যুক্তি হলেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইনক্লুজনের পথে এটি একটি বড় মাইলফলক।

৫ম অধ্যায়

পাকিস্তানের উন্নয়ন নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

ভূমিকা: চতুর্থ অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নীতির পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৯৫৪ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত গৃহীত প্রত্যেক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। পাকিস্তানের জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তি সেখানে প্রচলিত সনাতন গোত্রতান্ত্রিক উপজাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি ক্ষমতার সম্পর্ক তৈরি করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার পাহাড়িদের ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। পাহাড়িদের জুমচাষ নির্ভর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনেরও বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকার পাহাড়িদেরকে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে অন্তর্ভুক্তিকরণকে তাদের চেতনার গভীরে প্রোথিত করার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস চালায়। আপাতদৃষ্টিতে পাহাড়িদের মনোজগতে আধুনিক বাজারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত ও সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও এর গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। এসবের পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ আহরণ করে পাকিস্তানের জাতীয় অর্থনীতির পরিপুষ্টি সাধন। কারণ পাকিস্তান ভৌগোলিকভাবে দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল এবং নানাভাবে ভিন্ন হলেও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সারা দেশকে এক অবিচ্ছেদ্য ও সমরূপ অর্থনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতিগত ঐক্য এবং সীমান্ত অঞ্চলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি জোরদার করার বিবেচনাও ক্রিয়াশীল ছিল। এই পটভূমিকায় ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের গৃহীত উন্নয়ন নীতির পর্যালোচনা করা হবে। বিশেষ করে শিল্পায়ন, আধুনিকায়ন ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতিতে এগুলোর গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিক্ষা প্রসারের কর্মকাণ্ডও আলোচিত হয়েছে যার সুদূরপ্রসারী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে কিছু প্রচলিত ডিসকোর্স বা বয়ান

পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর এযাবৎ পরিচালিত একাডেমিক ও নন-একাডেমিক, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রায় সকল ক্ষেত্রে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পাকিস্তান আমলে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসঙ্গ। এসব বিবরণ পাঠে জানা যায় স্থানীয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট করা, তাদের স্বনির্ভর

অর্থনীতির ধ্বংস সাধন এবং ভূমি থেকে উচ্ছেদ করাই ছিল শাসকগোষ্ঠীর এসব উন্নয়ন নীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। অন্যদিকে পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল 'আধুনিকতার জয়ধ্বনি' এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের 'অহংকারের প্রতীক'। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক গবেষক ভল্ফ গ্যাং মের মূল্যায়ন,

> A number of capital intensive industrial development programmes were carried out in East Pakistan to facilitate ``growth''. Development schemes put through in the hill tracts with the aim of realizing Bengali economic interests and to uplift ``backward'' and primitive'' tribal economies turned out to be the script for the ruthless destruction of tribal cultures and annihilation of their members.[৪৯২]

কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আদিত্য কুমার দেওয়ান লিখেছেন,

> The Pakistani Government, with the help of overseas development assistance, has implemented several major industrial and commercial development projects in the CHT. ... Among them, the Kaptai Hydro-electric Dam is the single most destructive development project that has been responsible for bringing about radical socio-economic and political transformation in the CHT by displacing 100,000 tribals, submerging 55% of cultivable land and flooding 1,035 square kilometres of the CHT area.This partial industrialization of the CHT also led to urbanization and commercialization of the CHT's economy resulting in the migration of more non-natives. [৪৯৩]

পাকিস্তান সরকারের প্রদত্ত ক্যাপ্টেন, মেজর, এইড ডি ক্যাম্প খেতাবধারী এবং সাবেক মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত রাজা ত্রিদিব রায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন,

> The hillmen felt the main reason for constructing the dam at Kaptai was politically motivated. It was a well deliberated decision to disperse the bulk of the Chakmas, particularly the well to do and the influential that inhabited the river valleys of the Karnafuli and its main tributaries, the Chengi, the Subalong and the Kassalong. The motive, they felt, was to disperse and weaken the most advanced, the Chakmas, politically and economically.[৪৯৪]

এভাবে অধিকাংশ গ্রন্থে কাপ্তাই বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমেনা মহসিন, আদিত্য দেওয়ান, ভল্ফগ্যাং মে এবং আরও অনেক লেখক, গবেষক, পণ্ডিত কারো লেখনিতে পাকিস্তান

---

[৪৯২] Wolfgang Mey (ed.), *Genocide in The Chittagong Hill Tracts*, p. 102

[৪৯৩] Aditya Kumar Dewan, *Class and Ethnicity*, p. 440-441.

[৪৯৪] Tridiv Roy, *The Departed Melody*, p. 174.

শাসকগোষ্ঠী কী ধরনের জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এসব উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করেছে তা আলোচিত হয়নি। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে তৎকালীন স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কোনো ভূমিকা ছিল কিনা এ প্রসঙ্গও আলোচিত হয়নি। শিক্ষার উন্নয়নে পাকিস্তান সরকারের বহুবিধ পদক্ষেপ গুলোর গুরুত্বও সঠিকভাবে মুল্যায়ন হয়নি। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পূর্বে কী প্রকৃতপক্ষে চাকমারা রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে নিচের আলোচনায়।

৫.১ উন্নয়ন নীতির প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অর্থনৈতিক গতিশীলতার ওপর জোর দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষ ভেঙ্গে জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন দেশ। ভারত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের রেখে যাওয়া রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও অবকাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে পেলেও পাকিস্তানের বেলায় তেমনটি ঘটেছে সামান্যই। নগণ্য সংখ্যক সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং গুটি কয়েক অস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়া পাকিস্তানের ঝুড়িতে কিছুই ছিল না। এমনকি সাধারণ অর্থে রাজধানী বলতে যা বোঝায় পাকিস্তানের সে-ধরনের কোনো শহরও ছিল না। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেলের তদানীন্তন সামরিক সচিব মেজর জেনারেল শহিদ হামিদ তাঁর *সংকটের আলো-আঁধার: ভারত বিভাগের দিনগুলির এক ব্যক্তিগত স্মৃতি রোমন্থন* গ্রন্থে সেই সময়কার বর্ণনা দিয়ে গেছেন। লিখেছেন,

> ১৩ আগস্ট ১৯৪৭। করাচিতে উৎসবের মেজাজ। কিন্তু শ'য়ে শ'য়ে যে সমস্ত সাংবাদিক ও অভ্যাগত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দেখতে এসে পৌঁছেছেন, তাদের থাকার জায়গা খুবই কম। ... পাকিস্তান বলে কোনও রাষ্ট্র নেই, রাতারাতি সেটা তৈরি হবে। তাই কোনও সরকারি অফিস বিল্ডিং নেই, কোনও মন্ত্রক নেই, অফিস আসবাব কিংবা কাগজ-কলমের ব্যবস্থাটুকুও নেই। একটা টাইপরাইটারের কথা ভাবাও বিলাসিতার পযায়ে, পুরোটাই নৈরাজ্য।[৪৯৫]

এতো গেল পশ্চিম পাকিস্তানী প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য। পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) বিদ্বজ্জন আবুল মাল আবদুল মুহিত লিখেছেন,

> শূন্যের কোঠা থেকে একটা দেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে যে চাপ পড়ে, সেটা ছিল অসহনীয়। কেন্দ্রীয় এবং পূর্ব বাংলা সরকারের জন্য নতুন রাজধানী স্থাপন করতে হয়। ... নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ পাকিস্তানে ছিল খুবই সীমিত এসব ব্রিটিশ-ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে আমদানী করতে হতো। পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমার ভেতরে যেসব কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতো, সেগুলো শুধু প্রক্রিয়াজাত করাই নয়, বরং সেসবের ব্যবহারও করা হতো ভারতের ভৌগোলিক সীমায়। সম্পর্কের এ ধরনটি পরিবর্তন করা ছিল একটা দুঃসাধ্য কাজ।[৪৯৬]

---

[৪৯৫] উদ্বৃত- যশোবন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১১।
[৪৯৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৮।

স্বাধীনতার পর মফস্বল শহর করাচিকে রাজধানী হিসেবে বেছে নেওয়া হলেও রাজধানী পরিবর্তিত হয় বেশ কয়েকবার। আইয়ুবী সামরিক শাসনামলে ইসলামাবাদ নামে গড়া হয় নতুন রাজধানী। শুরুতে পাকিস্তানের ভাগে বৃহৎ কোনো শিল্প কারখানা ছিল না। শিল্প বলতে ছিল ছোট ও মাঝারি গুটি কয়েক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দুই অংশেই (পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান) সমানভাবে বিন্যাস্ত ছিল। তাছাড়া শক্তি ও জ্বালানি উৎপাদনের কোনো উৎস ছিল না। দুটি এলাকায় ছিল শিল্প ও বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ।[৪৯৭] পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ Gustav F. Papanek এর লেখায় দেশবিভাগ পরবর্তী পাকিস্তানের দৈন্যদশা ফুটে উঠেছে:

> The country was among the poorest in the world and had no industries to speak of, almost no industrial raw materials, no significant or commercial groups. It was difficult to see how Pakistan's economy could grow more rapidly than its population. Economic chaos and political disintegration seemed more likely. The 1950s were a period of apparent stagnation and mounting economic problems, when early dire predictions seemed to be fulfilled.
>
> In 1947, Pakistan had almost no known natural resources, except agricultural land, practically no modern industry, or modern banking, or commercial establishments. Power production was negligible. Few technicians, professionals, or political leaders existed among Pakistan's 75 million people, because Muslims in the subcontinent were largely peasants, artisans, and soldiers. ... Transportation, communications, and trade were interrupted, especially in East Pakistan. Cotton and jute producing areas were cut off from their customers, suppliers, and sometimes even from their ports.[৪৯৮]

এমবতাবস্থায় পাকিস্তানের শাসকদের পক্ষে নবসৃষ্ট রাষ্ট্রটি পরিচালনার জন্য অর্থের সংস্থান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে জন্মশত্রু ভারতের সেনাবাহিনীর সাথে কাশ্মীর নিয়ে সৃষ্ট যুদ্ধ মোকাবেলা করতে গিয়ে পাকিস্তানকে জাতীয় আয়ের সিংহভাগ অর্থ ব্যয় করতে হয়। পাকিস্তান মনে করে ভারত তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না এবং বাগে পেলেই তাকে শেষ করে ফেলবে। তেমনি ভারতও ভয় পায় এবং মনে করে যে, সুযোগ পেলেই পাকিস্তান তাকে বেকায়দায় ফেলবে এবং ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে।[৪৯৯] পরিণামে পাকিস্তান সামরিক খাতে লক্ষণীয় দ্রুততার সঙ্গে ব্যয় ও বাজেট বৃদ্ধি করেছিল। যদিও তার রাষ্ট্রের আয়তন এবং সেনাবাহিনীর বহর ভারতের মাত্র এক-চতুর্থাংশ, তবু নিজের

---

[৪৯৭] ঐ, পৃ. ৯৯।
[৪৯৮] Gustav F. Papanek, *Pakistan's Development: Social Goals and Private Incentives* (Pakistan: Oxford University Press, 1968), pp. 1-2. & Stephen R. Lewis Jr., *Pakistan*: *Industrialization and Trade Policies* (London: Oxford University Press, 1970), p. 15.
[৪৯৯] আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল,* পৃ, ১৬৯।

রাজস্ব থেকে সে খরচ করে চলেছে যা ১৯৫০ দশকে বছরে ছিল কম করে একশো কোটি টাকা।[৫০০] এই বর্ধিষ্ণু ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে পাকিস্তানের জন্য আশু করণীয় ছিল শক্তি ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া। কিন্তু পাকিস্তানের যে-অর্থনৈতিক দুরবস্থা তাতে নিজস্ব প্রযুক্তি ও অর্থ দিয়ে শক্তি উৎপাদন ও শিল্পকারখানা স্থাপন করে অর্থনৈতিক ঘাটতি মোকাবেলা করে সাবলম্বী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে নব্য পাকিস্তানের এমন করুণ বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করে পাকিস্তানের শিল্পায়ন ও বাণিজ্য নীতি বিশারদ Stephen R. Lewis বলেছেন, ‘‘Pakistan entered the world with an ‘‘abnormally’’ low amount of industrial capacity and industrial production for a country of her size, income level, and resource base.’’[৫০১] তন্মধ্যে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে ১৯৫০-এর দশকেও পূর্ব পাকিস্তান ছিল অধিকতর পশ্চাৎপদ অবস্থায়, গুস্টাভ পাপানেকের ভাষায়, ‘‘a rural community with poor transport, a poor power supply, and little industry.’’[৫০২] পাকিস্তান পঞ্চাশের দশকের প্রারম্ভে প্রচণ্ড খাদ্য সংকটে পড়ে এবং ১৯৫১-৫২ সালের অনাবৃষ্টির ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পরিস্থিতিকে নাজুক করে তোলে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।[৫০৩] অথচ পাকিস্তানকে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিকভাবে সক্ষমতা অর্জন অনিবার্য ছিল। যশোবন্ত সিংহের মতে, ‘‘পাকিস্তানের কাছে ভারতের প্রতি স্থায়ী বিদ্বেষ ও আক্রোশই হয়ে উঠল তার রাষ্ট্রনীতির মূল মঞ্চ।’’[৫০৪] তাই এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বুদ্ধিজীবীমহল নানাভাবে চেষ্টা করেন। পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র নির্ভর রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থনীতিকে দ্রুততম সময়ে চাঙ্গা করার অভিপ্রায়ে পুঁজিবাদী আমেরিকার দিকেই মনোযোগ দেয়। অধ্যাপক শামসুর রহমানের মতে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশটির নেতারা ভারতভীতি ও প্রয়োজনীয় আর্থ-সামরিক সহায়তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।[৫০৫] সৌভাগ্যক্রমে তখনকার বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাকিস্তানের জন্য আশীর্বাদ হিসেবেই আবির্ভূত হয়।

সমসাময়িক বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতি ছিল পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের দুই যুযুধান শিবিরে বিভক্ত। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় পরাশক্তিই আপন আপন মতাদর্শের প্রভাব বলয় বৃদ্ধি এবং বিরুদ্ধ সাম্যবাদী মতাদর্শের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়ার তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর দিকে

---

[৫০০] ঐ, সামরিক ব্যয়ের ঐ পরিসংখ্যান ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরের।
[৫০১] Stephen R. Lewis Jr., *Pakistan*: *Industrialization and Trade Policies* (London: Oxford University Press, 1970), p. 15.
[৫০২] Gustav F. Papanek, *Op., cit.*, p. 21.
[৫০৩] তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ: জান্তা না জনতা* অনু.মাফুজ উল্লাহ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৫২।
[৫০৪] যশোবন্ত সিংহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৪।
[৫০৫] এ এফ এম শামসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*,

দৃষ্টি দেয়। ১৯৪৭ সালে ট্রুম্যান মতবাদ ও মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষিত হলে ওয়াশিংটনের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় এশিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর দিকে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও শিল্পায়ন সুবিধা অনুন্নত দেশগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা পাকিস্তানের জন্য সুখবর বয়ে আনে। প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান ১৯৪৯ সালের ২০ জানুয়ারিতে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে তৃতীয় বিশ্বের প্রতি আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির মূল অঙ্গীকারগুলো তুলে ধরেন। ইতিহাসে এটি চার দফা নামে পরিচিত যেখানে গুরুত্বারোপ করা হয়: ‘‘a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of under-developed areas.”[৫০৬] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষত ভারত ও পাকিস্তানে মার্কিন নীতি বিষয়ক পণ্ডিত অধ্যাপক মাহমুদুল হকের মতে, পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার নজর আকৃষ্ট করে সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতা আদায় করা। তাঁর মতে, ‘‘Pakistan’s motive was to qualify itself for American military and economic aid to secure itself against India, and its leaders took an avowedly anti-Communist stance in order to get such aid.”[৫০৭] তারিক আলীর মতে, উপমহাদেশে পাকিস্তান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোঁড়া সমর্থকে পরিণত হয়। তাঁর মূল্যায়ন হলো,

> এক সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার উপলব্ধি করে যে, ভারতীয় বুর্জোয়ারা প্রকাশ্যে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে তৈরি নয়। তাই পাকিস্তানের প্রতি তারা নজর দেয় এবং পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফরে আমন্ত্রণ জানায়। সর্বশক্তিমান ডলারের দেশে লিয়াকতের জাঁকজমকপূর্ণ সফর শেষে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তান মার্কিনপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করে।[৫০৮]

এভাবে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থ এক জায়গায় এসে মিলিত হলে আমেরিকা পাকিস্তানকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে সাহায্য দিতে থাকে। ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাকিস্তান বর্ধিত হারে সাহায্য লাভ করে।[৫০৯] এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করা করে আইজেন হাওয়ার প্রশাসন। ১৯৫৪ সালের ১৯ মে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করাচিতে পারস্পরিক সাহায্য এবং নিরাপত্তা চুক্তি তথা সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে।[৫১০] কিন্তু এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমেরিকা কেবলমাত্র মানবতাবাদী ও পরার্থপরায়ণতার দৃষ্টিকোণ থেকে তার আধুনিক

---

[৫০৬] Mahmudul Huque, *War and Peace in South Asia: American Policy in Historical Perspective*, (Dhaka: Academic Press and Publisher Ltd., 2014), p. 2.

[৫০৭] Mahmudul Huque, *From Autonomy to Independence: The United States, Pakistan and the Emergence of Bangladesh*, (New Delhi: Vikash Publishing, 2014), p. 17.

[৫০৮] তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ: জান্তা না জনতা*, পৃ. ৬০।

[৫০৯] ঐ পৃ. ৬১।

[৫১০] ঐ, পৃ. ৬২।

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এবং আধুনিক শিল্পসরঞ্জাম দিয়ে পাকিস্তানকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বরং এটার পেছনে ছিল আমেরিকার চলমান স্নায়ুযুদ্ধ মোকাবেলার বৃহত্তর স্বার্থচিন্তা। আমেরিকার বিবেচনায় পাকিস্তানের সঙ্গে তার সামরিক চুক্তি ছিল কমিউনিজম রোধ করার উদ্দেশ্যে এবং পাকিস্তানের কাছে সেটা ছিল ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়।[৫১১] এক কথায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংশ্রব থেকে পাকিস্তানকে দূরে সরিয়ে রাখা।[৫১২] তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শ হিসেবে দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কমিউনিস্ট বিরোধী স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের শেষ সীমান্ত প্যাকিস্তানে অসাংবিধানিক সামরিক সরকারগুলোকেও সমভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি অথবা তার দেশের প্রত্যক্ষ ইশারায় সামরিক-আমলতান্ত্রিক চক্রকে রাষ্ট্রক্ষমতার বরমাল্য পরিয়ে দেয়।[৫১৩] এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতায় পাকিস্তান দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস্তবায়িত বৃহৎ শিল্প স্থাপনা তথা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পাক-মার্কিন মিলনের ঔরসজাত ফসল।

যখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে মার্কিন সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয় সেখানে বুদ্ধিজীবীমহল গুরুত্ব দেয় অভ্যন্তরীণ শক্তি-সম্পদ (প্রাকৃতিক সম্পদ) উৎপাদন করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের ওপর। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তারা বিশেষ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কাজী এস আহমেদ যুক্তি দেখান,

> Water power is of special significance to countries like Pakistan which lack in conventional fuels, coal and petroleum. Being the most efficient substitution of coal. . . . it is bound to play a vital role in her economy. It had to build up her economy. . . . For its full growth hydel-power has to be developed as much as possible. Not only the present deficiency of coal and oil has to be made up but Pakistan has to provide for the growing needs of power for development programmes. . . . Under the circumstances hydro-electricity is the only hope for industrial progress, if it was not to be dependent upon foreign countries.[৫১৪]

অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০) পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদগণ জোর দেন অনুন্নত এলাকাগুলোকে মূলধারার অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর। পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন উপজাতি অধ্যুষিত অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চল ছিল তেমনি পূর্ব

---

[৫১১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৯।

[৫১২] Foreign Relations of the United States, 1950, vol. V, 1490: ‘‘Our principal objective in our relations with Pakistan is the orientation of its government and people toward the US and other western democracies and away from the USSR.’’ Cited by Huque, 2014: 18.

[৫১৩] তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ*, পৃ.৭৩-৭৪।

[৫১৪] Kazi S. Ahmed, ‘‘Hydro-electric Development in Pakistan’’ *Pakistan Geographical Review,* 11.2(1956):1-36.

পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ছিল বিভিন্ন সংখ্যাল্প জাতিসত্তা অধ্যুষিত অঞ্চল– পার্বত্য চট্টগ্রাম। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০) প্রকল্প বাছাইয়ের প্রাধিকার নির্ধারণের জন্য আহুত অর্থনীতিবিদদের সম্মেলনে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলো উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়। ঐ সুপারিশে বলা হয়,

> Similarly, we should like to emphasize the importance of projects intended to improve the condition and welfare of our backward regions. It is highly important that the economic and social standards of our people in the backward regions should be raised to the level of the more developed parts of our country. This is needed not only on humanitarian grounds but also to ensure the political and social viability of our nation.[৫১৫]

এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে শাসকগোষ্ঠী ও তাদের পরামর্শকরা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে জাতীয় সংহতির প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন। পাকিস্তানি শাসকরাও রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতার জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং তাদের নজর পড়ে অনুন্নত অঞ্চলগুলোর প্রতি। অনগ্রসর এলাকাগুলোই দেশের ঐক্য ও সংহতির জন্য অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হয়। ফলে শাসকগোষ্ঠী এবং বুর্জোয়া পণ্ডিতদের গবেষণা ও ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে সেসব অনুন্নত অঞ্চলকে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় সংযুক্তকরণ। বিশ্বের অনগ্রসর আদিবাসী ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বিষয়ক পণ্ডিত John H. Bodley গত বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অনুন্নত অঞ্চল প্রসঙ্গে রাষ্ট্র ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গির দিকটি প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণটি এক নজর দেখা যায়:

> Following World War II, government pressures on small scale-economies greatly intensified as a result of a new world wide campaign for rapid economic growth. Under the technical and financial assistance of the leading industrial countries, nations everywhere attempted to raise their GNPs and initiate self perpetuating economic growth. Professional development experts, including economists, anthropologists, and other specialists from various countries and the United Nations, all turned their attention to indigenous peoples, who, because of their, ‘‘backward’’ cultures, were considered to be major obstacles to national and internationals economic goals. These experts devised elaborate programs to bring unwilling indigenous peoples fully into national economies, to further raise their agricultural productivity and per capita cash incomes, and to promote whatever

---

[৫১৫] Government of Pakistan, Planning Board, *Report of West Pakistan Economists Conference on the First 5-Year Plan of Pakistan, November 1956* (Lahore: Superintendent Govt. Printing, West Pakistan, 1985), p. 28.

socio-economic transformations planners deemed necessary to achieve their goals.[৫১৬]

John H. Bodley র উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণটি পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গেও সমভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায় পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী নাফিস আহমেদের ১৯৫১ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পূর্ব বাংলার সীমান্ত জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত মন্তব্যটি:

> The Chittagong Hill Tracts have remained so far in the back-waters as regards economic development. There is only one town with a population of over 10,000 not a mile of railways, no metalled roads, no factory, industry and no power station. The population is mainly organized in tribal groups and backbone of the economy is primitive agriculture and haphazard collection of forest produce. Much of the area remains remote and isolated and the general benefits of civilized life are non-existent. But the Hill Tracts may be said to be Eastern Pakistan's *land of promise*. If the crude, primitive, and the shifting cultivation called 'jhum' is replaced by settled cultivation and the problem of soil erosion is met by terracing the hill sides which are extremely fertile, some of the plain's growing population can possibly be absorbed in the thinly populated areas. What is needed is a scientific approach and a planned effort firstly, to make the Hill Tracts an agriculturally useful area. The valuable forest resources also need proper exploitation.[৫১৭]

মূলত উপর্যুক্ত সমসাময়িক বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বৈশ্বিক উন্নয়ন দর্শন এবং প্রতিবেশী ভারতের সাথে সামরিক প্রতিযোগিতা এবং পাকিস্তানের অনিবার্য অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাকিস্তান সরকারের উন্নয়ন নীতি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। নব্য রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকগণ ব্রিটিশদের মতো ভূমি রাজস্ব, তুলা ও বনজ দ্রব্য পরিবহন থেকে প্রাপ্ত রাজস্বতে আর সন্তুষ্ট থাকল না। তাদের আরও অধিক দরকার। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ আহরণের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করল। এজন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে গৃহীত পার্বত্য চট্টগ্রামকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি অকার্যকর বলে বিবেচিত হয়। পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি প্রসঙ্গে ভেলাম ভ্যান সেন্দেলের বিশ্লেষণও তেমনটিই তুলে ধরে। তাঁর মতে, "as both land tax and revenues from cotton and forest produce had become much less important. The new power-holders were looking for new ways to make the Chittagong hills productive and

---

[৫১৬] John H. Bodley, *Victim of Progress* (Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Fifth Edition, 2008), p. 142.

[৫১৭] Nafis Ahmed, ''Need for Development of Chittagong Hill Tracts,'' *Pakistan Geographical Review*, 6.2(1951):19-29.

these made the colonial policy of isolation redundant."[৫১৮] পাকিস্তান সরকার শিল্প উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'ট্যাক্স ফ্রি' অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে।[৫১৯] পার্বত্য চট্টগ্রামে একে একে স্থাপিত হয় পেপার মিল, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কাপ্তাই লেক নামে মানবসৃষ্ট সর্ববৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ, বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, রেয়ন মিল, দিয়াশলাই মিল, টিম্বার ও প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রি, সিগারেট ইন্ডাস্ট্রি, ম্যাচ ফ্যাক্টরি, টি এস্টেট ও মেকাকিক্যাল ওয়ার্কশপসহ বৃহৎ সব আধুনিক শিল্প কারখানা।[৫২০] ইতিপূর্বেকার অনগ্রসর উপজাতিদের জুমকৃষি ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিণত হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানা ও শ্রমিকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিণত করা হয় পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রথম আধুনিক কারখানা সমৃদ্ধ শিল্পতীর্থে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত ও দৃঢ় হয়। রাষ্ট্র অপ্রধান জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার জমি, জনগণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও হ্রদের জল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। ফুকো যেমনটি বলেছেন যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় জালের মতো বিস্তৃত সংগঠনের মাধ্যমে ঠিক তেমনটি প্রতিভাত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে। বিভিন্ন আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্প মালিক যারা রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিভু তারা অবাধে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে মেতে ওঠে সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে। আর পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে জল বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যারা হ্রদের জলসীমা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ দেখাশুনায় নিয়োজিত। পূর্বোক্ত শিল্পকারখানা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জীবন জীবিকার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল ।

৫.২ কর্ণফুলী পেপার মিল প্রতিষ্ঠার পটভূমি

পার্বত্য চট্টগ্রামের অঢেল বনজ সম্পদ আহরণ এবং এখানকার প্রধান খরস্রোতা নদী কর্ণফুলীর জল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় থেকে পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাথায় ছিল। মুসলিম লীগ অমুসলিম অধ্যুষিত জেলা হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে রাখার জন্য সীমানা কমিশনের সম্মুখে যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করেছিল কর্ণফুলী নদীর জলস্রোত ব্যবহার

---

[৫১৮] Willem van Schendel, ''The Invention of the `Jummas': State Formation and Ethnicity in Southern Bangladesh" in Shekhar Bondopadhyay et al (eds.), *Bengal: Communities, Development and States* (Dhaka: University Press Ltd, 1995), p. 135-173.

[৫১৯] Mohammad Mufazzalul Huq, *Government Institutions and Underdevelopment: A Study of the Tribal Peoples of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (Dhaka: Centre for Social Studies, 2000), p. 49. Anti-Slavery Society, *The Chittagong Hill Tracts: Militarization, oppression and the hill tribes* (London: Anti-Slavery Society, 1984), p. 36.

[৫২০] Muhammad Ishaq, *Bangladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts*, p. 154.

করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল অন্যতম। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে একটি শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানে পাল্প ও পেপার মিল স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। কারণ তখন পাকিস্তানকে প্রতিবছর প্রায় ৩৫ হাজার টন কাগজ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো।[৫২১] পাকিস্তান সরকার সেই সুপারিশের আলোকে ১৯৪৯-৫০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃহৎ শিল্প কমপ্লেক্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কারখানা স্থাপনের ভার ন্যস্ত করা হয় সরবরাহ ও উন্নয়ন বিভাগের ওপর[৫২২]; যেহেতু পূর্ব বাংলার সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামে অঢেল কাঁচামাল প্রাকৃতিকভাবে মজুদ ছিল। কিন্তু কিছু বাস্তব অসুবিধার কারণে পঞ্চাশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত সে-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। অতপর পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালে দেশের ইতিহাসে প্রথম শিল্পনীতি গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালে গঠিত আধা-স্বায়ত্তশাসিত পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনই (পিআইডসি) প্রথম বৃহৎ শিল্পের জন্য পরিকল্পনা, বিনিয়োগ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে পাকিস্তানে কোনো বৃহৎ শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়নি কতগুলো বিবেচনাযোগ্য কারণে। প্রথমত, তখনো বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পপুঁজির আর্থিক সামর্থ্য ব্যক্তি, পরিবার ও গ্রুপ পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের আয়ত্বের বাইরে ছিল। দ্বিতীয়ত, বড় অঙ্কের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের জন্য দরকার উঁচু মানের দক্ষ ব্যবস্থাপনা যা তৎকালীন পাকিস্তানের কোনো বেসরকারি উদ্যোক্তার মধ্যে ছিল না। তৃতীয়ত, বৃহৎ শিল্পে প্রারম্ভিক বিনিয়োগ এবং লাভের মুখ দেখতে নুন্যতম ৪-৫ বছরের সময়ের প্রয়োজন; এত দীর্ঘ সময় ধৈর্যধারণ ও অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা সদ্য গড়ে ওঠা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ছিল না।[৫২৩] এছাড়া বৃহৎ শিল্পকারখানা পরিচালনার জন্য দরকার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা। সর্বোপরি যোগাযোগ অসুবিধা এবং প্রতিকুল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বৃহৎ শিল্পকারখানা স্থাপনযোগ্য কোনো কোনো স্থান ছিল বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য অনাকর্ষণীয়।

উপরি-উক্ত প্রায় সবকটি অসুবিধাই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ছিল। এ অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম, স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল প্রাপ্তির যোগ থাকলেও শিল্প শ্রমিকের অভাব এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীদেরকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার সমস্যা ছিল প্রধান। ফলে একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব উক্ত এলাকায় শিল্প পুঁজি বিনিয়োগ করা। এমন বাস্তবতার আলোকে রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (পিআইডিসি) পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শিল্প কমপ্লেক্স' স্থাপনের কাজ হাতে নেয় ১৯৫২ সালে।

---

[৫২১] Willem van Schendel, Wolfgang Mey & Aditya Kumar Dewan, *The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland* (Dhaka: The University Press Ltd. 2001), p. 187.

[৫২২] Mohammad Ishaq, p. 155-156.

[৫২৩] Gustav F. Papanek, *op. cit*., p. 93

এটি একটি 'শিল্প কমপ্লেক্স' এ কারণে যে, এর সাথে অবশ্যম্ভাবীভাবে কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প সংযুক্ত ছিল: কারখানায় যাতায়াতের জন্য একটি ব্যয়বহুল প্রবেশসাধ্য (একসেস) সড়ক নির্মাণ, পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত জায়গা থেকে জলপথে কারখানায় কাঁচামাল পরিবহন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি বাঁধ নির্মাণ (বর্তমান চট্টগ্রাম থেকে কাপ্তাই সড়কটি সেসময় নির্মিত হয়), শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য আবাসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি প্রভৃতি। পিআইডিসি ছয় বছর সময় নিয়ে একটি ছাড়া ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আর আইয়ুব খানের উন্নয়ন দশকে বাস্তবায়িত হয় কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প।

১৯৫১-৫৩ সালের মধ্যে কর্ণফুলী পেপার মিল স্থাপন করতে সরকারের ব্যয় হয় প্রায় ৬৬ মিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছিল ৪.২০ মিলিয়ন ডলার।[৫২৪] এটি সম্ভব হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায়। পাকিস্তান আমলে এ কারখানার ব্যবস্থাপনা ১৯৫৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম শিল্প ও বণিক গোষ্ঠী দাউদ ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে এটি জাতীয়করণ করা হয়। এ কারখানাটি বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান।[৫২৫]

যাহোক পাকিস্তান তীব্র কাগজ সংকটের প্রেক্ষাপটে কর্ণফুলী কাগজ কল প্রতিষ্ঠা জনমনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। শুধু পাকিস্তানের উন্নয়ন নীতি নির্ধারকরা নয়, স্থানীয় পত্র পত্রিকাগুলোও কর্ণফুলী কাগজ কল স্থাপনের প্রয়াসকে ভূয়সী প্রশংসা করে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *কোহিনূর* পত্রিকার ১০ম সংখ্যায় পেপার মিল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে 'এশিয়ার বৃহত্তম কাগজ কল' শিরোনামে নিবন্ধ প্রকাশ করে। নিবন্ধের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল:

> মিলে পুরোপুরি উৎপাদন আরম্ভ হইলে বৎসরে কমপক্ষে ৫ কোটি টাকার কাগজ বিক্রয় হইবে এবং বিদেশ হইতে কাগজ ক্রয় করার দরুণ প্রতি বৎসর আমাদের যে সাড়ে তিন কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় তাহা বাঁচিয়া যাইবে। মিল স্থাপনের ফলে এক হাজার অভিজ্ঞ শ্রমিক ও ৩ হইতে ৪ হাজার অনভিজ্ঞ শ্রমিকের কর্ম্মসংস্থান হইবে। চন্দ্রঘোনা পেপার মিল হইবে এশিয়ার বৃহত্তম কাগজ কল। দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু ইহার গুরুত্ব নয়, দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবন ও ইহার ভূমিকা হইবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৫২৬]

---

[৫২৪] Mohammad Ishaq, p. 156.

[৫২৫] এক নজরে কেপিএম। তথ্য সরবরাহ করেন কেপিএমের প্রধান প্রকৌশলী বিনয় প্রকাশ চাকমা।

[৫২৬] *কোহিনূর*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৫২, পৃ. ১৮৪।

৫.৩ কর্ণফুলী পেপার মিলের প্রভাব

একদল বাংলাদেশি গবেষকের[৫২৭] অভিমত হলো পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল এসব উন্নয়ন প্রকল্প তথা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে স্থানীয় পাহাড়িরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হবে। তাদের কৃষিভিত্তিক জীবনধারণ অর্থনীতি শিল্পভিত্তিক কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত হবে। পাহাড়িরাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে জেলায় প্রাপ্য কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাদের স্বপ্ন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামও গড়ে উঠবে একটি ব্যস্ততম শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে। স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় এ প্রসঙ্গে *গৈরিকা* পত্রিকায় লিখেছেন,

> There are several industries that can be suitably introduced here to the advantage of the people e. g. paper pulp, timber sawing, cotton ginning, oil mills, sugar refinery from the sugar canes, rice husking, canning and hand loom industry. Government may kindly provide *means for the hill people to serve as apprentices and gain the technical knowledge* for which efforts are made in this line. The Hill Tracts may grow into *a busy centre of industry and trade*, and Branch Bank may be started for the conveniance of commercial transactions.[৫২৮]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে শিল্পায়ন সম্পর্কে স্থানীয় পাহাড়িদের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। পাকিস্তান জন্মের আগেই তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে শিল্পায়নের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু যে ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো শিল্পায়নের পূর্বে স্থানীয় লোকজনকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষানবিশ হিসেবে চাকরি করার সুযোগ সৃষ্টি করার দিকটি। সরকার এ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পাহাড়িরা পরিবর্তিত শ্রম ও উৎপাদন পদ্ধতির সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এধরনের কোনো চেতনা সঞ্চারী এবং প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা সৃজনী উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।[৫২৯] সত্যি বলতে কি স্থানীয়দেরও যে উন্নয়ন প্রসঙ্গে নিজস্ব চিন্তা ধারা থাকতে পারে সে বিষয়টি একেবারেই উপেক্ষিত হয়। কাগজ কল স্থাপনের একদশক পরে ১৯৬৩ সালে সরকার বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে ন্যাশনাল ব্যাংক ও হাবিব ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠা করে।

---

[৫২৭] R I Chowdhury, M Mizanur Rahman Miah, A. F. Hasan Chowdhury, A H Golam Quddus, *Tribal Leadership and Political Integration*. (University of Chittagong: Political Science, 1979)

[৫২৮] *গৈরিকা*, ১১শ বর্ষ ১২ শ সংখ্যা, ১৩৫৩।

[৫২৯] M. Q. Zaman, ‘‘Tribal Issues and National Integration: The Chittagong Hill Tracts Case” in M. S. Qureshi (ed.) *Tribal Cultures in Bangladesh* (Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1984), p. 311-324.

কিন্তু সেই ব্যাংকে লেনদেন করার মতো শিল্প ও বাণিজ্যে অংশীদার হওয়ার সুযোগ ততক্ষণে পাহাড়িদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

পরিণামে কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) পার্বত্য চট্টগ্রামের শিল্পায়নের সূতিকাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও শিল্পায়ন-প্রসূত প্রত্যক্ষ সুযোগ-সুবিধা কতটুকু স্থানীয়দের অনুকূলে টানার মতো অবস্থায় ছিল না। পাহাড়িদের কাঙ্ক্ষিত ব্যস্ততম শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রে জবরদস্তিমূলক গণবাস্তুচ্যুতির অভিঘাত অনুপস্থিত ছিল। অথচ কর্ণফুলী পেপার মিলকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে অন্যান্য আধুনিক প্রকল্প বিশেষ করে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী চাকমা ও মারমা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

দেশের প্রশাসন পরিচালনা ও শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতিতে কাগজ একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এটির অভাবে একটি দেশের সরকারি কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিতরা কাগজ শিল্প স্থাপনে অধিকতর প্রাধিকার দিবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু শিল্পকারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রযুক্তিগত দিকগুলোর চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। সরকারি প্রকাশনায় অবশ্য ভিন্নমত প্রতিফলিত যা ছিল স্বাভাবিক। চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস গেজেটিয়ারে বলা হয়ঃ ‘‘The Karnafuli Paper Mills Ltd. was located at Chandraghona because of natural advantages and existence of some economies like availability of raw materials and cheap electric power, transport facilities offered by the river Karnafuli and the city port of Chittagong’’[৫৩০] এই বক্তব্যটি মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। প্রথমত, কেবলমাত্র কাঁচামালের সহজলভ্যতার উৎসভূমির একদম সন্নিকটে শিল্পকারখানার স্থাপন যৌক্তিক ভিত্তি হতে পারে না। বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানী করেও শিল্পকারখানায় উৎপাদন করা যায় যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম তো চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাত্র ৫৪ কিমি দুরত্বে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, ১৯৫৩ সালে কেপিএম প্রতিষ্ঠার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যুতের কোনো উৎসই ছিল না, সস্তা বিদ্যুতের উৎস থাকা তো দূরের কথা। তৃতীয়ত, কর্ণফুলীর নদীপথ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে মোটরযান চলাচল উপযোগী কোনো সড়ক যোগাযোগ ছিল না যে কারণে পাকিস্তান সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ৩৮ মাইল দীর্ঘ চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়ক নির্মাণ করতে হয়। চতুর্থত, শিল্পকারখানায় কাজ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো উপযুক্ত শ্রম শক্তির সহজলভ্যতা ছিল না। পঞ্চমত, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো বন্দর নেই। অথচ বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরের যে স্থানে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা গড়ে উঠেছে সেখানে কাগজকলটি স্থাপন করা যেতো। এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চন্দ্রঘোনার মতো দুর্গম ও গহীন জঙ্গলাকীর্ণ

---

[৫৩০] Muhammad Ishaq, *Bangaladesh Dist. Gazetteer: Chittagong Hill Tracts*, p.155.

এলাকায়, অন্য কথায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বক্ষস্থলে কারখানা স্থাপনে সরকারের অন্য বিবেচনা কাজ করেছে। *জীবন আমাদের নয়* শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্ট মতে, পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতিকে 'জাতীয় মূলস্রোতধারায়' নিয়ে আসার জন্য বেশ কয়েকটি উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে অর্থাৎ শিল্প কারখানা স্থাপনের স্থান হিসেবে উপযুক্ত বিকল্প[৫৩১] থাকলেও সরকার পাহাড়ি অধ্যুষিত চন্দ্রঘোনাকেই বেছে নেয় মূলত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উছিলায় রাষ্ট্রের অবস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ পার্বত্য চট্টগ্রাম অবধি প্রসারিত করার লক্ষ্যে। চূড়ান্ত বিচারে এসব উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্য হলো পাহাড়িদের অর্থনীতিকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনভারসাম্য পরিবর্তন করা।"[৫৩২] পার্বত্য চট্টগ্রাম গবেষক ভল্ফগ্যাং মের মতে, পাহাড়ি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি ক্ষমতাবলয় সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত করা হয়। তার ভাষ্য, ''This attempt to ''Bengalize'' the district served the double purpose of somewhat easing land scarcity in the plains and of strengthening the position of the government in the hills by increasing the proportion of ''loyal'' (=Bengali) inhabitants .''[৫৩৩] যদিও তৎকালীন পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানের বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান দুই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী চাকমা ও মারমাদের জন্য প্রগতির নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে বলে মনে করেন। এ. বি. রাজপুত ১৯৬৫ সালে লিখেছেন,

> with the present pace of development in East Pakistan, the tribes man are bound to benefit. Already, the mighty Karnaphuli Mulit-purpose Project and the huge paper mills at Chandragona have opened new avenues of progress for the Chakma and Mong tribes in the hearth of the Hill Tracts.[৫৩৪]

নৃতত্ত্ববিদ রাজপুত এ কথা কিসের ভিত্তিতে বলেছেন তা স্পষ্ট নয়। কারণ খোদ বাংলাদেশি রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ ভিন্নমত পোষণ করে লিখেছেন উক্ত দুই প্রজেক্ট সৃজিত আর্থিক সুবিধা বাগিয়ে নিতে সমতল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন ঘটে প্রচুর ব্যাপারী ও উদ্যোক্তার যারা বিদ্যমান উপজাতীয় অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। আফতাব আহমেদ লেখায় সেটি স্পষ্ট: The Influx of tradesmen and

---

[৫৩১] কর্ণফুলী পেপার মিল ভাটিয়ারি ও শঙ্খ নদীর তীরে দোহাজারি এলাকায় স্থাপন করা যেতো বলে তৎকালীন বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছিলেন। যেখানে বন থেকে বাঁশ আহরণ সহজতর এবং রেল যোগাযোগ থাকায় উৎপাদিত পণ্য পরিবহনও সহজতর ছিল। *পাঞ্চজন্য* শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪৫।

[৫৩২] পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, *জীবন আমাদের নয়*, আপডেট, ২০০১, পৃ. ১০৩।

[৫৩৩] Wolfgang Mey (ed.), *Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (Copenhagen: IWGIA Document No. 51, 1984), পৃ. ২৭-২৮।

[৫৩৪] A. B. Rajput, *The Tribes of Chittagong Hill Tracts,* p. 26.

entrepreneurs from the samatal (plains) adversely affected the the fortunes and prospects of the *pahadis.'*'[৫৩৫] এম কিউ জামান, আরও খোলাসা করে লিখেছেন,

> Bengalis are brought in to manage new enterprises, and they in turn ''import" Bengali workers from outside. Tribals are usually not even informed when new factories are recruiting workers. The usual practice in such circumstances is only to place an advertisement in a Bengali newspaper, which cannot be expected to even reach the interior of the CHT and could not be read most tribals if it did. Bengalis who predominate in the industrial work force spread this information back to their plains villages and Bengali workers are usually ready and waiting to be hired before any official call for workers gets published. In addition, well-known practices of nepotism work in the well-established Bengalis favour.[৫৩৬]

কর্ণফুলী কাগজ কলে পরিবারসহ আনুমানিক দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে কারখানায় পাহাড়িদের চাকুরির সুযোগ ছিল নগণ্য সংখ্যক। এর অবশ্য অন্য কারণও ছিল। জুম কৃষিতে অভ্যস্ত উপজাতিদের মানস প্রকৃতি ও সামাজিক প্রথায় শ্রম বিক্রি দৈবাৎ দেখা যেতো। তারা শ্রম দিতো প্রথমত, স্বেচ্ছায় প্রতিবেশীর প্রয়োজনে এবং আরেক প্রকার শ্রম প্রচলিত ছিল প্রথানুসারে যা দিতে হতো সামাজিক ও গোত্র-প্রধান রাজা ও হেডম্যানদের জন্য যা ব্রিটিশ আমলে *বেগার* হিসেবে পরিচিত ছিল। শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ তখনও পাহাড়ি সমাজে একটি বহিরাগত সংস্কৃতি (এলিয়েন কালচার)। ফলে শ্রমিক হিসেবে চাকরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আবার শিক্ষা দীক্ষা বিশেষ করে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িরা পিছিয়ে ছিল যার ফলে কারিগরি পদগুলোতে তাদের মধ্য থেকে খুব নগন্য সংখ্যক চাকরি লাভ করে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমকালীন গবেষক অধ্যাপক পিয়েরে বেসাইনে দেখিয়েছেন রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগ থেকে স্থানীয় পাহাড়িরা খুব একটা লাভবান হয়নি।

> The Karnafuli Paper Mill, located at Chandraghona, attracts a labour force which, together with their families, forms a settelement of not less than 10,000. The Karnafuli project, which includes a dam and a power station and is situated at Kaptai, employed in December 1956, for the dagging of the splill way alone, 11,000 labours. In all, it concentrated at a time over 20,000 persons. .. As for the highway it involved in February 1957 the labour of some 7,000 persons. For the time being, the Hillman is not getting employment in the new industries. It is

[৫৩৫] Aftab Ahmed, "Ethnicity and Insurgency in the Chittagong Hill Tracts Region: A Study of the Crisis of the Political Integration in Bangladesh" in *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, 31.3(1993), pp. 32-66.
[৫৩৬] M. Q. Zaman, *Op., cit.,*

typical that out of a labour force of 3,290 strong, the Karnafuli Paper Mill employs only 14 hillmen.[৫৩৭]

এভাবে কর্ণফুলী পেপার মিলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অ-পাহাড়ি শ্রমিকদের বড় বসতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে এটি সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যার মাধ্যমে একইসাথে বিপুল সংখ্যক বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিক পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। আর উক্ত এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়িরা যারা যুগ যুগ ধরে বসবাস করে এসেছে তারা উচ্ছেদ হয়ে যায়।[৫৩৮] পাকিস্তান সরকার কেপিএম এর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য স্থায়ীভাবে বসতঘর, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সিনেমা হল, ক্লাব, মসজিদ, মন্দির, ডাকঘর, বাজার, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাটসহ সব নাগরিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করে।

১৯৫১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেন্সাস রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় কোনো শহুরে বসতির উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে প্রথম কেপিএম সংলগ্ন চন্দ্রঘোনা শহরটি শহরের তালিকাভুক্ত হয় এবং কেপিএম এলাকার জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪,৪৪২ জনে। ১৯৫০-এর দশকে কেপিএম এ সংস্থাপিত জনবল ছিল ২৫০০ এর কাছাকাছি আর শ্রমিক ছিল ৩,৯২০ জন। ১৯৬৬ সালে কেপিএম এর পাশে মেসার্স দাউদ ইন্ডাস্ট্রিজ লি. স্থাপন করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত স্থাপত্য নকশায় দৃষ্টিনন্দন কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যাল কারখানা। এভাবে শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত লোকসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় ষাটের দশকের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চন্দ্রঘোনা প্রথম বাঙালি অধ্যুষিত শহরে পরিণত হয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আমদানীকৃত বাঙালি শ্রমিকরা ১০ বছরের মধ্যে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নেয়। এর উল্লেখ পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখায়। ষাটের দশকে চন্দ্রঘোনা ও কাপ্তাই এলাকায় বাঙালি শ্রমিকদের শক্তিশালী অবস্থান প্রসঙ্গে এইচ টি ইমাম লিখেছেন,

> এই পরিস্থিতিতে (মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে) আমাদের কাপ্তাই-চন্দ্রঘোনার দিকে তাকাতে হয়েছিল। শিল্প এলাকা এবং বিরাট সংখ্যক শ্রমিকের সমাবেশ। শ্রমিকদের সবাই বাঙালি এবং অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন; শক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কাপ্তাই পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্পে, চন্দ্রঘোনা কাগজকলে ও বন শিল্প প্রতিষ্ঠানে; চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর স্বাধীন -চেতা মানুষ সবাই। অতএব এটা হলো আমাদের শক্ত ঘাঁটি।[৫৩৯]

৫.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে কর্ণফুলী কাগজ কলের অবদান

কর্ণফুলী কাগজ কল থেকে বাৎসরিক ৩০ হাজার মেট্রিক টন কাগজ উৎপাদিত হয়। যদিও নানাবিধ কারণে এই পরিমাণ প্রায়শ উঠানামা করতো তবুও আয়তন, উৎপাদন, মূলধন বিনিয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং

---

[৫৩৭] Prof. Pierre Bessainet, *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts*, p. 59-61.
[৫৩৮] A K. Dewan, *Class and Ethnicity in the hills of Bangladesh.* p. 225
[৫৩৯] এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ২৬০।

ব্যবস্থাপনা সকল দিক বিচারে কেপিএম এশিয়ার বৃহত্তম কাগজ কলে পরিণত হয়। এ কাগজকল অচিরেই হয়ে ওঠে পাকিস্তানের জাতীয় অহংকারের প্রতীক এবং বিদেশিদের নিকট পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধির প্রদর্শনীয় বস্তু– 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল শো পিস'।[৫৪০]

এ শিল্প কারখানা পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সাথে সাথে শ্রম বিন্যাসেও আনে ইতিবাচক পরিবর্তন। পাহাড়ি আর্থ-সামাজিক জীবনে যুক্ত হয় নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। তবে কর্ণফুলী পেপার মিল স্থাপনকে কেন্দ্র করে গাছ ও বাঁশের কেনাবেচা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গাছ ও বাঁশ কর্তন এবং পরিবহনের কাজে সম্পৃক্ত হয়। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরুষরা দলবেঁধে বনে জঙ্গলে গাছ বাঁশ কাটার কাজে নিযুক্ত হয়। ডা. ভগদত্ত খীসা তাঁর বাঁশ কাটার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> বনে বিপুল বাঁশের ঝাড়। শতবছর ধরে সংরক্ষিত এই ঝাড়ে মোটা মোটা বাঁশ। কিছু বাঁশ কেটে ভেলা বেঁধে মাইনীমুখে নিয়ে এলে তবেই নগদ পয়সা। ... পাঁচ সাত জন নিয়ে একটা দল তৈরী হয়। সঙ্গে রাখতে হয় অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি– ''কাবিদাং''। সেই-ই পথ প্রদর্শক। বনাঞ্চলের অন্ধি-সন্ধি সব তাঁর জানা। বিপদে-আপদে সেই একমাত্র ভরসা। একটা নৌকা ভাড়া করে প্রথমে যেতে হয় কাসালং বেয়ে মাইনীমুখ। সেখানে একটা ফরেস্ট অফিস। বনে ঢুকবার 'পাস' বা অনুমতি নিতে হয় এখান থেকে। তারপর উজান বেয়ে চলে যাও যার যেখানে খুশী– সিজক, গঙ্গারাম, বাঘাইহাট। নৌকায় থাকে মাস খানেকের খোরাকী। চাল, লবণ, তেল, মশলাপাতি, কেরোসিন, বাঁশের হুঁকো-কলকি-তামাক-বিড়ি দেয়াশলাই। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে শুরু হয় বাঁশ কাটা। কাবিদাং থাকে সদা সর্তক। বাঁশ এনে জড়ো করা হয় নদীর তীরে। গোলাক বা কেরেত বেত দিয়ে বাঁধা হয় ভেলা। একটার পিছে আর একটা। বাঁশের ভেলায় চড়ে, ভাঁটির টানে, চালি ঠেলে ওরা এগিয়ে যায় মাইনীমুখের দিকে। সেই সময় মাইনীমুখ ছিল প্রসিদ্ধ গাছ-বাঁশের ব্যবসাস্থল। সওদাগরেরা ওখানে অপেক্ষায় থাকে উজান থেকে কখন কাঠুরিয়া বাঁশ গাছ নিয়ে আসে। ফরেস্ট অফিসে যথারীতি ট্যাক্স জমা দিয়ে বাঁশ বিক্রি হয়। হিসাব করা হয় লাভ লোকসান। এই কদিনের খোরাকী, নৌকার ভাড়া, ইত্যাদি মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে থাকে কয়েকটা টাকা।[৫৪১]

পার্বত্য চট্টগ্রামে এই কাঠুরিয়ারা 'কাট্টন্যা' নামে পরিচিত হয়।[৫৪২] এই একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পাহাড়িরা একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে। তার কারণ, আদিত্য কুমার দেওয়ানের মতে, " Bengali labourers were not expert in cutting bamboo in the dense forest and they also had difficulties in adjusting to hill environment."[৫৪৩] তখন নগদ টাকা হাতে পাওয়াতে লোকজন বাঁশবনে গিয়ে বাঁশ কাটার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে ফসল কাটা, ধানচাষ,

---

[৫৪০] Willem van Schendel et al, *The Chittagong Hill Tracts,* p. 190.
[৫৪১] ডা. ভগদত্ত খীসা রচনাস্মারক, পৃ. ১৭০-১৭৩।
[৫৪২] সাক্ষাৎকার ডা: এ কে দেওয়ান, প্রবীণ নাগরিক, ১৬/৩/২০১৮। স্থান: গবেষকের বাসা।
[৫৪৩] Aditya Kumar Dewan, *Class and Ethnicity,* p. 224.

নিড়ানি ও অন্যান্য কাজে লোক পাওয়া যেত না।[৫৪৪] তবে বাঁশ কাটার বড় ঠিকাদারিগুলো সব অপাহাড়িদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে। এর একটি কারণ ঠিকাদারির জন্য যে প্রাথমিক পুঁজির দরকার সেটি পাহাড়িদের নেই। এভাবে ১৯৫৬ সাল থেকে কেপিএম পূর্ণ উৎপাদনে আসলে দেখা যায় সামষ্টিকভাবে দেশ কারখানার উৎপাদন জনিত সুবিধা থেকে লাভবান হলেও স্থানীয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠী লাভবান হয়েছে মাইক্রো বা ক্ষুদ্র পরিসরে। কারণ সরকার দুর্বল পাহাড়িদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের কাজটি করে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে। কর্ণফুলী কাগজ কলের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের কাচালং ও রেইংক্ষ্যঙের ১,২৬,০০০ একর আয়তনের বিশাল বাঁশ সমৃদ্ধ বনভূমি ৯৯ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয় বন বিভাগ থেকে। একইভাবেই কর্ণফুলীর তীরবর্তী সীতার পাহাড় এলাকা থেকে ৬৮২ একর আয়তনের বন ইজারা দেওয়া হয় চারা ও বন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য। জেলা প্রশাসন থেকে ফ্যাক্টরির অবকাঠামো, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের আবাসনের জন্য অধিগ্রহণ করা হয় ৬৮ একর জমি। চরিত্রগতভাবে কর্ণফুলী কাগজ কল একটি আবাসিক শিল্প কারখানার রূপ ধারণ করে। এতে করে উক্ত সমস্ত এলাকা ও বনজ সম্পদের ওপর প্রতিষ্ঠানটির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জের হিসেবে এলাকার মানুষ তাদের গৃহ নির্মাণ ও গৃহস্থালী কাজের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় বাঁশ সংগ্রহের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে, পার্বত্য জাতিসত্তাগুলোর দৈনন্দিন জীবনধারায় বাঁশের গুরুত্ব অসীম যেটি সেই উনিশ শতকে ক্যাপ্টেন টমাস লুইন প্রত্যক্ষ করে তাঁর আকর গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ করেছিলেন। কেপিএম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঁশ গৃহস্থালী ব্যবহার্য দ্রব্য থেকে রাতারাতি শিল্পের কাঁচামাল ও বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত হয়। আর সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ কেপিএমের মাধ্যমে সরকারের হাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে Bodley’র নিম্নোক্ত মূল্যায়ন যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়। মূল্যয়নটি নিম্নরূপ,

> Official statements frequently justified the extension of government control over tribal populations as an effort to bring them peace, health, happiness, but undoubtedly the extension of government control was directly related to protecting the economic interest of non-indigenous peoples moving into formerly exclusive tribal areas.[৫৪৫]

কর্ণফুলী পেপার মিল স্থাপন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী শিল্প কমপ্লেক্স স্থাপনের সূচনা মাত্র। এ বিশাল শিল্পোদ্যোগটিকে সচল রাখার জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বি এল সি জনসন যেমনটি বলেছেন. ‘‘Primary aim to supply cheap power for industry and rural

---

[৫৪৪] সাক্ষাৎকার: দেবদত্ত খীসা, অবসর প্রাপ্ত যুগ্ম সচিব, ট্রাইবেল অফিসার কলোনী, নিজ বাসা তাং ০১/৫/২০১৮।

[৫৪৫] John H. Bodley, *op.*, *cit.*, p. 75-76.

development''[৫৪৬] আর পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য নৌপরিবহন সুবিধা। বিল এল সি জনসনের বক্তব্য সঠিক হলে প্রশ্ন জাগে কেপিএম চালু হয় ১৯৫৩ সালে। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের আগে কর্ণফুলী পেপার মিলের উৎপাদন কী তবে বন্ধ ছিল? যাহোক এ দুটি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে আরেকটি সম্পুরক প্রকল্প বাস্তবায়নের আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৫.৫ কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (কাপ্তাই বাঁধ)

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জনজীবন, রাজনীতি, অর্থনীতির ওপর অমোচনীয় প্রভাব ফেলেছে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত ২,২০০ ফুট দীর্ঘ ও ৮০০ ফুট প্রশস্ত এবং ১৫৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কাপ্তাই বাঁধ ও তৎসৃষ্ট ৩৫৬ বর্গমাইলের কৃত্রিমহ্রদ। এ প্রকল্প নিয়ে নানামূখী সমালোচনা আছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখানো হয়েছে পাকিস্তানের চিন্তকরা (টিংক-ট্যাঙ্ক) সস্তা দামে শক্তি উৎপাদনের জন্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরামর্শ দেন। একজন বিশেষজ্ঞের মতে,

> Unlike petroleum, gas or coal, nothing is consumed in it but simply gravity of water is used to produce power. For this reason water-power is much cheaper than fuels. On account of its low cost of production and cheap transmission its development not only accelerates the pace of industrial development but also helps in a more rational distribution of industry. It is no longer necessary to take the factory to coal or oil or carry fuel to it from long distances. With the help of hydro-electricity it could be established at a suitable point in relation to transport and markets, comparatively much more economically as it would save capital expenditure in power-generating plants. Spreading over a network in the rural area it promotes the disersal of the industry to raw materials and thus reduces the cost of production.[৫৪৭]

এমতাবস্থায় পাকিস্তান সরকার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে জ্বালানী ও শক্তি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেয়। এর মধ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পই প্রাধান্য পায়। প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন নদী ও খালের ওপর প্রকল্প গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার আগে এবং অব্যবহিত পরে প্রস্তাবিত ও গৃহীত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর মধ্যে গিলগিট মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট, মিয়ানথাল খাল ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী মিয়ানওয়ালি হাইডেল প্রজেক্ট, কুনওয়ার নদীর ওপর কুনওয়ার ভ্যালি হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট,

---

[৫৪৬] Johson, B. L.C. ''Karnafuli Hydro-electric Scheme'' in *Geography*, 42.2(1957): Pp.115-117.

[৫৪৭] Kazi S. Ahmed, ''Hydro-electric Development in Pakistan'' *Pakistan Geographical Review,* 11.2(1956):1-36.

ক্যানাল হাইডেল স্কিম, মালাকান্ড দরগাই হাইডেল স্কিম (১০,০০০ কি. ওয়াট), দরগাই স্কিম (২০,০০০ কি. ওয়াট), ওয়ারসাক হাইড্রো ইলেকট্রিক স্কিম (১৫০,০০০ কি. ওয়াট), টাউনসা মাল্টি পারপাস প্রজেক্ট (১০০,০০০ কি. ওয়াট), সর্বশেষ কর্ণফুলী মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট।[৫৪৮]

উপরের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ ধরনের প্রকল্পের মধ্যে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রই যেমন একমাত্র নয় তেমনি পাকিস্তানেও প্রথম প্রকল্প নয়। অথচ বিদ্যমান উৎসসমূহে প্রতিফলিত যুক্তি এমন যে পাকিস্তান সরকার স্থানীয় উপজাতিদের উচ্ছেদ করার জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ ড. সুধীন কুমার চাকমা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'অনগ্রসর পাহাড়িদের দমিয়ে রাখার জন্যই পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করেছিলো।'[৫৪৯] বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্য যাচাই করা হয় ব্রিটিশ আমলে, ১৯০৬-০৭ সালে। ১৯২২ সালে মি. গ্রিভস পুনরায় নদীতে অনুসন্ধান চালান। তবে ১৯৪০ সালের আগে কোনো প্রস্তাব তৈরি হয়নি। স্বাধীনতার এক বছর পূর্বে ১৯৪৬ সালে তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মি. ই এ মুর বরকল থানা সদরে বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব রেখে কর্ণফুলী স্কিমের ওপর তাঁর প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেন। ব্রিটিশ সরকারও কি তাহলে উপজাতিদের সর্বনাশ করার জন্যই কর্ণফুলী প্রকল্প হাতে নিয়েছিল? পাকিস্তান সরকার কর্ণফুলী প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো ধাপে কি উপজাতিদের সম্পৃক্ত করেনি?

স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলা সরকার প্রকল্পটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়। ১৯৫১ সাল থেকে প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৫৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকার মানুষগুলোর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করা হয়। ঐ সভায় ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন চাকমা সার্কেল চিফ রাজা ত্রিদিব রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কামিনী মোহন দেওয়ান,এমএলএ, কুমার রমনী মোহন রায়। উক্ত সভায় চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে চেয়ারম্যান করে গঠিত ছয় সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটিকে পার্বত্য জনগণের ওপর কাপ্তাই প্রকল্পের প্রভাব নিরুপণের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বলভদ্র তালুকদার (চাকমা) অতিরিক্ত মহকুমা প্রশাসক, কামিনী মোহন দেওয়ান, এমএলএ, কুমার রমনী মোহন রায়, কাজী আবদুল কুদ্দুস কোরেশী ও হাজী কাদির বক্‌শ মাতবর। এ কমিটিকে নিমোক্ত চারটি বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির ভার অর্পণ করা হয়। যথা :

১) To make proposal for future Dist. Hq. with estimated cost.

২) To suggest the most suitable areas for transfer of displaced persons.

৩) To suggest the most suitable terms for such transfer with estimated cost thereof.

---

৫৪৮ ঐ।

৫৪৯ আজাদ বুলবুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

৪) To decide place of rehabilitation of non-hillmen should sufficient land be not available for hillmen.

উক্ত কমিটি জেলার হেডকোয়ার্টার রাঙামাটিতে পুন:স্থাপনের পক্ষে সুপারিশসহ সম্ভাব্য চাকমা উদ্বাস্তুদের রাঙামাটির চাকমা সার্কেলের অন্তর্গত বা নিকটস্থ বিভিন্ন সংরক্ষিত বনে পুনর্বাসনের সুপারিশ করে। তবে চুড়ান্ত সুপারিশ হিসেবে প্রকল্পটি বরকলে স্থাপনের যুক্তিসহ অনুরোধ পেশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভূতাত্ত্বিক বিবেচনায় কর্ণফুলীর উৎসমুখ অর্থাৎ লুসাই পাহাড় থেকে বরকল, চিলারডাক ও শিলছড়ি এলাকাকে সম্ভাব্য এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়। একটি জাপানি বিশেষজ্ঞ কমিটিও এ সমন্ধে তাদের রিপোর্টে জানায় যে পরিকল্পনাটি কর্ণফুলীর আরও একটু উপরিভাগে করার উপযোগিতা ছিল। ওখানে করা হলে এত ব্যাপক আবাদী জমি নষ্ট বা প্রচুর মানুষকে স্থানচ্যুত হতে হতো না।[৫৫০] বাঁধ নির্মাণের স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন নেতৃবৃন্দও বরকলের পাশাপাশি সাঙ্গু নদীর কথাও উল্লেখ করেন; যেখানে বাঁধ নির্মাণ করা হলে মানবিক বিপর্যয় কম হতো এবং রাষ্ট্রের বিদ্যুতের প্রয়োজনও মিটতো। *কাপ্তাই হাইডেল ড্যাম ডিসপ্লেসড্ পিপলস্ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের* আহবায়ক চারু বিকাশ চাকমা কাপ্তাই বাঁধকে 'রাজনৈতিক বাঁধ' আখ্যায়িত করে বলেন, ''The project could very well be set up at Sangu and only few hundred people would have been affected.''[৫৫১]
কিন্তু ১৯৫৬ সালে গভর্নর আমির উদ্দিন তাঁর ভাষণে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে কাপ্তাইকে বাছাইয়ের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''To these people I can only say that the location of the present site of the Dam was decided upon after consultation with some of the best engineers of the world and I am sure that in selecting the present site they have chosen the best that was possible and which would give us the maximum benifits.''[৫৫২]
উল্লেখ্য বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার মি. গ্রুইস প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে কর্ণফুলী নদীর সর্বনিম্ন গিরিখাতে বর্তমান স্থানে বাঁধ নির্মাণের পক্ষে মত দেন। চট্টগ্রাম বন্দর ও তার সহযোগী শিল্প ও নগরাঞ্চলের উন্নতির স্বার্থে কাপ্তাই মুখ উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়।[৫৫৩] কিন্তু গভর্নরের ভাষণটি একটু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় প্রকল্পের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল। ''Apart from all these tangible benifits it is expected that there will be many intangible benifits.''

---

[৫৫০] স্নেহাশীষ ঘোষ, *বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদ, বিশেষভাবে উল্লেখ্য চাকমা প্রসঙ্গ*, পৃ. ৭১।

[৫৫১] Hari kishore Chakma et al, *Bara Parang* [The Great Exodus] (Dhaka: Centre for Sustainable Development, 1995), 21.

[৫৫২] H. E. The Governor's Speech at Kaptai, 1956. Records Office of The Deputy Commissioner, Chittagong Hill Tractrs, memo No. Dated The 10th of February 1956

[৫৫৩] আজাদ বুলবুল, *স্বপ্নাভ্রষ্টা কাপ্তাই বাঁধ* (ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০০৮) পৃ. ১৪।

এখানে একটি বাঁধ নির্মাণের জন্য ২৫৪ বর্গমাইল এলাকা নির্দিষ্ট হয়। অবশ্য জমি মীমাংসায় পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে জ্বালানী, শক্তি ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী ভুট্টো ভারত সরকারের সাথে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আয়োজন করেন। পাক প্রতিনিধি লে. কর্ণেল কে. এস শেখ ও ভারত প্রতিনিধি শরণ সিং এর আলোচনায়, ভারত কাপ্তাই প্রকল্পে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না– এই স্বীকৃতি দেয়।[৫৫৪] পূর্ব পাকিস্তানে পানি সম্পদ কাজে লাগানোর এটিই সর্বপ্রথম এবং সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিষদ বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পটি প্রথম ধাপের কাজ অনুমোদন দেয়। কিন্তু ১৯০০ সালের রেগুলেশন অনুসারে ৩৪ সি(i) বিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য শহর এলাকার বাহিরে অনুর্ধ ১০ একর পর্যন্ত যোগ্য শিল্প উদ্যেক্তাদের নিকট দীর্ঘমেয়াদি লীজ প্রদান করতে পারেন। আবার ১৯২৭ সালের বন আইন এ অঞ্চলে প্রযোজ্য ছিল যার আওতায় সংরক্ষিত বনভূমি অধিগ্রহণ করা যায় যায় না। ফলে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালের জুন মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে *দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস (ল্যান্ড একুইজিশন) রেগুলেশন, ১৯৫৮* (পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৫৮ সালের ১ নং রেগুলেশন) শিরোনামে দ্বিতীয় রেগুলেশন জারি করে। এ পৃথক ভূমি অধিগ্রহণ আইনের আওতায় ডেপুটি কমিশনারকে অধিগ্রহণের বিষয়ে জরুরি অবস্থা বিবেচনায় কোনো নোটিশ না দিয়েই ভূমি অধিকরণ করার এখতিয়ার প্রদান করা হয়। অতপর পূর্ব পাকিস্তান সরকার আরো দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হয়। পাকিস্তান সরকারের অনুরোধক্রমে যুক্তরাষ্ট্র এ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিষয়ক সহযোগিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হয়। তার ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান সরকার ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালে আইসিএর সাথে প্রকল্পের সম্ভাব্য যাচাই ও নির্মাণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে।[৫৫৫] অর্থ, প্রযুক্তি প্রকৌশলী, তদারকি সব শতকরা একশতভাগ মার্কিনী বদান্যতায় শুরু হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকায় আনুমানিক সাত হাজার লোক নিযুক্ত হয় এবং একটি ক্যাম্প স্থাপিত হয় যেখানে ১৫,০০০ লোক অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণের পর এই প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হয়। এভাবে বৈদিশিক সাহায্য ও স্বদেশের ইচ্ছায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক জীবনে ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের উদ্বোধন এক নতুন সংযোজন।

ব্রিটিশ আমলে কর্ণফুলীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সদর দপ্তর রাঙামাটি শহর। কাপ্তাই বাঁধের ফলে সৃষ্ট বৃহৎ জলাধারে ডুবে যাওয়ার পূর্বে শহরটি স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। প্রেসিডেন্ট

[৫৫৪] *দ্য পাকিস্তান টাইমস*, ২১ শে মে ১৯৬২ উদ্ধৃত- স্নেহাশীষ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭১।

[৫৫৫] Mohammad Ishaq, *Op. cit.*, p. 155.

আইয়ুব খান নতুন রাঙামাটি শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। ১৯৬২ সালে ৩১ মার্চ তিনি জমকালো অনুষ্ঠানে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। উক্ত ভাষণে তিনি পার্বত্যবাসীদের জন্য নানা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দেন। তাঁর ভাষণের কিয়দংশ নিম্নরূপঃ "The Government should do its best to settle them on other lands and would try to provide them with other remunerative occupations, to give them many amenities like schools, hospitals and roads as possible but it would take some time.''[৫৫৬] আইয়ুব খানের উক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ তাঁর শাসনামলে শুরু হয়।

মানচিত্রঃ ৫.১

কর্ণফুলী পেপার মিল ও কাপ্তাই বাঁধের অবস্থান

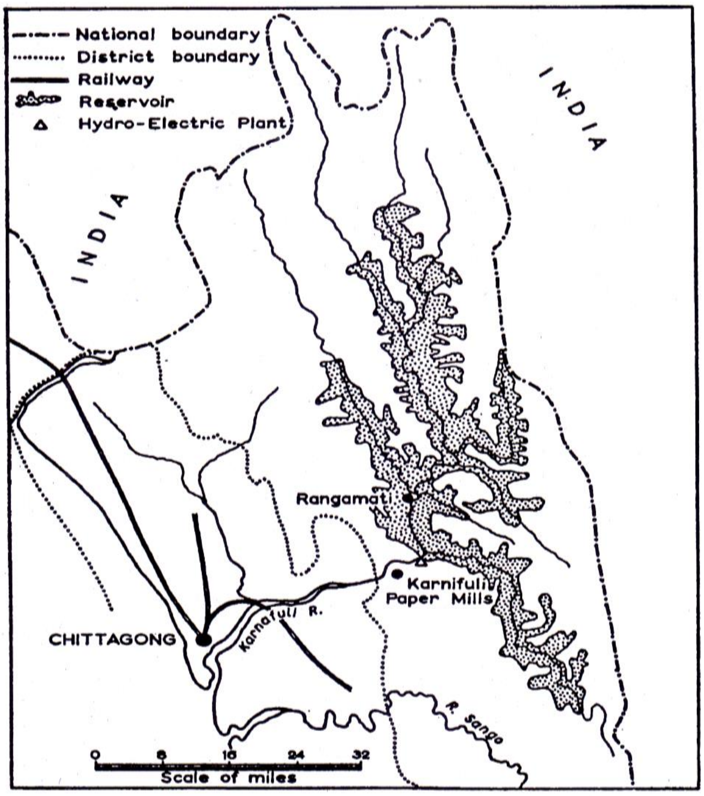

উৎসঃ বি এল সি জনসন, ''কর্ণফুলী হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কিম'' *জিওগ্রাফি* ৪২.২(১৯৫৭), পৃ. ১১৫-১১৭।

[৫৫৬] *The Pakistan Times*, 24 January 1960

৫.৬ শিক্ষা উন্নয়ন নীতি

পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ব্রিটিশ আমলে ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ২,৪৭,০৫৩ জন জনসংখ্যার জন্য রাঙামাটিতে শুধু একটি সরকারি হাইস্কুল ছিল। রামগড়, খাগড়াছড়ি, ছোট মহাপ্রুম, বান্দরবানসহ মোট ১০টি মিডল ইংলিশ স্কুল (যেখানে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হতো) ছিল। কিন্তু রাঙামাটি সরকারি হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ফলে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও কলকাতা শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা গরিব পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব হতো না। এতে শিক্ষার অগ্রগ্রতি ছিল খুবই শ্লথ। ব্রিটিশ সরকার শুধুমাত্র তাদের ঔপনিবেশিক প্রশাসন যন্ত্র কার্যকর রাখার স্বার্থে তাদের সাথে ভাষিক যোগাযোগে সক্ষম ও সরকারি অফিসের অধ্বঃস্তন পদের দাপ্তরিক কাজ চালাতে পারঙ্গম চাকুরিজীবী যোগান দেওয়ার ক্ষুদ্র কারখানা হিসেবে স্কুলটি পরিচালনা করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় শিক্ষার অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়। একদিকে পাকিস্তান সরকারের প্রগতিশীল শিক্ষাবান্ধব পদক্ষেপ অন্যদিকে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থানীয়দের বিশেষ করে চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রধান অনুঘটক। অধ্যাপক ভূমিত্র চাকমার মতে, 'ষাট দশকের প্রথম দিকে একটি ঘটনা শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তনসাধনকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এটি হলো কাপ্তাই বাঁধ।'[৫৫৭]

পাকিস্তান সরকারও এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার উন্নতি সাধনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে জেলার পিছিয়ে পড়ার কথা বিবেচনা করে ১৯৬০-৬১ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারকে সভাপতি করে 'উন্নয়ন কমিটি' নামে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়, যার দায়িত্ব ছিল জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা নিরুপণ করা। কমিটির রিপোর্টে বলা হয় তখন জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২২২টি সুতরাং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য জেলায় আরও ৭২৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দরকার। সেই মোতাবেক ১৯৬৬ সালের মধ্যে ১৬৯টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯১টিতে।[৫৫৮] ১৯৭০ সালের মধ্যে সুপারিশকৃত ৭৪১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় রাজা ত্রিদিব রায়ের নির্বাচনী ইশতেহারে। তিনি লিখেছেন, 'আমি প্রাদেশিক পরিষদে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করাইতে সক্ষম হই। যেমন ১৯৬১-৬৩ সালে ছিল মাত্র ২২২টি এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে তাহার সংখ্যা হইয়াছে ৭৪১টি;'[৫৫৯] যেখানে ৩৬,৩৩৯ জন ছেলে মেয়ে অবৈতনিক

---

[৫৫৭] ভূমিত্র চাকমা, "পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" ফজলে এলাহী (সম্পা.), *পার্বত্য পুরাণ*, বিশ্ব আদিবাসী দিবস '০৩ সংখ্যা (রাঙামাটি: গ্লোবাল ভিলেজ, ২০০৩), পৃ. ২৮-৩০।

[৫৫৮] Mohammad Ishaq, *op. cit.*, pp. 189-195.

[৫৫৯] রাজা ত্রিদিব রায়, *নির্বাচনী ইশতেহার*।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। ১৯৬৫-৬৬ সালে ৯ টি জুনিয়র হাই স্কুল, ৫ টি মিডল ইংলিশ স্কুল ও ১১ টি হাই স্কুল স্থাপিত হয় যার মধ্যে একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে তৎকালীন রাঙামাটির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শরদিন্দু শেখর চাকমা লিখেছেন, '১৯৬৬ সালে তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাঙামাটি কলেজ এবং রাঙামাটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।'[৫৬০] এভাবে ১৯৬৫-৬৬ অর্থবছরে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করে ১৯,৯৯,০৩৭ টাকা যেখানে 'উন্নয়ন কমিটি' প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪৭-১৯৬১ সাল পর্যন্ত এ খাতে সরকারি ব্যয় ছিল মাত্র বছরে গড়ে মাত্র ৭৯ হাজার টাকা।[৫৬১] অন্যদিকে বেসিক ডেমোক্রেসির উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় অবকাঠামো খাতে সরকার ১৯৬৬ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ৩৯১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে ৩১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা যেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয়িত হয় ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা।[৫৬২] সরকারের এসব উদযোগ রাঙামাটির সচেতন নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষানুরাগ বৃদ্ধি করে। তাঁরা সরকারি উদ্‌যোগের সাথে সংহতি প্রকাশ করে সর্বাত্মক সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে রাঙামাটি কলেজ নামে জেলার প্রথম ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় এ সম্পর্কে বড় শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি লিখেছে,

> An intermediate College is being set up at Rangamati to start from the next session. A strong founders' committee has been formed for the purpose with prominent non-officials, elite and educationists of the district of Chittagong Hill Tracts under the Chairmanship of the Deputy Commissioner. To start with the Intermediate College will impart education in Arts and Commerce, upto the higher secondary stage. The college will hold classes in the premises of the Government High School until the college gets its own building. Prominent persons like Mr. S. T. Hussain, Dr. A. K. Dewan, Dr. B (Bhagadatta) Khisa and Hajee A Kuddus have been entrusted with the task of construction of the required quarters and hostels for the staff andthe students of the college.[৫৬৩]

ডেপুটি কমিশনার মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, সি, এস, পি, নতুন স্থাপিত রাঙামাটি কলেজের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি হিসেবে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার কিছু নমুনা এখন দেখা যেতে পারে। ডেপুটি কমিশনার কলেজে শিক্ষার্থী আকর্ষণের জন্য স্বনামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। তাতে আহ্বান করা হয়,

---

[৫৬০] শরদিন্দু শেখর চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: একাল সেকাল* (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ৭৬।
[৫৬১] ঐ.
[৫৬২] Mohammad Ishaq, *op. cit.*, pp. 189-195.
[৫৬৩] *Morning News*, 21 June 1965.

স্বাধীনতা পূর্ব্ব হইতেই রাঙ্গামাটীতে কলেজের অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। এই জেলার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণকে বহু ক্লেশ ও বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইতেছিল। এবং কলেজের অভাবে বহু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ও ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতেছিল। বহু আকাঙ্খিত কলেজ স্থাপনে এই বিশেষ অভাব দূর হইল এবং উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সহজ ও সুগম হইল।

পাহাড় ও হ্রদ বেষ্টিত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন রাঙ্গামাটী কলেজে প্রথম বর্ষ সায়েন্স, হিউমেনিটিস ও কর্মাস গ্রুপে ছাত্রভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। মনোমুগ্ধকর পরিবেশে উপযুক্ত অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলীর দ্বারা কলেজ অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছাত্রদের অল্প খরচে থাকার ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বাজার ফাণ্ড ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম, কাপ্তাই এবং অন্যান্য জায়গার সহিত যাতায়াত ব্যবস্থা অতি উত্তম। অনতিবিলম্বে ভর্ত্তির জন্য প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করুন।[৫৬৪]

তাঁর এ উদ্‌যোগ ফলপ্রসু হয়। ১৯৬৬-৬৭ সেশনে অর্থাৎ প্রথম শিক্ষাবর্ষে রাঙ্গামাটি কলেজে ১৯১ জন শিক্ষার্থী ছিল যার মধ্যে একাদশ শ্রেণির মানবিক শাখায় ৫৩ জন, দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক শাখায় ছিল ২১ জন, একাদশ বিজ্ঞান শাখায় ছিল ৩০ জন, বিজ্ঞান শাখায় দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়তো ২৭ জন, একইভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৩০ জন করে শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল।[৫৬৫] ১৯৭০ সালে ১ মে তারিখে কলেজটি প্রাদেশিকরণ (জাতীয়করণ) করা হয় এবং মানবিক শাখায় ডিগ্রি পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি রাঙামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও রাঙামাটি সরকারি কলেজ পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এছাড়া ১৯৬২ সালে সুইডিশ সরকারের কারিগরি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত কাপ্তাই সুইডিশ-পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের জন্য ১০টি আসন এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস নিয়মিত ও কনডেনস্‌ড কোর্সে ১টি করে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। বুড্ডিস্ট এডুকেশন ফাণ্ড থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের জন্য ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং পালি শিক্ষার জন্য ২০টি টোল সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। কবি মুকুন্দ চাঙমা তাঁর কাব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের কথা চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। তার কয়েকটি লাইন এখানে দেওয়া হল।[৫৬৬]

জুম্মউনে জানি গেলাগ পুরনি নিয়মে আ ন' চলিব, [জুম্মরা বুঝে উঠল পুরনো নিয়ম ছারখার,]
সংসারানদ বাচত' চেলে শিক্ষা জ্ঞান থা পড়িব'। [দুনিয়াতে বাঁচতে হলে শিক্ষাজ্ঞান দরকার।]
জাগায় জাগায় স্কুল হল' শিক্ষা বাড়ি গেল,' [পাড়ায় পাড়ায় স্কুল বসল, শিক্ষার কদর বাড়ল,]
হিলট্রেকসত নানা জাগাত হাইস্কুল বসিল'। [হিলট্র্যাক্টর অনেক জায়গায় হাইস্কুল পেল।]
শিক্ষার এই অগ্রগতি ধারা রাখাবাল্লায়, [শিক্ষার চলমান অগ্রগতি ধরে রাখা বড় প্রয়োজন,]
জেলা সদর রাঙামাত্যাত কলেজ বঙ্গ যায়। [জেলা সদর রাঙামাটিতে কলেজ হয় স্থাপন।]

---

৫৬৪ ডেপুটি কমিশনার, ''রাঙ্গামাটী কলেজ'' শিরোনামে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি (নিউ রাঙ্গামাটীঃ সরোজ আর্ট প্রেস)

৫৬৫ Mohammad Ishaq, *op. cit.*, pp. 189-195.

৫৬৬ মুকুন্দ চাঙমা, *হিলট্রেকসর দুগ সুগ* [পার্বত্য চট্টগ্রামের সুখ দঃখ] (খাগড়াছড়িঃ প্রকাশক জ্ঞানের আলো চাঙমা, ২০১২), পৃ. ৪৬।

রাঙামাত্যাত কলেজ বঙ্গন্যায় শিক্ষা সুযোগ হ্ল’, [রাঙামাটিতে কলেজ হয়ে শিক্ষার সুযোগ বাড়ে,]
জুম্মউনর সেই ধারা অব্যাহত রল’।   [জুম্মদের শিক্ষার ধারা আর থামে না রে]

ব্যক্তি উদযোগে পরিচালিত *শিক্ষাঙ্গনে চাকমা জাতির অগ্রগতি* শীর্ষক সমীক্ষামূলক গ্রন্থ থেকে জানা যায় ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের প্রোগ্রেসিভ ডিকেড এর আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা অধ্যুষিত এলাকা দিঘীনালা, বড়াদাম, বাবুছড়া, কাচলং, রূপকারী, শিশকমুখ, পানছড়ি, কমলছড়ি, মাইসছড়ি, সিনালা, রামহরিপাড়া, নানীয়ার চর, তবলছড়ি প্রভৃতি স্থানে ১৩ টা হাই স্কুল স্থাপিত হয়। এই হাই স্কুল সমূহ থেকে শত শত চাকমা ছেলে মেয়ে মেট্রিক পাশ করে বিএ এমএ পাশ করার সুযোগ পান এবং সরকারী বে-সরকারী বিভিন্ন কর্মসংস্থানে চাকুরী গ্রহণ করেন বা আত্ম কর্মসংস্থানে জীবন জীবিকার পেশা বেছে নেন।[৫৬৭]

উপসংহার

এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে পূর্ব পাকিস্তান বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পেছনে পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত ভারতের সমকক্ষতা অর্জন করা ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। পাশাপাশি ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদী শিবিরে দ্বিখণ্ডিত বিশ্বব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুকুল্য লাভ করে সামরিকভাবে নিজের অবস্থান শক্ত করাও পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের সক্রিয় বিবেচনায় ছিল। পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাছাইকৃত কর্ণফুলী পেপার মিল, কাপ্তাই বাঁধ বা কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্পের মতো বৃহৎ প্রকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ ও প্রকৌশলগত সহায়তা কামনা করে। এতে উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থ হাসিল হয়।

এভাবে পৃথিবীর অনেক দেশের মতো উপমহাদেশেও নব সৃষ্ট প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক বৈরিতার কারণে অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর বলি হয় দেশের প্রান্তস্থিত দুর্বল জনগোষ্ঠী। পরিবর্তনের আকস্মিকতায় অনেকে খেই হারিয়ে ফেলে চিরতরে দেশান্তরিত হয়। কিন্তু যারা ধৈর্যধরে স্বদেশের মাটি আকঁড়ে ছিল পাকিস্তান সরকার তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগ তৈরি করে দেয়। হয়ত প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুলতার দোষে দুষ্ট। ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটিতে ত্রুটিপূর্ণ। এজন্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে উদারহস্তে অর্থ ব্যয় করে, প্রতিষ্ঠা করে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

[৫৬৭] কুমুদ বিকাশ চাকমা (সংকলক ও সম্পাদক), *শিক্ষাঙ্গনে চাকমা জাতির অগ্রগতি(১৮৬২-২০০০ইং)* ১ম খণ্ড (রাঙামাটি: দ্রৌপদ চাকমা ও রিপা চাকমা কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০২), পৃ.২৫।

শিক্ষাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর সুদুরপ্রসারী সুফল হলো পার্বত্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি। সমাজ ও জীবনদর্শনের পরিবর্তন। তাদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি ও আত্মশক্তির জাগরণ। চাকমা কবির ভাষায়[৫৬৮],

পাকিস্তান আমলত জুম্মউনে সচেতন হয়্যন,
লেগাপড়া শিক্ষাদীক্ষায় মনযোগ দিয়্যন।
জুম্ম সমাজ বদলেই যার টের ন'পিয়্যা গরি
যাত্রা আমার শুরু হ্য়্যে আধুনিক' পধধরি।
[পাকিস্তান আমলে জুম্মরা হয়েছে সচেতন,]
[লেখাপড়া শিক্ষাদীক্ষায় দিয়েছে মনন।]
[জুম্ম সমাজ পাল্টে যাচ্ছে ঠাওর করা দায়,]
[যাত্রা মোদের হলো শুরু আধুনিকের রাস্তায়।]

[৫৬৮] মুকুন্দ চাঙমা, *হিলট্রেকসর দুগ সুগ* [পার্বত্য চট্টগ্রামের সুখ দঃখ] (খাগড়াছড়িঃ প্রকাশক জ্ঞানের আলো চাঙমা, ২০১২), পৃ.৪৯-৫০।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

৬. বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

বাঙালির হাজার বছরের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ, অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ একটি নিষ্পত্তিমূলক ন্যায় যুদ্ধ।[৫৬৯] এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জয় হয় অসত্যের ওপর সত্যের, উন্মাদনার ওপর প্রকৃতিস্থতার, কাপুরুষতার ওপর শৌর্যের, অবিচারের ওপর ন্যায় বিচারের, অমঙ্গলের ওপর মঙ্গলের।[৫৭০] এর সাথে প্রখ্যাত সাংবাদিক এ্যান্থনী মাসকারেনহাস যোগ করেন, ১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিজয় ছিল মানবতার জন্যে এক সর্বোত্তম বিজয়।[৫৭১] এভাবে ন্যায়পরায়ণ, শান্তিকামী মানুষের শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক দেশের ভাবমূর্তি নিয়ে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের।[৫৭২] বিজাতীয় শাসন ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে রাষ্ট্রপ্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে নতুন সরকারের কার্যক্রম শুরু হয়। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ মওদুদ আহমদের লেখায় সেটি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ফুটে উঠেছে:

---

[৫৬৯] বলশেভিক মতবাদ অনুসারে যুদ্ধ দুই প্রকার: ক) ন্যায় যুদ্ধ যে-যুদ্ধ পররাজ্য জয়ের যুদ্ধ নয়, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ; যে-যুদ্ধ লড়া হয় বিদেশী আক্রমণ হইতে এবং ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খল হইতে জনগণকে রক্ষার জন্য। খ) অন্যায় যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ বিজয়ের জন্য, বিদেশ ও বিদেশী জাতিকে পরাভূত করিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করিবার জন্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি ন্যায় যুদ্ধ কারণ বাংলাদেশের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির অন্বেষায় যুদ্ধ করেছিল দ্রষ্টব্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনু.), *সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ষোড়শ মুদ্রণ, ২০১১), পৃ. ১৮৪।

[৫৭০] ফারুক চৌধুরী, *জীবনের বালুকাবেলায়* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৭), পৃ. ২০৭।

[৫৭১] এ্যান্থনী মাসকারেনহাস, *বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ*, মোহাম্মদ শাহজাহান (অনু.) (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ ২০১৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[৫৭২] ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে বাংলাদেশের এমন ভাবমূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর ভাষণে কিয়দংশ এরূপ ছিল: ''আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ... আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ... বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম হইতেছে সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম। আর সেই জন্যই জন্মলগ্ন হইতেই বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পাশে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে সমবেত উন্নয়নশীল দেশসমূহ শান্তির স্বার্থকে দৃঢ় সমর্থন করে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাহারা প্রকাশ করিয়াছেন। মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাইবে এবং ন্যায়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।'' খায়রুল আলম মনির (সম্পা.) *বঙ্গবন্ধুর ষোলোটি ভাষণ* (ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০১৮), পৃ.১০৪-১০৯।

> Then the triumphant moment came and with that Mujib brought with him the heaviest responsibility to straighter a country ravaged by war and to meet the hopes, expectation of seventy-five million people built up through a struggle of long 24 years. It was a mammoth reception, warm and spontaneous for an undisputed leader . . . so long an agitator, a demagogue, a spitfire orator belonging to the opposition for almost his entire life, he now arrived in the midst of his own people as the President and father of the nation.[৫৭৩]

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১১ জানুয়ারি স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বদলে সংসদীয় গণতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণা দেন এবং তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৫৭৪] যেহেতু যুদ্ধের সময়ে বঙ্গভবনের বর্তমান দরবার হল বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান সেদিন পরিচালিত হয়েছিল দরবার হলের বাইরের প্রবেশ লবিতে।[৫৭৫] সেদিন থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত একটানা সাড়ে তিন বছর সরকার পরিচালনা তথা দেশ পুনর্গঠন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করে।

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক, সামরিক, রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং পার্লামেন্টারি তথা মন্ত্রিপরিষদশাসিত এবং কেয়ারটেকার (তত্ত্বাবধায়ক) পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ধরনের সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে।[৫৭৬] উক্ত সরকারসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সেখানকার মানুষকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একটি সরকারি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়:

> There is, needless to underscore, a deep sympathy and real commitment to find a peaceful solution for the problems of the tribal people of the Hill Districts of Chittagong. The following pages present in a focussed manner efforts made by the Government of Bangladesh in this positive direction and on-going efforts to achieve real progress to achieve a solution to the satisfaction of all concerned.[৫৭৭]

---

[৫৭৩] Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman* (Dhaka: University Press Ltd. 4th imp.1991), p. 4.

[৫৭৪] Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, p. 8.

[৫৭৫] ফারুক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩।

[৫৭৬] ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকার, আবার তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭৪-৭৫ পর্যন্ত একদলীয় ও প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার, ১৯৭৫-১৯৭৯ পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার, ১৯৭৯-১৯৮১ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার, ১৯৮১-১৯৮৬ পর্যন্ত হু. মু. এরশাদের সামরিক ও স্বৈরতান্ত্রিক সরকার; ১৯৮৭-১৯৯০ পর্যন্ত এরশাদের প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার, ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং ১৯৯১ থেকে আবার মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার।

[৫৭৭] Govt. of Bangladesh. *A Report on the Problems of the Chitagong Hill Tracts and Bangladesh Responses for their Solution* (Dhaka: Special Affairs Division, Prime Minister's Office, 1993), p. iii.

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সেখানকার মানুষের ওপর বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সময় গৃহীত নীতিসমূহ বহুমুখী প্রভাব ফেলে। আলোচনা ও বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সরকারসমূহের গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক. রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি; দুই. প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে অন্ত-র্ভুক্তি। তবে প্রথমে অনুসন্ধান করা করা হয়েছে কোন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আলাদাভাবে অগ্রসর হতে হয়েছে।

৬.১ পটভূমি

পাকিস্তানের ২৪ বছরের 'অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক' শাসন[৫৭৮] ও পাঞ্জাবিদের বৈষম্যমূলক একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ডের অভিঘাতে বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সঠিক পথে বিকশিত হতে পারেনি। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের হাল ধরলে কেবল সর্বক্ষেত্রে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে-সময়ে দেশ গঠনের কর্মযজ্ঞ শুরু করেন তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি ভয়ার্ত, আতঙ্কিত জনপদ। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে ভয়ানক ফাটল সৃষ্টি হয়।[৫৭৯] পাহাড়ি ও বাঙালি– এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি হয় অবিশ্বাসের প্রাচীর। মুক্তিযুদ্ধে পাহাড়িদের অংশগ্রহণ করা না করা এর তাৎক্ষণিক কারণ হলেও এর পটভূমি তৈরি হয় পাকিস্তান আমলে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মোট ভূখণ্ডের দশভাগ আয়তন নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। ব্রিটিশ আমলে থেকে এটি একটি পৃথক প্রশাসনিক ইউনিট বা জেলা হিসেবে শাসিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৯৭ ভাগ যারা জাতিগভাবে বিভিন্ন জাতিসত্তার। অবশিষ্ট ৩ ভাগ ছিল হিন্দু ও মুসলমান। ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ও বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৫: ১৭ তে। ওই ১৭ ভাগ বাঙালি জনসংখ্যার সিংহভাগ কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনা কাগজ কারখানা এলাকায় বসবাস করত। ১৯৫৭ সালে ডেনিস ও লুসিয়েন বের্নোর গবেষণা বলছে পাহাড়িদের মৌলিক জীবনধারার ওপরে তখনো অপাহাড়িদের প্রভাব পড়েনি। ফলে তখনও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র

---

[৫৭৮] আশফাক হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের জন্ম ও জাতিসংঘ* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২ ১ম বাংলা একাডেমি সংস্করণ ২০০২) পৃ.২১

[৫৭৯] পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সাথে ওয়াকিবহাল সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ফেরদৌস আহমদ কোরেশী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''মুক্তিযুদ্ধকালীন এই মনোভাবের বহি:প্রকাশ নানাভাবে ঘটতে থাকে। এটা আমাকে ভীষণভাবে চিন্তিত করে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশবাংলায় 'চাকমাদের কাছে টানো' শিরোনামে একটি নিবন্ধে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম।'' *পার্বত্য নিউজ* ২৯ এপ্রিল ২০১৩।

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। ডেনিস ও লুসিয়েন বের্নোর ভাষায়, ‘‘But the hilly region, known as the Chittagong Hill Tracts, forms a unique administrative unit, inhabited and governed to a large extent by tribal peoples.”[৫৮০] অধিকন্তু এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী, এবং তাদের রাজনৈতিক অতীত একই। পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের ‘ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া’ উন্নয়ন নীতির পরিণামে পার্বত্য চট্টগ্রামের সিংহভাগ মানুষ শুধু নয়, বাস্তুসংস্থানও রাষ্ট্রের একপেশে নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের মনে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানারকম জিজ্ঞাস্য তৈরি করে। স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের ভাষায়:

> কেন অসংখ্য মানুষ নিজেদের পৈত্রিক ভিটা হারাবে, সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা মন্দির, স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার, এমন আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ডুবে যাবে? এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। উদ্ভট, অসম্ভব। একটি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য আর একটি জনগোষ্ঠী এভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হতে পারে না।[৫৮১]

কিন্তু এটাই ছিল বাস্তবতা। ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে লিখিত পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে একলক্ষ মানুষ ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয় কাপ্তাই বাঁধের কারণে। *চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার*-এ উল্লেখ আছে,

> The socio-economic condition of a large section of the people of the district was affected by the construction of Karnafuli Multi-purpose Hydel Project and the formation of its reservoir. The Karnafuli Hydel Project, submerged 125 Mauzas, houses of 18,000 families; approximatley one lakh of people were displaced from their hearths and homes.[৫৮২]

কাপ্তাই বাঁধের প্রভাব সম্পর্কে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে মাওলানা ভাসানীর *সাপ্তাহিক হক-কথা* লিখেছিল:

> সম্পদ প্রাচুর্য্যে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকেই কোটি কোটি টাকার বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। কর্ণফুলী পরিকল্পনায় জলবিদ্যুত দিয়েই আলোকিত হয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম। উপজাতীয় অধিবাসীরা সমগ্র দেশের উন্নতির জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকার করেছে তার উদাহরণ কর্ণফুলী বাঁধ। এ বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃত্রিম হ্রদে পানি জমে আশেপাশের পাহাড়গুলি পানির নিচে ডুবে গেছে। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে এখন লঞ্চ চলে। এ থেকে বুঝা যায় কি বিরাট এলাকা হয়েছে জলমগ্ন। আর এর ফলে এক লক্ষাধিক উপজাতীয় লোক আবাদী জমি ও ভিটা থেকে উৎখাত হয়েছে।[৫৮৩]

---

[৫৮০] Denise and Lucien Bernot, ‘‘Chittagong Hill Tribes,” in Stanely Maron (ed.), *Pakistan: Society and Culture* (Human Relations Area Files, New Haven, Connecticut, 1957), pp. 46-61.

[৫৮১] সেলিনা হোসেন, *পার্বত্যভূমির পথেপ্রান্তরে* (ঢাকা: ১ম ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৪, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯), পৃ. ২৪।

[৫৮২] Government of Bangladesh, *Bangladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts* (Dacca: BG Press, 1971), p. 126.

[৫৮৩] *সাপ্তাহিক হক-কথা, ৩০ জুন* ১৯৭২ আবু সালেক (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *মাওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক হক-কথা সমগ্র*

তন্মধ্যে ১৯৬৪ সালে ৪০ হাজারের অধিক পাহাড়ি-চাকমা পরিস্থিতির ভয়াবহতায় নিরুপায় হয়ে চিরদিনের জন্য দেশান্তরী হয়।[৫৮৪] এজন্য সাবেক কূটনীতিক ও কলাম লেখক মহিউদ্দিন আহমদ কাপ্তাই বাঁধকে, 'The biggest example of man-made ecological disaster in the country'[৫৮৫] হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ১৯৬৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে ফজুলল কাদের চৌধুরীর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিত্বে আনীত সংশোধনী দ্বারা পাকিস্তানের সংবিধান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'উপজাতি এলাকার' মর্যাদাও মুছে ফেলা হয়। এন্টি-স্ল্যাভারি সোসাইটির অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে ১৯৬৩ সালের মধ্যে ভারতের আসাম থেকে প্রায় ১৫ হাজার *মোহাজের* শরণার্থী রাঙামাটি মহকুমার কাচালং উপত্যকায় সরকারি উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়।[৫৮৬] অধিকন্তু, ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক পিয়েরে বেসাইনে ও ভূগোলবিদ মি. ব্যাসিল জনসন যৌথ উদযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত ক্ষেত্র সমীক্ষা পাঠে জানা যায়:

> The Karnafuli paper Mill located at Chandraghona, attracts a labour force which, together with their families, forms a settlement of not less than 10,000. The Karnafuli Dam project, which includes a dam and a power station and is situated at Kaptai, employed in December 1956, for the digging of the spillway alone, 11,000 labours. In all, it concentrated at time over 20,000 persons not counting there families. As for the highway, it involved in February 1957 the labour of some 7,000 persons.[৫৮৭]

এভাবে একদিকে স্বজাতি ও রক্ত-সম্পর্কের নিকট আত্মীয়স্বজন পরিবার-পরিজনের চিরজীবনের জন্য অনিচ্ছাকৃত বিদেশ-গমনজনিত প্রিয়-বিয়োগ অন্যদিকে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের আগমনজনিত অপ্রিয়-সংযোগ পাহাড়িদের মনস্তত্ত্বে গভীর বেদনার উদ্রেক ঘটায়। এসব ঘটনাবলি পাহাড়িদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষের পথে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে বলে স্বপন আদনানের লেখায় উঠে এসেছে: "Viewed in a long term perspective, these factors provided

---

(ঢাকা: ঘাসফুল নদী, ২০০২), পৃ.৩৫০।

[৫৮৪] শরদিন্দু শেখর চাকমা, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম* (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ১৯।

[৫৮৫] Mohiuddin Ahmad, ''The ethnic minorities of CHT: Root of causes of their alienation" *Weekly Holiday*, March 29, 1991.

[৫৮৬] Anti-Slavery Society, *The Chittagong Hill Tracts: Militarization, oppression and the hill tribes* (London: Anti-Slavery Society, 1984), p. 24.

[৫৮৭] এঁরা দুজনই ইউনেস্কো নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের দুজনের গবেষণা ফলাফল গ্রন্থাকারে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় বলে প্রফেসর বেসাইনে উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে একটি হচ্ছে এই গ্রন্থ। Prof. Pierre Bessaignet, *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1958), p. 60.

the bases for the growth of political consciousness among the Paharis."[৫৮৮] এছাড়া পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালিদের সশস্ত্র সংগ্রাম, নাগাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য নাগাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, মিজোরাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিজোদের সশস্ত্র লড়াই পাহাড়িদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধিকার চেতনার স্ফুরণ ঘটায়। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য উঁকি দিচ্ছিল, যখন সারা দেশের মানুষ সোনালী সুখের ভোর দেখবে বলে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে মানুষের জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্দিন। ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে ক্রমাগত মুক্তিবাহিনীর হিংসাত্মক আক্রমণের শিকার হয় পাহাড়ি ব্যক্তি, বাড়িঘর, পাড়া, গ্রাম, মন্দির, মূর্তি প্রভৃতি। কূটনীতিক ফারুক চৌধুরীর বর্ণনায় সমকালীন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ করা যায়: '১৯৭১-এর ডিসেম্বরের গোড়াতেই মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করলো। তাদের অনেকের কাছে উপজাতীয়রা শত্রু বলে পরিগণিত হলেন। তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন অনেকে। খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা ইত্যাদি অঞ্চলে উপজাতীয় বসতবাড়িতে করা হলো অগ্নিসংযোগ, চললো লুটতরাজ।'[৫৮৯] অনেকের ধারণা মুক্তিযুদ্ধে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য অং শৈ প্রু চৌধুরী এবং তাদের অনুসারীদের পাকিস্তানি জান্তার পক্ষে ভূমিকা পালন একটি নেতিবাচক অবস্থান তৈরি করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং সমগ্র বাংলাদেশে চাকমা রাজা হিসেবে ১৯৬০-১৯৭০-এর দশকে বিখ্যাত ব্যক্তির নাম ছিল ত্রিদিব রায়। এহেন চাকমা রাজার পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পক্ষাবলম্বন[৫৯০] (মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানি মন্ত্রী এবং সেখানেই শেষকৃত্য) সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে। পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে তা অতিরঞ্জিত করে ভারতে বিশেষ করে আগরতলা কেন্দ্রিক মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তুলে ধরা হয়। রাজা ত্রিদিব রায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানে চলে যান।[৫৯১] অং শৈ প্রু চৌধুরী স্বাধীনতার পর জেলে বন্দি হন। এই দুই জনের সবদোষ নিরীহ উপজাতিদের কাঁধে চাপে। সিদ্ধার্থ চাকমা ছদ্মনামে লেখক দীপংকর তালুকদার (প্রাক্তন এম.পি ও মন্ত্রী) তাঁর *প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম* গ্রন্থে একাত্তরের পাঁচই ডিসেম্বর উপজাতিদের জীবনে একটি কালো দিন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অগ্‌গবংশ মহাথেরর তথ্যসূত্রের বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'এই দিন নিরীহ উপজাতির রক্তে পানছড়ি এলাকা হয়েছিল রক্তাক্ত। সেই ক্ষত এখনও শুকোয়নি। বন্ধ হয়নি রক্তক্ষরণ। ঐ দিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পানছড়ি এলাকা ছেড়ে দিলে অন্যতম

---

৫৮৮ Shapan Adnan, *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict* (Dhaka: Research & Advisory Services, 2004), p. 25.

৫৮৯ ফারুক চৌধুরী, ''বাংলার অশান্ত অগ্নিকোণ(২),'' *ভোরের কাগজ*, ৯ মার্চ ১৯৯৭

৫৯০ ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী লিপ্ত হয় হত্যাযজ্ঞে। ফারুক চৌধুরীর অভিমত পাহাড়িয়া জনগণ যাতে তাদের রুদ্ররোষ থেকে পরিত্রাণ পায়, প্রধানত সেই মানসেই রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষ নেন।

৫৯১ রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকা দেখুন- Priyajit Debsarkar, *The Last Raja of West Pakistan* (London: Quintus, 2015)

প্রধান একটি জাতীয় দলের জেলা শাখার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা নামধারী একদল যুবক পানছড়িতে ঢুকে শুরু করে তাণ্ডব। ষোলো জনকে গুলি করে ফেলে দেওয়া হয় জঙ্গলে। তার ভেতর ভাগ্যক্রমে দু'জন বেঁচে যায়।'[৫৯২] তারাই নৃশংস ঘটনার স্বাক্ষী।[৫৯৩] সাপ্তাহিক হক-কথা লিখেছিল, 'বর্তমানে(১৯৭২ সাল) তিনি (ত্রিদিব রায়) পাকিস্তান মন্ত্রীসভার সদস্য হওয়ায় অভিযোগ আনা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মগ ও মংরা পাক-বাহিনীর দালাল। এই অভিযোগে ১৬ই ডিসেম্বরের পর মুক্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকে পাইকারী গ্রেফতার ও মারপিটও শুরু করে। ফলে সারা এলাকায় প্রচণ্ড বিশৃংখলা এবং অরাজকতার সৃষ্টি হয়।'[৫৯৪] স্বজাতির লোকদের এমন ভয়াবহ সংকটে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপ কামনা করে ত্রিপুরাস্থ চাকমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ত্রিপুরার রাজ্য গভর্নরের মাধ্যমে ভারত সরকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। সেই স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দীঘিনালা, রামগড় বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত বিভীষিকাপূর্ণ ঘটনার চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়,

> With the withdrawal of the Pak Army from Panchari in Chittagong Hill Tracts, contingent of the Mukti Bahi was sent there from Silachari on the Dec. 5 1971. They raided, plundered, raped and pillaged the Panchari area.
>
> On 7.12.71 and 8.12.71 the victorious Mukti Bahini entered Panchari and Nakaba and burnt hundreds of Chakma houses and killed more than hundred Chakmas including women indiscriminately.
>
> On 15.12.71 and 16.12.71 they indiscriminately killed hundreds of Chakmas and burnt houses of Chakma houses of Gabanchara, Parachara and singilnal etc. under

---

[৫৯২] সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬।

[৫৯৩] প্রমোদ বিকাশ চাকমা ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর পানছড়ি বাজারে যাওয়ার পথে মুক্তিবাহিনীর রোষানলে পড়েন। তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেনঃ Today after 16 years it shivers me from head to feet to remember the most terrible and harrowing incident that I had ever met in my life which took me at the door of certain death. It was wednessday, 8 Dec. 1971, I, along with a companion, was going to the Panchari Bazar to purchase some essentials for my family. On the way we came across a group of freedom fighters commanded by Subedar Khairuzzaman. They were carrying authomatic weapons, bayonets, knives, spears and other sharp weapons. No sooner had they seen us they asked, ` who are you?' Without hesitation we replied, 'we are Chakma, going to market.' Immediately they arrested us and started beating mercilessly. We begged their leniency and requested to let us go. The more we begged the more they beat us. So we realised that we would not be left alive.... We were taken to Panchari Bazar where we met 20/25 Chakma who were being subjected to inhuman tortures. We were all tied up, gathered and taken to place across the river, Chengi to the west of Panchari Bazar. I realised that we were taken to slaughter place and death was knocking at the door. We were blind folded and made to lie down facing the ground by the brutes. Suddenly I heard a loud lamented sound which pierced into the sky and and in no time a blow of sharp weapon hit me on my neck. I realised that the brutes finished their task. Fortunately the blow did not hit me deeply. I remained motionless like the dead. The brutes took all of us for dead and left the place gladly. Jana Samhati Samiti, CHTs, *Persecution of Human Rights in Chittagong Hill Tracts,* September 1987. p.6.

[৫৯৪] *সাপ্তাহিক হক-কথা*, ৩০ জুন ১৯৭২।

Khagrachari Sub-divisional Head Quarter and are perpetrating, loot, rape and so on.

The Mukti Bahini is undertaking the mass atrocities in colaision with the local Muslims Tabalchari Union under Ramgarh P. S.

Indian Army men are not with the Mukti Bahini and the Chakmas are praying for Indian Army to intervene.[৫৯৫]

এমন অসহনীয় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের জাতিসত্তাগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে অর্থাৎ পাহাড়িদের মধ্যে এক ধরনের হুমকিবোধ (Threat Perception) তৈরি হয়। তাদের জাতিসত্তাসমূহের এমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতা, সাংবিধানিক আইনের সুরক্ষার অভাব ও আর্থ-সাংস্কৃতিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণে প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতিকে মূল কারণ হিসেবে মনে করে। ফলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর নিকট অতীতের সংকটাপন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে আত্মপরিচয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার চৈতন্য তাদের মধ্যেও জন্ম নেয়, ১৯৮৪ সালে দাসত্ব বিরোধী সোসাইটি এটাকে আখ্যায়িত করেছে: "a new political awakeing of the tribes people."[৫৯৬]

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রনীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের রাষ্ট্রভাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সুষম সামাজিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন ছিল মূল প্রতিপাদ্য। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পর সশস্ত্র মুক্তিকামী মানুষের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চৈতন্যের জোয়ারের আবেগময় উচ্ছ্বাস নীতি নির্ধারকদের চৈতন্যকে ছুঁয়ে যায়। ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের রাষ্ট্রভাবনায় উপরে-বর্ণিত তিনটি মূল চেতনার পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয় রাষ্ট্রীয় নীতিভুক্ত করার প্রত্যয় জাগে। অন্যদিকে পাহাড়িদের রাষ্ট্রভাবনায় ছিল নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি হবে বহুজাতির অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুত্ববাদী চেতনাভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী

---

[৫৯৫] Memorandum of Chakma Leaders of Tripura to Lt. Governor of Tripura, The Dated, 28.12.71.1972. See D. K Chakma (eds.) *The Partition and The Chakmas and other writings of Sneha Kumar Chakma* (India: Pothi.com, 2013) p. 253 Annexure-21. See also Subir Bhaumik, *Insurgent Crossfire: North-East India* (New Delhi Lancer Publishers Pvt. Ltd. 1996), pp. 254-255.

[৫৯৬] Anti-Slavery Society, *The Chittagong Hill Tracts: Militarization, oppression and the hill tribes* (London, 1984), p. 46.

যেমন 'বহুত্ববাদিতা ও সহনশীলতাকে ভারতের অন্তরাত্মা'[৫৯৭]বলে অভিহিত করেছেন তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ভেবেছিল ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ভেঙে সৃষ্ট বাংলাদেশও একটি বহুজাতি-বান্ধব, বহুভাষা-সংস্কৃতি-সহনশীল রাষ্ট্র হবে। বহুত্ববাদী সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যাকে *কালচারাল প্লুরালিজম* বলে অভিহিত করেছেন তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত বাক্যগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন:

> Political and social pluralism refer to the idea or fact of coexistence of various political, ideological, cultural or ethnic groups without the predominance of any group in particular. It also calls for the transfer of political power to self-governing intermediate bodies capable of countervailing both an atomistic and a totalitarian state. ... The concept of cultural pluralism admits of many cultures in the world and their right to develop their own way.[৫৯৮]

সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের তাত্ত্বিক বয়ান থেকে তিনি স্বদেশের বিশেষ ও বাস্তব উদারহণ টেনে বলেন,

> Undoubtedly, the hillsmen belong to a different culture from the Bangalees, whereas the religious factor is but only one element of Bengali culture. Cultural pluralism demands that we accord an equal place to the cultures of the ethnic groups along with the mainstream culture; it also demands that one religious group does not dominate the others. Ours experience in the last half a century has been this that it is easier to forge unity against a common enemy- say, during the nationalist movements of one kind or another- than to maintain it afterwards- say, for the purpose of nation-building or constructing a multinational state.[৫৯৯]

পাকিস্তানি শাসনামলে বাংলাদেশের মানুষ একই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন, সাংস্কৃতিকভাবে আক্রান্ত, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত এবং জাতিগতভাবে অবদমিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতায় অতিষ্ঠ হয়েছিল। ফলে এটা ধর্তব্য ছিল নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে প্রত্যেকের নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃত ও সুরক্ষিত থাকবে। অন্তত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের বাঙালি জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা তেমনটিই প্রতিফলিত করে:

> বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে ক্রিয়াছিল ছিল দুটি উপাদান। প্রথমটি হচ্ছে: বাঙালি জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতার বিরোধী এক মতাদর্শ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে: বাঙালি জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য বহুত্ববাদী এক সমাজ বিনির্মাণ। বহুত্ববাদী সমাজ সংখ্যালঘিষ্ট জনসমষ্টির সমাজ ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। সেজন্য বাঙালি

---

[৫৯৭] প্রণব মুখার্জির ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিদায়ী ভাষণ, *প্রথম আলো*, ২৫ জুলাই ২০১৭

[৫৯৮] Anisuzzaman, *Cultural Pluralism* Indira Gandhi Memorial Lecture 1991 (Kolkata: The Asiatic Society, 2nd Reprnt. 2016), p. 6-7.

[৫৯৯] Anisuzzaman, *op., cit.,* p. 19.

জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য একপক্ষে বহুত্ববাদী সমাজ বিনির্মাণ ও অন্যপক্ষে সংখ্যালঘু বিভিন্ন আদিবাসী কৃষকদের জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা।[৬০০]

এক কথায় রাষ্ট্র হবে দেশের ভৌগোলিক সীমাভুক্ত সকল জাতিগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বাধীনতার নিরপেক্ষ রক্ষক। কিন্তু যখনই বাঙালি জাতি-পরিচয় অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার রাষ্ট্রীয় আয়োজন শুরু হলো তখন রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ ন্যায়ভিত্তিক চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ হল। আমেনা মহসিনের মতে, ‘‘The state instead of playing the role "honest broker" itself becomes the major partner and often the source of conflict. The CHT, Bangladesh, is a classic case in point."[৬০১] এভাবে তৎকালীন বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্বের রাষ্ট্রভাবনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক জাতিগোষ্ঠীয় নেতাদের রাষ্ট্রভাবনা ও রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দেয়। অতঃপর প্রথমপক্ষ প্রয়াস পায় রাষ্ট্রের বাঙালি চরিত্রায়ন অক্ষুণ্ন রেখে দ্বিতীয় পক্ষকে অঙ্গীভুত করতে। সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেনের মতে,

> Nationalism represented an assertion by the people of their identity, which evolved during the course of its historical struggle into the right to their language, culture, traditions and history.
>
> . . . In Pakistan, the ruling elite had denied that there could be such a nationalism based on a distinct language and cultural heritage. Such insensitivity had been accentuated when Bangalis were confronted with the question: Are you a Bangali or a Muslim? Now that Bangladesh had been estabalished as a nation state, and was recognised as such by the world, their national identity could no longer be questioned. These sense of fulfillment, however led to smaller ethnic communities, in particular those living in the Chittagong Hill Tracts feeling excluded. Bangabandhu's response was that they would enjoy equality in all respects, and that special provisions would be made through affirmative action to ensure such equality.[৬০২]

উপরের উদ্ধৃতাংশে বর্ণিত ‘সেন্স অব ফুলফিলমেন্ট’ বা ‘স্বপ্ন-পূরণানুভূতি’ কিসের তা এ প্রসঙ্গে একটু উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। এক্ষেত্রে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর যুক্তিগুলোর দিকে একনজর দৃষ্টিপাত করা যায়,

> পাকিস্তান আমলে বাঙালি কথাটার ব্যবহার কার্যতঃ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আমাদের একমাত্র পরিচয় ছিল পাকিস্তানি অথবা পূর্ব পাকিস্তানি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই আরবি (উর্দু) হরফে বাংলা লেখার সরকারি অভিযান শুরু করা হয়। বাংলা নববর্ষ পালন, বৈশাখী মেলা, নতুন ফসল ওঠার হৈমন্তী নবান্ন উৎসব, বসন্ত উৎসব প্রভৃতি বাঙালির জাতীয় উৎসবগুলোকে বিজাতীয় ও হিন্দুদের উৎসব আখ্যা দিয়ে বর্জন করা হয়।

---

[৬০০] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "পার্বত্য চট্টগ্রাম ও খালেদা জিয়া" *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭ ইংরেজী।

[৬০১] Amena Mohsin and Delwar Hossain, *Conflict and Partition: Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd, 2015), p. 4.

[৬০২] Kamal Hossain, *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice* (Dhaka: University Press Ltd, 3rd Imp. 2016), p. 141.

> বাংলাভাষাকে প্রাদেশিক সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতেও প্রথমে পাকিস্তান সরকার অসম্মত হন। বাংলাভাষার আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয়। বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রসহ সকল অমুসলিম সাহিত্যিকদের লেখা পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করার জন্য উগ্র মৌলবাদী ও জামাতপন্থীদের দ্বারা দাবি তোলানো হয়। ... এমনকি নজরুলের গজল ও ইসলামী গানগুলো ছাড়া অন্যান্য কবিতা ও গান বর্জনে সরকারি উৎসাহ দান ইত্যাদি সবই ছিল বাঙালি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও জাতীয়তাবোধকে বিলোপ করার নব্য ঔপনিবেশিক অপচেষ্টা। এই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং বাংলাদেশের মানুষ অপহৃত বাঙালি পরিচয় ফিরে পেয়েছে।[৬০৩]

একজন বাঙালি রাজনৈতিক এবং একজন লেখকের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালির আত্মপরিচয় হারানোর সকল হুমকি, ভয়, শঙ্কা, অন্তরায়, উপদ্রব দূরীভূত হয়েছে পাকিস্তানিদের এদেশ থেকে চিরতরে বিতাড়নের মধ্য দিয়ে। লরেন্স জাইরিং যথার্থই বলেছেন, ‘‘Bangla was no longer in danger.’’[৬০৪] সুতরাং নতুন করে বাঙালি পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য আর সংবিধানের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো আবশ্যকতা ছিল কিনা তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে যখন কিনা দেশের সীমানাভুক্ত বাঙালি ব্যতীত অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করার ঝুঁকি থাকে এবং যা নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধের বা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র খ্যাত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেতনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের ভাবনায় আত্মস্বীকৃত, স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রকাশ্যরূপ দান করেই গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত রাখার প্রসঙ্গটি সক্রিয় বিবেচনায় আসে।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। কয়েকটি কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের নতুন সরকার প্রধান ও নবগঠিত সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে কিছু দাবি ও বক্তব্য উপস্থাপন করা জরুরি বলে মনে করে। প্রথমত, প্রণিতব্য সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পুন:প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে এবং অব্যবহিত পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত কিছু অপ্রীতিকর সহিংস ঘটনা, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের মতে, ‘মুক্তিবাহিনীর ভয়ংকর প্রতিশোধ’ যা পরিণামে পাহাড়িদের জনজীবন উদ্বেগজনক নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দেয়।[৬০৫] নূহ-উল-আলম লেনিন উক্ত ঘটনাগুলোকে ‘বেদনাদায়ক ভুল এবং বাঙালি ও

---

[৬০৩] আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, *আমরা বাংলাদেশী, না বাঙালি?* (ঢাকা : অক্ষরবৃত্ত, ১৯৯৫, ১ম প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ২১।

[৬০৪] Lawrence Ziring, *Bangladesh: From Mujib to Ershad- An Interpretive Study* (Dhaka: University Press Ltd., Reprnt. 1994) p. 7.

[৬০৫] হুমায়ুন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

পাহাড়ির মধ্যে অনভিপ্রেত দূরত্ব সৃষ্টিকারী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৬০৬] উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে পাহাড়িরা তাদের স্বতন্ত্র জাতিত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, মেসবাহ উদ্দিন আহমেদের (মেসবাহ কামাল) ভাষায় 'আদিবাসীরা উদ্বিগ্ন ও হতাশ' হয়ে পড়ে।[৬০৭] এটি একটি সাধারণ ধারণা যে, একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যেকোনো দেশেই অরাজকতা, লুণ্ঠনযজ্ঞ, অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্য দেখা দেয়। বাংলাদেশ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামেও তার অন্যথা হয়নি। স্মর্তব্য যে, ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করলেও তখনো রাজধানী ঢাকা বা সারা দেশে কার্যত কোনো সরকারি কর্তৃত্ব ছিল না। নিরাপত্তার বিবেচনায় প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদের কেউই তখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেননি অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেন।[৬০৮] এবং ২২ ডিসেম্বর তারিখে দেশে ফেরার পরও দেশব্যাপী সশস্ত্র গ্রুপগুলোর অরাজকতা নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার মতে,

> তখন পর্যন্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করা সম্ভব না হওয়া, স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী এবং অন্যান্য দল ও গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী নেতৃত্বের অধীনে অবস্থান, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেও পাকিস্তান বাহিনীর উপস্থিতি ... ইত্যাদি কারণে দেশে এক অস্বস্তিকর ও অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছিল।[৬০৯]

ওই অবস্থায় অস্ত্রধারীরা যার যার জায়গায় প্রতিশোধপরায়ণ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফেরার পর বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে এই অরাজকতা, অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্য বহুলাংশে দূর করেন।[৬১০]

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার মাত্র এক মাস ৫ দিনের মাথায় পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সাথে দ্রুত সাক্ষাৎ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে তাদের লিখিত দাবিনামা পেশ করে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার ভার লাঘব করতে সচেষ্ট হন। এক্ষেত্রে পাহাড়ি নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রধানমন্ত্রীর উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা মং সার্কেলের চিফ রাজা মং প্রু সাইনের নেতৃত্বে গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, ১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী কোকনদাক্ষ রায়, রাজমাতা মিসেস বিনীতা রায়, তৎকালীন বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী, মি. সুবিমল দেওয়ান ও অ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমাসহ সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল

---

[৬০৬] নুহ-উল আলম লেনিন (সম্পা.), *জুম পাহাড়ে শান্তির ঝর্ণাধারা: ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি* (ঢাকা: গণ প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ. ২৮।

[৬০৭] মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫। পৃ. ২৪৫।

[৬০৮] S. A. Karim, *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy* (Dhaka: The University Press Ltd. 2005), p. 269.

[৬০৯] এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

[৬১০] আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, *আমরা বাংলাদেশী, না বাঙালি?* পৃ. ৪১।

বঙ্গবন্ধু তথা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য ঢাকা গমন করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তারা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চারদফা দাবিনামা রেখে আসেন। দাবিগুলো হল:[৬১১]

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের অনুরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না করা হয়, এরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

পরে ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উক্ত দাবিনামা লিখিতভাবে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে পেশ করেন। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র উনিশ দিনের মাথায় (২৯ জানুয়ারি ১৯৭২) ১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম আসনে বঙ্গবন্ধুর মনোনীত প্রার্থী ও আওয়ামী লীগের তৎকালীন পার্বত্য জেলার সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে সাত সদস্য[৬১২] বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রাখার অনুরোধ জানান। চারু বিকাশ চাকমা তাঁর নিজের লেখায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উক্ত সাক্ষাৎ করাকে 'প্রথম নিয়মতান্ত্রিক ট্রাইবেল রাজনীতির সূচনা' বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কের নিকট কোনো বিশেষ এলাকার জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পেশকৃত সর্বপ্রথম স্মারকলিপি। উক্ত স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত দাবিগুলো সন্নিবেশিত ছিল:

ক) স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে ভূমি সমস্যার সমাধান করা; খ) স্থায়ী উপজাতি ও স্থায়ী অ-উপজাতি জনগোষ্ঠীর (ভোটার) সমন্বয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন যারা অত্র এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জাতীয় সংসদ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করবে'; গ) একাধিক উপজাতি বা আদিবাসী রাজনৈতিক দল বা ফোরামের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন করা যে-কাউন্সিলের একটি ছোট মন্ত্রণাসভা থাকবে এবং ঐ সভার চেয়ারম্যান বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে একদিকে রিজিওনাল কাউন্সিল অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহি করবেন।[৬১৩] তাঁর এ স্মারকলিপির কথা কখনও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি বা আলোচনায় আসেনি

---

[৬১১] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ* (রাঙামাটি: উসাই, ১৯৯৩), পরিশি-ঙ

[৬১২] উক্ত প্রতিনিধি দলে ছিলেন- যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, (প্রফেসর) মংসানু চৌধুরী, উগ্য জাইন যুগ্ম সচিব (অব.), মথুরা লাল চাকমা, চিং হ্লামং মারি, রণবিক্রম ত্রিপুরা প্রমুখ।

[৬১৩] চারু বিকাশ চাকমা, "পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাবলীর রাজনৈতিক সমাধানের নতুন চিন্তাভাবনা" হাফিজ রশিদ খান

যেভাবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মারকলিপিটি এসেছে। প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার বক্তব্য থেকেও উক্ত লিখিত দাবিনামা বা স্মারকলিপির কথা জানা যায়। তিনি বলেছেন, ‘‘সেখানে চারু বিকাশ চাকমা একটি লিখিত দাবিনামাও এনেছিলেন, যেটা আমাদের বলেননি, সেখানে স্বায়ত্তশাসনের কথাও ছিল।’’[৬১৪] চারু বিকাশ চাকমার পরবর্তী ডেলিগেশনের সদস্য বর্তমানের অবসর প্রাপ্ত যুগ্মসচিব দেবদত্ত খীসা উক্ত স্মারকলিপি প্রসঙ্গে বলেন,

> চারু বিকাশ চাকমা খুব নোলেজিবল লোক ছিলেন, বঙ্গবন্ধু উনাকে খুব পছন্দ করতেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতে যাওয়ার পূর্বে তিনি একটি স্মারকলিপি প্রদানের কথা চিন্তা করেন। যেই কথা সেই কাজ। তিনি তাঁর বাসায় আমাকে ডিকটেশন দেন আর আমি স্বহস্তে লিখি। পরে টাইপিস্ট বিদ্যুৎ দেওয়ান সেটা টাইপ মেশিনে টাইপ করে দেন।[৬১৫]

সমকালীন পত্র পত্রিকায় চারু বিকাশ চাকমার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের খবরটি প্রকাশিত হয়। *দৈনিক ইত্তেফাকে* বলা হয় বঙ্গবন্ধু উক্ত সাক্ষাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং ভূমি অধিকার পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।[৬১৬]

ঠিক এই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে যায় এক ঐতিহাসিক ঘটনা। গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের সত্যিকার অর্থে কোনো গণভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামে ‘উপজাতি’দের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখতে সত্তর সালের ষোলোই মে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে রাঙামাটি কোর্ট ভবনে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, অমিয় সেন চাকমা, কালী মাধব চাকমা ও পঙ্কজ দেওয়ান। সেই গোপন সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে পাহাড়িদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন, তা সংরক্ষণ এবং বিকাশের মাধ্যমে তাদের অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ও সব শ্রেণির পাহাড়ি সম্প্রদায়ভিত্তিক একটি আঞ্চলিক দল গঠিত হবে। কিন্তু সর্বশ্রেণির এবং সর্ব সম্প্রদায়ের পাহাড়িদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গড়ার মতো উপযুক্ত ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে তখনও ছিল না।[৬১৭] জনসংহতি সমিতির প্রাক্তন সদস্য যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার লেখনি থেকে জানা যায় ১৯৭০ সালে ১৬ মে রাঙামাটি কমিউনিস্ট পার্টি (আরসিপি) নামে একটি গোপন সংগঠন জন্মলাভ করেছিল। আরসিপি তাদের ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবক্ষয়ের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও

(সম্পা.), *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী: অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত* (ঢাকা: চিংসাপ্রু কেসি, ১৯৯৩), পৃ. ৯-১১।

[৬১৪] মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭।

[৬১৫] সাক্ষাৎকার : বাবু দেবদত্ত খীসা, অবসর প্রাপ্ত যুগ্মসচিব, ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, তবলছড়ি, তাং ১/৫/২০১৮।

[৬১৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ শে জানুয়ারি, ১৯৭২ ।

[৬১৭] সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১

পাহাড়ি সমাজে বিদ্যমান সামন্ততন্ত্রকে দোষারোপ করেন এবং একই সাথে পাহাড়িদের তৎকালীন অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে দায়ী করেন। পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান বাঙালি সম্প্রসারণকে অশনি সংকেত হিসেবে সতর্ক করে দেন।[৬১৮]

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পাল্টে যায়। স্থানীয় রাজনীতিতে উন্মেষ ঘটে নতুন চিন্তা চেতনার। ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থতা এবং উপস্থাপিত দাবিনামার প্রতি ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ার ঘটনা বিকাশমান জাতিগত রাজনৈতিক চিন্তা চেতনাকে আরো শাণিত করে। বিশিষ্ট লেখক জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার ভাষ্যমতে, ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একটি নতুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠনের জোর প্রচেষ্টা চালান। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের রাজনীতি সচেতন এবং স্বতন্ত্র জাতিগত, ভাষা ও সংস্কৃতিগত অস্তিত্ব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ব্যক্তিগণ পাহাড়িদের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য আঞ্চলিক না জাতীয় কোনো ধরনের রাজনৈতিক দল উপযুক্ত এ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে নেমে পড়েন। ১৯৬৬ সালে গঠিত উপজাতীয় কল্যাণ সমিতির আহ্বায়ক ও পরবর্তীতে খাগড়াছড়ি জেলায় বাকশাল সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বিহারী খীসার অভিমত ছিল 'ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশক'। তাঁর যুক্তি হল, ''কেউ যদি জাতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে বা থাকতে চায়, এটা ভাল বৈ খারাপ কিছুই নয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সর্বোপরি এখানকার ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচয় আলাদা হওয়ায় এখানে উপজাতীয়দের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলা জরুরি।"[৬১৯] অতঃপর প্রবীণ নেতা কামিনী মোহন দেওয়ানের পরামর্শ নিয়ে তাঁরই উদ্যোগে ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর তরুণ সহযোগীদের নিয়ে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মতান্তরে ৭ মার্চ গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। ১৯৭২ সালের ২৪-এ জুন রাঙামাটি ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলে নবগঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সাহিত্যিক বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৬০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।[৬২০] জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে তৎকালীন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির

---

[৬১৮] Subir Bhaumik, *op., cit.*, p. 251.

[৬১৯] প্রদীপ্ত খীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬) পৃ. ৪০।

[৬২০] যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, "পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা: একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা" খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, *প্রার্থীত প্রহর: প্রথম বর্ষ পূর্তি উদযাপন স্মরণিকা'* ৯০ খাগড়াছড়ি, ১৯৯০ পৃ. উল্লেখ নেই।

প্রতিবাদ ও প্রতিকার চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর রাঙামাটিতে বহু প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। সকল সম্প্রদায়ের সকল বয়সের মানুষের সমবেত মিছিলে রাঙামাটির রাজপথ সরগরম হয়ে ওঠে।[৬২১] কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে সরকারের নির্লিপ্ততা পাহাড়িদেরকে নিজস্ব প্রতিকারের পথ বেছে নিতে প্ররোচিত করে। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখেছিল,

> বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা নামধারী কিছু সংখ্যক সশস্ত্র বাঙালী যুবক পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ তারা চালিয়েছে নির্বিবাদে। রাজাকার বাহিনীর বেশকিছু পাহাড়ি নিরক্ষর সদস্য রামগড় এলাকায় অস্ত্র জমা দিতে এসে এদের হাতে নিহত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়, উপজাতি নেতা অং শৈ প্রু চৌধুরী পাকিস্তানীদের সহযোগী ছিলেন এই অজুহাতে সমগ্র পাহাড়ি সম্প্রদায়কে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে এক শ্রেণির বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে যে তাণ্ডবলীলা শুরু করে তা দমনের চেষ্টা সরকারীভাবে করা হয়নি। এর উপর পাকিস্তান আমলের শরণার্থী অনুপ্রবেশ ও তাদের স্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। এদুটি ঘটনা পাহাড়ি সম্প্রদায়ের মনে অত্যন্ত ক্ষোভের সৃষ্টি করে।[৬২২]

এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পাহাড়িরা পাকিস্তানি সেনাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গড়ে তোলে প্রতিরোধ বাহিনী যা 'শান্তিবাহিনী' নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার মতে, এভাবেই গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস রুদ্ধ হবার পর ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি জন্ম হয় জনসংহতি সমিতির সশ্রস্ত্র বাহিনী– শান্তিবাহিনী। সিদ্ধার্থ চাকমার মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামে গঞ্জে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে উপজাতি সমাজ জীবনে ভারসাম্য, স্বাভাবিকতা ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য এ বাহিনীর জন্ম দেওয়া হয়েছিল বলে বাহিনীর নাম রাখা হয় শান্তিবাহিনী।[৬২৩] ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হলে শান্তিবাহিনী তার মাতৃ-সংগঠন জনসংহতি সমিতির চেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করে।

এদিকে ড. কামাল হোসেনের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রস্তাবিত ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত খসড়া সংবিধান বিল তিন সপ্তাহ আলোচনার পর গণপরিষদে গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর। ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন দেশের বহুল-প্রশংসিত ১৯৭২ সালের সংবিধান কার্যকর হলে দেখা যায় মং সার্কেলের চিফ রাজা মং প্রু সাইনের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের পেশকৃত দাবিনামা, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের নিকট দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির কোনোটির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ওই সংবিধানে ঘটেনি। কোনো কোনো বাঙালি জাতীয়তাবাদী

---

৬২১ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গৌতম দেওয়ান, প্রাক্তন জেলা ছাত্রলীগ সেক্রেটারি, তারিখ: ০৫/০৯/২০১৭ স্থান: ডিসি বাংলোস্থ নিজ বাসা।

৬২২ চিন্ময় মুৎসুদ্দী, "পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন," *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৩ বর্ষ ২ সংখ্যা ২৫ শে মে ১৯৮৪।

৬২৩ সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

স্কলারদের অভিমত হলো বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও নৃ-জাতিগত সমরূপতার কারণে সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে 'একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম' প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। 'একক বা ইউনিটারি' কাঠামোয় 'পৃথক আইনসভা বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' প্রদানের কোনো অবকাশ সংবিধানে নেই।"[৬২৪] কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের ব্যাখ্যা জাতীয়তাবাদীদের ঐ ব্যাখ্যা সমর্থন করে না। ব্যরিস্টার ইসলামের ব্যাখ্যা উদ্ধৃতিযোগ্য: 'ক্ষমতাবিকেন্দ্রীকরণ আমাদের সংবিধান স্বীকৃত পথ। এক কেন্দ্রিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আমাদের সংবিধান স্বীকৃত পথ। এককেন্দ্রিক ক্ষমতা গণতান্ত্রিক রীতি নীতিরও সমার্থক নয়। সংবিধানের ৫৯/৬০ ধারায় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে।'[৬২৫] প্রশ্ন হলো পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ যখন দাবিগুলো উত্থাপন করেন তখনও বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া চলমান। "অবকাশ নেই"– এধরনের বক্তব্য কর্তৃত্বপরায়ণতা ও অসংবেদনশীলতার পরিচায়ক। মানুষের প্রণীত আইন মানুষের প্রয়োজনমাফিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন অতীতেও হয়েছিল, বর্তমানেও হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে।[৬২৬] সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি স্বয়ং স্মৃতিচারণ করেছেন যে,

> Different points of view within the committee, were reflected in the discussions on major issues such as the definition of the the fundamental principles, and ... after, prolonged debate and discussion, the issues were resolved by consensus. A large number of amendments were proposed for the draft Constitution Bill and over fifty of the amendments proposed by the members were incorporated.[৬২৭]

১৯৭৩ এর নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে ৩০৭টি আসন লাভ করেছে বিশ্বের সংসদীয় গণতন্ত্রের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন, লরেন্স জাইরিং এর মতে এই বিজয় ছিল, "Astonishing Awami League victory."।[৬২৮] সুতরাং রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সদ্যজাত রাষ্ট্রের নৃ-জাতিগত বৈচিত্র্যের প্রতি সত্যিকারের সংবেদনশীলতাই এখানে মুখ্য বিষয়। এটা কিভাবে অস্বীকার করা যে, ভৌগোলিক দিক দিয়ে একে অপরের কাছাকাছি হলেও, সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চল সুদীর্ঘকাল ধরে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও আইনি শাসনের অধীনে ছিল। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র-র সভাপতি, প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

---

[৬২৪] নূহ-উল-আলম লেলিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

[৬২৫] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭

[৬২৬] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শওকত আরা হোসেন বক্তব্য: ১৯৯৭ এর শান্তিচুক্তির পূর্বে বাংলাদেশে সংবিধান প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে ১৩ বার সংশোধিত হয়েছে। এ ইস্যুতে সংশোধনের একটি মাত্রা সংযোজিত হলে বোধ হয় দেশের মঙ্গল হতো। ''শান্তির প্রত্যাশায়" *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭।

[৬২৭] Kamal Hossain, *Op. cit.*, p. 144.

[৬২৮] Lawrence Ziring, *Bangladesh: From Mujib to Ershad- An Interpretive Study*, p. 96.

যেমন বলেছেন, ''পার্বত্য এলাকার চিরদিনই একটা স্বতন্ত্র প্রশাসনিক মর্যাদা আছে এবং কিছুটা স্ব-শাসনের সুযোগও রয়েছে– যা বহুদিনের স্বীকৃত।[৬২৯] আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত আইন হলেই সর্বদা বর্জনীয় এমন বক্তব্যকে ইতিহাস ন্যায্যতা প্রদান করে না। ভারত ও পাকিস্তান তাদের সংবিধানে তফসিলি উপজাতি সংক্রান্ত ঔপনিবেশিক আমলের আইনই বহাল রেখেছে। পাকিস্তানের পাঠান উপজাতীয় এলাকাগুলো ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে।[৬৩০] সুতরাং সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১০ ভাষাভাষী ১৩ টি পাহাড়ি জাতিসত্তা সম্পর্কে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না রাখার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার উপমহাদেশের অন্য দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানের উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসন প্রদানের সাংবিধানিক ঐতিহ্য থেকে বিস্ময়করভাবে সরে আসলো।

তবে তৎকালীন পাহাড়ি নেতাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপনের সময়কাল, পরিস্থিতি ও কৌশলগত দিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। জাতীয় নেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারার পেছনে এসব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে শাসনতান্ত্রিক বাস্তবতা তাতে দুই ধরনের সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হিসেবে একটি কিন্তু এক জেলায় আবার তিনজন পাহাড়ি রাজা ও তাদের অধীনস্ত হেডম্যান ও কার্বারীদের শাসন অন্যদিকে একজন ডেপুটি কমিশনার ও রাঙামাটি, রামগড় ও বান্দরবান তিন মহকুমায় তিনজন মহকুমা প্রশাসকের শাসন। সারাদেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাতন্ত্র্য এই জায়গায়। পিয়েরে বেসাইনের মতে, "It is the juxtaposition of these two, which marks the peculiarity of the Hill Tracts''[৬৩১]

আন্তঃগোত্রীয় প্রশাসনে সমরূপতা থাকলেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা, শিক্ষাদীক্ষার স্তর, অর্থনৈতিক অবস্থা, বাসস্থানের ভৌগোলিক বিক্ষিপ্ত অবস্থিতি এমনকি রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার স্তরভেদে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের লেখায় এ দিকটা যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে, ''যে-তেরোটি উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করেন, তাঁরা সবাই সমানসংখ্যক যেমন নন, তেমনি সমান অগ্রসরও নন; এবং সবাই একাত্মও নন। তাদের সমাজ স্তরে স্তরে বিন্যাস্ত।''[৬৩২] সুতরাং সেখানে পৃথক আইনসভাসমেত স্বায়ত্তশাসন প্রদান ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং তাদের নির্বাচনী

---

[৬২৯] আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের শান্তিচুক্তির প্রতিক্রিয়া, *আজকের কাগজ* ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭, উদ্ধৃত– জুম পাহাড়ে শান্তির ঝরণা ধারা, পৃ. ২২১।

[৬৩০] এ প্রসঙ্গে শাহরিয়ার কবির লিখেছেন, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত ছিল উপজাতি অধ্যুষিত, যারা ব্রিটিশ আমলে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। পাকিস্তান হওয়ার পর সরকার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিদের স্বায়ত্তশাসন বহাল রেখেছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ উত্তর-পশ্চিমের বাসিন্দারা উপজাতি হলেও তারা ধর্মীয় পরিচয়ে ছিল মুসলিম আর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দারা ছিল অমুসলিম।– 'শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭। আরও দেখুন– পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন প্রতিবেদন, ২০০১, *জীবন আমাদের নয়,* পৃ. ২৫।

[৬৩১] Prof. Pierre Bessaignet, *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts,* p. 20.

[৬৩২] হুমায়ুন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

এলাকার এখতিয়ার নির্ধারণসহ সবকিছু নিয়ে একটি জটিল প্রক্রিয়া।[৬৩৩] ১৯৯০ সালে প্রকাশিত *দ্য মেইনস্ট্রীম (মূলধারা)* ম্যাগাজিনে জুম বিজয় চাকমা পার্থ তাঁর ''পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন: অতৎপর–" শীর্ষক নিবন্ধে এ ধরনের জটিলতা তুলে ধরেন। তিনি জেলা পরিষদের কিছু ত্রুটি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,

> ৪ নং ধারা (২ উপধারা) অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যরা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হবেন। এই বিধিটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। ধরা যাক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ত্রিপুরাদের নির্ধারিত একটি আসনে 'ক' ত্রিপুরাকে ত্রিপুরা সম্প্রদায় মনে তাদের উপযুক্ত নেতা, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সম্প্রদায় ইচ্ছে করলে 'ক' ত্রিপুরাকে নির্বাচিত করতে ব্যর্থ হবে। ধরা যাক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ভোটার সংখ্যা ২,০০০ জন। সমগ্র রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ভোটার সংখ্যা ৫০,০০০ জন। সেই ক্ষেত্রে 'ক' ত্রিপুরার ভাগ্য নির্ধারিত হবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভোটের উপর। এই ব্যখ্যা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তদুপরি এই জেলা পরিষদের ৩০ জন সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো নির্বাচনী এলাকা না থাকায় একই জায়গা বা পরিবার থেকে সমস্ত আসন দখল করার সুযোগ রয়েছে।[৬৩৪]

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গেছে ব্রিটিশ আমলে বঙ্গীয় আইনসভা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে আইনপরিষদ পরিচালনায় পূর্বাভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ছিল না বললেই চলে। যেকোনো সমাজ ও সম্প্রদায়ে রাজনৈতিক উন্নয়নও হয় বিবর্তন প্রক্রিয়ার মতো ধাপে ধাপে। পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সামনে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে পাহাড়িদের ভূমিকা সম্পর্কে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে পরিস্কার ধারণা ছিল না। অধ্যাপক আনিসুজ্জমান যেমন বলেছেন "আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পাহাড়িদের অংশগ্রহণের কথা তখনো তেমন জানা ছিল না।"[৬৩৫] তার কারণ প্রথমত, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যেসকল পাহাড়ি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সবাইকে সমবেত করে পাহাড়িদের কর্মপন্থা সম্পর্কে মতৈক্য স্থাপন করা হয়নি। যার ফলে একই এলাকা থেকে পৃথক দুটি প্রতিনিধি দল দেখা করেছে। দ্বিতীয়ত, দাবি উত্থাপনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রীসহ জাতীয় নেতৃত্বের সকাশে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে মুক্তিযুদ্ধে পাহাড়িদের অংশগ্রহণ, অনেক পাহাড়ির আত্মদান, ক্ষয়ক্ষতিসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা সবিস্তারে তুলে ধরা হয়নি। তৃতীয়ত, স্বায়ত্তশাসন এবং পৃথক আইনপরিষদের মতো বিশাল দাবি উত্থাপনের প্রাক্কালে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এসব বিষয়ে কোনো প্রাথমিক আলোচনা, বৈঠক বা সংলাপও হয়নি।

---

[৬৩৩] যে কারণে ১৯৮৯ সালে জুন মাসে প্রবল বাধাবিঘ্ন ও জোর জবরদস্তিপূর্ণ প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হলেও দ্বিতীয়বার নির্বাচন দেওয়া যায়নি।

[৬৩৪] জুম বিজয় চাকমা পার্থ, ''পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন: অতৎপর–" *The Mainstream BOI SA BI' 90* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশনা, ১৯৯০), পৃ. ৫-২৩।

[৬৩৫] আনিসুজ্জমান, "একই দেশের অন্নে লালিত" নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পা.) *পার্বত্য চট্টগ্রাম*, পৃ. ১৫।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পৃথক আইন পরিষদসহ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন রাজনৈতিক বিবর্তনের ধাপ থেকে উল্লম্ফনের সামিল। এতে বঙ্গবন্ধুসহ সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মনে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে নঞর্থক ধারণা গাঢ় হয়। কারণ উভয় প্রতিনিধিদলের অধিকাংশ সদস্যবৃন্দের মুক্তিযুদ্ধে জোরালো ভূমিকা পালনের রেকর্ড ছিল না। পরিণামে মং রাজা মং প্রু সাইন, অশোক মিত্র কার্বারী, উক্য চিং বীর বিক্রম, প্রভুধন চৌধুরী, বিখ্যাত ফুটবলার চিংহ্লা মং মারি, রণ বিক্রম ত্রিপুরা, হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরাসহ অসংখ্য পাহাড়ি মুক্তিযোদ্ধার শ্লাঘনীয় ভূমিকাও অনেকটা আড়াল হয়ে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আইনপরিষদসহ স্বায়ত্তশাসন ও আমলাতন্ত্র বা নির্বাহী পরিষদ পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকবল পাহাড়িদের মধ্যে ছিল কিনা তাও বিবেচ্য। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রথমবার আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোয় প্রবেশ করলেও এই জেলা কখনো বঙ্গীয় আইনসভায় প্রণীত আইন দ্বারা শাসিত হয়নি। ফলে জেলার লোকজনও গোটা ব্রিটিশ আমলে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা আইন প্রণয়নের অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়নি। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৪-র নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ আসন থেকে নির্বাচিত প্রাক্তন এমএলএ কামিনী দেওয়ান বার্ধক্যে ন্যূব্জ। ওই নির্বাচনে নির্বাচিত আরেকজন এমএলএ বি. কে. রোয়াজার বছরখানেক অভিজ্ঞতা ছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সত্তরের নির্বাচনে জয়ী হলেও বাহাত্তর সালে সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদের অধিবেশন বসার আগ পর্যন্ত আইনসভায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাননি। অন্যদিকে বাষট্টির মৌলিক গণতন্ত্রের যুগে নির্বাচিত এমএলএ ত্রিদিব রায় ও অং শৈ প্রু চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাদের নেতিবাচক ভূমিকার কারণে বাংলাদেশে তখন অপাঙতেয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। পৃথক প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার মতো জনবল ছিল অপ্রতুল। মাঠপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে শরদিন্দু শেখর চাকমা (এনডিসি), চিত্তরঞ্জন চাকমা (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট), তারাচরণ চাকমা (ম্যাজিস্ট্রেট), যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা (ম্যাজিস্ট্রেট) বিপুলেশ্বর দেওয়ান (নোয়াখালীর ইনস্পেক্টর থেকে রাঙামাটির এসপি), ত্রিপুরা কান্তি চাকমা (এসডিপিও), প্রকৌশলী অমলেন্দু বিকাশ চাকমা প্রমুখ গুটিকয়েক কর্মকর্তা ছিলেন।[৬৩৬] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সেসময় পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে চাকমা অটোনমাস ডিসট্রিক্ট কাউন্সিলের কর্মকাণ্ডও আশাব্যঞ্জক ছিল না। এখানে বলা অসমীচীন নয় যে, ভারতীয় সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২ এপ্রিলে ভারতের মিজোরামে গঠিত চাকমা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। ঐ জেলা পরিষদের নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব ও অসহনশীলতার কারণে নির্বাহী পরিষদকে এত ঘন ঘন গঠন ও পুনর্গঠন করতে হয়েছিল যে তাদের

---

[৬৩৬] সাক্ষাৎকার: দেবদত্ত খীসা, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব। তবলছড়ি, তাং ০১/৫/২০১৮।

প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়েছিল। এস পি তালুকদারের নিম্নের বর্ণনা থেকে যা কিছুটা আঁচ করা যায়।

> The Council by and by became a byword of mismanagement and finally government appointed a one man Commission ... to enquire as to whether the administration of the District Council was carried on in accordance with the provisions of the Sixth Schedule of the Constitution of India. The Commission duly completed its enquiry into the various allegations and in its report it was pointed out that the administration in the District Council neglected the observance of the financial rules and regulations and official procedures and had failed to carry on the administration in conformity with the provisions of the Sixth Schedule of the Constitution.[৬৩৭]

মিজোরামে ওই জেলায় চাকমারা ছাড়া অন্য জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা নগণ্য (চাকমা ২৫,০০০, মিজো ২,০০০ রিয়াং ২,৫০০ এবং বাঙালি ৫০০[৬৩৮]) তারপরও সেখানে এমন চিত্র দৃশ্যমান। সে তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতিগত, মতাদর্শগত, শ্রেণিগত, ভাষা ও সংস্কৃতিগত হিসাব নিকাশ বেশ জটিল যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত টেনে আনার অর্থ এই নয় যে এখানে পাহাড়িদের আইনসভা পরিচালনার অনভিজ্ঞতার জন্য তাদের স্বায়ত্তশাসন দাবির যৌক্তিকতাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। মূল বিষয় হলো দাবি উত্থাপনের সময়কার দেশের পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট এলাকার উপরিকাঠামোগত বাস্তবতা অনুধাবনের প্রয়াস।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে চিন্তাশীল বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজের মধ্যে এ ধারণা প্রচলিত যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে এবং অস্থির পরিস্থিতির সময়ে পৃথক আইন পরিষদসহ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন ছিল সময়ের বিবেচনায় একটি অসময়োচিত পদক্ষেপ। অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর একটি গ্রন্থে এমন ধারণার অবতারণা করেছেন:

> For the sake of objectivity, however, it should be admitted that the problem almost burst upon the government of Bangladesh at a time when it was preoccupied with the most pressing business of putting the house in order after a nine month long sanguinary war of liberation. As this business proved difficult and time-comsuming the Government of Bangladesh's response evolved slowly.[৬৩৯]

---

৬৩৭ S P Talukdar, *The Chakmas: Life and Struggle* (New Delhi: Gian Publishing House, 1988), p. 64.

৬৩৮ Sabyasachi Basu Ray Chaudhury and Ashis K. Biswas, 'A Diaspora is Made: the Jummas in the North-East India' in Subir Bhaumik at el. (eds.) *Living on the Edge: Essays on the Chittagong Hill Tracts* (Calcutta: South Asia Forum for Human Rights, Kathmandu, 1997), p. 158.

৬৩৯ Syed Anwar Husain, *War and Peace in the Chittagong Hill Tracts: Restrospect and Prospect*, p. 32.

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত সাবেক কূটনীতিক ফারুক চৌধুরীর অভিমত হলো:

> এই দাবিনামাটি (চার দফা) বাংলাদেশের যাত্রারম্ভের সমস্যা সংকুল সেই অনিশ্চয়তায় ভরা দিনগুলোতে সেই ভাব ও ভাষায় পেশ করা হয়তো বা সঙ্গত ছিল না। নব গঠিত সরকারের সামনে তখন ছিল বহুবিধ জরুরি সমস্যা। আর অবশ্যই ছিল উপজাতীয় সমস্যার গুরুত্ব এবং কারণ সম্বন্ধে যথার্থ উপলব্ধির অভাব, যার জন্য বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে কোনো বিশেষ ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।[৬৪০]

১৯৭২ সালে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মীর প্রত্যবেক্ষণ মতে বাহাত্তরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রই ছিল দেশি বিদেশি বহুমূখী সমস্যা, সংকট ও ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণাবতে আবর্তিত ধ্বংসস্তুপ।[৬৪১] প্রখ্যাত সাংবাদিক এ্যান্থনী মাসকারেনহাসের বর্ণনায়, ''পাকিস্তানি হায়েনাদের হিংস্র থাবার চরম আক্রোশে দেশটি একটি বধ্যভূমি আর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল।''[৬৪২] পাশবিক, বর্বর অত্যাচারের ভেতর থেকে জন্ম নেয়া একদেশ বাংলাদেশ।[৬৪৩]

এছাড়া রাষ্ট্রের কর্ণধার বঙ্গবন্ধু থেকে সংবিধান প্রণয়নে সম্পৃক্ত কোনো রাজনীতিকেরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। বাহাত্তরে প্রণীতব্য বাংলাদেশের সংবিধান বাংলা ভাষান্তরের কাজে নিযুক্ত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,

> বাংলাদেশ গণপরিষদে ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি যখন সেখানকার জনসমষ্টির স্বাতন্ত্র্যের কথা ঘোষণা করছিলেন, তখন আমরা অনেকেই চমকিত হয়েছিলাম। তার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে, পাকিস্তানের ২৪ বছরে যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবধারা ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হচ্ছিল, তখন পাহাড়ি জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য বা আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের দাবি শোনা যায়নি। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধকালীন নিপীড়ন ও সংগ্রামের শেষে স্বাধীনতা লাভ করে আমরা তখন এমনই আত্মহারা যে, বাংলাদেশকে সমজাতীয় জনসাধারণের দেশ বলে ধরে নিয়েছি,এখানে যে আরো অনেক জাতিসত্তার বাস, তারা যে স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র হয়ে বিকশিত হওয়ার অধিকার যে তাদের আছে– একথা আমরা ভাবিনি। তৃতীয়ত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পাহাড়িদের অংশগ্রহণের কথা তখনো তেমন জানা ছিল না, অধিকন্তু ১৯৭২ সালেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ বিরোধী শক্তি আত্মগোপন করেছিল, তাদের তৎপরতাও বন্ধ ছিল না। ফলে পাহাড়িদের ন্যায্য দাবিও তখন বাংলাদেশ-বিরোধিতার আরেক রূপ বলে গণ্য হয়।[৬৪৪]

---

৬৪০ ফারুক চৌধুরী, ''শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ: বাংলার অশান্ত অগ্নিকোণ (২)'' *ভোরের কাগজ*, ৯ মার্চ ১৯৯৭।

৬৪১ ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশ-পাকিস্তান সর্ম্পক, ১৯৭১-১৯৭৫" আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ সেলিম (সম্পা.) *বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২০১৫), পৃ. ২৩-৬৭।

৬৪২ তিনি আরও লিখেছেন, দোকান পাটে ছিল না খাদ্য কিংবা জীবন রক্ষাকারী কোনো ঔষুধ। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট আর চা শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী দেশের এককোটি শরণার্থী ফিরে আসতে শুরু করল। তাছাড়া দেশের ভেতরে প্রায় দুকোটি লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। যানবাহন রাস্তাঘাট ফেরী, সেতু ইত্যাদি চরমভাবে ধ্বংস করে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বিকল ও স্থবির করে দেয়া হয়েছিল। পৃ. ২৩।

৬৪৩ মিহির মৈত্র, *শেখ মুজিবের বাংলাদেশ (প্রত্যক্ষদর্শীর ডায়েরি থেকে ১৯৭২-১৯৭৬)* (কলকাতা: রচয়িতা প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৫২।

৬৪৪ আনিসুজ্জামান, ''একই দেশের অন্নে লালিত'' *প্রাগুক্ত।*

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষতো দূরের কথা দেশের সবচেয়ে অগ্রসর, এলেমদার নাগরিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরাও পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে খুব কম খবর রাখতেন। এমনকি স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক পরে সরেজমিনে পরিদর্শন করে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ যে বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে চাকমাদের সম্পর্কে বাঙালিদের অপরিজ্ঞাততার চিত্রই ফুটে উঠে। ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের কয়েক মাস পূর্বে বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর আমন্ত্রণে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরে দেখার পর হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন,

> পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী কারা? আমরা এটুকু জানি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী উপজাতীয়রা, যাঁরা নিজেদের 'উপজাতি' বলতে পছন্দ করেন না, বলেন 'জাতি'; আর এ-উপজাতীয়রা কারা? সমতলের আমরা এটুকু জানি যে এরা চাকমা। একটা বড়ো ভুল ঢুকে আছে আমাদের ভেতরে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয়দের, আর ওই উপজাতীয়রা চাকমা; অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম চাকমাদের। এটা একটা বড়ো ভুল; সেখানে শুধু চাকমারা নেই, ওই পাহাড়গুলো শুধু চাকমাদের নয়, ওই পাহাড়গুলোতে আছে আরো বারটি উপজাতি: মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চঙ্গ্যা, বৌম, পাংখু, খুমি, উসাই,, খিয়াং, চাক, লুসাই, রিয়াং।[৬৪৫]

বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফা এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সারা বাংলাদেশ সফর করলেও তিয়াত্তরের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন নি। সুতরাং কোনো ধরনের সংলাপ ও জনমত গঠন ব্যতীত একটি জেলার জন্য পৃথক আইনসভার ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যেকোনো শিশু রাষ্ট্রের জন্য ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সাম্প্রতিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ১৯৮৯ সালে এরশাদ সরকারের আমলে শুধু তিনটি পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ যা বর্তমানে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে পরিচিত সেগুলোর রূপরেখা প্রণয়নের জন্য পাহাড়ি সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় কমিটির পৃথক পৃথকভাবে ১২টি বৈঠক করতে হয়। ওই স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা পাহাড়িদের অনমনীয় অংশ অর্থাৎ শান্তিবাহিনী প্রত্যাখান করেছে অগণতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন ও ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করে। আর এটা সুবিদিত যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের জন্য সংলাপ করতে হয়েছিল মোট ২৬ বার।

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র রচনাকারী ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী মুজিবনগর সরকারের নীতি ও চিন্তাভাবনায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের ভিতর আরেকটি দেশ গড়ার কথা ছিল না যেমনটি ছিল না সংবিধান প্রণেতাদের ভাবনায়।[৬৪৬] আরো গুরুত্বপূর্ণ যে গভীর ও নিখুঁত বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা

---

[৬৪৫] হুমায়ুন আজাদ, ***পার্বত্য চট্টগ্রাম:*** *সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা*, পৃ. ১৪-১৫।

[৬৪৬] প্রয়াত অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন: ''মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যে-দাবিগুলো পেশ করেছিলেন সংবিধান প্রণেতাদের কাছে, সেগুলো সত্যিই মানার মতো ছিলো না, তাতে বাংলাদেশের ভেতরে সৃষ্টি হয়ে যেতো স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বা জুম্মদেশ বা জুম্মল্যান্ড– যেমন চায় শান্তিবাহিনী।'' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

অধ্যুষিত অঞ্চলকে পৃথক আইন পরিষদসহ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পরিণামে রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তঃউপজাতি/আন্তঃপার্টি/ আন্তঃসাম্প্রদায়িক ক্ষমতার লড়াইজনিত দ্বন্দ্বমুখর অসহিষ্ণু ও অস্থির পরিস্থিতি উদ্রেক ঘটার ঝুঁকি ছিল। যেরকম ভয়ংকর ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত চলমান রয়েছে সাতানব্বইয়ের শান্তিচুক্তির পর। ড. আনিসুজ্জামানের মতো আলোকিত বুদ্ধিজীবীও তেমনই আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন।

> We were so happy and contended at the near homogeneity of our linguistic and cultural miliu that most of us were completely taken by surprise when fellow citizens from the hill areas claimed that they were different from the Bengalees. In order to achieve their demands for political autonomy and for recognition of separate cultural identity, the hillsmen of Bangladesh, who belong to at least 13 tribes having distinct ways of life, now claim themselves to be a nation. In the event of their success, the possibility of which seems to be remote at the moment, the separateness of each of the ethnic groups, I am sure, will surface.[৬৪৭]

পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন সিনিয়র আইনজীবী ও লেখকের পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রসঙ্গে মূল্যায়নও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "কোনো কোনো ক্ষুদ্র উপজাতির মতে অখণ্ড পার্বত্য অঞ্চল মানেই একটি বিশেষ উপজাতি কর্তৃক অন্যান্য উপজাতিগুলির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এই একটি বিশেষ উপজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশংকায় শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অর্জনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।"[৬৪৮] তবে আদিবাসী, উপজাতি বা নৃ-গোষ্ঠীগুলোর স্বতন্ত্র জাতিগত পরিচিতির সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি সেই তুলনায় ন্যায়সঙ্গত দাবি করতে পারে।[৬৪৯]

পাহাড়ি নেতাদের উত্থাপিত দুই নম্বর দাবি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হলেও ১৯৭৩ সালে জুনে বঙ্গবন্ধুর নির্বাহী আদেশে ১৯০০ সালের হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল বলবৎ রাখার নির্বাহী আদেশ জারি হয়। এর দ্বারা তিন সার্কেল চিফের পরম্পরাগত দপ্তর ও শাসন সুরক্ষিত হয়। এছাড়া চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় বঙ্গবন্ধুর ডাকে[৬৫০] স্বদেশে ফিরে না আসা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু তাঁর নাবালক ছেলেকে নতুন চাকমা রাজা এবং ১৯৭৩

---

[৬৪৭] Anisuzzaman, *Cultural Pluralism,* p. 18.

[৬৪৮] জে. বি চাকমা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯০এ

[৬৪৯] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, তারিখ, ৬/৯/২০১৭ স্থান : ডিসি বাংলোস্থ নিজ বাসা, জনাব গৌতম দেওয়ান, প্রাক্তন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান, তৎকালীন জেলা সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা।

[৬৫০] S. A Karim wrote: In the autumn of 1972, when Tridiv Roy, Chief of the Chakma tribe, was sent to New York as the leader of the Pakistan delegation to the United Nations, General Assembly, Mujib asked Roy's mother to go to the United States to persuade him to renounce his association with Pakistan and come back to Bangladesh. I{S. A. Karim} was also instructed him to contact him and try to entice him to his homeland by offfering an unspecified high position. He agreed to meet me for lunch. He obviously did so with knowledge of his superiors in Pakistan. For while he remained uncommitted on the offer made to him, he tried to probe our intentions in regard to Pakistani POWs and outlook for relations with Bangladesh. ... After this abortive

এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ত্রিদিব রায়ের ভাই কুমার সমিত রায়কে রিজেন্ট ও রাঙামাটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেন। এ ঘটনা বঙ্গবন্ধুর অসম্ভব রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অপার মহানুভবতার পরিচায়ক। কারণ এর দ্বারা পুরো চাকমা রাজপরিবারকে একটি অনিশ্চিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু।

চার নম্বর দাবিটি অস্পষ্ট। যেখানে বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন বা সংশোধন যেন না করা হয় এরূপ সংবিধি শাসনতন্ত্রে থাকবে। এই দাবি দ্বারা হয়তো বুঝানো হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন পরিষদের সাথে আলোচনা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না।

উপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান যে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের উত্থাপিত দাবির বাস্তবায়নযোগ্য অধিকাংশ দাবি বঙ্গবন্ধুর আমলেই বাস্তবায়িত হয়।

কিন্তু বাংলাদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকরা জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের গণপরিষদ সংবিধানে বাংলাভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষার প্রতি রাষ্ট্রের ভূমিকাটি গৌণ হয়ে যায়। বাংলাভাষা বাংলাদেশের অফিসিয়াল ভাষা হোক এতে কারো দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই। কিন্তু এটি 'উপেক্ষিত সত্য' যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক সীমার মধ্যে সংখ্যাল্প হলেও গারো, সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মনিপুরি, খাসিয়াসহ ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জনযুদ্ধে তাঁদেরও রক্তস্নাত অবদান সুবিদিত। মুজিবনগর সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারি এইচ টি ইমাম ২০০৪ সালে লিখেছেন,

> উপজাতিদের অনেকেই আমাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন মানিকছড়ির মং রাজা। তিনি সরাসরি মীর শওকত আলীকে মার্চে-এপ্রিল মাসে সহযোগিতা করেন। পরবর্তীকালে ভারতে আশ্রয় নেবার পর সরকার তাঁর জন্য বিশেষভাতা মঞ্জুর করেন। তিনি পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ঘুরে ঘুরে উপজাতিদের মধ্যে আমাদের প্রচার কাজ চালাতেন। বরেণ ত্রিপুরার কথা আগেই বলেছি। চাকমাদের একটা বিরাট অংশ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বেশ কিছু চাকমা-ত্রিপুরা যুবক ছিলেন। কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। মেজর রফিক (বীর উত্তম) তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে চাকমাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত ফুটবলার মারির উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন তিনি।[৬৫১]

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতায় সারা দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর গৌরবময় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষাগুলোর প্রতি রাষ্ট্রীয় নীতি কী হবে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতারা সংবিধান প্রণয়নের সময়

---

attempt to entice Tridiv Roy, Mujib seems to have neglect to allay the fears and anxieties of the tribal people of the CHT. See ----, *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*, p.312.

[৬৫১] এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ৪৬।

সেটিও স্পষ্ট করেনি। এতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও আত্মোৎসর্গকারী সমতলের আদিবাসী ও পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের ভাষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ মাতৃভাষা প্রসঙ্গে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনে কালে সহ্য করে নাই।"[৬৫২] ১৯৪৮-৫২ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ লোকের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দুর্বার আন্দোলনে তিনি ছিলেন গর্বিত সংগঠক। অথচ কী বেদনাদায়ক যে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষাগুলোকে রাষ্ট্রানুকুল্য লাভ থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। এভাবে সংবিধান পরিষদ কর্তৃক একদিকে রাষ্ট্রের মধ্যে একটি জাতির তথা বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা প্রদান অন্যদিকে অন্য ভাষাগুলোর ব্যাপারে সংবিধানের নীরবতা ও রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের 'ভদ্রোচিত উদাসীনতা' জাতিসত্তাগুলোর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করা বা অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার সামিল। দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা একটি গর্ব করার মতো অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভাষা। বাংলাদেশের অবাংলাভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীগুলোর জন্যও পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও যোগাযোগের জন্য বাংলাভাষা জানা ও শেখা অপরিহার্য। কিন্তু তাদের নিজস্ব লোকসাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য তাদের মাতৃভাষার অন্দরেই গ্রোথিত।

বাহাত্তরের সংবিধানে বাংলাদেশের বাঙালি ব্যতীত অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষদের নিকট আরও একটি অশ্লাঘনীয়, অপরিচেয় ধারা হলো বাংলাদেশের সকল নাগরিককে বাঙালি হিসেবে পরিচিতকরণ। এটি স্বীকার্য যে-বাঙালি জাতীয়তাবাদ মুক্তিসংগ্রামে অফুরন্ত প্রেরণা ও অদম্য শক্তি যুগিয়েছে ভাবাদর্শ হিসেবে বাঙালির অন্তরে সেটি ছিল। বাংলাদেশের সিংহভাগ জনগণ বাঙালি সেটি শুধু ১৯৭১-এ নয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. অতুল সুরের মতে, ভূখণ্ড হিসেবে বাংলা ও অধিবাসী হিসেবে বাঙালির অস্তিত্ব প্লাইওসিন যুগ থেকে এবং সেই বাংলা বর্তমানের পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশকেও নির্দেশ করে। আর বাংলা ভাষার আদিযুগের সময়কাল ৯৫০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ।[৬৫৩] নৃ-তাত্ত্বিক জাতি হিসেবে বাঙালি হাজার বছরের প্রাচীন যেমনি প্রাচীন তার মুখের ভাষাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লরেন্স জাইরিং এর ভাষায়,``The Bengalis were a community prior to their demand for self-deternination.''[৬৫৪] ১৯৭১ সালে হাজার বছরের প্রাচীন বাঙালি জাতি অধ্যুষিত একটি ভূখণ্ডের মানুষ বাংলাদেশ নামে একটি আধুনিক স্বাধীন সার্বভৌম

---

[৬৫২] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৯৯।

[৬৫৩] ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন* (কলিকাতা: সাহিত্যলোক, ১ম প্র. ১৯৮৬, ২য় সং, ১৯৯৪), পৃ. ৫৬ ও ১৭৬।

[৬৫৪] Lawrence Ziring, *প্রাগুক্ত*, p. 2.

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। বাঙালি জাতির মর্যাদা নৃতাত্ত্বিক জাতি থেকে রাজনৈতিক জাতিত্বে (পলিটিক্যাল ন্যাশনহুড) উন্নীত হয়।

বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনীতিকরা রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি হিসেবে ব্রিটেনের ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গ্রহণ করেছিল। কিন্তু জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ জাতীয়তা বা সিটিজেনশিপের ধারণা অনুসৃত হয়নি। ব্রিটেনে ইংরেজ, আইরিশ এবং স্কটিশ তিন জাতির লোক আছে যদিও ইংরেজপ্রাধান্য সুস্পষ্ট, তথাপি তাদের নাগরিক পরিচয় ইংলিশ নয়; ব্রিটেনের নাগরিক ব্রিটিশ। এপার ও ওপার বাংলার অনেক বাঙালি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে সেদেশে আছে কিন্তু তাদের নাগরিকত্ব ইংরেজ হয়নি, হয়েছে ব্রিটিশ। সুতরাং বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে একটি স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্রের ভূ-সীমানাভুক্ত সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় পরিচিতি ঐ দেশের ভৌগোলিক সীমা নির্দেশক হওয়াটাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবসম্মত। এবং তাতেই রাষ্ট্রের বিমূর্ততা, নিরপেক্ষতা স্পষ্ট হয়, সংহতি সুদৃঢ় হয় ও জাতীয় চরিত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে ওঠে। এমনটা হলে রাষ্ট্রের স্থান এথনিসিটি বা জাতিকতার উর্ধ্বে সংস্থাপিত হয়। সকল নাগরিকদের নিকট রাষ্ট্র নৈতিকভাবে বলীয়ান ও রাজনৈতিকভাবে টেকসই হয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধু পরিবারের ঘনিষ্ট সদস্য বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার স্পষ্ট জানা আছে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করেছিল যে, স্বাধীন বাংলাদেশের মূল রাষ্ট্রীয় নীতি হবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। পাকিস্তান থেকে মুক্তিপেয়ে বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি দিল্লিতে, এমনকি রেসকোর্স ময়দানের জনসভার ভাষণেও অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেন– আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু এর মাত্র তিনদিন পর ১৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র– এ চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হবে বলে ঘোষণা করেন। এদিন বঙ্গবন্ধুর "জাতীয়তাবাদ"– এই নীতিকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[৬৫৫] ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জমান তাঁর আত্মজীবনী *বিপুলা পৃথিবী* শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, "{১৯৭২-এর}ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখে রাষ্ট্রীয় সফরে বঙ্গবন্ধু গেলেন কলকাতায়।... কলকাতার জনসভায় প্রদত্ত বতৃতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে জাতীয়তাবাদ কথাটা যোগ করলেন তিনি।"[৬৫৬] উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''আমি আপনাদের আশ্বাস দিবার পারি যে বাংলাদেশ চারটি স্তম্ভের উপর চলবে, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এর

[৬৫৫] ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা* (ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯২), পৃ. ১২৪।
[৬৫৬] আনিসুজ্জামান, *বিপুলা পৃথিবী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ৪র্থ মুদ্রণ ২০১৭, প্রথম প্রকাশ ২০১৫), পৃ. ৩১।

মধ্যে কোন কিন্তু-ফিন্তু নাই। এর মধ্যে কেউ হাত লাগাতে পারবে না।"[৬৫৭] রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রযুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে আরেকজন ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বিশ্লেষণটি বেশ মননশীল:

> শুরুতে যুদ্ধকালে, মূলনীতি ছিল তিনটি: ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। এদের কেউই ভুঁইফোড় নয়। আকাশ থেকেও পড়েনি। কোনো ষড়যন্ত্রের কারণে কিংবা করুণার পথ ধরে আবির্ভূত হয়নি। তাদের আসাটা ছিল যেমন অনিবার্য, তেমন স্বাভাবিক। ... জাতীয়তাবাদ যুক্ত হয়েছে যুদ্ধজয়ের পরে। সংযোজনটা জাতীয়তাবাদীরাই করেছেন। আগে যে করেননি, সেটা হয়তো প্রয়োজন মনে করেননি বলেই। কেননা যুদ্ধটা তো আত্মস্বীকৃত ও ঘোষিত রূপেই ছিল জাতীয়তাবাদী। কিন্তু মূলনীতির তালিকায় পরে যে জাতীয়তাবাদকে যুক্ত করলেন, তার পেছনে তাড়নাটি কী ছিল? সেটা কি এই যে, নিজেদের এই মর্মে আশ্বস্ত করাটা দরকার পড়েছিল যে তাঁরা জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্যুত হবেন না? নাকি অন্য তিনটি মূলনীতিকে নিয়ে তাঁদের অস্বস্তি ছিল, সেগুলো যাতে জাতীয়তাবাদকে অভিভূত করে না ফেলে তার জন্যই জোরেশোরে জানিয়ে দেওয়া যে, জাতীয়তাবাদ আছে এবং থাকবে?[৬৫৮]

কিন্তু স্বাধীনতার পর সংবিধান প্রণয়নের সময় ঠিকই ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র– এ তিনটি নীতির সাথে জুড়ে দেওয়া হয় {বাঙালি}জাতীয়তাবাদ। এ প্রক্রিয়ায় বাঙালি রাজনৈতিক এলিটদের ভাবাবেগের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিসত্তা ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক করার পথ নিষ্কণ্টক করার প্রবণতা প্রধান্য পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ভেলাম ভ্যান সেন্ডেলের বিশ্লেষণও এমন আভাস প্রদান করে:

> After 1971, however, Bengali nationalism was quickly appropriated by the new Bangladeshi state elite which found nationalist phraseology useful to legitimise its power and policies, discredit its critics as unpatriotic, and disciplines the ælower orders." . . . As nationalism became an ideological tool in the hands of a state elite which was soon widely considered to be self-serving, nationalism showed its other face, that of conservatism, protection of vested interests and repressive violence.[৬৫৯]

কিন্তু মূল সংবিধান-বিলে প্রস্তাবিত ৬ নং অনুচ্ছেদের সাথে অনুক্ত 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন' বাক্যটি সংশোধনী হিসেবে যুক্ত করার প্রস্তাবে গণপরিষদের সদস্যদের সমর্থনদান ছিল আবেগতাড়িত, বলা যায় 'অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন'। আবেগতাড়িত এজন্য যে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ জাতির শ্রেষ্ঠ

---

[৬৫৭] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং সংগ্রামী জীবন* (ঢাকা: সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১১), পৃ. ৩১০।

[৬৫৮] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ''রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির অগ্রপশ্চাৎ,'' স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, *প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০১৭।

[৬৫৯] Willem van Schendel, ''Bengalis, Bangladeshis and Others: Chakma Visions of a Pluralist Bangladesh" in Rounaq Jahan Edited, *Bangladesh: Promise and Performance* (Dhaka: The University Press Ltd. 2nd Imp, 2002), pp. 65-105.

সন্তানদের রক্তের দাগ তখনো শুকায়নি। ড. কামাল হোসেনের ভাষায়, ''The wounds of the liberation struggle were still fresh, and the agonies suffered by the entire nation were keenly felt."[৬৬০] তৎকালীন শিল্প মন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলামের বক্তব্য আরো আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরা। গণপরিষদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, "সামগ্রিকভাবে আমরা বাঙালি জাতি এবং বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা হচ্ছি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান- ঐক্যবদ্ধ শক্তি– যার বলে আমরা বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি আশা করি, এই ঐক্য, এই জাতীয়তাবাদ বিনষ্ট করার জন্য কেউ প্রচেষ্টা চালাবেন না। যদি চালান, তাহলে সারা জাতির অন্তরে ব্যাথা দেওয়া হবে।"[৬৬১]

অবর্ণনীয় দুঃখ, কষ্ট, গ্লানি ও ত্যাগ তিতীক্ষা স্বীকার করে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী প্রাণপণ মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভে বাঙালির ভাবাবেগের পারদ তখন আকাশচুম্বী। সেই ঐন্দ্রজালিক মুহূর্তে গণপরিষদের কোনো বাঙালি সদস্যের পক্ষে আবদুর রাজ্জাক ভুঁইয়ার আনীত উক্ত সংশোধনীকে সমর্থন না করে বিপক্ষে কথা বলা অনুকুল ছিল না। ফলশ্রুতিতে বাঙালি পরিচয়কে রাষ্ট্রীয় নাগরিক পরিচিতি হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব গণপরিষদে পাস হয়ে যায়। এভাবে দেশের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের ওপর বাঙালি রাষ্ট্রীয় পরিচয় আরোপিত হয় যার ফলে রাষ্ট্রের মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষ হলেও জাতি-নিরপেক্ষ হতে পারেনি। এ-পদক্ষেপে দেশের ভিতর একটি জাতি, একভাষা ও এক সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে সংবিধানসম্মত করা হয়। আমেনা মহসিন সাবলীল ভাষায় বলেছেন, 'ধর্মের পরিবর্তে ভাষা ও সংস্কৃতিই এখন আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে'।[৬৬২] বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনীকার এস এ করিমের পর্যবেক্ষণেও বাহাত্তরের সংবিধানে বাস্তবতাকে অস্বীকারের কথা পুর্নব্যক্ত হয়েছে,

> The constitution ignored a significant fact: the territory of Bangladesh also includes a compact geographical area along the border of Burma known as Chittagong Hill Tracts whose inhabitants do not share the language and culture of the Bengali majority of the new state. Since one of the state principles was socialism, and the other was democracy, it stood to reason that the cultural identity of the people of Chittagong Hill Tracts should have been respected by granting them some measure of autonomy or special status.[৬৬৩]

---

[৬৬০] Kamal Hossain, *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice*, p.138.

[৬৬১] মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা), *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম*, পৃ. ১৫৫।

[৬৬২] Amena Mohsin, *The Politics of Nationalism: The Case of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (Dhaka: Univerity Press Ltd, 2002), p. 61.

[৬৬৩] S A Karim, *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy* (Dhaka: The University Press Ltd. 2005), p. 303.

বাংলাদেশ সরকারের এহেন 'সহৃদয় উদাসীনতা' একই রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় পরিচিতি ও জাতিগত সংহতি প্রশ্নে দীর্ঘস্থায়ী সংকট সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবাংলাভাষী পাহাড়িদেরকে পৃথক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা অনুসন্ধানের পথে ঠেলে দেয়।[৬৬৪] মওদুদ আহমদের মতে, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ নৃ-তাত্ত্বিক জাতিকতাকে রাজনৈতিক জাতীয়তার সাথে মেশাতে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে নিয়ে প্রবল বির্তকের সুযোগ করে দেয়।[৬৬৫] সংবিধান-বিল বাংলাভাষ্য রচনার কাজে নিযুক্ত এবং সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে আহুত গণপরিষদ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অধ্যাপক আনিসুজ্জামান পরে তাঁর প্রৌঢ়ত্বে এসে স্বীকার করেছেন যে,

> পাহাড়িদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য যে সেদিন আমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হইনি, এ ছিল নিজেদের বড়োরকম এক ব্যর্থতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রেরণা পেয়েও যে পাহাড়ি জাতীয়তাবোধের বা চাকমা জাতীয়তাবোধের সূচনা হতে পারে, এ-কথা একবারও আমাদের মনে হয়নি। নিজেদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যে আমরা তখন বেশিদূর দেখতে পারছি না, মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরে অন্য কোনো জাতীয়তাবোধ স্বীকার করতে পারছি না, বরঞ্চ তাকে সন্দেহের চোখে দেখছি। ৬ অনুচ্ছেদের ওই ছোট্ট সংশোধনীকে উপলক্ষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতিত্বের সঙ্গে পাহাড়িদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার যে-বিরোধ সেদিন সূচিত হলো, তার ফল কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, তা এখন আমরা জানি।[৬৬৬]

বাংলাদেশের প্রথিতযশা কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের বক্তব্যেও একই সুর:

> ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময়ে পাহাড়িদের একমাত্র প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন, তাঁরা চাকমা, বাঙালি নন এবং বাঙালি হতেও চান না। তখন যদিও তিনি কেবল চাকমাদের হয়ে কথা বলেছিলেন, কিন্তু পরে সকল পাহাড়িরা একত্রে নিজেদের জুম্ম জাতি আখ্যা দিয়েছিল। পাহাড়িদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা সত্ত্বেও আমরা তাদের বাঙালি হয়ে যেতে বলেছিলাম। এ ছিল আমাদের ভাষাগত প্রায়-সমরূপতার ফল। পরে যখন বুঝলাম যে, পাহাড়িদের স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক।[৬৬৭]

যদিও বাঙালি জাতীয়তাবাদী বিশ্লেষকদের মতে, জন সংহতি সমিতি তথা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৩ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতির সমন্বয়ে 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ'- এর ধারণা হঠকারি এবং দেশের বাস্তবতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।[৬৬৮] রাষ্ট্র ও আদিবাসীদের মধ্যে এভাবে শুরুতেই ভাবনাগত, চেতনাগত ও আদর্শগত দূরত্ব সৃষ্টি হয় যার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত একমাত্র অ-আওয়ামী লীগ, স্বতন্ত্র গণপরিষদ সদস্য চাকমা বংশোদ্ভূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্তৃক সরকার ও সংবিধান পরিষদের

---

[৬৬৪] ibid, p. 58.
[৬৬৫] মওদুদ আহমদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, '' Here an attempt has been made to join the ethnic nationality with the political nationhood leaving a wide scope for controversy over the concept of `Bangalee nationalism.' Moudud Ahmed, *Era of Sheikh Mujib*, p. 114.
[৬৬৬] আনিসুজ্জামান, *বিপুলা পৃথিবী*, পৃ. ৫৯।
[৬৬৭] সেলিনা হোসেন, *পার্বত্যভূমির পথেপ্রান্তরে*, পৃ. ২২৩।
[৬৬৮] নূহ-উল-আলম লেনিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

অধিবেশনে নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি পরিচয় সংবিধানভুক্ত করার দাবি থেকে। এম এন লারমা গণপরিষদ অধিবেশনে বলেছিলেন:

> আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলাভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা, আমার বাপ, দাদা চৌদ্দ পুরুষ– কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি। ... আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।[৬৬৯]

স্বাধীন দেশের সূচনালগ্নে প্রণীত বহু আশা জাগানিয়া প্রথম সংবিধানে অবাংলাভাষী জাতিসত্তা অধ্যুষিত একটি অঞ্চলের জাতিগত পরিচিতির স্বীকৃতি দাবি করে লারমার মর্মস্পর্শী বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন এবং প্রতিবাদে গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন[৬৭০] ভবিষ্যতে সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর বা তিনি যে অঞ্চলের প্রতিনিধি সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়মতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে সন্দিহান করে তোলে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের জাতীয় মূলধারার রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসঙ্গটি বাংলাদেশ সরকারের নীতিতে পরিণত হয়।

৬.২ রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি

ক) ১৯৭৩ সালের নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি:

পাকিস্তান আমলে জাতীয় ও স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ চর্তুথ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ তারিখে

---

[৬৬৯] মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা) *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম*, পৃ. ১৫৩ ।

[৬৭০] স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই দ্বিতীয় গণপরিষদের অধিবেশন বসে মারীতে। এম. এ গুরমানীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। মাত্র কয়েকদিন এ অধিবেশন স্থায়ী হলেও এ সময়েই পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট হিসেবে পরিণত করে একটি বিল পাস করা হয় এবং পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি আই আই চুন্দ্রীগড় শাসনতন্ত্র বিল গণপরিষদে উত্থাপন করেন। পূর্ব বাংলার বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, কংগ্রেস, গণতন্ত্রী দল, তফসিলি ফেডারেশনসহ বিরোধী দলীয় সদস্যরা যুক্তফ্রন্টের প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ সংবিধানে সন্নিবেশিত না করা এবং এতে পূর্ববঙ্গের অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের বিধান না থাকায় অধিবেশন বর্জন করেন। ফলে বিপক্ষে ভোট দেবার আর কেউ রইল না। ৫২-০ ভোটে সংবিধান পাস হয়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে সংবিধান চালু হয়। ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫ ও মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে।[৬৭১] ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন যেটি তৎকালীন অস্থিতিশীল প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এছাড়া নতুন রাষ্ট্রের জন্য জনগণের মেনডেট নিয়ে একটি সংবিধানসম্মত ও বৈধ সরকারকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানোও সমান গুরুত্ববহ ছিল। আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল সংবিধানে সন্নিবেশিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির অন্যতম গণতন্ত্রকে বাস্তবে রূপদান। নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবিধানে সন্নিবেশিত পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় ও বহির্বিশ্বে স্বাধীন বাংলাদেশের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল সরকারের বড় কাজ। দেশের নির্বাচন পরিচালনার ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মুহাম্মদ ইদ্রিস ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য সম্বন্ধে কমিশন রিপোর্টে যা উল্লেখ করেন তা এখানে উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে হয়।

> For many reasons this first Parliamentary election has a great importance and special significance for the nation.''. . . The country has certainly emerged stronger from the polls and can look ahead with greater assurance for realising its cherished goals.[৬৭২]

এটার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রাজনৈতিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের বিরোধী দলসমূহকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার জন্যও নির্বাচনটির গুরুত্ব ছিল সমধিক। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর সরকার দ্রুত সংবিধান প্রণয়ন করে ত্বরিত ভিত্তিতে নির্বাচন দিয়ে অনেক কঠিন কাজ সহজতর করতে চেয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ তাদের পৃথক আইন পরিষদসহ স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও 'বাঙালি'র পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতিগত পরিচয় বাংলাদেশ সংবিধানে স্বীকৃত না হওয়ায় ওই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে কিনা ছিল একটি বড় প্রশ্ন। তাদের নির্বাচন প্রত্যাখ্যান দেশে আরেকটি বড় জাতীয় সংহতি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তার কারণ পাহাড়িদের নির্বাচন বর্জন দেশের সরকার পদ্ধতির প্রতি অনাস্থার সামিল হবে। এছাড়া পাহাড়িরা নির্বাচন বর্জন করলে দেশের এক দশমাংশ এলাকা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে থেকে যাবে।

বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশন অর্ডার ১৯৭২ এর আদেশবলে গঠিত হয় প্রথম নির্বাচন কমিশন। বিচারপতি মুহাম্মদ ইদ্রিসকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নূর মোহাম্মদ খানকে নির্বাচন কমিশনার করে গঠিত দুই সদস্য বিশিষ্ট প্রথম নির্বাচন কমিশন ৭ জুলাই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে। নির্বাচন কমিশন ১৯৭২ সালে ২৯ আগস্টে *বাংলাদেশ ইলেক্টরাল রোলস অর্ডার* '৭২ জারি করে। ১৮ বছর

---

[৬৭১] Moudud Ahmed, *Op. cit.*, p. 162.

[৬৭২] Bangladesh Election Commission, *Report on the First General Election to Parliament in Bangladesh 1973*, p. 1.

বয়সকে ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রারম্ভিক বয়সসীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয় যা পূর্বে ছিল ২১ বছর। ১৯৭২ সালের ২০-এ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন সংসদীয় আসন বিন্যাস প্রকাশ করে। জাতীয় সংসদে নির্ধারিত ৩০০ আসনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ২৯৯ ও ৩০০ এ দুটি আসন বরাদ্দ রাখা হয় যার মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২,৫২,৪০৮ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পাকিস্তান আমলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম-১ (২৯৯ নং আসন) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম-২ (৩০০ নং আসন) – এই দুটি আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যও ১৯৭৩ এর নির্বাচন ছিল নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ পাকিস্তান আমলেও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে, ভোট দিয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করেছে। কিন্তু সুফল পেয়েছে কিঞ্চিৎ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাদের পক্ষে গণপরিষদে লড়েছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রের চিরচেনা নীতি ‘‘মেজরিটি শুড্ বি গ্রান্টেড” এর কাছে তাঁর (সংখ্যালঘুর) অভিমত, যুক্তিতর্ক, আকুতি মিনতি সবই মেজরিটির দাম্ভিক চাপায় পিষ্ট হয়ে যায়। এখানে আরেকবার আমেনা মহসিনের মূল্যায়নটি টেনে আনা যায়, “The demands of the Hill people may also be interpreted as a move on their part for political inclusion in a pluralist and democratic sturcture, which was outrightly rejected by Bengali elite. This was reflective of the political character that the state was about to take.[৬৭৩] সুতরাং ১৯৭৩ সালের নির্বাচন তাদের সমুখে দুটি বিকল্প হাজির করে। প্রথমত, নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য অকার্যকর গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন। দ্বিতীয়ত, ১৯৭৩ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমত কোন দিকে তা পরিষ্কারভাবে দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ’৭৩ এর নির্বাচনকে বিবেচনা করে দেশের দশভাগ অঞ্চলে জাতীয় রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে রাঙামাটিতে বঙ্গবন্ধুর সফর ও নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার ঘটনা থেকে বুঝা যায় সরকার নির্বাচনটি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামকে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাখার ইস্যুটিকে খুব গুরুত্বসহকারে নিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর উক্ত সফর ও স্মরণকালের বিশাল সমাবেশে ভাষণের ঘটনাটি পরদিন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়। দৈনিক *ইত্তেফাক* এ প্রসঙ্গে লিখেছিল,

> জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান আজ ১৬ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটিতে ঘোষণা করেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের আর উপজাতীয় হিসেবে গণ্য করা হইবে না। তাহারা দেশের অন্যান্য এলাকার লোকদের সাথে সমান

---

[৬৭৩] Amena Mohsin and Delwar Hossain, *Conflict and Partition: Chittagong Hill Tracts, Banglaesh* (New Delhi: Sage, 2015), p. 32.

ও পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করিবেন। বঙ্গবন্ধু আশ্বাস দেন যে পার্বত্য এলাকার লোকদের নিজস্ব ভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী বসবাসের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। তাহাদের জীবনযাত্রায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা তাহাদেরকে শোষণের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করিয়া দেওয়া হইবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে পার্বত্য অধিবাসীদের ''উপজাতীয়'' বলিয়া গণ্য করার বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসকদের অনুসৃত নীতির অবসান ঘটিয়াছে। তিনি পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের জাতীয় পুনর্গঠন কাজে পূর্ণোদ্যমে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।[৬৭৪]

*দৈনিক আজাদী*র প্রতিবেদনে বলা হয়,

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাংগামাটিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে ঐ এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে অন্যান্য বাঙালিদের মতোই এবং তারা বাংলা মায়েরই সন্তান। পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার অবশ্যই রক্ষা করা হবে এবং কাউকেই তা ধ্বংস করতে দেওয়া হবে না ... বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে বাঙ্গালী জাতির সমান অংশ হিসেবেই মনে করে এবং তাদের সমানাধিকার ও সুযোগের নিশ্চয়তা রয়েছে ... পার্বত্য চট্টগ্রামের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। তাদের উপর কোন অবিচার করা হলে তিনি নিজেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং তিনি জনগণের উপর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন।[৬৭৫]

দৈনিক বাংলা বাসসকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিল, "পার্বত্য অঞ্চলের এই বাসিন্দাদের কাছে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসকরা তাদের উপজাতি হিসেবে গণ্য করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা দিত। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তাদের সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধের গ্যারান্টি দিয়ে বাঙালী জাতির অন্তর্ভুক্ত সমান সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।''[৬৭৬]

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বাসিন্দাদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এজন্য তিনি ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের তুলনায় স্বাধীন দেশে বাঙালি জাতির সমমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন এবং সেটা করা হবে উপজাতিদের পৃথক সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য বজায় রেখেই। কিন্তু তাঁর এ রাঙামাটি ভাষণ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সদর্থক ও নঞর্থক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কাব্যিকভাবে ঘুরিয়ে তাঁর বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করেন। ঠিক যেমন তাঁর বিশ্বস্বীকৃত ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। কিন্তু তাঁর ভাষণে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা 'উপজাতি পরিচয়ের বিলুপ্তি ঘোষণা' এবং এর বদলে পাহাড়িদের 'বাঙালি জাতির অন্তর্ভুক্ত সমান সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার' কথাগুলো ব্যাপক ধুম্রজাল সৃষ্টি করে। কোনো কোনো লেখকের মতে, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে 'সেইদিন থেকে পাহাড়িদেরকে উপজাতি থেকে প্রমোশন দিয়ে বাঙালি করা হল' বলেছিলেন

---

[৬৭৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

[৬৭৫] *দৈনিক আজাদী*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩।

[৬৭৬] *দৈনিক বাংলা*, ১৭ ফেব্রয়ারি ১৯৭৩ ।

বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৭৭] ঐ জনসভায় উপস্থিত তৎকালীন পাহাড়ি ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক রূপায়ন দেওয়ানের স্মরণে আছে "আজ থেকে তোমাদেরকে বাঙালি জাতিতে প্রমোশন দিলাম" বলে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৬৭৮] **১৯৭১** সালে রেসকোর্স ময়দানে যারা ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ শুনতে জনসমাবেশে জড়ো হয়েছিলেন তাদের শিক্ষাদীক্ষা, রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার স্তর থেকে **১৯৭৩** সালের রাঙামাটির ঐ জনসভায় উপস্থিত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার স্তরে ব্যাপক পার্থক্য ছিল রূপক অর্থে বলা যায় 'আসমান-জমিন তফাৎ'। অন্যদিকে **১৯৭৩** সালে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে কোনো প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি।[৬৭৯] পরিণামে নির্বাচনী সমাবেশে সমবেত জনগণ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ থেকে সরকারের উপজাতি নীতি নিয়ে আশান্বিত হওয়া যায় বা সরকার তথা আওয়ামী লীগের ওপর ভবিষ্যতে ভরসা রাখা যায় এমন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। সিদ্ধার্থ চাকমার মতে 'হঠাৎ বাঙালীত্বে প্রমোশন তারা কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারেনি। বরং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণাকে তারা ধরে নেয় জাতিগত অস্তিত্বের চরম আঘাত হিসেবে।[৬৮০]

কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা আসনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মনোনীত সাংসদ সুদীপ্তা দেওয়ানের সঙ্গে আলাপকালে বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতীয় এলাকা' হিসেবেই আখ্যায়িত করেন।[৬৮১] এছাড়া বাকশাল প্রতিষ্ঠার পর **১৯৭৫** সালের **১২** ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাঙামাটি সফরে গিয়ে পার্বত্যবাসীদের 'জাতীয় সংখ্যালঘু' হিসেবে ঘোষণা করে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করা হবে বলে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সুতরাং একটি নির্বাচনী জনসভার একটি মাত্র বক্তব্যকে ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি বা উপজাতি নীতি মূল্যায়ন করা হবে অনৈতিহাসিক কাজ। যেখানে তাঁর পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতিকে অনুধাবন ও মূল্যায়নের জন্য পরবর্তী দুই বছরের কর্মকাণ্ড হাতে আছে। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রমাণ করে যে পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন।[৬৮২] প্রবীণ লেখক জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার মনে করেন বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি অপব্যাখ্যা করে নবগঠিত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল *পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি* নির্বাচনে বিষয়টিকে রাজনৈতিক ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করে। তাঁর

---

[৬৭৭] সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম*, পৃ. ৪৯ ও জে বি চাকমা, পৃ. ৫২।

[৬৭৮] রূপায়ন দেওয়ান, *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু পুস্তকের উপর কিছু মন্তব্য*, অপ্রকাশিত, লেখক এ নিবন্ধের একটি কপি আমাকে পড়তে দিয়েছেন।

[৬৭৯] জিল্লুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *ঘোষণাপত্র (মেনিফেস্টো)* (ঢাকা: প্রকাশক সরদার আমজাদ হোসেন, ১৩৮০)

[৬৮০] সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

[৬৮১] *পূর্বদেশ*, ৭ জুন ১৯৭৩

[৬৮২] জে বি চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

ভাষায়, "১৯৭৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের একটি উক্তিকে অপব্যাখ্যা করে সহজ-সরল উপজাতীয় জনগণের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২টি আসনেই জনসংহতি সমিতির দুজন প্রার্থীকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করান।"[৬৮৩] এ বক্তব্য ইঙ্গিত করে নির্বাচনী রাজনীতিতে এম এন লারমা বেশ শক্ত ও কৌশলী প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছেন।

১৯৭৩ সালে নির্বাচনে ১৬ ফেব্রুয়ারিতে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণই জয় পরাজয়ের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। জনসংহতি সমিতির পক্ষে উত্তরাঞ্চল হতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, দক্ষিণাঞ্চল হতে চাই থোয়াই রোয়াজা (১৯৩০-১৯৯৪) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তখন সারা বাংলাদেশে প্রবাদ ছিল যে আওয়ামী লীগের টিকেটে কলাগাছকে দাঁড় করিয়ে দিলে জনগণ কলাগাছকেও ভোট দিবে। সারা দেশে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাঠামো এমন মজবুত ছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের চিত্র ভিন্ন। এখানে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে অতটা সবল নয়। এতদিন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িরা ছিল তিনজন সার্কেল চিফ বা রাজার খাস সমর্থক। মুক্তিযুদ্ধের সংকটাপন্ন পরিস্থিতির তাড়নায় চাকমা সার্কেলের চিফ ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য রাজা ত্রিদিব রায় যুদ্ধ চলাকালে তাঁর রাজত্ব ছেড়ে পাকিস্তানে গমন করলে উপজাতিদের মধ্যে বড় ধরনের নেতৃত্ব শূণ্যতা সৃষ্টি হয়। কারণ ইতিপূর্বে রাজারা ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংহতি ও ঐক্যের প্রতীক এবং অত্রাঞ্চলের একমাত্র রাজনৈতিক মুখপাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক হালচাল ঘুরপাক খেতো রাজাদেরই অঙ্গুলি নির্দেশে। গত শতকের ৭০-এর দশকের একটি গবেষণায়ও সেটা উঠে এসেছে সেখানে বলছে,

> Both the tribal groups of the Chakma and the Mong are organized around a tribal political system with a hierarchical set of leaders, who command the respect and allegiance of the members, organized and direct community enterprises and conduct group activities. This is implied that this network of political organiztion is devoted to various socio-political ends of the community.[৬৮৪]

তৎকালীন মং সার্কেলের রাজা মং প্রু সাইন ইতিহাসের গতিমুখ অনুধাবন করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্লভ মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজটি করে গেছেন। কিন্তু যুদ্ধ পূর্বাবস্থায় অন্য দুই রাজার তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর প্রভাব অতটা দৃশ্যমান ছিল না। তাছাড়া শিক্ষিত ছাত্র যুবক ও পাহাড়ি 'বাবুদের' মধ্যে রাজতন্ত্র সম্পর্কে ইতিমধ্যে বীতরাগ দেখা দিয়েছে। তারা তখন তাদের দূর্দশার জন্য

---

[৬৮৩] জে বি চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

[৬৮৪] R I. Chowdhury et al. (ed.) *op. cit.*, p. 94.

পার্বত্য অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করা শুরু করেছে।[৬৮৫] ফলে সমাজ একটি বৈপ্লবিক, গণমুখী নেতৃত্বের জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল।

পার্বত্য সমাজে যে ভাঙ্গাগড়ার মহাকাল উপস্থিত তা বোধগম্য। সমাজকে ভেঙ্গে গড়ার জন্য নতুন আদর্শের, নতুন চিন্তার ও নতুন পথের নেতা দরকার। এ শূণ্যতা পূরণ করেন এম এন লারমা। লারমা তখনও বয়সে তরুণ। রাজনীতিতে নবীন। কিন্তু গণপরিষদে প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য পাহাড়ে লারমার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার সুবাদে তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত জনসংহতি সমিতির জনপ্রিয়তাও বাড়ে। তৎকালীন রাঙামাটির টিংক ট্যাঙ্ক বলতে যারা ছিল তারা আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি প্রচণ্ড রক্ষণশীল অথচ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি। রাজন্য ও সামন্ত প্রভুদের বাদ দিলেও এই সৃজ্যমান আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণিটি পার্বত্য চট্টগ্রামে সমাজ ব্যবস্থায় বড় সামাজিক শক্তি ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর মধ্যে গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত শিক্ষকসমাজ ছিল লারমার বড় সহায়ক শক্তি। পক্ষান্তরে, দেশব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ যাদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল তাঁরা সম্মানিত ব্যক্তি হলেও রাজনীতিতে শুধু সম্মান দিয়ে অভিষ্ট পূর্ণ হয় না। তাদের দলগত বা সংগঠনগত শক্তি ও গণসমর্থন ছিল অপ্রতুল। ফলে ১৯৭৩-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনেই জনসংহতি সমিতির প্রার্থী যথাক্রমে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাই থোয়াই রোয়াজা জয়লাভ করেন। নির্বাচনের ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট হয় এই নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে একীভুত করছে অন্যদিকে আঞ্চলিক রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটাচ্ছে। এ যুগপৎ ভূমিকার মধ্যেই নির্বাচনটির তাৎপর্য নিহিত। এটাও ঠিক যে, কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলো সমাজে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জাতীয় সংহতি স্থাপনের পূর্বশত। নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রায়ন অকল্পনীয়। যদিও সমালোচনা আছে যে তখনও পর্যন্ত পাহাড়িদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসর মাত্র ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত।[৬৮৬] ৬.১ নং সারণিতে নির্বাচনের ফলাফল প্রদর্শিত হয়েছে।

---

[৬৮৫] চিন্ময় মুৎসুদ্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২৭।

[৬৮৬] R I. Chowdhury et al. (ed.) *op. cit.*: the political participation of the tribal people was only limited to suffrage level. The tribal people as has been included in the national electorate have participated in various national elections and local body elections. p. 111.

সারণি- ৬.১

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম[৬৮৭]

২৯৯, পার্বত্য চট্টগ্রাম-১(উত্তর) মোট ভোটার ১,৩০,১৪৯		৩০০, পার্বত্য চট্টগ্রাম-২(দক্ষিণ) মোট ভোটার ১,২২,২৫৯	
প্রার্থীর নাম	প্রাপ্তভোট	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট
১. তিলক চন্দ্র চাকমা (জাসদ)	১,৭০৩	১. আতিকুর রহমান (ন্যাপ-বি)	৩,৪১২
২.মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (স্বতন্ত্র)	৬০,৭০১	২. উপেন্দ্র লাল চাকমা (জাসদ)	২,৫৬২
৩. সামশুল হুদা (ন্যাপ-এম)	৪,৩১৩	**৩. চাই থোয়াই রোয়াজা (স্বতন্ত্র)**	২৬,৯৮৮
৪. সমিত রায় (আ. লীগ)	১৮,৭৩৪	৪. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা (ন্যাপ-এম)	৩,২২২
মোট ভোট গ্রহণ	৮৫,৪৫১	৫. মং শৈ প্রু চৌধুরী (আ.লীগ)	২২,১৩৮
		মোট ভোট গ্রহণ	৫৮,৩২২

উপরের সারণিতে উপস্থাপিত ফলাফলে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনেই স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে যদিও তারা নির্দলীয় নয়। দুজন প্রার্থীই নবগঠিত দল *পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির* সক্রিয় প্রার্থী। জনসংহতি সমিতির একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হল এ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী দেয় কিন্তু দলটি নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত নয়। স্বতন্ত্র প্রার্থীদ্বয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে সুপরিচিত তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল (অবশ্য বিএনপির আবির্ভাবের পূর্বে) আওয়ামী লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) প্রার্থীদেরকে বিশাল ব্যবধানে হারানোর মধ্যে লুকিয়ে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির আসল রূপ। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১ নং (উত্তর) আসনে আ.লীগ, জাসদ ও ন্যাপের তিনজন প্রার্থীর প্রাপ্তভোট যুক্তভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রাপ্তভোটের থেকে অর্ধেকেরও কম। এর কারণ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাদামাথা জীবনদর্শনজনিত ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, সংবিধান প্রণয়নের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের দশভাষাভাষী ১১টি জাতিসত্তার পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ে গণপরিষদে তাঁর একক ও আপোষহীন সংগ্রাম, তাঁর অসম্ভব সাংগঠনিক দক্ষতা ও মানুষের মনস্তত্ত্বকে বুঝা ও বুঝানোর ক্ষমতা তাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের গণমানুষের জাতীয় নেতার আসনে সমাসীন করে। এছাড়া প্রভাবশালী রাজা ত্রিদিব রায়ের অনুপস্থিতিজনিত রাজনীতির শূন্য মাঠ তার সামনে সফল রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়ার নবদ্বার উন্মোচন করে দেয়। এতদিন পার্বত্য এলাকার জনসাধারণের রাজনীতি সীমাবদ্ধ ছিল রাজপ্রাসাদসমূহে। এম এন লারমা সেই রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের কাতারে নিয়ে আসেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে গণ সংগঠনের কাতারে নিয়ে যান।

উত্তরের আসনে সমিত রায়ের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন দলীয় আনুগত্যের চেয়ে নিজেদের সংকটাপন্ন রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নই ছিল মূখ্য। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল সাধারণ চাকমাদের পাশাপাশি চাকমা রাজকীয় প্রভাবকে

[৬৮৭] Bangladesh Election Commission, *Report on the First General Election to Parliament in Bangladesh 1973*, p. 104.

দলীয় কাজে ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামে দলের ভিত্তি স্থাপন করা। উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের একটি নামসর্বস্ব আহবায়ক কমিটি ছিল। স্বাধীনতার পর তৎকালীন আহ্বায়ক চারু বিকাশ চাকমার পীড়াপীড়িতে বাহাত্তরের শেষের দিকে নতুন কমিটি গঠনের কাজ খতিয়ে দেখতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ও প্রচার সম্পাদক সরদার আমজাদ হোসেন রাঙামাটি সফর করেন। সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়াতে কেন্দ্রীয় নেতাদের সেই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম পদার্পন। এ-সফরের ফলশ্রুতিতে চারু বিকাশ চাকমা ও জেড এ আলমকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কমিটি গঠিত হয়। এরপর ১৯৭৩ সালে নির্বাচনের বিশ দিন আগে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বাচনী সফরে আসেন যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। দল ও সরকার প্রধানের রাঙামাটি সফরটি আওয়ামী লীগ যে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল তারই সাক্ষ্য দেয়। তারপরও নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয় প্রমাণ করে জাতীয় রাজনীতির নীতি আদর্শের সাথে আঞ্চলিক রাজনীতির চাওয়া পাওয়া মধ্যে পার্থক্য আছে।

দক্ষিণের আসনে এম এন লারমার নবগঠিত জনসংহতি সমিতি মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী চাই থোয়াই রোয়াজা পাকিস্তান আমলে মৌলিক গণতন্ত্রের যুগে গঠিত কলমপতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। কাউখালি এলাকায় সমবায় আন্দোলনে ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম শহরে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য, যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৬৮৮] তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী মং শৈ প্রু চৌধুরী বান্দরবানের প্রভাবশালী বোমাং রাজা। রাজাদের গ্রাম ও পাড়া পর্যায়ে বিশাল নেটওয়ার্ক। জাতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের অপরিসীম জনপ্রিয়তার ভাবমূর্তি এবং নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য ও নেটওয়ার্ক কাজে লাগানো সত্ত্বেও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে রাজা মং শৈ প্রুর পরাজয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ও রাজনীতিতে পালাবদলের ইঙ্গিত প্রদান করেছিল। পাশাপাশি পাহাড়ি সমাজ ও মানুষের ওপর পরম্পরাগত রাজাদের প্রভাব যে প্রবলভাবে ক্ষীয়মাণ তাও দেখিয়ে দিল তিয়াত্তরের নির্বাচন। আরও দেখিয়ে দিল পৃথক জাতিসত্তা অধ্যুষিত জনপদে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারায় বিবর্তিত হয়। কালাম সাহেদের মূল্যায়নেও প্রথাগত নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে লারমার আবির্ভাব ত্বরান্বিত হওয়ার প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন, ‘‘The traditional leaders, lacking the education and dynamism of the new generation, lost control over the tribes. Larma emerged as the

[৬৮৮] জাফর আহমদ খান (সম্পা.), *রাঙ্গামাটি: বৈচিত্রের ঐক্যতান* (রাঙ্গামাটি: জেলা প্রশাসন, ২০০৪), পৃ. ৩০৩।

undisputed leader with a large following of educated youths, armed with the Marxist ideology of class war."[৬৮৯]

খ) ১৯৭৯-১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি:

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পরই বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গভবন বা সংসদ ভবন ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টে চলে যায় অর্থাৎ সামরিক জান্তার 'ইচ্ছামাফিক' হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার চার বছর পূর্ণ না হতেই চারমাসে পর পর তিনটি রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থান দেশের রাজনীতিতে সামরিক ব্যাহিনীকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নিয়ে আসে। রাষ্ট্রের মসনদে কে আরোহন করবে আর কে নামবে তা নির্ধারণ করে সামরিক বাহিনী। যেমন- সেনাবাহিনীর ইশারায় স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাজত্বের ৮৩ দিনের মাথায় গদিচ্যুত হন এবং পঁচাত্তরের নভেম্বরের ৬ তারিখ দেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ৭ নভেম্বর ঘটনা আবার অন্যদিকে মোড় নেয়। দৃশ্যপটে চলে আসেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (পরবর্তীতে লে. জেনারেল)। অতঃপর প্রেসিডেন্ট হিসেবে এস এস সায়েমকে বহাল রাখলেও উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে কার্যত তিনিই পরিণত হন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের বর্ণনায় দেশের 'ডি ফ্যাক্টো সামরিক শাসকে'।[৬৯০] ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জিয়া তাঁর সরকারকে নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক বলে অভিহিত করেন।[৬৯১] যাহোক বহির্বিশ্বের কাছে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য সামরিক শাসকরা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। যদিও সে গণতন্ত্র ছিল কূটনীতিক ফারুক চৌধুরীর ভাষায় "লোক দেখানো, খাকি প্রভাবান্বিত 'মেকি গণতন্ত্র'।[৬৯২] আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক পথে দেশ চললেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করতো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সামরিক নেতার ইচ্ছা ও সদিচ্ছার উপর।[৬৯৩]

পিটার জে. বার্টোসির মতে তখন দেশের শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। "a mixture of relative democracy and relative dictatorship throughout." [৬৯৪]

---

[৬৮৯] Kalam Sahed, *Ethnic Movements and Hegemony in South Asia* (Dhaka: Hakkani Publishers, 2002), p. 223.

[৬৯০] Syed Serajul Islam,``The State in Bangladesh under Zia, 1975-81''in *Asian Survey*, 24.5(1984): pp. 556-573.

[৬৯১] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি*, ১৯৭১-২০১১ (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬, ১ম প্রকাশ ২০১৩), পৃ. ৪২।

[৬৯২] ফারুক চৌধুরী, *জীবনের বালুকাবেলায়* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ৫ম মুদ্রণ ২০১৭, ১ম প্রকাশ ২০১৪), পৃ. ৪০৩।

[৬৯৩] মিহির মৈত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

[৬৯৪] Peter J. Bertocci, ''Bangladesh in the Early 1980s Praetorian Politics in an intermediate Regime" in *Asian Survey*, 22.10 (1982): 988-1008.

সামরিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে দেশের সংবিধান ও মৌলিক অধিকার ভুলুণ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন, ১৯৭৬ নামে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির আদেশে দেশে রাজনৈতিক দল গঠন ও কার্যক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। বাকশালসহ অনিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। সেই আদেশের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতিও নিষিদ্ধ হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন জনপ্রিয় সাময়িকী *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* প্রকাশিত নিবন্ধেও দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের শীর্ষ নেতা এম এন লারমা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের মতে, ১৯৭৫-এর নভেম্বরে মানবেন্দ্র লারমা শান্তি আলোচনার জন্য যোগাযোগ করেছিলেন জিয়ার সাথে, কিন্তু পরে আর করেন নি; কেননা ভারত তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৬৯৫] এভাবে, অবশেষে তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দেশের (প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ) রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সর্বময় ক্ষমতার আধার ব্যক্তির সাথে আলোচনার চেয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের সামরিক সহায়তায় কার্যসিদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চিন্ময় মুৎসুদ্দীও লিখছেন,

> এদিকে ৭ নভেম্বর পুনরায় সরকার পরিবর্তনের পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে দূত পাঠালেন সেনাবাহিনী প্রধান সি.এম.এল.এ. জিয়াউর রহমানের কাছে। উক্ত দূত (সেলিম সামাদের মতে উপেন্দ্রলাল চাকমা) অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকাশ্য একজন পাহাড়ি নেতা হিসেবেই জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। জিয়া জানালেন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে তিনি ওয়াকেবহাল। তবে বিস্তারিত জানতে তিনি আগ্রহী। উপজাতি সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া শুনে তা সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। কিন্তু ছয় মাসের আগে এ ব্যাপারে তিনি সময় দিতে পারবেন না বলে জানান। একটি সূত্র জানাচ্ছে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্য অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধুদেশ তার উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে 'সামরিক এ্যাকশন' কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকেই শান্তিবাহিনী সামরিক এ্যাকশনে নেমে পড়ে।[৬৯৬]

জনসংহতি সমিতি 'আন্ডার গ্রাউন্ড পাটি' বা গুপ্ত সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জনসংহতি সমিতি অনেকটা পূর্ব ঘোষণা ছাড়া একতরফা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নিলে ৭৩-৭৫ সালব্যাপী গড়ে ওঠা পাহাড়িদের রাজপথের প্রকাশ্য গণ আন্দোলনের জোয়ারে ভাটা পড়ে। কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে, রাজপথের আন্দোলনের 'অকাল গর্ভপাত' ঘটে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আর কোনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি।[৬৯৭] বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সামরিক সরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে পাহাড়ে অকস্মাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। কারণ জনসংহতি সমিতি বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে

---

[৬৯৫] হুমায়ুন আজাদ, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: সবুজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরণাধারা*, পৃ. ৩৬।
[৬৯৬] চিন্ময় মুৎসুদ্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-৩৬।
[৬৯৭] জে. বি চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫।

তাদের বিস্তারিত দাবিনামা পেশ করে ১৯৮৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে। এর আগে তাদের আক্রমণাত্মক (অফেনসিভ) সশস্ত্র আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বা দাবি দাওয়া ছিল অস্পষ্ট। এস এম আলী যথার্থই বলেছেন, ''Till 1986, the PCJSS did not come up with its clear cut objectives. Neither did its armed cadre Shanti Bahini. Apart from that memorandum submitted to the Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman in 1972, it never let the government formally know its goals.''[৬৯৮]

১৯৭৫-১৯৮৭ একযুগ পরিক্রমায় পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে বিকল্পধারার আবির্ভাব ঘটে। সেটি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসা নেতৃত্ব ও শহুরে শিক্ষিত পেশাজীবী সমাজের নমনীয় ধারা। জিয়াউর রহমান এ শ্রেণির ওপর ভর করে ঘূর্ণায়মান অবনতিশীল পার্বত্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার প্রয়াস চালান। এজন্য বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি রাঙ্গামাটিতে তাদের সকাশে মিলিত হন। কিন্তু *ডি ফ্যাক্টো* রাষ্ট্রপতির সমূখে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ স্মারকলিপি আকারে যা উপস্থাপন করেছেন তার রাজনৈতিক বার্তা অনুধাবন করতে জিয়াকে বেগ পেতে হয়নি। ৬৭ জন পাহাড়ি প্রতিনিধির স্বাক্ষরিত ঐ স্মারকলিপির বক্তব্যের কিয়দংশ দেখা সমীচীন মনে হয়।

> স্বাধীনতা উত্তরকাল হইতে প্রশাসনিক অব্যবস্থার দরুণ হোক, স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তের ফলে হোক অথবা নেতৃবর্গের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই হোক এই অঞ্চলের সামগ্রিক পরিমণ্ডল এমন কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে যে, জনগণের মন আশঙ্কায় আড়ষ্ট হইয়া আছে, স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য নিথর হইয়া পরিয়াছে। রক্ষণের নামে ভক্ষণের যে প্রক্রিয়া চলিতেছে, শান্তি রক্ষার নামে অশান্তির যে-বীজ বপন করা হইতেছে, সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নামে বিদ্বেষের যে দাবানল প্রজ্বলিত করা হইতেছে সে সবের ফলশ্রুতি হিসাবে জনচিত্তে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দানা বাঁধিয়া বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে।[৬৯৯]

১৯৭৫ এর ৭ নভেম্বরের পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রপতি এ এস এম সায়েমের ২৪ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় যার মধ্যে ৭ জন ছিলেন অসামরিক ব্যক্তিত্ব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দেশের রাজনৈতিক এহেন অস্থির পরিস্থিতিতেও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গটি শাসকদের নজর এড়িয়ে যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চাকমা রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা পরিষদে নিয়োগ করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে জিয়ার এ পদক্ষেপ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণী পর্ষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অন্তর্ভুক্তিকে ইঙ্গিত করে যদিও জিয়াউর রহমানের এই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক চিন্তা অচিরেই পূর্ণ সামরিক রূপ পরিগ্রহ করে। বলা হয়ে থাকে যে উপদেষ্টারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন এবং প্রেসিডেন্টের পছন্দের ব্যক্তিরাই মনোনীত হন উপদেষ্টা হিসেবে। কিন্তু জিয়াউর রহমানের সাথে বিনীতা রায়ের কোনো পূর্ব পরিচয় ছিল

---

[৬৯৮] Syed Murtaza Ali, *The Hitch in the Hills* (Chittagong: Pub. by Dil Monowara Begum, 1996), p. 46.

[৬৯৯] সালিম সামাদ (সম্পা.), *পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম-১* (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৮), পৃ. ১১০-১১১।

কিনা তা গবেষণাসাপেক্ষ। কারণ ক্যান্টমেন্টের বাসিন্দা সামরিক কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানের সাথে চাকমা রানি বিনীতা রায়ের সম্পর্ক গড়ে উঠার মতো কোনো সুযোগ ছিল না। তারপরও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদে রানি বিনীতা রায়ের অন্তর্ভুক্তিকে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতির ইতিবাচক দিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। রানি এমন সময়েই প্রেসিডেন্টের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন যখন একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সহিংসপথে ধাবমান অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক রাজনীতি 'চরম শত্রুভাবাপন্ন' ও 'প্রতিশোধপরায়ণতা'র দিকে ধাবমান। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রখ্যাত গবেষক সুবির ভৌমিক 'RAW' এর পরিচালকের বরাত দিয়ে লিখেছেন,

> What really provided a fillip to the underground movement in the CHT was the almost overnight change in the Indian attitude. It shifted from a declared policy of friendship towards the Mujib Government to implacable hostility towards the new regime. According to senior Indian intelligence officials close to Indira Gandhi, the source of this sudden change in attitude towards Bangladesh was the Prime Minister herself. ''She seemed to take Mujib's assassination as a personal defeat and looked on members of the caretaker Government as if they were pariahs."[৭০০]

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাও পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট পরবর্তী পার্বত্য রাজনীতির হালচাল সম্পর্কে অনুরূপ পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন,

> ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব নিহত হল। ... শেখ মুজিবের মৃত্যুর অব্যবহিত পর পাক ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক অংগনে বিরাট এক পরিবর্তন এসে গেল। শত্রু মিত্রের অবস্থান পাল্টিয়ে গেল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১৯৭২ সাল থেকে ভারতের সহানুভূতি লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এই ঘটনার পর তা সহজলভ্য হয়ে গেল। তখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যায় সংযোজিত হলো অন্য একটি Factor। যে-Factor পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে এখন একটি বড় অন্তরায়।[৭০১]

এতে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেশের ভিতরকার দুপক্ষ মিলে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের সম্ভাবনার পথে অদৃশ্য প্রাচীর তৈরি হয়। *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর* মতে, সে সময়কার পরিস্থিতি বাঁক নেয় "The situation took a turn for the worse" এর দিকে।[৭০২] ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল মে. জে. জিয়াউর রহমান ৪৩ বছর বয়সে ৭ম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় উপদেষ্টা হিসেবে জিয়া সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতির ওপর বিনীতা রায়ের পক্ষে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করা অসুবিধাজনক

---

[৭০০] Subir Bhoumik, *Insurgent Crossfire: North-East India*, p. 267.

[৭০১] যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, "পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা: একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা" আ. ওয়াদুদ ভুঁঞা (সম্পা.) *প্রার্থীত প্রহর: বর্ষপূর্তি উদযাপন স্মরণিকা-'৯০*, (খাগড়াছড়ি: স্থানীয় সরকার পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, ১৯৯০), পৃ. উল্লেখ নেই।

[৭০২] S. Kamaluddin, ''A Peace offensive in the hills," *Far Eastern Economic Review* May 2, 1980, p.30.

হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে রানির উপদেষ্টা সময়কাল একদম বৃথা যায়নি। তাঁর উপদেষ্টা থাকাকালেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর রাঙামাটিতে উপজাতীয়দের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট। প্রদীপ্ত খীসা মনে করেন এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ছিল সরকারের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ যা সমতল ভূমির মানুষের সাথে পার্বত্যবাসীদের সাংস্কৃতিক লেনদেন এবং পরস্পর জানাও বোঝার ক্ষেত্রে একটা মাইলফলক স্বরূপ।[৭০৩] একইভাবে ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে জিয়া সরকার কর্তৃক কারান্তরীণ থাকা শান্তিবাহিনীর দুই শীর্ষ নেতা সন্তু লারমা ও চাবাই মগের মুক্তিদানে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপদেষ্টা হিসেবে রানি বিনীতা রায়ের হস্তক্ষেপ ছিল বলে মনে করে এন্টি স্ল্যাভারি সোসাইটি।[৭০৪] অন্যদিকে *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর* প্রতিবেদন উক্ত দুই নেতার মুক্তিতে বিরোধী দলীয় সাংসদ উপেন্দ্র লাল চাকমার ভূমিকার কথা বলেছে।[৭০৫] যাহোক রানি বিনীতা রায়ের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদে যোগদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে 'অনির্বাচিত ও অরাজনৈতিক' সরকারের সময়কালেও সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তিনি পদত্যাগ করলে সুবিমল দেওয়ান ১৯৮০-১৯৮২ সাল পর্যন্ত সহকারী উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।[৭০৬] ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত মন্ত্রী পদ মর্যাদায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের উপদেষ্টা পরিষদে নিয়োগ লাভ করেন উপেন্দ্র লাল চাকমা। উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ও পাহাড়িদের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নে তিনি অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। এরশাদ সরকারের সর্বশেষ উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন সাংসদ বিনয় কুমার দেওয়ান। উপদেষ্টা নিয়োগের ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গটি সর্বদা বাংলাদেশ সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় ছিল। একইভাবে সামরিক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামও তার অন্তর্ভুক্ত হয়।

জিয়া ও এরশাদের শাসনামলে তিনটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আরও অনুষ্ঠিত হয় বেশ কয়েকটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন। ১৯৭৮ সালের প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে

---

৭০৩ প্রদীপ্ত খীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, পৃ. ৫২-৫৩। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ এর ১৬ আগস্ট বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আগরতলাস্থ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কে ইঙ্গিত দেয় যথাশীঘ্র সম্ভব সর্বোচ্চ প্রাধিকার দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। 'র'এর মাঠ কর্মকর্তা গোপাল চাকমা দ্রুত জে বি লারমা ওরফে সন্তু লারমা ও জনসংহতি জেনারেল সেক্রেটারি ভবতোষ দেওয়ানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ২১ আগস্ট সন্তু লারমা ও ভবতোষ দেওয়ান দিল্লির পথে উড়াল দেন। সেখান থেকে প্রাথমিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর ২৮ আগস্ট আগরতলায় ফিরে আসেন এবং পরদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে সন্তু লারমা বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধৃত হন এবং তখন থেকে মুক্তিলাভ পর্যন্ত সাড়ে চার বৎসরকাল কারান্তরীণ থাকেন। দেখুন- সুবির ভৌমিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬৮।

৭০৪ Anti Slavery Society, P. 48.

৭০৫ *Far Eastern Economic Review* May 2, 1980, p. 30.

৭০৬ জাফর আহমদ খান, রাঙ্গামাটি: *বৈচিত্রের ঐক্যতান*, পৃ. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

জিয়াউর রহমান তাঁর জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলের সুবাধে বিপুল ভোটে (১৫,৭৩৩,৮০৭ ভোট, ৭৬.৬৩%) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। বিরোধী দলগুলোর অনড় দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে দেশ থেকে সামরিক শাসন তুলে নেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে স্বাধীন বাংলাদেশে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে জিয়াউর রহমান কর্তৃক নির্বাচনের মাত্র ছয়মাস আগে (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮) গঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২০৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, সেনাপ্রধান, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সংসদে বিএনপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান একচ্ছত্র ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর সরকারের গৃহীত পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি ঐ অঞ্চল এবং সমগ্র দেশের ওপর সুদুরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

১৯৭৯ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষও অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনে জয়লাভ করেছিল সেই জনসংহতি সমিতি এসময় প্রকাশ্য রাজনীতি তথা নির্বাচনের মাঠে নেই। তারপরও পার্বত্য চট্টগ্রামের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা স্তিমিত হয়ে যায়নি। বরং নতুন জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পাহাড়িদের সংযোগ স্থাপিত হয়। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন দাবির প্রতি সুবিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ জাসদের প্রার্থীকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে ভোট দেয়। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানেই নিহিত। বাংলাদেশের বামধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের যোগাযোগ ও ভাবের আদান প্রদান শুরু।[৭০৭] পার্বত্য চট্টগ্রাম-১ (২৯৯) নং আসনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের মনোয়ন নিয়ে উপেন্দ্র লাল চাকমা জয়লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। জাতীয় রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়েও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। এতে করে সরকার ও পার্বত্য জনগণ উভয়ের কাছে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্যতা পায়। ১৯৭৬ সাল থেকে চলা ইন্সার্জেন্সির সময় বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ স্থাপনে এবং বিরোধী দলের সাংসদ হিসেবে সরকারের নীতির গঠনমূলক সমালোচনা করে তিনি বিরাট সুখ্যাতি অর্জন করেন। উপেন্দ্র লাল চাকমার সাংসদ হিসেবে রাজনৈতিক ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য:

> উপেন্দ্র লাল চাকমা ১৯৭৯-এর সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে সংসদে নির্বাচিত হন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল একটি ছোট সমাজবাদী দল এবং বাংলাদেশে প্রদেশ গঠন করা তার দলীয় কর্মসূচীর

[৭০৭] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার : গৌতম দেওয়ান, প্রাক্তন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান, তারিখ ৬/৯/২০১৭, স্থান- ডিসি বাংলোস্থ বাসা।

অংশ। তিনি জনসংহতি সমিতির সমর্থনে জয়লাভ করেন যদিও তিনি এই দলের সদস্য নন। তার এই জয়লাভ তাকে একটি জাতীয় ভূমিকা দান করে যা তিনি বিভিন্নভাবে পালন করেন। তিনি জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর দুই প্রধান নেতা লারমা ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগ্নীপতি। এই আত্মীয়তার সূত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এরই ফলে তিনি জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতার দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৭০৮]

উপেন্দ্র লাল চাকমার সমন্বয়ধর্মী রাজনৈতিক জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখক এস এম আলী লিখেছেন,

> The wily politician had been a leader of the tribal people in the troubled Chittagong Hill Tracts for several decades. He virtually reigned the politics in CHT from his home Khagrachhari. And apparently, no political issue could get spurn without his say in Bangladesh's eastern fringe-CHT. In 1979, when late Ziaur Rahman was in power, Babu Upendra Lal Chakma was elected Parliament Member from hill constituency Khagrachhari on a nomination from JSD, a small socialist party. In his capacity as Parliament Member primarily represening ethnic minority (CHT tribals), he closely worked with the then Chittagong Area commander Major General Abul Manzur in the latter's bid to hammer out a solution to tribal insurgency problem in CHT.[৭০৯]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই জনমত যাচাই এবং যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা এবং এতে নির্বাচনের ভুমিকা খুবই তাৎপযপূর্ণ। দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে অন্তর্ভুক্তিতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম-২ (৩০০) নং আসন অর্থাৎ বান্দরবান থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার পছন্দসই ব্যক্তি হিসেবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করে অং শৈ প্রু চৌধুরী রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। নির্বাচনের পর বিএনপিতে যোগ দিয়ে তিনি খাদ্য প্রতিমন্ত্রীর পদ লাভ করেন।[৭১০] পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণের রাজনীতিতে অং শৈ প্রু চৌধুরীর ফিরে আসা বান্দরবানে স্থানীয় রাজনীতির মেরুকরণ ঘটায়।

তিনি বান্দরবানের ঐতিহ্যবাহী বোমাং রাজপরিবারের সদস্য এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। স্বাধীনতার পর কারান্তরীণ হন এবং জিয়াউর রহমানের শাসনামলে মুক্তিলাভ করেন। সেই যে বিএনপির রাজনীতির সাথে বোমাং রাজ পরিবারের সম্পৃক্ততা তা আজো অটুট আছে।

---

[৭০৮] পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, *জীবন আমাদের নয়*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৭।
[৭০৯] Syed Murtaza Ali, *The Hitch in the Hills,* p. 92.
[৭১০] চিন্ময় মুৎসুদ্দী, *প্রাগুক্ত।*

এরশাদের সামরিক শাসন, ১৯৮৬ র সংসদ নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে দেশের পরিস্থিতি যখন কিছুটা স্থিতিশীলতার দিকে ধাবমান তখন হঠাৎ করেই সামরিক বাহিনীতে, 'ক্যু' ও পাল্টা ক্যু' দেখা দেয়।[৭১১] ১৯৮১ সালে ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সফরে এসে স্থানীয় সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। অতঃপর উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। একই বছর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত তুমুল প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচনে জনাব সাত্তার ড. আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ দেশে আবার সামরিক আইন জারির মাধ্যমে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। পাকিস্তান ফেরত সেনাবাহিনী প্রধান লে. জে. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতার চালকের আসনে অধিষ্ঠিত হন। পিটার জে বার্টোসি যথার্থই বলেছেন, ''But soon after the onset of Bangladesh first decade, they {armed forces} were back in the driver's seat, and the shape of the immediate future will rest in large part on the role they play over the next several years."[৭১২]

রাষ্ট্রপতি এরশাদের সময়ে ১৯৮৬ সালের ৭ মে এবং ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ যথাক্রমে দেশের ইতিহাসে তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনগুলোর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটে। জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ দুজনেই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দুটি রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করেন। বিএনপির কথা আগেই বলা হয়েছে। এরশাদের পার্টি গড়া শুরু জনদল নাম দিয়ে, বিকাশ জাতীয় ফ্রন্ট হিসেবে অবশেষে পূর্ণতা পায় জাতীয় পার্টিতে। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এরশাদের গড়া জাতীয় পার্টির বাংলাদেশের রাজনীতিতে অভিষেক দিবস। রাষ্ট্রযন্ত্রের সোপান বেয়ে ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩ টি আসন লাভ করে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং বিরোধী জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮৪ সালের ১৯ মার্চ *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় আর্মিদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, "The Army capture power first by the gun, then they indulge in politics. They form their own so-called parties, using the government's machinery and funds. They want to legitimate their power before the world."[৭১৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের মূলধারার রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এরশাদের শাসনামল বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। তিনি বেশ কিছু সৃজনশীল এবং দৃষ্টান্তস্থাপনকারী উদযোগ

---

[৭১১] এ্যান্থনী মাসকারেনহাস এর তথ্যমতে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কুড়িটির বেশি অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চলে। সব কয়টা অভ্যুত্থানই ছিল অদূরদর্শিতা আর অপরিপক্কতা দোষে দুষ্ট। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

[৭১২] Peter J. Bertocci, *op. cit.*, p. 988-1008.

[৭১৩] Cited in Anti-Slavery Society, *op. cit.*, p. 31.

গ্রহণ করেন। এরশাদ সরকারই ১৯৮৭ সালের চট্টগ্রামে পাহাড়ি নেতাদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে শান্তিবাহিনীর পরিচালিত সশস্ত্র আন্দোলনকে জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৭১৪] দ্বিতীয় 'তাৎপর্যপূর্ণ সরকারি পদক্ষেপ ছিল' সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। এর পূর্বে ১৯৮৩ সালের ১০ অক্টোবর নগদ অর্থ, রেশন ও পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট চার বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। তাঁর গৃহীত কর্মসূচির ফলশ্রুতিতে শান্তিবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য (২,২৯৪ জন) আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।[৭১৫] আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর সাথে এরশাদ সরকারের রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত হয় ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর পানছড়িতে অনুষ্ঠিত প্রথম ঐতিহাসিক বৈঠকের মাধ্যমে। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামকে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে অঞ্চলটিকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করে কিছু প্যাকেজ সুবিধা দেওয়া হয়।[৭১৬] ১৯৮৪-৮৫ অর্থবছর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। অধিকন্তু এরশাদ সরকারের সময়ে বিপুল সংখ্যক পাহাড়ি, অধ্যাপক মিজানুর রহমান শেলীর প্রদত্ত তথ্যমতে, ১৮৭৫ জন শিক্ষিত পাহাড়ি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভ করে এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা পদ্ধতিতে ভর্তির সুযোগ লাভ করে। মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে জানা যায় ১৯৮৭-৮৮ সালে বিপুল সংখ্যক পাহাড়ি শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশুনা শেষ করে বেকার জীবনযাপন করছিল। এক পর্যায়ে তারা বেকার সমিতিও গঠন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান গণহত্যা, দলে দলে স্বজাতির লোকদের প্রাণ বাঁচাতে ভারতে গমন, শহরে শিক্ষিত পাহাড়ি যুবকদের প্রতি মিলিটারিদের সন্দেহজনক দৃষ্টি, অনিরাপদ জনজীবন তাদেরকে গভীর ভাবনায় ফেলে দেয়। এক পর্যায়ে শান্তিবাহিনীতে যোগদানের সম্ভাব্যতা নিয়েও বৈঠকে বসে। কিন্তু এরশাদ সরকার পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের হতাশা নিবৃত্ত করতে বিগত পাঁচ বছরের সরকারি কোটায় পুঞ্জিভুত শুণ্যপদগুলোতে যোগ্যতানুসারে নিয়োগ দেয়। এতে একটি প্রজন্ম দেশের কাজে ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়। পরে তাদের পথ ধরেই অনেক পাহাড়ি শিক্ষিত বেকার আন্দোলনের পথ পরিহার করে দেশের কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহী হয়।[৭১৭] এছাড়া হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ নির্বাচনে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা ছিল

---

[৭১৪] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪।

[৭১৫] Syed Anwar Husain, *op., cit.*, p. 51. ১৯৮৫ সালের ২৯ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ২৩৩ জন শান্তিবাহিনী সদস্য অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। এ সংখ্যা ১৯৯১ সালের ২৪ আগস্টের মধ্যে ২৫৭৪ জন।

[৭১৬] Mizanur Rahman Shelley, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, p.135.

[৭১৭] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: অরুনেন্দু ত্রিপুরা, নিজ কার্যালয়। রাঙামাটি, তারিখ ৫/৫/২০১৭।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংসদীয় আসন সংখ্যা ১৫ বছর পর দুটি থেকে তিনটিতে উন্নীতকরণ। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে ভেঙ্গে ১৯৮১ ও ১৯৮৩ সালে যথাক্রমে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা গঠিত হয়। এ পরিস্থিতিতে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার জনপ্রতিনিধিরা এরশাদ সরকারের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বা নবগঠিত জেলাগুলোর সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এরশাদ এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলে ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আসন সংখ্যা তিনটিতে বৃদ্ধি পায়।[৭১৮] এর মধ্যে ২৯৯ নং রাঙামাটি-১ আসন থেকে বিনয় কুমার দেওয়ান জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সাংসদ নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সালে তাঁকে পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন।[৭১৯] অন্যদিকে ৩০০ নং বান্দরবান-১ আসন বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরীও জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে সাংসদ নির্বাচিত হন। এতে বোমাং রাজপরিবার বিএনপি ও জাতীয় পার্টি দুটি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তাদের মধ্যকার এ ভাঙ্গন বান্দরবানের পরবর্তী স্থানীয় রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। এ সুযোগে ১৯৮৯ সালে গঠিত বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অখ্যাত সদস্য উশৈ সিং (বীর) আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে ১৯৯১ এর নির্বাচনে জয়লাভ করে বান্দরবানের রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। তিনি পরে বীর বাহাদুর উশৈ সিং নাম ধারণ করেন। তবে খাগড়াছড়িতে জাতীয় পার্টি থেকে আলীম উল্লাহ সাংসদ নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালের নির্বাচন তথা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব দুটোই বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া আরও একধাপ প্রসারিত হয়। অতপর ১৯৮৯ সালে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করেন (এ সম্বন্ধে প্রাতিষ্ঠানিক উদযোগ অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিষয়াদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের জন্য স্পেশাল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রি নামে একটি মন্ত্রণালয় গঠন করেন।

১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিতে এর গুরুত্ব

যদিও ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬, প্রথমে সামরিক আইন এবং পরে বেসামরিক বেশে সামরিক কর্তৃত্বের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামে হিংসাত্মক কার্যকলাপ আর তার তাৎক্ষণিক সামরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে হাজার হাজার পাহাড়ি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনায় এরশাদের এসব উদযোগগুলোর সুনাম ম্লান হয়ে যায়।

---

[৭১৮] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: শ্রী গৌতম দেওয়ান, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ০৫/৯/২০১৭। নিজ বাসা। তিনিসহ শান্তিময় দেওয়ান, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, ডা: এস এম চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংসদীয় আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রামে নির্বাচন অফিসে আবেদন দাখিল করেন।

[৭১৯] জাফর আহমদ খান (সম্পা.), *রাঙ্গামাটি : বৈচিত্রের ঐক্যতান*, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অন্যদিকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায়, এই নির্বাচনের ফলাফল দেশের রাজনৈতিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। বরং লে. জে. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ, ছাত্রসমাজ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন পেশার লোকজন হরতাল ও বিক্ষোভসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে ৪ ডিসেম্বর এরশাদের পতন ঘটে। ৫ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে ৮,৭ ও ৫ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানরূপে দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করে। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ধারার পাহাড়িদের মধ্যে ১৯৯১ সালের নির্বাচন ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে বলে উল্লেখ ছিলো। *জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহার–১৯৯১* শিরোনামে প্রকাশিত ঐ মেনিফেস্টোতে উপজাতি অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে:

> দেশের উপজাতিদের স্বীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা সংরক্ষণ ও বিকাশের নিশ্চয়তা ও বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাবলী সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে।[৭২০]

অধিকন্তু আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা রাঙামাটির জনসমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রকাশ্য রাজনৈতিক ওয়াদা করেন। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান সংকট শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের প্রত্যাশায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রকাশ্য সহযোগী সংগঠন হিসেবে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণপরিষদ ও হিল উইমেন ফেডারেশন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মকর্তারা এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। সে সময়কার ঘটনার অন্যতম কুশীলব শরদিন্দু শেখর চাকমা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

> আমরা সবাই আলোচনা করে দীপংকর আওয়ামী লীগের টিকিট পেলে তাকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন দেওয়ার জন্য একমত হই। যথা সময়ে দীপংকর আওয়ামী লীগের টিকিট পান। এরপর আমরা সবাই তাকে নির্বাচনে জেতাবার জন্য উঠে পড়ে লাগি। আমার বাসায় ঘন ঘন মিটিং হতে থাকে। পাহাড়ি গণ পরিষদ এবং পাহাড়ি ছাত্র

[৭২০] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহার– ১৯৯১* (ঢাকা: আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯১) এবং আরও দ্রষ্টব্য- এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯।

> পরিষদের নেতা কর্মীদের রাঙামাটি জেলার আনাচে কানাচে পাঠানো হয়। আমি অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নিই এবং ঢাকাবাসী উপজাতিদের ঘরে ঘরে যেয়ে চাঁদা তুলি এবং তাদেরকে তাদের আত্মীয় স্বজনকে দীপংকরের জন্য কাজ করতে বলতে অনুরোধ করি। তাছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং অন্যান্য জেলায় কর্মরত উপজাতি কর্মকর্তাদের টেলিফোন করে চাঁদা পাঠাতে অনুরোধ করি। আমি নিজেও আমার দু'মাসের ঘরভাড়া দেই। ... আমাদের সকলের ব্যাপক প্রচারনার ফলে দীপংকর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।[৭২১]

উল্লেখ্য যে ১৯৯১-এর নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৬৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮৮টি আসন লাভ করে যার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের এ বিজয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তৎকালীন আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু স্বয়ং পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বাচনী সফর এবং ভাষণ দিয়েও যেখানে আওয়ামী লীগের দুজন প্রার্থীই পরাজিত হয়েছিলেন সেখানে শেখ হাসিনার সময়ে আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনেই বিজয়ী হয়। উপরন্তু যেখানে এরশাদশাহীর শাসনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে উৎসাহবোধ করতো না সেখানে নিরপেক্ষ সরকারের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি, জনগণের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। মানুষ মাইলের পর মাইল হেঁটে এসে, কেউ বা আগের রাতে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে রাত্রিযাপন করে 'ভোট উৎসবে' সামিল হয়েছে। দূর দুরান্ত থেকে আগত ভোটারদের জন্য দুপুরে খাবার ব্যবস্থা করেছে।[৭২২] দেশের প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও আনুগত্য আছে বলেই জনগণ দলে দলে নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৯১ এর নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসন লাভ করে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিএনপির ভোটও লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এ নির্বাচনে ফলাফলে দেখা যায় পাহাড়িরা বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের দুটি প্রধান জাতীয় রাজনৈতিক দলের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়।

১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। ১৯৯১ এর মতো '৯৬ এর নির্বাচনেও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের রায় প্রদান করে। এ নির্বাচনেও খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবান আসন থেকে যথাক্রমে কল্প রঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার ও বীর বাহাদুর জয় লাভ করেন। এবারের নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংহতির ক্ষেত্রে নববারতা নিয়ে আসে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ পর পর দুটি নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের তিনটি আসনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে পাহাড়িদের সাথে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক আরও

---

[৭২১] শরদিন্দু শেখর চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন* (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ১৪৩।

[৭২২] আমি নিজে আমাদের পাশ্ববর্তী প্রাইমারী স্কুলে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে জনতার ঢল দেখেছিলাম।

ঘনিষ্ঠ হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনকে তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বাঁকবদলকারী নির্বাচন বলা সঙ্গত। সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্যবহ এ নির্বাচনে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ একুশ বছর পর রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাই এসেই দেড় বছরের মধ্যে দেশের সার্বভৌমত্ব, সংবিধানকে সমুন্নত রেখেই ২৪ বছরের অধিককাল যাবৎ ঘনীভূত জটিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিকভাবে সমাধান করেন ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি একটি মীমাংসিত প্রপঞ্চে পরিণত হয়। নিম্নের লেখচিত্রগুলোতে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অংশগ্রহণের চিত্র পাওয়া যায়।

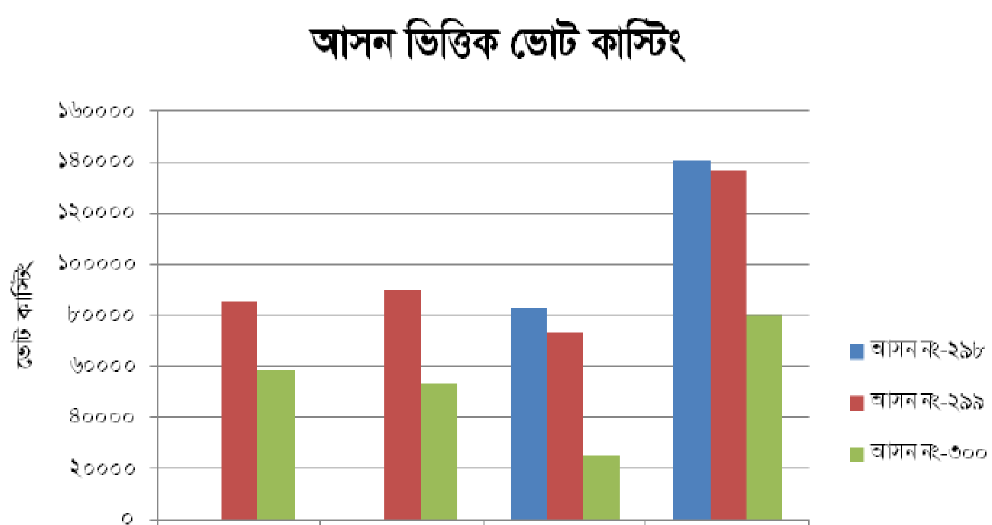

	১৯৭৩	১৯৭৯	১৯৯১	১৯৯৬
আসন নং-২৯৮	০	০	৮৩২৩৯	১৪১২৫৯
আসন নং-২৯৯	৮৫৪৫১	৯০০৬৮	৭৩৮৩৮	১৩৭৪৭৯
আসন নং-৩০০	৫৮৩২২	৫৩৯৪১	২৫২৮৬	৮০১৯২

[বি. দ্র. উপাত্তগুলো ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সমূহ থেকে নেয়া হয়েছে।]

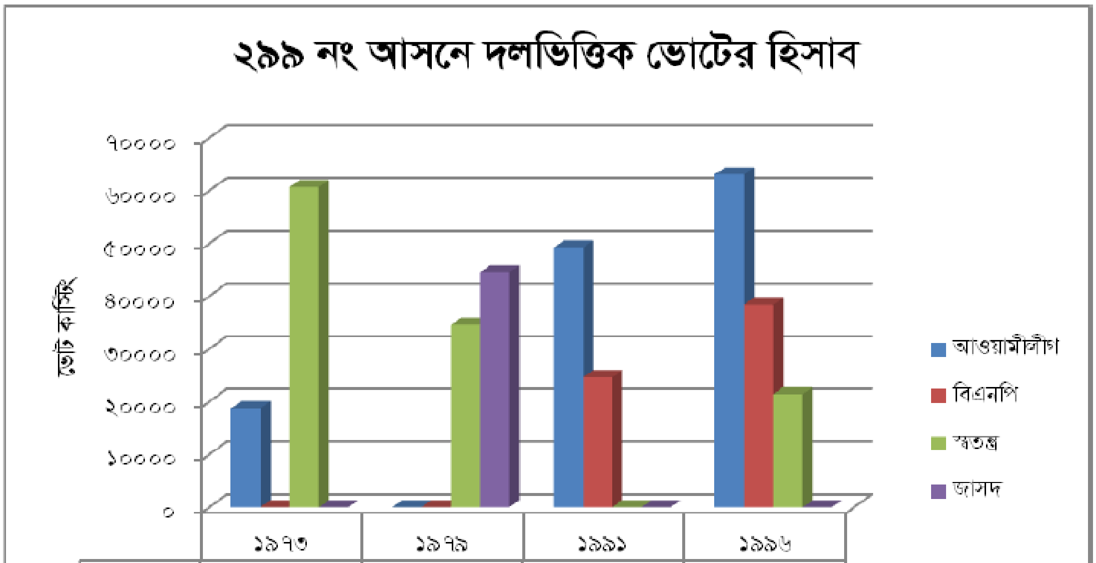

	১৯৭৩	১৯৭৯	১৯৯১	১৯৯৬
আওয়ামীলীগ	১৮৭৩৪	০	৪৯২২১	৬৩১০১
বিএনপি	০	০	২৪৬১৭	৩৮৪০৯
স্বতন্ত্র	৬০৭০১	৩৪৫৫৩	০	২১৪২২
জাসদ	০	৪৪৫২৮	০	০

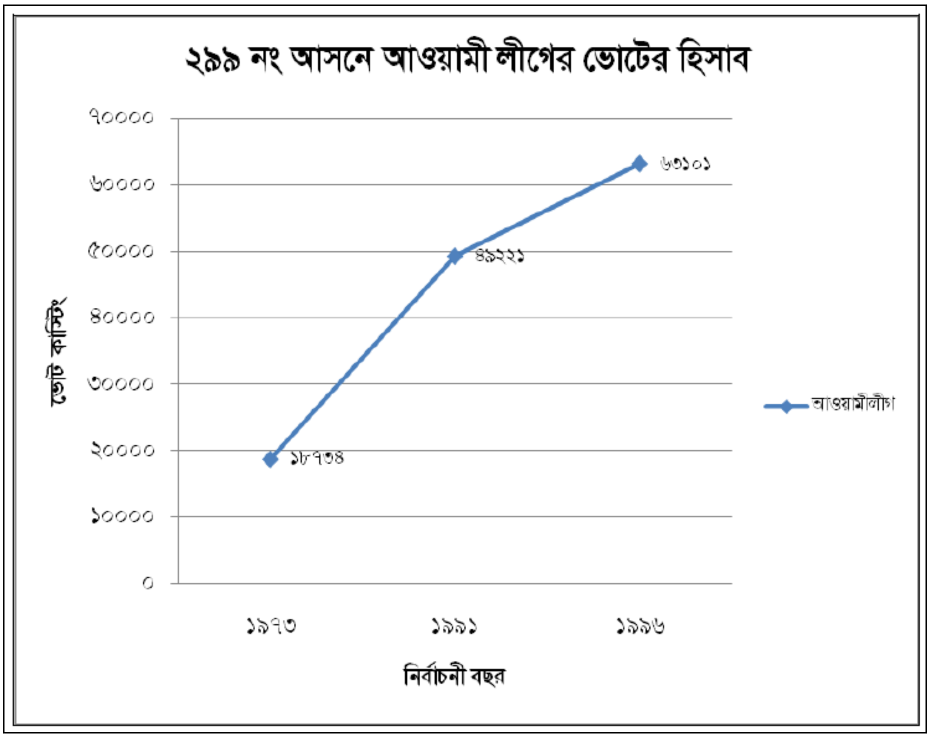

উপরের প্রথম লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ এ দুটি সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংসদীয় আসন ছিল দুটি কিন্তু ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে সংসদীয় আসন তিনটিতে বৃদ্ধি পায়। প্রতি আসনে জনগণের ভোট দানের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯৬ এর নির্বাচনে ২৯৯ নং রাঙামাটি ও

২৯৮ নং খাগড়াছড়ি আসনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক মঞ্চ রাঙামাটির আসনে যেখানে আওয়ামী লীগ তথা জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের সমর্থন ছিল বিশ হাজারের নিচে সেখানে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ তথা জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসমর্থন যথাক্রমে পঞ্চাশ ও ষাট হাজারের উর্ধ্বে উন্নীত হয় অর্থাৎ জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি পার্বত্যবাসীদের আগ্রহ তিনগুণ বৃদ্ধি পায়।

৬.৩ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্‌যোগে অন্তর্ভুক্তি

ক) বঙ্গবন্ধু সরকারের বাকশাল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকাকালে বাংলাদেশ সরকার দেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, স্থিতিশীলতা আননয়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তন্মধ্যে বাকশাল গঠন ছিল সবচেয়ে পাহাড়ি-বান্ধব। বাকশাল যদিও ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ নামীয় একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ইংরেজি নামের সংক্ষিপ্ত রূপ (BAKSAL) তথাপি এটি কেবল একটি সংগঠন নয়– একটি রাজনৈতিক দর্শন এবং একটি আদ্যপান্ত সরকার কাঠামো।[৭২৩] ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম বাকশাল ব্যবস্থা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে গণমূখী করার লক্ষ্যে ঢেলে সাজানোই ছিল বাকশাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। বাকশালের একটি বড় লক্ষ্য ছিল দেশের প্রভাবশালী আমলাতন্ত্রের সংস্কার সাধন। নতুন ব্যবস্থায় পুনর্গঠিত আমলাতন্ত্রকে দুটি ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল। এর একটি ছিল জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অপরটি জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কাউন্সিল।...উদ্দেশ্য ছিল, জেলা গভর্নর পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শোষণমূলক ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং স্বাধীনতাকে তাদের কাছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অর্থবহ করে তোলা সম্ভব হবে। ... একটি পদ্ধতি হিসেবে বাকশালের লক্ষ্য ছিল এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন, যে ব্যবস্থা আদর্শ ও প্রায়োগিক দিক থেকে কমবেশি সমকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অনুসৃত ব্যবস্থার কাছাকাছি।[৭২৪]

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িরা এই রাজনৈতিক দর্শনে নিজেদের স্বাধিকার লাভের পথরেখা খুঁজে পায় এবং বাকশালী সরকার কাঠামোর সাথে সংহতি প্রকাশ করে। এই সময়কার পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পরম্পরাগত সামাজিক নেতৃত্ব এবং আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব উভয়ই বঙ্গবন্ধুর বাকশাল

---

[৭২৩] আলী রীয়াজ, *শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৩৬।

[৭২৪] সিরাজুল ইসলাম, ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ৬ (ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।

ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এবারের আলোচনা বাকশাল ব্যবস্থা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তি ও তার প্রভাব প্রসঙ্গে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে সংবিধানকে চতুর্থবারের মতো সংশোধন করে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করেন। তখনকার সংবিধানে উল্লেখিত দেশের শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য পেশকৃত প্রস্তাবনাকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত করেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব' হিসেবে।[৭২৫] অতঃপর দেশের সার্বিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে যায় ব্যাপক পরিবর্তন। সংশোধনী মোতাবেক দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবার বিধি প্রবর্তিত হলো, তালুকদার মনিরুজ্জামান যেটাকে ''One-Party dictatorship and totalitarian control''[৭২৬] বলে বর্ণনা করেছেন সে-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতির ওপর একক ক্ষমতা অর্পিত হলো রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার। এই দলের নাম, কর্মসূচি, সদস্য সাংগঠনিক কাঠামো থেকে শুরু করে সবকিছুই রাষ্ট্রপতিই নির্ধারণ করবেন। ফলে নতুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন- এই বিধান সত্ত্বেও 'রাষ্ট্রপতি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান' দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানকে পরবর্তী ৫ বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগ করা হলো।[৭২৭] এতে করে দুবছর আগে ১৯৭৩ সালে পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাচিত সংসদ কার্যত নতুন করে আরো ৫ বছর বহাল রাখার ব্যবস্থা গৃহীত হলো।[৭২৮] ২৫ জানুয়ারির ওই পার্লামেন্ট অধিবেশনে শেখ মুজিব সংবিধানের আমূল পরিবর্তন ও তার প্রেক্ষিতে দেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্র ও শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।' অর্থাৎ এ বিপ্লব শোষণ আর অন্যায় থেকে দুঃখী মানুষের মুক্তি বয়ে আনবে।[৭২৯] চলমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেশের সাধারণ মানুষের কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে শেখ মুজিব বলেন, 'জনগণকে অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করা এবং শান্তি-তে ঘুমানোর ব্যবস্থা করার

---

[৭২৫] Lawrence Ziring, *Bangladesh: From Sheik Mujib to Ershad*, p. 105. দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে ছিল– সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন, একটি জাতীয় দল গঠন, ৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার অনুমতি, মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা, জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে জনগণের প্রতিনিধি বা গভর্নর নিয়োগ, সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, গ্রামে মাল্টিপারপাস বা বহুমুখী কো-অপারেটিভস, পল্লী অঞ্চলে হেলথ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, পরিকল্পিত পরিবার ইত্যাদি। দেখুন–হারুন অর রশিদ,*৭ই মার্চের ভাষণ : কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ*, (ঢাকা: অন্য প্রকাশ,২০১৮), পৃ. ৬০।

[৭২৬] Talukder Maniruzzaman, ``Bangladesh in 1975: The Fall of Mujib Regime and Its Aftermath'' in *Asian Survey*, (16.2(1976), pp. 119-129.

[৭২৭] Talukder Maniruzzaman, ``Bangladesh in 1975.

[৭২৮] ঐ,

[৭২৯] এ্যান্থনী মাসকার্নহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

জন্য একটি সুষ্ঠু প্রশাসন গড়ে তোলাই এই পরিবর্তনের কারণ।'[৭৩০] মুজিবের এই প্রত্যয় জাগে যে, জনগণ ঐক্যবদ্ধ না হলে এবং বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আগাগোড়া পরির্বতন না করলে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা রূপায়ন সম্ভবপর নয়। শেখ মুজিবের শাসনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিশ্লেষক মওদুদ আহমেদের মতে, ''Mujib called it a 'Second Revolution' through which exploitation of people would come to an end. He ended by saying ''we have to work sincerely and honestly for the emancipaiton of the poor people of the country.'' [৭৩১]

উপর্যুক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং বিগত ৩ বছরের বেদনাদায়ক, দুঃস্বপ্নের মতো রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ক্রান্তিকালের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের তদানীন্তন বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি নতুন জাতীয় রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করেন– বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। এমনকি দুটো রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটি (সিপিবি) ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)–(মোজাফ্‌ফর) তাদের দলীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে বাকশালে একীভুত হয়ে যায়। এমনকি জননেতা মাওলানা ভাসানীও পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।[৭৩২] পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর ১১৭-ক বিধি বিধান অনুযায়ী এই দলকে 'জাতীয় দল' বলে আখ্যায়িত করে একটি আদেশ জারি করেন।[৭৩৩] সিপিবি নতুন ব্যবস্থাকে 'সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান,' 'জনগণের সাচ্চা গণতন্ত্র তথা শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও 'নতুন জাতীয় ঐক্য কায়েমের ব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করল।[৭৩৪] ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনে ঢাকায় প্রদত্ত সর্বশেষ ভাষণ ও সর্বশেষ বড় জনসভায় উপস্থিতি। ওই জনসভায় তিনি বাকশাল পার্টির কর্মসূচি ও সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা করেন। সংক্ষেপে পার্টির কর্মসূচির মধ্যে ছিল, গভর্নরি শাসনভিত্তিক প্রশাসনিক সংস্কার, সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক সংস্কার, ট্রাইবুনালভিক্তিক বিচার ব্যবস্থা, জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ়করণ ও দেশদ্রোহীদের দমনের জন্য রাজনৈতিক সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও কালোবাজারি উচ্ছেদের লক্ষ্যে সামাজিক সংস্কার অন্যতম।[৭৩৫]

৭ জুন ১৯৭৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির এক আদেশবলে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা করা হয়। উক্ত গঠনতন্ত্রে চারটি রাষ্ট্রীয় মূল আদর্শের ভিত্তিতে শোষণমুক্ত

---

[৭৩০] আলী রীয়াজ, *শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: আনন্দধারা, ১৯৮৭), পৃ.৪০-৪১।

[৭৩১] Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman* p.289

[৭৩২] Lawrence Ziring, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

[৭৩৩] এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২।

[৭৩৪] সিপিবি-র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদের বিবৃতি, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫, *দৈনিক ইত্তেফাক।* উদ্ধৃত-আলী রীয়াজ, পৃ. ৬০।

[৭৩৫] আলী রীয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

সমাজ প্রতিষ্ঠাকেই বাকশালের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৭৩৬] বাকশালের সাংগঠনিক কাঠামোতে দেখা যায় দলের চেয়ারম্যান হচ্ছে সর্বোচ্চ পদ, এর পরবর্তী ধাপগুলো হচ্ছে যথাক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কাউন্সিল। দলের গঠনতন্ত্রে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বা নির্ধারণের কোনো উপায় উল্লেখিত হয়নি। তবে দল গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নতুন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় সংস্থা কার্যনির্বাহী কমিটিতে চেয়ারম্যান ছাড়া যে ১৪ জন সদস্য তাদের মনোনয়ন দেয়ার সমস্ত অধিকার চেয়ারম্যানের হাতে দেয়া হয়েছে গঠনতন্ত্রে। অন্য দিকে ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ সদস্য মনোয়ন দেয়ার ক্ষমতা চেয়ারম্যানের হাতে রেখে দেওয়া হয়।

১৯৭৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাকশালের সাংগঠনিক রূপরেখা প্রকাশের আগে ১২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাঙামাটি সফরে আসেন। ওই সফরে তিনি জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে তাঁর সরকারের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন। রাঙামাটির স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজাতীয় প্রধান, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ভাষণদান কালে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'জাতীয় সংখ্যালঘুদে'র ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবশ্যই রক্ষা করা হবে। বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী কর্মকাণ্ডে তাঁর এ প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটে। বাকশালের অধীনে গঠিত ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাপূর্ণ কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে একজন পাহাড়ি প্রতিনিধিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তিনি হলেন মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারকারী ও সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা মানিকছড়ির মং রাজা বঙ্গবন্ধুর উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা মং প্রু সাইন। সোয়া সাত কোটি জনসংখ্যার দেশের একটি মাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পাওয়া রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির উজ্জ্বল স্মারক বহন করে।

২৭-এ জানুয়ারি ১৯৭৫ তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি পৃথক জেলায় বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালের ১৯ জুন অনুষ্ঠিত বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধু দেশের ভবিষ্যত প্রশাসনিক রূপরেখা বর্ণনা করে বলেন,

> (বাংলাদেশকে) ভাগ করা হবে ষাটটি জেলায়। প্রত্যেক জেলার জন্যে একজন গভর্নর থাকবেন। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তাঁর অধীনে এসপি থাকবেন। দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, সংসদ সদস্যরা থাকবেনম জনগণের প্রতিনিধিরা থাকবেন। (ডিস্ট্রিক্ট) কাউন্সিলে সরকারী কর্মচারীরাও থাকবেন। প্রত্যেক জেলায় অর্থাৎ বর্তমান মহকুমাসমূহে একটি করে এডমিনিস্ট্রেডিভ কাউন্সিল থাকবে এবং তার একজন গভর্নর থাকবেন। তিনি স্থানীয়ভাবে শাসন ব্যবস্থা চালাবেন। ... জেলা গভর্নরের কাছে যাবে আমার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা। তাঁর কাছে যাবে আমার খাদ্য সামগ্রী। তাঁর কাছে যাবে আমার টেস্ট রিলিফ, লোন, বিল ও সেচ প্রকল্পের টাকা। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাইরেক্ট কন্ট্রোলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ও ডিস্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালিত হবে।[৭৩৭]

[৭৩৬] এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১।
[৭৩৭] এম. এ ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩।

এ পরিকল্পনা ও কর্মসূচির আলোকে বঙ্গবন্ধু সরকার ২১ জুন রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিদ্যমান ১৯টি জেলা ভেঙ্গে ৬১টি জেলার প্রশাসনিক কাঠামো ঘোষণা করে।[৭৩৮] ৭ জুলাই তারিখে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিল পেশ করা হয় এবং ৯ জুলাই তারিখে জাতীয় সংসদ বাংলাদেশ জেলা পুনর্গঠন বিল অনুমোদন করে।[৭৩৯] তবে বাকশাল পদ্ধতির আওতায় প্রণীত উক্ত গভর্নরি শাসনভিত্তিক জেলা কাউন্সিল ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে অন্যদের জন্য পরিসর (স্পেস) সৃষ্টিকারী (অ্যাকোমোডেটিং) প্রতিষ্ঠান। মওদুদ আহমেদের মতে,

> But the most interesting aspect was the administration of the district was now vested in a politically appointed Governor as opposed to a bureaucrat like District Magistrate or Deputy Commissioner.All the planing implementation, maintenance of the law and order and administration of the entire district would now be co-ordinated and supervised by a person holding a political office. Mujib argued that it would (i) take the administration closer to the people and help in replacing the old colonial system; ii) ensure decentralisation of the administration; (iii) bring all the branches of the government i. e. departments of food, agriculture, family planning, education and all others under one command and the tendency of the government departments working independent of each other or in indifference to each other by shifting responsibities would go; (v) ensure participation of people in preparing development plans and their inplementation and (v) make the district administration efficient and responsible under a single political leadership.[৭৪০]

সেই আলোকে ১৯৭৫ এর ১৬ জুলাই ৬১ জন নবনিযুক্ত গভর্নরের নাম ঘোষিত হয়। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি জেলায় পূনর্বিন্যাস করা হয়– রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। খাগড়াছড়ির গভর্নর নিযুক্ত হন মং রাজা মং প্রু সাইন আর বান্দরবানের গভর্নর হন বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী। রাঙামাটির গভর্নর নিযুক্ত হন তৎকালীন জেলা প্রশাসক এ এম. আব্দুল কাদের; যাঁকে চাকমা লেখক ও সাবেক রাষ্ট্রদূত এস এস চাকমা ''a real friend of the tribal people of Chittagong Hill Tracts.'' এবং ''a man of great human qualities'' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৭৪১] তাঁর মনোয়ন নিয়ে পাহাড়িদের মনে ক্ষোভ, হতাশা বা সংশয় ছিল না কারণ এস এস চাকমার মতে, জনাব কাদির অত্যন্ত মানবদরদী, সহৃদয়বান ও পাহাড়িদের অধিকার ও জীবনদর্শনের প্রতি সংবেদনশীল, সহানুভূতিশীল।

---

[৭৩৮] Talukder Maniruzzaman, ``Bangladesh in 1975.

[৭৩৯] ঐ, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

[৭৪০] Moudud Ahmed, *Bangladesh*, pp. 294-295.

[৭৪১] এস এস চাকমা, *দ্য আনটোল্ড স্টোরি*, পৃ. ১২-১৩।

বঙ্গবন্ধু সরকার শুধু গভর্নর নিয়োগ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেনি। তিনটি জেলায় জেলা কাউন্সিলের সেক্রেটারিও হিসেবে নিযুক্ত হন তিনজন পাহাড়ি গুরুত্বপূর্ণ নেতা। রাঙামাটিতে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চারু বিকাশ চাকমা। দলীয় পরিচয়কে ভিত্তি করে তাঁর এ পদে আসীন হওয়া স্থানীয়, জাতিগত এবং দলীয় তিন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে অনন্ত বিহারী খীসার খাগড়াছড়ি জেলা কাউন্সিলের সেক্রেটারি পদে নিযুক্তিও নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মি. খীসা ১৯৫০ সালে স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। পরবর্তী সময়ে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি রামগড় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং ছাত্রাবস্থা থেকে প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। বান্দরবানে সম্পাদক নিযুক্ত হন কে এস প্রু।[৭৪২] রাঙামাটি জেলার ন্যাপ নেতা যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা ও ডা. এ কে দেওয়ান।[৭৪৩]

বাকশাল সরকারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে তাৎপর্যময় ঘটনা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও জাতিগত পরিচিতির সাংবিধানিক স্বীকৃতির অধিকার আদায়ের অগ্রদূত ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জন-সংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাই থোয়াই রোয়াজা– এদুজন সাংসদের বাকশালে যোগদান। তাঁদের এ যোগদানকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বাকশাল কাঠামোতে কোনো পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি বা পৃথক জাতিপরিচয়ের স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগও ছিল না। ছিল সমগ্র দেশের মেহনতি মানুষের মুক্তির বার্তা। তার মানে এই যে লারমা তাঁর আদর্শিক অবস্থান থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর এলাকার অনগ্রসর পাহাড়িরাও এই কাঠামোর মধ্যে নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারবে। সিদ্ধার্থ চাকমার মতে, তিনি (লারমা) বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সারা দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উপজাতি সমস্যা সমাধানে বিশ্বাসী।[৭৪৪] তৎকালীন ন্যাপ নেতা জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার অভিমত হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র প্রশাসনিক মর্যাদার দাবি তাৎক্ষণিকভাবে মেনে না নিলেও এর একটা সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস দিলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিজেই বাকশালে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দিন পর্যন্ত তিনি বাকশালের সদস্য ছিলেন।[৭৪৫] অন্যদিকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার এক সময়ের রাজনৈতিক সতীর্থ, পঙ্কজ ভট্টাচার্যের মতে, লারমা ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া হওয়াতে লারমা বাকশালে যোগদান করেন। পঙ্কজ ভট্টাচার্যের ভাষ্যটি ছিল:

---

[৭৪২] প্রদীপ্ত খীসা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

[৭৪৩] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- ডাঃ এ কে দেওয়ান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, রাঙামাটি পৌরসভা, তারিখ ১৫/২/২০১৫ স্থান তাঁর তবলছড়ি বাজারস্থ চেম্বার।

[৭৪৪] সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম*, পৃ. ৬২।

[৭৪৫] জে বি চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

> ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব তার দলের ব্যর্থতা ও জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে বাকশাল নামে একমাত্র পার্টি গঠনের জন্য যখন মরিয়া হয়ে উঠেন তখন তিনি আতাউর রহমান, মো. তোয়াহা এবং মানবেন্দ্র লারমাকে বাকশালে যোগ দিতে পৃথক পৃথক ভাবে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে এম এন লারমার এই বৈঠক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমার ক্ষুদ্র উদ্যোগ কিছুটা ছিল। এ বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সাথে এম এন লারমার দীর্ঘ তর্ক বিতর্ক ও কার্যকর আলোচনা হয়। আলোচনায় বঙ্গবন্ধু পাহাড়ী জনগণের সংস্কৃতি-অর্থনীতি, ভাষা-ঐতিহ্য রক্ষার্থে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার হিসেবে অনেকাংশে স্বশাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন এই শর্তে যে, এম এন লারমাকে বাকশালে যোগ দিতে হবে, অবশেষে লারমা বঙ্গবন্ধুর এ শর্ত মেনে নেন।[৭৪৬]

এম এন লারমার বাকশালে যোগদান তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। রাজনীতিতে 'শেষকথা' বলে কিছু নেই। সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খেয়ে নেতৃত্ব রক্ষা করে দেশ ও জনগণের উন্নতির পথ সুগম করাই রাজনীতির মূখ্য উদ্দেশ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কাঠামো নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর পর বাংলাদেশ সরকারের নীতি সম্বন্ধে পাহাড়িদের মনে আস্থা ফিরে আসে। শুরু হয় নতুন উদ্যোগে পথচলা। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপে একটা আশাপ্রদ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

> The transformation of the tribal spirit into civic sentiment cannot be achieved under coercion or threat of force. The political integration of the tribal society can only come through mutual respect and reciprocity. The political socialization of the tribal groups can only bring about the desired integration.[৭৪৭]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কেন্দ্রিক পদক্ষেপসমূহ একটি বিশেষ অঞ্চল ও মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও শুভ রাষ্ট্রনীতির পরিচায়ক। এভাবে কেন্দ্র ও অঞ্চলের পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থান (পলিটিক্যাল স্পেস) সৃজনী নীতি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার যে পাহাড়িদেরকে বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, আরক্ষা সর্বক্ষেত্রে টেনে আনতে বদ্ধ পরিকর তার সরকারের গৃহীত নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ তার প্রমাণ হাজির করে।

প্রথমত, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সার্কেলের চিফ ও রাজা হিসেবে দেশত্যাগ ও পাকিস্তানপন্থী রাজা ত্রিদিব রায়ের নাবালক ছেলে দেবাশীষ রায়কে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। তাঁর এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অগ্রসর চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারি নীতির প্রতি আস্থাবর্ধক এবং জাতিগত সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বিরাট মাইলফলক।

---

[৭৪৬] পঙ্কজ ভট্টাচার্য, "জুম্ম জাতির স্থপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা" দীপায়ন খীসা (সম্পা.) *মাওরুম: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিশেষ সংখ্যা* (ঢাকা: হিল রিসার্চ এন্ড প্রোটেকশন ফোরাম, ২০০৯), পৃ. ১৩-১৭।

[৭৪৭] Rafiqul Islam Chowdhury, M. Mizanur Rahman Miah, Mosharraf Hossain, A. F. Hasan Chouwdhury, A. H. Golam Quddus, *Tribal Leadership and Political Integration: A Case Study of Chakma and Mong Tribes of Chittagong Hill Tracts*, p.104.

দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুন্নত ও অবহেলিত পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ দানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বৈদেশিক বৃত্তি মঞ্জুরের ব্যবস্থা। সরকারের এই উদার ও প্রগতিশীল পদক্ষেপের সুবাদে, ড. আদিত্য কুমার দেওয়ানের পর্যবেক্ষণ অনুসারে ১৯৭০ এর দশকে কমপক্ষে ২৫ জন চাকমা শিক্ষার্থীকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো হয়।[৭৪৮] বাংলাদেশ সরকারের এসব পদক্ষেপ যথার্থ ও সুদূরপ্রসারী। এছাড়া দেশের খ্যাতনামা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৭ জুনের *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার তথ্যানুসারে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৩টি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ২টি, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি, কৃষি কলেজে ২টি এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহে ৫টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

তৃতীয়ত, বঙ্গবন্ধু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ও আবাসনের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম ও ঢাকা শহরে দুটি বাড়ি বরাদ্দ প্রদান করে। এটি গরিব পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাষ্ট্রের প্রদত্ত সেরা উপহার যেটাকে পুঁজি করে পরবর্তীতে অনেক পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষার পাঠ সম্পন্ন করে। এছাড়া পাহাড়ি ছাত্রাবাসগুলো ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মধ্যে সামাজিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক ঐক্যের সূতিকাগার হিসেবে কাজ করে। চতুর্থত, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষায়িত উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। পরে জিয়ার আমলে সেটি প্রতিষ্ঠিত হলেও উদ্দেশ্য পাল্টে যায়। পঞ্চমত, জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে তিনশত পাহাড়ি যুবককে নিয়োগের ঘোষণা দেন এবং নিয়োগ শুরু হয়। বান্দরবানের রুমা থানা থেকে সাধুরাম ত্রিপুরার ১৯৭৫ সালে জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে যোগদান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বাস্তবায়নের উদাহরণ।

খ) স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে পাহাড়িদের অন্তর্ভুক্তি

এরশাদের বেসামরিক বেশে সামরিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির জন্য যে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছিল তাকে 'পলিটিকস্ অব এথনিক একমোডেশন' বলা যায়। তদনুসারে ১৯৮৯ সালে সংসদীয় আইন দ্বারা তিন পার্বত্য জেলায় সীমিত স্বশাসনের ক্ষমতাসহ স্থানীয় সরকার (জেলা) পরিষদ গঠন ছিল প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর থেকে ১৯৮৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার অনুষ্ঠিত পর পর ছয়টি বৈঠকের ব্যর্থতার পর নবগঠিত তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের ধারণাটি সক্রিয় হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের সৃষ্টিকে 'সামরিক পরিকল্পনার ফসল

---

[৭৪৮] Aditya Kumar Dewan, *Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh*, p. 349.

বা কাউন্টার ইন্সারজেন্সির কৌশল’[৭৪৯] হিসেবে মূল্যায়ন করে। জেনারেল জিয়ার আমলে বাংলাদেশ সরকারের নীতির অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গটি সামরিক বাহিনী একচেটিয়াভাবে দেখভাল করতো। চট্টগ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুর এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রচুর কাজ করেন। এসব দিক অবলোকন করে এ্যান্থনী মাসকারেনহাস বলেছেন, ‘‘পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার সুযোগ নিয়ে মঞ্জুর ঐ এলাকায় এক ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।”[৭৫০] ফলে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এরশাদের সামরিক সরকার উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান কল্পে নয় দফা[৭৫১] প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে।

কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হয় বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের নমনীয় ধারার পাহাড়ি নেতাদের সংলাপের ফসল হলো তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন। বাংলাদেশ সরকার দেশের সংবিধান ও সার্বভৌমত্বের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে যে সীমিত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে তা পাহাড়িদের অনমনীয় ধারার প্রতিনিধিত্বকারী শান্তিবাহিনী তখন প্রত্যাখ্যান করলেও এ পদক্ষেপ ছিল সংসদীয় আইন দ্বারা পাহাড়িদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিসর সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন সাংসদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, “স্মরণাতীত কাল থেকে এ পর্যন্ত উপজাতীয়দের স্বার্থে যত আইন প্রণীত হয়েছে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন-১৯৮৯ ই নিঃসন্দেহে বাস্তবধর্মী ও কল্যাণকর একটি আইন।”[৭৫২]

স্বৈরশাসক এরশাদের সরকার সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত সরকার হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রেক্ষাপটে এ প্রতিষ্ঠানগুলো সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অনড় শান্তিবাহিনীর চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও কেন পার্বত্য চট্টগ্রামের নমনীয় ধারার নেতৃবৃন্দ সরকারের সাথে সংলাপ ও সমঝোতায় উপনীত হলো তার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

---

[৭৪৯] পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, *জীবন আমাদের নয়* (ঢাকা: ২০০১), পৃ. ৭৬।

[৭৫০] এ্যান্থনী মাসকার্নহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯।

[৭৫১] সরকার প্রদত্ত নয় দফা রূপরেখা হলো: ১) সংবিধানের ২৮ ধারার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলাকে বিশেষ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা। ২) সংবিধানের ৯ ও ২৮ ধারার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক পৃথক জেলা পরিষদ গঠন। ৩) বিষয় বিভক্তি স্থিরকরণ। ৪) সংবিধানের ৬৫ ধারার আলোকে জেলা পরিষদসমূহকে মূল আইনের অধীন নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন, আদেশ, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়ন, জারি এবং কার্যকরী করার ক্ষমতা অর্পণ। ৫) জাতীয় সংসদ কর্তৃক কোন আইন, জেলা পরিষদ কর্তৃক নিজস্ব এলাকার জন্য আপত্তিকর বিবেচিত হলে সংসদে পুনর্বিবেচনার দাবী সরকারকে অবহিত করার জন্য আইনগত ক্ষমতা অর্পণ। ৬) জেলা ও উপজাতীয় সার্কেলের এলাকা একত্রীকরণার্থে সীমানা পুনর্নির্ধারণ। ৭) জেলা প্রধান ও উপজাতীয় প্রধানের সমন্বিত অবস্থান নির্ণয়। ৮) প্রতি সার্কেলে পুলিশবাহিনী গঠন। ৯) পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলের যথাযথ বাস্তবায়ন অথবা বাতিল করন। – সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ ২০০৪), পৃ. ২২২।

[৭৫২] খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রথম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা *প্রাগ্রীত প্রহর* , খাগড়াছড়ি, ১৯৯০। পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ নেই।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে রক্তপাত, অস্ত্র হিংসা-প্রতিহিংসা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়। পূর্ববর্তী সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনের পরিবর্তে ধর্মভিত্তিক, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে।[৭৫৩] পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনীতিতেও অস্বস্তিকর, অস্থিতিশীল জাতীয় রাজনীতির প্রভাব পড়ে এবং স্থানীয় রাজনীতির হালচাল অকস্মাৎ আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটে যায়। বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রবর্তিত বাকশাল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির মধ্যে যে সমন্বয়, সমঝোতা ও ঐক্যের সূত্রপাত হয় নিমিষেই তার যবনিকাপাত ঘটে। অতঃপর জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয়ক্ষেত্রে উত্থান ঘটে চরমপন্থার। রাষ্ট্রক্ষমতা যেমন সামরিক বাহিনীর কুক্ষিগত হয় তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার কর্তৃত্ব চলে যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন গোপন সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর হাতে। বিকাচ কুমার চৌধুরীর বর্ণনাতে এর সঠিক চিত্র পাওয়া যায়,

> They established a sort of parallel administration in CHT. They openly collected taxes and tried people for different offences. The PCJSS and the Shanti Bahini together had set up different wings of their own administration like intelligence, Communication, Supply, Training, Militia Department, Finance etc.[৭৫৪]

জেএসএস তার সংগ্রামের ধারা ও কর্মপদ্ধতিকে 'ছায়া সরকার' বা 'শ্যাডো গভর্নমেন্ট' হিসেবে গণ্য করে।[৭৫৫] সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের মতে এটি ছিল 'শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপ্রকাশ্য প্রশাসন' যার আলামত তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৭৫৬] এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ দ্বৈত সামরিক শাসনের কবলে নিপতিত হয়। সামরিক বাহিনী পরিচালিত বাংলাদেশ সরকার যেমন গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে দ্রুত অসংখ্য সামরিক বেস্টনীর মধ্যে পরিবেষ্টন করে তেমনি শান্তিবাহিনী কৌশলগত উপায়ে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেক্টর, জোন, সাব-জোন, অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভক্ত করে গড়ে তোলে গেরিলা ও গণমিলিশিয়া বাহিনী।[৭৫৭]

---

[৭৫৩] জিয়াউর রহমান সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানি রহিম' যুক্ত করেন। এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে সংবিধান সংশোধন করেছেন।

[৭৫৪] Bikach Kumar Choudhury, *Genesis of Chakma Movement 1772-1789* (Agartala: Tripura Darpan Prakashani, 1991), p. 11.

[৭৫৫] মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, শান্তিবাহিনীর উর্দ্ধতন কমান্ডার মেজর মলয় প্রকাশ শ্রী উষাতন তালুকদার এর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন: "আসলে আমরা ছিলাম একটা 'শ্যাডো গভর্নমেন্ট'। গ্রামের বিচার থেকে শুরু করে সবকিছুই আমরা নিয়ন্ত্রণ করতাম। পাহাড়িরা কখনো প্রশাসনের কাছে যেতো না। খুনের মামলা থেকে শুবু করে সবকিছুই আমরা দেখতাম। সামরিক বিভাগ, বিচার বিভাগ, এরকম প্রতি বিষয়ে আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। এভাবেই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শ্যাডো গভর্নমেন্ট' চালাতাম। এ কারণে পাহাড়ি সমাজে কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা ছিল না।" পৃ. ৩১৮।

[৭৫৬] মে. জে. সৈয়দ মুহম্মদ ইবরাহিম, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন* ,পৃ. ২৪০।

[৭৫৭] Subir Bhaumik মনে করেন, The PCJSS-Shanti Bahini has had by far the best organizational

বাংলাদেশের সামরিক সরকারের লক্ষ্য দেশের সংবিধান, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা সুরক্ষা। অন্যদিকে শান্তিবাহিনী চায় পার্বত্য চট্টগ্রামে 'জুম্ম জাতির' পরিচয়, জাতিগত অস্তিত্ব, ভূমি অধিকার ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (পরে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন) কায়েম করতে। উভয়পক্ষ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সামরিক সমাধানের পথ বেছে নেয়। এতে বৈপরিত্যের মধ্যে সমন্বয় সমাধানের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার অন্তর্ধান ঘটে। এমতাবস্থায় একদিকে পাকিস্তানি ভাবধারার সেনাশাসক জিয়ার সামরিকায়ন ও জনস্থানান্তর নীতি এবং তার উত্তরসুরী পাকিস্তান ফেরত ফৌজি শাসক হু. মু. এরশাদের অরাজনৈতিক সামরিক প্রভাবান্বিত সরকারের ইসলামী ভাবধারার জিহাদী শাসন অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জনজীবন নাজুক করে তোলে। ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর এ অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে: 'পাহাড়ি জনগোষ্ঠী পড়ে গেল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও শান্তিবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থানের মাঝখানে উভয় সংকটে।'[৭৫৮] এরশাদ সরকারের সময় দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ফারুক চৌধুরীর মতে,

> দেশের রাজনৈতিক আকাশে এক ভয়াবহ দুর্যোগ নামল। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর সহিংস কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেল। তার সঙ্গে বৃদ্ধি পেল সেই এলাকায় সামরিক প্রতিক্রিয়া। দেশের রাজনীতি তখন সামরিক আইনের হাতে জিম্মি। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা হলেন সেই পরিস্থিতির নির্মম শিকার। এরশাদশাহির দশকটি পার্বত্য চট্টগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬, প্রথমে সামরিক আইনের এবং পরে বেসামরিক বেশে সামরিক কর্তৃত্বের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামে হিংসাত্মক কার্যকলাপ আর তার তাৎক্ষণিক সামরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে হাজার হাজার আদিবাসী শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিল।[৭৫৯]

এতে মুক্তিযুদ্ধের মতো ন্যায়যুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বহির্বিশ্বে যে একটি নিষ্পাপ শান্তি-প্রিয় অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি ছিল জিয়া ও এরশাদ সরকারের পৌনপুনিক সামরিক শাসন ও দেশের একটি অঞ্চলে মানবাধিকার পরিপন্থী কৃতকর্মের পরিণামে সেই ভাবমূর্তি মুছে গিয়ে জায়গা করে নিল স্বৈরাচার, মানবাধিকারহরণকারী, সাম্প্রদায়িক সরকারের ভাবমূর্তি। জিয়া ও এরশাদের আমলের প্রথম দিকে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার চাকমা ও অন্যান্য উপজাতি শরণার্থী ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছু উপজাতি আন্তর্জাতিক সীমান্তের দুর্গম এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট এই মানবিক ট্রাজেডি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে দেয়।[৭৬০] এমতাবস্থায় বহির্বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠনগুলো এরশাদের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন

---

structure ever evolved by any underground group in the triangle. *প্রাগুক্ত*, p. 271.

[৭৫৮] ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম, খ্রিস্টান মিশনারী ও বৌদ্ধধর্মের ভবিষ্যৎ-১' *পার্বত্য নিউজ* ২৯ এপ্রিল ২০১৩।

[৭৫৯] ফারুক চৌধুরী, *জীবনের বালুকা বেলায়*, পৃ. ৪০৪-৪০৫।

[৭৬০] নূহ-উল আলম লেনিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

করে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ, আইএলও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগজনক প্রতিবেদন[৭৬১] প্রকাশ করে। শুধু তাই নয় ১৯৮৬ সালের ১১ অক্টোবরে নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম শহরে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো এক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং বাংলাদেশ সরকারকে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পেশ করে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আর্মি ও প্যারামিলিটারি বাহিনী প্রত্যাহার করা;
২) পার্বত্য চট্টগ্রামে অবিলম্বে অ-উপজাতীয় পুনর্বাসন বন্ধ করা;
৩) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পুনর্বাসিত বসতিস্থাপনকারীদের সরিয়ে নেওয়া এবং তাদের দখলিকৃত জমি ট্রাইবেল জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়া।
৪) পার্বত্য অঞ্চলে মানবাধিকার সাহায্য সংস্থা, সাংবাদিক ও স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করা।
৫) ইতিমধ্যে ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী যাদের জীবিকার কোনো ব্যবস্থা নেই তাদেরকে সরকারি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬) পাহাড়ি জনগণের স্বার্থবিরোধী প্রকল্পে বৈদেশিক অনুদান ও সাহায্য ব্যবহার না করা।[৭৬২]

এস এস চাকমার মতে, এসব কারণে এরশাদ সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট খুবই চাপের মুখে পড়ে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার সমস্যার কোনো উন্নতি না হলে আন্তর্জাতিক সাহায্য বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে জেনারেল এরশাদের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান সমস্যার আশু সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উপেন্দ্র লাল চাকমা, নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা এবং কে এস প্রু কে নিয়ে একটি যোগাযোগ কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮৭ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিম্নোক্ত বিবৃতি থেকে তাঁর সরকারের অবস্থান আঁচ করা যায়,

> We are always interested and ready to do everything necessary to take back and rehabilitate all those genuine Bangladeshis who were compelled to leave the country and take shelter abroad through organized terrorism and propangada. But the success of our sincere efforts does not depend only on our good intention. I hope that barriers in the way of repatriation of the refugees would be removed soon and they would be able to return to their homesteads.[৭৬৩]

---

[৭৬১] Amnesty International, *Bangladesh: Unlawful Killings and Torture in the Chittagong Hill Tracts* (London: AI Publications index : ASA/13/2186, 1986)
[৭৬২] Subir Bhaumik, *Insurgent Crossfire: North-East India*, p. 301.
[৭৬৩] Avtar Singh Bhasin (ed.), *India Bangladesh Relations Documents–1971-2002*, vol. V (New Delhi: Geetika Publishers, 2003), p. 2497.

অন্যদিকে ভারতের তৎকালীন রাজীব গান্ধীর সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা থেকে সৃষ্ট চাকমা শরণার্থী সমস্যার দ্রুত এবং স্থায়ী সমাধানের জন্য এরশাদ সরকারকে তাগাদা দেয়।[৭৬৪] চাকমা শরণার্থী তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করার অভিপ্রায়ে ১৯৮৭ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তাঁর মন্ত্রীসভার জ্যৈষ্ঠ মন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাওকে এরশাদের দরবারে বিশেষ দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। মি. রাও ঢাকা ছাড়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট এরশাদের 'এ্যাকশন প্লান' এর কথা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সমূখে উপস্থাপন করবেন বলে উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করেন।[৭৬৫] প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বিশ্লেষক সুবির ভৌমিকের মতে, ''Mr. Rao is said to have assured H. M. Ershad that India wanted a settlement of the CHT problem within the frame work of a united and sovereign Bangladesh.''[৭৬৬] মি. রাও এর এ সফরের রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম। এর একমাস পর ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তারিখে এরশাদ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। তিনি ভারতীয় দূতের আশ্বাসে এতটাই নির্ভার হন যে পাহাড়ি প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঐ বৈঠকে তিনি উচ্ছ্বসিত চিত্তে বলেছিলেন, "আপনারা যা চান আমি এখনই তা দিব। আমার সরকারের পক্ষ থেকে আমি এখনই স্বাক্ষর করবো। তবে শর্ত হচ্ছে আপনারা যা চাইবেন তা যেন বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে হয়।"[৭৬৭] ঐ বৈঠকের পর পরিকল্পনামন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি জাতীয় কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃতি চিহ্নিত করে সুপারিশমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করে যেখানে তিনজন ছিলেন ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন ও কর্মরত কূটনীতিক। ওই কমিটির অন্যতম সদস্য দিল্লিতে নিযুক্ত তৎকালীন বাংলাদেশি হাইকমিশনার ফারুক চৌধুরীর মতে, "যার সদস্যরা সবাই ছিলেন সামরিক এবং বেসামরিক আমলা। তাঁরা এদেশের জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন না, ছিলেন এক নায়কের মেজাজবাহক।"[৭৬৮] তবুও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এরশাদ সরকারের এ উদ্যোগ ছিল স্বৈরাচারি সরকারের পক্ষে একটি গঠনমূলক ও প্রগতিশীল পদক্ষেপ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার জনসংহতি সমিতির বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রয়াস জিয়াউর রহমানের সরকার প্রথম নিয়েছিল ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে *ট্রাইবেল কনভেনশন* বা উপজাতি সম্মেলন গঠনের মধ্য দিয়ে। এটি সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে

---

[৭৬৪] ibid.

[৭৬৫] ibid p. 2508.

[৭৬৬] Subir Bhaumik, `Strategic Pawn: Indian Policy in the Chittagong Hill Tracts' in Subir Bhaumik et al (eds.) *Living on Edge: Essays of the Chittagong Hill Tracts,* (Calcutta: South Asia Forum for Human Rights, Kathmandu, 1997), p.127-138.

[৭৬৭] সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩১-২৩২।

[৭৬৮] ফারুক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত, ।*

পাহাড়ি সিভিল সমাজকে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম দেওয়ার একটি অসামরিক উদ্‌যোগ। একজন সাবেক সেনাকর্মকর্তা ও লেখকের মতে, "ট্রাইবাল কনভেনশনের উদ্দেশ্য ছিল, পাহাড়ী জনগণের সেন্টিমেন্টকে গোপন তৎপরতা থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং অতঃপর জাতীয় রাজনীতির মূলধারা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা।"[৭৬৯] সেই ট্রাইবেল কনভেনশন গঠনের লক্ষ্যে গঠিত ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির সদস্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্কেল প্রশাসনের প্রথাগত রাজারা মূখ্য ভূমিকায় ছিলেন: মং রাজা মং প্রু সাইন সভাপতি, বোমাং রাজা মং শোয়ে প্রু চৌধুরী ও চাকমা রাজার রিজেন্ট কুমার সমিত রায় সহসভাপতি। ১৯৭৭ সালে ২-৪ জুলাই রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম উপজাতি সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মং রাজা মং প্রু সাইন।[৭৭০] এর সাথে আরও ছিলেন আঞ্চলিক দলের চেয়ে জাতীয় রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ে বিশ্বাসী কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ– চারু বিকাশ চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, এ এস প্রু চৌধুরী, বি. কে. রোয়াজা প্রমুখ। এরশাদ ১৯৮৩ সালের ৩০ আগস্ট থেকে এই উপজাতি কনভেনশকে পুনরুজ্জীবিত করার উদযোগ নেন। অত:পর জনপ্রতিনিধিদেরও এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

এরশাদ সরকারের সময় ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার অধিকাংশ উপজেলায় পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন।[৭৭১] ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টির মনোয়ন নিয়ে নির্বাচিত হন বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী। তিনি বান্দরবানের বার সদস্য বিশিষ্ট আলোচক দলের নেতৃত্বে ছিলেন। মূলত পরিস্থিতির নাজুক অবস্থা উপলব্ধি করে বান্দরবান জেলাসহ অপর দুই জেলার নেতৃবৃন্দ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। বান্দরবান জেলার বিজ্ঞ রাজনৈতিক, প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ও বিদগ্ধ জননেতাদের সমন্বয়ে গঠিত বার সদস্যের প্রতিনিধি দল জাতীয় কমিটির সাথে সংলাপে বসে।

---

[৭৬৯] মে. জে. সৈয়দ মুহম্মদ ইবরাহিম, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন*, পৃ. ১৪৭।

[৭৭০] *সাপ্তাহিক বনভূমি*, ২৬ মার্চ ১৯৭৮ সংখ্যা

[৭৭১] ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে স্থানীয় সরকার (উপজেলা) অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে একটি করে উপজেলা উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। উপজেলা সৃষ্টির পর মহকুমা প্রশাসন বাতিল হয়ে যায়। প্রায় সব মহকুমাই জেলা পর্যায়ে উন্নীত হয়। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বান্দরবান মহকুমাকে ১৯৮১ সালেই জেলায় উন্নীত করা হয়। আর রামগড় মহকুমাকে ১৯৮৩ সালে খাগড়াছড়ি জেলায় উন্নীত করা হলে রাঙামাটি সদর মহকুমাও রাঙামাটি জেলায় পরিণত হয়। ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে দেশব্যাপী উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ সরকার তিন পার্বত্য জেলাকেও উপজেলা ভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তারই ধারবাহিকতায় ১৯৮৫ সালে রাঙামাটি সদর উপজেলায়- শান্তিময় দেওয়ান, নানিয়ারচর উপজেলায় তিলক চন্দ্র চাকমা, কাউখালী উপজেলায়- তুষার কান্তি দেওয়ান, বিলাইছড়ি উপজেলায়- লাল এংলিয়ানা পাংকো, রাজস্থলী উপজেলায়- ক্যজসাইন মারমা, জুড়াছড়ি উপজেলায়- নন্দ দুলাল চাকমা, বাঘাইছড়ি উপজেলায়– লক্ষী কুমার চাকমা, বরকল উপজেলায়– করুনা মোহন চাকমা, লংগদু উপজেলায়- আবদুর রশীদ সরকার নির্বাচিত হন। এঁরা সহ রাঙামাটি থেকে ২১ জন, বান্দরবান থেকে ১৭ জন, খাগড়াছড়ি থেকে ২৭ জন গণ্যামান্য পাহাড়ি জনপ্রতিনিধি, পেশাজীবী ও শীর্ষ স্থানীয় সমাজনেতা নিয়ে তিনটি আলোচক দল গঠিত হয়।

সংলাপে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অং শৈ প্রু চৌধুরী (প্রাক্তন খাদ্য প্রতিমন্ত্রী) এবং বিজ্ঞ রাজনীতিক কে এস প্রু, সাচিং প্রু জেরি (বান্দরবান জেলা পরিষদের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান), ক্য শৈ অং, এল ডলিয়ান বম, লাল নাগ বম, অনিল ত্রিপুরা, মংছা থোয়াই চাক, পূর্ণচন্দ্র ম্রো, অং লাই ম্রো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।[৭৭২]
অন্যদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে চাকমা সার্কেলের রাজা দেবাশীষ রায় রাঙামাটি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আলোচকদলের নেতৃত্ব দিলেও সরকারের আলোচনার পদ্ধতি নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি সরে যান তার পরিবর্তে রাঙামাটি আলোচক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন রাঙামাটি উপজেলা থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান শান্তিময় দেওয়ান। ঐ কমিটিতে আরও ৫ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন। খাগড়াছড়ির ২১ সদস্য বিশিষ্ট আলোকদলের নেতৃত্বে ছিলেন রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন উপদেষ্টা উপেন্দ্র লাল চাকমা। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে শিক্ষাবিদ অনন্ত বিহারী খীসা, নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা (পরে আওয়ামী লীগের এম.পি), সমীরণ দেওয়ান (খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান), কংজরী চৌধুরী (বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান) প্লাইহ্লা চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।
এভাবে পূর্বের ট্রাইবেল কনভেনশনের সাথে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি আলোচকদল গঠিত হয়।[৭৭৩] এরশাদ সরকারে সাথে চলমান সংলাপের ধারাবাহিকতায় সপ্তম বৈঠকে বসতে জেএসএসের গড়িমসি, ক্রমশ অবনতিশীল পার্বত্য পরিস্থিতি, সমঝোতায় আসতে ব্যর্থ হলে সামরিক বাহিনীর চূড়ান্ত জাতিগত নির্মূল অভিযান পরিচালনার ইঙ্গিত[৭৭৪] প্রভৃতি ঘটনা পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করে। সাবেক রাঙামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার বক্তব্যেও এসব বিষয় স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন,

> শান্তিবাহিনীর আক্রমণ ও নিরাপত্তাবাহিনীর প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট উপজাতীয় জনগণের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলে। সে চিন্তা চেতনা থেকেই জনসংহতি সমিতিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ এবং আলোচনার টেবিলে বসানোর উদ্যোগ গ্রহণে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও জন সংহতি সমিতির অনমনীয় মনোভাব, উপজাতীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তবতা এবং সর্বোপরি উপজাতীয় জনগণ ও নেতৃত্বের প্রতি জনসংহতি সমিতির সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, এ সবকিছু উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে জাতীয় কমিটির সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করেছে।[৭৭৫]

---

[৭৭২] বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রকাশিত প্রথম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা *শান্তির অন্বেষায়*, বান্দরবান, ১৯৯০।

[৭৭৩] আলোচক দলগুলোর পরিচিতির জন্য দেখুন- তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রথম বর্ষপূর্তি '৯০ স্মরণিকাসমূহ।

[৭৭৪] সাক্ষাৎকার: গৌতম দেওয়ান, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান, তারিখ- ৫/৯/২০১৭, স্থান: ডাকবাংলোস্থ বাসা।

[৭৭৫] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৪৮ জন উপজাতীয় নেতাবিশিষ্ট আলোচকদলগুলোর সাথে ১৯৮৮ সালের ২৯ আগস্ট থেকে ১৯৮৮ সালের ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত ৪ দফা বৈঠকের পর জাতীয় কমিটি ও আলোচকদলগুলো সমঝোতায় উপনীত হয়।[৭৭৬] এরই ধারিবাহিকতায় ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন পাশ হয়। জেএসএস ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে এই আইন একটি বিরাট অগ্রগতি হিসেবেই বিবেচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৭-এর ২ ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির ভিত্তি তৈরি করেছে ১৯৮৯ সালের এই আইনই।[৭৭৭]

পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদসমূহ বাংলাদেশের বাকী অংশের জেলা পরিষদ থেকে কিছু বিষয়ে ভিন্ন। এর চেয়ারম্যান অবশ্যই একজন পাহাড়ি হবেন এই বিধান রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো এলাকার অপ্রধান জনগোষ্ঠীর প্রতি বড় রাজনৈতিক ছাড় বলা যায়। এই পরিষদসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেছে এবং সম্মিলিতভাবে পাহাড়ি সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবিধা পেয়েছে।

উক্ত পরিষদসমূহের কাছে রাষ্ট্রযন্ত্রের ২২টি প্রশাসনিক বিভাগ/বিষয় হস্তান্তরের বিধান করা হয়। প্রথম গঠিত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা যথার্থই বলেছেন যে,

> স্থানীয় প্রশাসনে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসকারী জনসমষ্ঠির বৃহত্তর অংশ উপজাতীয় জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী। তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করে উপজাতীয় জনগণের সেই দাবী অনেকাংশে পূরণ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধ হলেও স্থানীয় সরকার পরিষদ একটা স্বশাসন ব্যবস্থা। এই স্বশাসন ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য এবং সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একটা নূতন ব্যবস্থা। [৭৭৮]

এভাবে জেএসএসের বিরোধিতা সত্ত্বেও আশির দশকের শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামো গড়ে ওঠে যেখানে পাহাড়িদের নমনীয় ধারার প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ লাভ করে। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের বিশ্লেষণে বাংলাদেশের এককেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামোতে নবগঠিত জেলা পরিষদসমূহের তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন,

> বাংলাদেশের এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যন্তরে এমনি 'হস্তান্তরিত' বিষয় একটি অভিনব সংযোজন। ১৯১৯ এর ভারত শাসন আইনে এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক আইনসভার কাছে এমনি ছয়টি জাতি গঠনমূলক বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছিল। অবশ্য পার্বত্য জেলাগুলোর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো ১৯১৯ এবং পরবর্তী আইন/সংবিধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক সংসদের পরিবর্তে তাদের রয়েছে জেলা পরিষদ। উপরন্তু প্রশাসনের কাঠামোগত পার্থক্য তো আছেই। কাজেই মনে হয়, স্বতন্ত্র প্রদেশ বা স্বায়ত্তশাসনের যে দাবী

---

[৭৭৬] Syed Anwar Husain, *War and Peace*, পৃ. ৪৬।

[৭৭৭] নূহ-উল-আলম সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

[৭৭৮] স্থানীয় সরকার পরিষদ, *অন্বেষা: স্মরণিকা ১৯৯০*, পৃ. আহবায়কের বক্তব্য অংশ দ্রষ্টব্য।

শান্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে উঠেছিল তা যখন মেনে নেওয়া সাংবিধানিক কারণে সম্ভব নয়, তখন ১৯৮৯ এর আইনই যথার্থ সমাধান। কারণ স্থানীয় পর্যায়ে উপজাতীয় প্রশাসনে উপজাতীয় প্রতিনিধিত্বের সার্বিক নিশ্চয়তা এ ব্যবস্থায় আছে। কাজেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অংশীদারীত্বের প্রশ্নটির আপাতত গ্রহণযোগ্য সমাধানটি এমনিভাবে হতে পারে।[৭৭৯]

গ) শান্তিচুক্তি, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি:

বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জাতিগত রাজনৈতিক সংহতি বিনির্মাণের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসমূহের জাতিগত পরিচিতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে সশস্ত্র আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির মধ্যকার সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসান কল্পে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল বলে এটি শান্তিচুক্তি নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে। শান্তিচুক্তির বড় দিক হলো বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে আঞ্চলিক পরিষদ কাঠামো গঠন, জটিল রাজনৈতিক সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও জেএসএসের একে অপরের প্রতি রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রদর্শন, সমঝোতার মানসিকতা ও আস্থা স্থাপন। শান্তিচুক্তির আরেকটি বড় দিক হল চুক্তির মধ্যদিয়ে জনসংহতি সমিতিকে পাহাড়ি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। এসব বিষয় রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির অন্যতম পূর্বশর্ত। বাস্তবিক বিচারে, ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ১৯৯৭’ হলো জাতীয় জীবনে বহু কষ্টার্জিত অনন্যসাধারণ অর্জনগুলোর মধ্যে অন্যতম অর্জন; গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রিভূত শাসন ব্যবস্থায় অগ্রগতির মাইলফলক এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষার এক ‘রূপালী রেখা’।[৭৮০]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসমূহের নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বকীয় জাতিগত পরিচিত অক্ষুণ্ন রেখে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক, সংসদীয় পথে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে ছিল প্রায় সাড়ে তিন বৎসর যাবৎ। সে লক্ষ্যে বাকশাল রাজনৈতিক কাঠামোর অধীনে তারা অনেক দূর অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা সশস্ত্র বাহিনীর হাতে চলে গেলে পাহাড়িদের পক্ষে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় পন্থায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পথে ঘোরতর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। পরিবর্তিত পটভূমিতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির জন্য আন্দোলনকারী রাজনৈতিক

---

[৭৭৯] ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, “শান্তি অশান্তির দোলাচলে পার্বত্য চট্টগ্রাম” *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, ২০ মাঘ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

[৭৮০] পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, *এক দশক পূর্তি স্মরণিকা*, রাঙ্গামাটি, ২০১০। পৃ. মুখবন্ধ অংশ দ্রষ্টব্য।

সংগঠন জেএসএস পাশ্ববর্তী দেশের সহযোগিতায়[৭৮১] সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। লেখক আহমদ ছফার মতে, সেই থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার ভারত একটি শক্তিশালী পক্ষ বা নিয়ামকে পরিণত হয়। ভারতের প্রশিক্ষণ লাভ করে পাহাড়ি সশস্ত্র আন্দোলনকারী গেরিলা যোদ্ধারা সীমান্তের ওপার থেকে, কখনও কখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের গোপন ঘাঁটি থেকে দলবেঁধে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে নাশকতামূলক কাজের আয়োজন করতে থাকে। জিয়াউর রহমানের সরকার পুরো বিষয়টি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেন। এমতাবস্থায় জিয়া ও তার উত্তরসুরী এরশাদের সামরিক সরকারের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ভারতীয় সামরিক সাহায্যপুষ্ট পাহাড়ি গেরিলারা যদি এভাবে ক্রমাগত হামলা পরিচালনা করতে থাকে, এমন একটা সময় আসা বিচিত্র নয়, যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।"[৭৮২] সরকারি রিপোর্টে এমন আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়েছে: "This was done to intensify an insurgency operation aimed at achieving by force regional autonomy or even ultimately secession."[৭৮৩] এটা প্রতিকারের জন্য জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালি অভিবাসনকেই উক্ত এলাকা বাংলাদেশের দখলে রাখার একমাত্র পন্থা বলে অনেকটা নিশ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই বাঙালি জনগোষ্ঠীর অভিবাসন পাহাড়ি জনগণের সে বিপুল অংশটিকেও ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি যাদের কোনো অনুরাগ কিংবা আস্থা ছিল না।[৭৮৪] অন্যদিকে অভিবাসিত বাঙালি বসতিগুলোকে শান্তিবাহিনীর আক্রমণ এবং তার পাল্টা হিসেবে বহিরাগত বসতিস্থাপনকারী বাঙালি ও সামরিক বাহিনীর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য দমনপীড়ন ও নিবর্তনমূলক অপারেশন পরিচালনার ফলে উদ্ভূত সংঘাতময় পরিস্থিতিতে জীবন বাঁচাতে অর্ধলক্ষাধিক পাহাড়ি শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলে পরিস্থিতি জটিল ও ঘোলাটে হয়ে উঠতে থাকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর থেকে ১৯৯৫ সালের ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসনকামী অনমনীয় ধারার শান্তিবাহিনীর সাথে সংলাপের পর সংলাপ আয়োজন করে (৬ দফা ও ১৩ দফা বৈঠক মিলে মোট ১৯ দফা বৈঠক)। বিএনপি সরকারের ভাষায়,

---

[৭৮১] Darek Davis wrote: Indeed during the war of secession from Pakistan, Islamabad armed and trained minority resistance groups who fought against the Bengalis. Since then, the tribal minorities have been used as pawns in the manoeuverings between India and Bangladesh: India has given support and comfort to the Chakmas, and has accused Dhaka of giving similar aid to a parallel minority revolt in one of its states bordering Bangladesh- that of the Tripura National Volunteer. See ``Four rays of hope", *Far Eastern Economic Review*, 23 March 1989. আরও দেখুন– দেবযানি দত্ত ও অনসূয়া বসু রায় চৌধুরী, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম*। পৃ. ৬৪।

[৭৮২] আহমদ ছফা, *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১২, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮), পৃ.২১।

[৭৮৩] Govt.of Bangladesh. *A Report on Problem of Chittagong Hill Tracts and Bangladesh Responses for their Solution*, p. ii.

[৭৮৪] মোরশেদ শফিউল হাসান (সম্পা.), *আহমদ ছফা: নির্বাচিত প্রবন্ধ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৫ম মুদ্রণ ২০১৫), পৃ.৩৬১। আরও দেখুন– দেবযানি দত্ত ও অনসূয়া বসু রায় চৌধুরী, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম*। পৃ. ৬৪।

> Immediately after coming to power in March, 1991 through popular vote, the democratically-elected Government of Bangladesh addressed itself to the solution of the long Standing Chittagong Hill Tracts' problems and made policy statements expressing its keen desire to find out the much-needed political solution to those problems. ... in July 1992, the Government of Bangladesh appointed a 9-member Committee with Mr. Oli Ahmad, Bir Bikram Communication Minister as its head to look into the CHT issue, with the directive to submit recomendations in this regard. ...Consequently, the talks between the committee formed by the Government and PCJSS have so far been held in Khagrachari on 5-11-92, 26-12-92, 22-5-93, 14-7-93 and recently on 18-9-93.[৭৮৫]

কিন্তু জেএসএস/শান্তিবাহিনী পূর্বোক্ত কোনো দল ও সরকারের প্রতি আস্থা ও সমঝোতায় উপনীত হয়নি। জেএসএস প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার জবানীতে সেটি স্পষ্ট :

> {বিএনপি} সরকারের সাথে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সংলাপে তেমন কোনো মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। অতএব পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানে সরকারের সদিচ্ছা বা আন্তরিকতার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে বলা যায়। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সরকার [পার্বত্য] চট্টগ্রাম বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, যে কারণে এ সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানে এখনো পর্যন্ত সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেই। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের প্রেক্ষাপটে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিগত এরশাদ সরকার ও বর্তমান খালেদা জিয়া সরকারের মধ্যে এ পর্যন্ত কোন মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়নি।[৭৮৬]

এভাবে বিএনপি সরকারের আমলের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে এসে সংলাপ, সংহতি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনা অনেকটা উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সাথে ব্রিটেনের শান্তি প্রক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯৭৩ সাল থেকে চলমান উত্তর আয়ারল্যান্ডের শান্তি প্রক্রিয়া বিবদমান দলগুলোর দরকষাকষির কারণে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এসে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বে উদারপন্থী দল লেবার পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করলে ব্রিটিশ আইরিশ শান্তি প্রক্রিয়া পুনরুজ্জীবিত হয়। টনি ব্লেয়ার সরকার দ্রুত গতিতে এই সমস্যা সমাধানে মনোযোগ দেয় যেমনটি তারা করেছিল স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের ক্ষেত্রে। তারই সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৯৮ সালে ১০ এপ্রিল ব্রিটিশ-উত্তর আয়ারল্যান্ডের মধ্যে গুড ফ্রাইডে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে।[৭৮৭]

---

[৭৮৫] GOB. *A Report on CHT,* p. iii.

[৭৮৬] *ভোরের কাগজ*, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর ১৯৯৫; উদ্ধৃত–সালিম সামাদ (সম্পা.), *পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম-১* (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৯৪।

[৭৮৭] প্রাক্তন মার্কিন সিনেটর জর্জ মিটশেলের মধ্যস্থতায় ১৯৯৮ সালে ১০ এপ্রিল বেলফাস্টে ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড ও উত্তর

ঠিক এ দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৯৬-এর নির্বাচনের বড় গুরুত্ব এ জায়গায় যে, এ নির্বাচনে ১৪৬টি আসন লাভ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর আবার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। আওয়ামী লীগকে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ উভয় নির্বাচনে বিপুল সমর্থন দিয়ে পার্বত্য তিনটি আসনে জয়যুক্ত করেছে। অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এ ঘটনাকে ''a fact of considerable importance impacting on the successful peace deal between these two sides.''[৭৮৮] হিসেবে বিবেচনা করেন। জেএসএস চিন্তা করেছে আওয়ামী লীগের প্রতি যেহেতু অধিকাংশ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সমর্থন আছে এবং এ দলটির প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সুপ্রসন্ন সেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে অর্থপূর্ণ সংলাপ ও সমঝোতায় উপনীত হলে ব্যাপক জনগণের সমর্থন যেমনি পাওয়া যাবে তেমনি তাতে ভারত সরকারের সায় থাকবে। শাহরিয়ার কবিরের মতে, ''আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে সামরিক বাহিনীর ভিতরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। সামরিক বাহিনীর যেসব জেনারেল এতকাল মনে করতেন সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্ত বা পাহাড়িদের শায়েস্তা করা সম্ভব তাঁরাও পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করছেন যে, বাস্তবে তা সম্ভব নয়।''[৭৮৯]

অধিকন্তু আওয়ামী লীগ ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের উভয় নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি শান্তিবাহিনীর সদস্যদের গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে। শান্তিবাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্যের স্পষ্ট কথা, ''আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার পাওয়ার পর আমরা শান্তিচুক্তি করার জন্য সক্রিয় হই।''[৭৯০] তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁর ভাষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে তাঁর দলের বহু বছরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন।

> ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অবাধ-নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনে জনগণের রায় নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আমরা সরকার গঠন করার পর খোলামনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেছিলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমাদের আলোচনার সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতীতের সরকারগুলো কখনো কখনো সমস্যাটিকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এর সমাধান চেয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি মূলত ছিল একটি রাজনৈতিক সমস্যা। আমিই প্রথম ১৯৮২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের

আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

[৭৮৮] Syed Anwar Husain, *op., cit.*, p. 61. See: Kristen P. Williams ns Neal G Jesse, ``Resolving Nationalist Conflict: Promoting Overlapping Identities and Pooling Sovereignity-- The 1998 Northern Irish Peace Agreement'' in *Political Psychology*, 22.3(2001): 571-599. www.jstor.org. access date 15.7.2018.

[৭৮৯] শাহরিয়ার কবির, *প্রাগুক্ত*,

[৭৯০] সেলিনা হোসেন, *পার্বত্যভূমির পথে প্রান্তরে*, পৃ. ১৬৮।

আহ্বান জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে একটি সেল গঠন করা হয় এবং এ এলাকার ঘটনাবলির উপর সচেতন দৃষ্টি রাখা হয়।[৭৯১]

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রণিধানযোগ্য। ঘটনাবলির সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকে লেখক আহমদ ছফার উপলব্ধি হয়েছে যে, 'পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা উপলব্ধি এতদিনে নিশ্চয় এসেছে, ভারত নিজস্ব স্বার্থ ছাড়া চিরদিন তাদের দায়িত্ব বহন করতে রাজি হবে না।'[৭৯২] আমেনা মহসীনের মতে, 'শান্তিবাহিনী ভারতের মাটি থেকে তাদের ঘাঁটি সরিয়ে নেয়ার চাপে ছিল।'[৭৯৩] অন্যদিকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার (আই কে) গুজরাল (২১ এপ্রিল ১৯৯৭-১৯ মার্চ ১৯৯৮) সরকারের সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের কৌশলগত সম্পর্ক ছিল অধিক মাত্রায় গ্রহণযোগ্য।

> আই কে গুজরাল যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন তখনই বলেছিলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে ভারতকেই উদ্যোগী এবং নমনীয় হতে হবে; প্রয়োজন হলে কিছু ছাড়ও দিতে হবে। গুজরালের এই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছে এবং তার এই অবস্থানকে বিশেষভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'গুজরাল ডকট্রিন' হিসেবে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ভারত ও বাংলাদেশের শীর্ষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে– এই দুই বন্ধুপ্রতীম প্রতিবেশী রাষ্ট্র একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। এর ফলে বাংলাদেশে নাগা-মিজোদের যেমন সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে, ভারতেও শান্তিবাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণ ও সাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।[৭৯৪]

উপরন্তু, ফারাক্কা ইস্যুভিত্তিক গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদনও আওয়ামী লীগকে পার্বত্য সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়ার পথে অনুপ্রাণিত করেছে। এসব বিষয় আওয়ামী লীগের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। অধ্যাপক রেহমান সোবহানও ইন্দর কুমার গুজরালের আন্তরিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন,

> Gujral's move to solve outstanding problems extended beyond the Ganges to seek a settlement to the lingering crisis over the CHT where insurgents from the Chakma Community, over the past 15 years, were being sheltered across the border by India... The agreement Hasina government and the Chakma insurgents was facilitated by Gujral's intervention and presumably some presure on the insurgents, so that they agreed to lay down their arms and eventually returned to Bangladesh with their families.[৭৯৫]

---

[৭৯১] মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত লিখিত ভাষণ,খাগড়াছড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

[৭৯২] ঐ, পৃ. ৩৬২

[৭৯৩] Amena Mohsin, *Politics of Nationalism*, p. 202.

[৭৯৪] শাহরিয়ার কবির, *প্রাগুক্ত*,

[৭৯৫] Rehman Sobhan, ''I. K Gujral: A Tribute from Bangladesh'' *The Daily Star*, 13 Dec. 2012.

উপর্যুক্ত বিষয়াটি বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৯৯৬ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি গ্রহণ করা হয়।[৭৯৬] অতঃপর পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ১১০ দিনের মাথায় চৌদ্দই অক্টোবর ১৯৯৬ তারিখে জাতীয় সংসদের তৎকালীন চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে এ কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়িতে। উভয়পক্ষ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরবর্তী বৈঠকসমূহ ঢাকায় এক নাগাড়ে অনুষ্ঠানে একমত হন। অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সংলাপ প্রক্রিয়ায় এ মতৈক্যকে ‘আওয়ামী সরকারের প্রতি জেএসএসের গভীর আস্থার প্রতিফলন’ এবং সংলাপ প্রক্রিয়ায় ‘অনন্য অগ্রগতি’ হিসেবে বর্ণনা করেন।[৭৯৭] ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে ৬টি বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২৬ নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখ থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সপ্তম বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখের ১০ টা ২৫ মিনিটে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শেখ হাসিনার রাষ্ট্রনায়কত্বে সম্পাদিত এ পুরো ঘটনাপ্রবাহকে অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন:

> If the sequence of events linked with the negotiations were compared to an opera the finale showed that the *prima dona* was Sheikh Hasina, the Prime Minister. It was her tenacity and resolution that goaded the negotiations to such a rewarding end.[৭৯৮]

এ চুক্তির মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের সংবিধান সমুন্নত এবং সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখেই ভারতের মাটিতে আশ্রিত পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে আন্দোলনকারী শান্তিবাহিনী ও শরণার্থীদের দেশের জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়ি মাঠে অনুষ্ঠিত শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ঘোষণা করেন:

---

[৭৯৬] মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, ‘শান্তিচুক্তি ও প্রাসঙ্গিক কথা’ নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯৯।

[৭৯৭] Syed Anwar Husain লিখেছেন: This fact of PCJSS representatives coming to Dhaka for negotiations demonstrated the amount of confidence that they had in the Awami League Government. This was a unique development in negotiations as all the previous meetings under the past government were held at different hill venues. *War and Peace*, p. 62.

[৭৯৮] Syed Anwar Husain, *War and Peace*, p. 62.

আমি কোনরূপ দ্বিধা ছাড়াই স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং আনুগত্য সমুন্নত রেখেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ বিষয়ে কারো মনে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি, অস্পষ্টতা, দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা থাকা সমীচিন হবে না।[৭৯৯]

অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক *The Daily Star* ৪ ডিসেম্বর তারিখের সম্পাদকীয়তে শান্তিচুক্তি, আওয়ামী লীগ দেশের ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক সংহতি প্রসঙ্গে লিখেছিল,

> The Awami League government under Sheikh Hasina must be credited for having shown a lot of courage, commitment and willingness to take risk in solving the several decades old problems in the Chittagong Hill Tracts Area. . . . [The accord makes] a very delicate balance between the over-binding concern to maintain the territorial and administrative integrity of the country and effectively responding to the genuine concern of the rights of the Hill people.[৮০০]

উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে এক ইতিবাচক ফলশ্রুতি যা স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হলেও আন্তর্জাতিক মহলে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে বিশ্ব সম্প্রদায় সরকারের পাশে দাঁড়ায়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে জাতীয় অখণ্ডতা, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে যথাযথ পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ দূতাবাসের মুখপাত্র চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে ৪ ডিসেম্বর বলেন,

> we are hopeful that, with goodwill on all sides, a peace agreement can be implemented that will put an end to a long-standing conflicts that has claimed many lives over more than two decades. [৮০১]

একইভাবে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ডেভিড ওয়াকার বলেন,

> This is a very significant and considerable achievement and I congratulate warmly all those involved in recent negotiations and those in 1992 to 1995.[৮০২]

এভাবে অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী Alexander Downer ৫ ডিসেম্বর প্রেরিত অভিনন্দন বার্তায় বলেন, ''This event promises to end over two decades of armed insurgency in the CHT and establishes an administrative structure to meet the desire of the tribal people of enhanced autonomy." আবার ঢাকাস্থ অস্ট্রেলীয় দূতাবাস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছে, ''The agreement represents a significant achievement for Bangladesh and the Australian

---

[৭৯৯] মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত লিখিত ভাষণ,খাগড়াছড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

[৮০০] *The Daily Star*, 4 Decemeber 1997

[৮০১] Avtar Singh Bhasin, *প্রাগুক্ত*, p. 2637

[৮০২] Avtar Singh Bhasin, *প্রাগুক্ত*, p. 2638

Government recognizes the commitment and dedication that Bangladesh Governments have brought to negotiations since 1986.”[৮০৩] এভাবে ফ্রান্স, তুরস্কসহ অনেক দেশ ও সরকার চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানায়। দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিক সময়ের সশস্ত্র যুদ্ধের পরিসমাপ্তির লক্ষ্যে কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেখে শান্তিপূর্ণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের একটি চুক্তি আলোচনার মাধ্যম হতে পারে, এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।[৮০৪] পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরের বছর ১৯৯৮ সালে উত্তর আয়ারল্যান্ডে জাতিগত ও গোষ্ঠীগত সংঘাত নিরসনকল্পে যে শান্তিচুক্তির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে বাংলাদেশের শান্তিচুক্তির মধ্যে বিষয়বস্তু, বৈশিষ্ট্যগত ও কৌশগত বৈসাদৃশ্য আছে। গুড ফ্রাইডে এগ্রিমেন্ট খ্যাত ঐ চুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার, আয়ারল্যান্ড সরকার ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের তিনটি বিবদমান রাজনৈতিক দল জড়িত ছিল। তাছাড়া চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার জোরে। সে-বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কোনো দেশ, ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যস্থতা ছাড়াই বাংলাদেশ সরকার ও একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ব্রিটেন-উত্তর আয়ারল্যান্ড চুক্তি অনুসমর্থনের জন্য গণভোটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এমনকি আইরিশ সংবিধানও সংশোধন করতে হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার কোনোটাই প্রয়োজন হয়নি।

সুতরাং দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসন করে জাতিগত ও রাজনৈতিক সংহতি স্থাপনের এ অসামান্য কৃতিত্বের দাবিদার গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অতঃপর চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে যেসব কার্যক্রম সম্পাদিত হয় সেগুলোর রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম। বাংলাদেশের সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তে আন্দোলনকারী শান্তিবাহিনী প্রধানসহ ১৯৪৫ জন সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্র, গোলাবারুদ জমাদান করে বাংলাদেশের মাটিতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এবং বিপুল সংখ্যক সদস্যের রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনীর সদস্য[৮০৫] হয়ে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা তথা দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত হওয়ার ঘটনা বাংলাদেশ এবং বিশ্ব ইতিহাসে একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। গোপন ও সশস্ত্র পন্থার রাজনীতি পরিত্যাগ করে জেএসএস কর্তৃক নিজেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল ঘোষণা দেওয়া দেশের প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি অবিচল আস্থা স্থাপন ও আনুগত্য প্রকাশের প্রতীক। একইভাবে চুক্তিতে বাংলাদেশের এককেন্দ্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর মূল কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেএসএস কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদ কাঠামো রাজনৈতিকভাবে মেনে নেওয়া ছিল দেশের মূলধারার প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

---

[৮০৩] ঐ।

[৮০৪] এ এস এম মোবাইদুল ইসলাম, ‘শান্তি চুক্তির কাল ও আজ’ নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫-৭৩।

[৮০৫] জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে নিয়োগ বিধিমালার শর্ত শিথিল করে ৭০৫ জনকে পুলিশের কনস্টেবল পদে এবং ১১ জনকে সার্জেন্ট পদে নিয়োগ করা হয়। বাকীদের অন্যান্য চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়।- জুলফিকার আলী, *প্রাগুক্ত*, ।

১৯৯৭ সালের ৯ মার্চ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীদের ফিরে আনার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা সার্কিট হাউজে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের মহাপরিচালকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৮০৬] ঐ চুক্তি অনুযায়ী ২০ দফা প্যাকেজের আওতায় ১৯৯৭ সালের ২৮ মার্চ থেকে ১৯৯৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রিত বাংলাদেশের ৬৩,৮৬১ জন পাহাড়ি শরণার্থীর ১২,৩৮৩ টি[৮০৭] পরিবার স্বদেশে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতে, 'উপজাতীয় শরণার্থী শব্দটি আমাদের জীবন থেকে চিরদিনের মতো মুছে যায়'।[৮০৮] অতঃপর জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়ার অসএইড্‌, এডিবি প্রভৃতি দাতাসংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংঘাতপীড়িত পার্বত্য এলাকার আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে এগিয়ে আসে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শুরু হয় শান্তি ও সংহতির পথে নতুন অভিযাত্রা। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এ. কে. আজাদ চৌধুরীর ভাষায়, ''আমরা শান্তির জন্য নজির স্থাপন করলাম। আমাদের যাত্রা শুরু। অনেক কঠিন প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে, সেগুলোকে অতিক্রম করে আমরা শান্তির অন্বেষায় বিশ্বকে পথ দেখাবো।''[৮০৯]

উপসংহার

বিশ শতকের সত্তরের দশকে তৃতীয় বিশ্বে জাতি-রাষ্ট্র অভ্যুদয়ের ইতিহাসে বাংলাদেশ একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বরে অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাটিতে প্রথম সরকারের পথচলা। শুরু থেকেই স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় নবীন রাষ্ট্রের সরকারকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ছিল তার অন্যতম। বাংলাদেশের সংবিধান, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা (ডেমোক্রেটিক পলিটি) ও প্রশাসনিক কাঠামোতে এ অঞ্চলের পাহাড়িদের স্বকীয় সত্তা নিয়ে অন্তর্ভুক্তির দাবি নিয়ে সৃষ্ট একটি আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির সমস্যার প্রকৃতি অনুসন্ধান, অনুধাবন ও সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় সমাসীন বিভিন্ন পদ্ধতির, বিভিন্ন দলের ও দৃষ্টিভঙ্গির সরকার ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। তন্মধ্যে বঙ্গবন্ধু

---

[৮০৬] এ এস এম মোবাইদুল ইসলাম, 'শান্তি চুক্তির কাল ও আজ'।

[৮০৭] Avtar Singh Bhasin, *India Bangladesh Relations Document*, p. 2641.

[৮০৮] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাগুক্ত ভাষণ দ্রষ্টব্য

[৮০৯] এ. কে. আজাদ চৌধুরী, 'শান্তি প্রচেষ্টায় সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে' মেসবাহ কামাল ও শারমিন মৃধা (সম্পা), *পার্বত্য চট্টগ্রাম: সংকট ও সম্ভাবনা* (ঢাকা: গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ, ২য় সংস্করণ, ২০০১, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯), পৃ. ১৩-১৫।

শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের বাকশাল কাঠামোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একটি সমন্বয়ধর্মী অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে বহু শতাব্দী পর পার্বত্য চট্টগ্রামের মূলধারার রাজনৈতিক ও পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে জাতীয় মূলধারার সাথে মর্যাদাপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করা হয়।[৮১০] কিন্তু জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার কর্তৃক উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, ট্রাইবেল কনভেনশন গঠন, চাকমা রানি বিনীতা রায়কে মন্ত্রী পদমর্যাদায় উপদেষ্টা নিয়োগ ও স্বায়ত্তশাসনপন্থী তরুণ পাহাড়ি নেতা সন্তু লারমাকে কারাগার থেকে মুক্তিদান সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে অবিবেচনাপ্রসূত বাঙালি জনস্থানান্তর নীতি ও ব্যাপক হারে সেনা ছাউনি বৃদ্ধি ও নিপীড়নমূলক সেনাশাসন কায়েমের ফলশ্রুতিতে আগের সরকারের আমলে গড়ে ওঠা জাতিগত সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশকে হিংসাত্মক পরিস্থিতিতে পরিণত করে। স্থানীয় পাহাড়ি জনগণ ও পুনর্বাসিত বাঙালি জনগণকে চরম বৈরিতাপূর্ণ সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়।[৮১১] অন্যদিকে আগের সরকারের ধারাবাহিকতায় বেশ কয়েকটি লোমহর্ষক গণহত্যার (৮৪-র ভুষণছড়া, ৮৬-র পানছড়ি গণহত্যা, ৮৯-র লংগদু গণহত্যা) দায়ভার মাথায় নিয়ে এরশাদ সরকার আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার গঠন করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রথম পাহাড়িদের হাতে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার নজির স্থাপন করেন। ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর এ উদ্‌যোগ অন্যদের জন্য অধিকতর প্রাগ্রসর চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। তারই পথ ধরে ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে জেএসএসের সাথে 'লোক দেখানো'[৮১২] আলোচনা চালিয়ে যায়। সর্বশেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার জেএসএসের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে 'ওয়াচডগ' করে তার অধীনে একটি আইন প্রণয়নের ''স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন'' আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের ১৮ মাস পর ১৯৯৯ সালের ২৭ মে তারিখে সন্তু লারমার নেতৃত্বে অন্তবর্তী আঞ্চলিক পরিষদ যাত্রা শুরু করে। এভাবে দীর্ঘকালব্যাপী স্বায়ত্তশাসনের

---

[৮১০] নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

[৮১১] আহমদ ছফার লিখেছেন, ''বিগত বিশ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে জঙ্গলের আইন চালু রয়েছে। পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছে। সেনাবাহিনীর লোকেরা পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ওপর অকথ্য নির্যাতন করেছে। অসংখ্য লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। নারী নির্যাতনের ঘটনাও অল্প নয়। পাহাড়িদের জানমালের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। শান্তিবাহিনীর লোকদের হাতেও সেনাবাহিনীর যথেষ্ট মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। অনেক নিরীহ বাঙালিও তাদের হাতে নিহত হয়েছেন। বিরোধ সেনাবাহিনী এবং শান্তিবাহিনীকে ছাড়িয়ে পাহাড়ি এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে।'' *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ*, পৃ. ২১-২২।

[৮১২] শাহরিয়ার কবির লিখেছেন, ''এরশাদের মতো খালেদা জিয়ার সরকারেরও এই আলোচনা প্রয়াস ছিল লোক দেখানো, কারণ আগের মতোই আলোচনা চলাকালীন পাহাড়ী সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে। হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, গ্রেফতার ও নারী ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটেছে। এরশাদের মতো খালেদা জিয়ার সরকারও আলোচনা করেছিল পশ্চিমের দাতাদেশ ও সংস্থাদের সন্তোষ লাভের জন্য– প্রকৃত অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।'' *দৈনিক জনকণ্ঠ* ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭।

আন্দোলনে লিপ্ত পাহাড়ি নেতারা বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হন। আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও পাহাড়ি নেতাদের দায়িত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়:

> The Regional Council (RC) was at the apex of new institutional hierarchy– it offered a modicum of political space to the indigenous groups. A tribal leader is its head, an unprecedented power sharing posture with the *pahari* representatives.[৮১৩]

মাত্র ৫৫ হাজার ৬০০ বর্গমাইল আয়তনের ছোট্ট বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে দেশের একদশমাংশ অঞ্চলে দীর্ঘকালব্যাপী বিরাজমান সশস্ত্র সংঘাতপূর্ণ জাতীয় সংহতি সমস্যা যা বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে আন্ত-র্জাতিক মাত্রা লাভ করে তা তৃতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনো পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিচক্ষণতার সাথে মীমাংসা করে বিশ্বের ইতিহাসে একদেশে অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশে বহুজাতির রাজনৈতিক সংহতি প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এভাবে শুরু হয় একটি নতুন অধ্যায়।

[৮১৩] Dr. Mohammad Rashiduzzaman and Dr. Mahfuzul Hoque Chowdhury, *Building Peace in Bangladesh's Chittagong Hill Tracts (CHT): An Assessment of the 1997 Peace Accord*, Report for the USIOP Project Number: S.G. 105-05S Glassboro, April 2008, p. 31.

৭ম অধ্যায়

উপসংহার

ব্রিটিশদের অত্রাঞ্চলে শাসক হিসেবে আগমনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলো মুঘলদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও অর্থব্যবস্থার কিঞ্চিৎ সংস্পর্শে এসেছিল। এরপর ইতিহাসের নানা যুগান্তকারী ঘটনা পরম্পরায় এই পার্বত্য এলাকার ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ব্রিটিশদের গঠিত একক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা বাংলাদেশ আমলে এসে তিন জেলায় খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সরকারিভাবে গৃহীত হওয়ায় একক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সত্তা এখনো দ্যুতিময়।

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি ১৮৬০ থেকে ২০০০ খ্রি. পর্যন্ত এই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই তিনটি রাষ্ট্রের সরকারি নীতির প্রেক্ষাপট, স্বরূপ এবং রাষ্ট্রসমূহের গৃহীত সরকারি নীতির প্রতিক্রিয়ায় ওই অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তার প্রথাগত, আধুনিক গণতান্ত্রিক এবং সশস্ত্র রূপের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপনের একটি একাডেমিক প্রয়াস। তিন রাষ্ট্রের মধ্যে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ-ভারতের সরকারি নীতির রাজনৈতিক তাৎপর্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে ব্রিটিশ-ভারতের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বহির্ভূত রাখা। অন্যদিকে উত্তর উপনিবেশ পর্বে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের সরকারি নীতির মূল প্রতিপাদ্য হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের চলমান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একীভূত রাখা। ফলে আলোচ্য গবেষণাধীন ১৪০ বছরের সময়কালের সরকারি নীতিকে বর্ণনা যেতে পারে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোকে রাজনৈতিক বহির্ভূতকরণ থেকে একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার রাজনীতি হিসেবে। প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনার সারবস্তুসমূহ এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

১

প্রথম অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠনের পটভূমি অনুসন্ধান করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব দিকের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলগুলো 'কার্পাস মহল বন্দোবস্ত' নামে চট্টগ্রামের কালেক্টরেট অফিসে নথিভুক্ত ছিল। দুই প্রভাবশালী পার্বত্য রাজা চাকমা ও বোমাং রাজাসহ অনেক ছোট ছোট গোষ্ঠী প্রধান হেডম্যান হিসেবে চট্টগ্রাম রাজস্ব অফিসে রাজস্ব জমা দিতো। এছাড়া ঐ এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো আঞ্চলিক কেন্দ্রাভিভূত নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

রাজারা মহলভিত্তিক প্রভাব বলয় তৈরি করে অধীন জুমিয়াদের নিকট থেকে খাজনা, বেগার, আবওয়াব, নজরানা প্রভৃতি প্রথাগত কর আদায় করত। কিন্তু ১৮৫৯ সালে এসে দেখা গেল রাজারা আর তাদের প্রভাবাধীন এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না। ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এলাকার বাইরে থেকে

স্বাধীনচেতা উপজাতি কুকিদের আক্রমণ, লুটতরাজ প্রতিহত করার সামর্থ্য তারা হারিয়ে ফেলেছে। এর অনেকগুলো কারণ উঠে এসেছে। চাকমা অভিজাত শ্রেণি দেওয়ানদের সাথে রাজাদের সম্পর্কাবনতি, অঞ্চলভিত্তিক দেওয়ানদের মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং একে অপরের বিরুদ্ধে কুকিদেরকে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে নিয়োগ উল্লেখযোগ্য। একইভাবে দক্ষিণের বোমাং রাজা কংহ্লা প্রুর উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও উত্তরাধিকার সমস্যা, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত এবং আরাকান সীমান্তস্থিত বন্য যোদ্ধা সেন্দু, বনযোগি, খুমি উপজাতিগুলোকে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে ব্যবহার ঐ এলাকার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এতে চট্টগ্রাম রাজস্ব অফিসে কার্পাস মহলের রাজস্ব বছরের পর বছর বকেয়া পড়ে থাকে। চাকমা প্রভাবাধীন এলাকায় একজন প্রভাবশালী দেওয়ান ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে নিহত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে চাকমাদের মধ্যে নিহত দেওয়ান পরিবারের উত্তরাধিকারীরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের সাহায্য কামনা করে। প্রথমদিকে ব্রিটিশ সরকার জেলাটি সরাসরি দখলে নেওয়ার ব্যাপারে অনিহা প্রদর্শন করলেও পরে কুকিদের আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করলে এবং জেলার প্রাকৃতিক সম্পদকে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের লক্ষ্যে কার্পাস মহলগুলো নিয়ে একটি পৃথক জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে কার্পাস মহল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এর সুদুরপ্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম একটি একক রাজনৈতিক সত্ত্বা ও পরিচিতি অর্জন করে।

২

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বহির্ভূত শাসন প্রবর্তন ছিল প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ভারতে প্রবর্তিত 'ভাগ করে শাসন করা নীতি'রই একটি ক্ষুদ্র (সংস্করণ) সংস্করণ। উপজাতি অধ্যুষিত জেলায় এধরনের শাসন প্রবর্তনের পিছনে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা বর্ণবাদ, বিবর্তনবাদী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ বঙ্গীয় মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র, জাতিগতভাবে পৃথক, রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার দিক থেকে অনগ্রসর– এসব যুক্তি তারা খাড়া করেছে। অর্থাৎ মিশেল ফুকোর ক্ষমতা মেকানিকসের তৃতীয় উপাদান গভর্নমেন্টালিটি বা প্রশাসনিকতা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। এর মূল কথা হলো, ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য। কোনো সাধারণ অর্থে কল্যাণ নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ কল্যাণের জন্য। পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ জনগোষ্ঠীর বসবাস। ব্রিটিশরা তাদের মঙ্গলের জন্যই আলাদা শাসনতন্ত্র বা রেগুলেশন দিয়ে শাসনের আবশ্যকতা তুলে ধরেছেন। ফুকো দেখাচ্ছেন, আধুনিক সমাজে যতই প্রশাসনিকতা বিস্তৃত হয়েছে, ততই গড়ে উঠেছে জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে তাদের সম্বন্ধে সরকারি তথ্য সংগ্রহ ভাণ্ডার। এজন্য জেলা গঠনের

শুরু থেকে প্রশাসকদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল পার্বত্য অঞ্চলের জনসংখ্যা, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, সমাজ কাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ। ব্রিটিশরা বিশেষ শাসনের আবশ্যকতার যুক্তি দেখিয়ে ১৮৬০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৭৫ বছর যাবৎ পৃথক শাসন চালিয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্তর একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত করতে ব্যর্থ হয়। এ থেকে ঐ শাসনের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি পরিষ্কার। ১৯৩৫ সালে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সময় আবার পাহাড়িদের মধ্যে যথোপযুক্ত রাজনৈতিক উপাদানের অভাবের যুক্তি দাঁড় করিয়ে ভারত ও বাংলার শাসন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের ভাগে দেওয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা ৮৭ বছর ধরে বহির্ভূত শাসন প্রয়োগের যুক্তিগুলোর কথা (জাতিগত ভিন্নতা, ধর্মীয় ভিন্নতা, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা) দেশবিভাগের 'টার্ম অব রেফারেন্স' বা অনুসরণীয় নীতিমালায় একবারও উল্লেখ করেনি।

৩

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে পাহাড়িদের সম্পর্কের পারদ পরিমাপের প্রধান নিক্তি ছিল ভূমি ও রাজস্ব নীতি। তৃতীয় অধ্যায়ের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় জুমকর ও ভূমি রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে 'এ্যাংলো-ইন্ডিজেনাস' মিশ্র রাজস্ব ব্যবস্থাপনা যেখানে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি জুমকর ও ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে পাহাড়ি রাজাদেরকে কোনো কোনো ছাড় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিশন দিয়ে তোষণ করার প্রয়াস চালিয়েছে। গবেষণায় আরো উঠে এসেছে যে ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের ওপর ক্রমাগত বহির্ভূত শাসন প্রয়োগ করলেও এতে তারা কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়নি। তার কারণটিও স্পষ্ট তারা ভূমি রাজস্ব নীতিকে এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে যাতে করে ব্রিটিশ বিরোধী নয়, অনুগত সামন্তশ্রেণি গড়ে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা থেকে সংগৃহীত রাজস্বের প্রধান দুটি খাত জুমকর ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ, জুমকরের হার নির্ধারণ ও বন্টন তারা এমনভাবে করেছে যাতে স্থানীয় রাজা ও হেডম্যানগণ তুষ্ট হয় এবং জুমিয়া কৃষকরা থাকে শান্ত। কিন্তু যুগ যুগধরে বহির্ভূত পরিবেশে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত এ-সুবিধার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার মতো গণতান্ত্রিক পন্থা, রাজনৈতিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টার অভাব ও উদাসীনতার ফলে তারা ১৯৪৭-এ এসে সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়।

৪

চতুর্থ অধ্যায়ে পাকিান সরকারের নীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে মিশেল ফুকোর রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগের ইতিবাচক বিশ্লেষণকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এ গবেষণার পূর্বে বিদ্যমান জ্ঞানকাণ্ডে শুধু এমন বচন (ডিসকোর্স) প্রচলিত ছিল যে, পাকিস্তান সরকারের ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নিম্নগামী (ডাউনওয়ার্ডস) উন্নয়ন নীতি পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সমস্যার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। পাহাড়িদের জনজীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গবেষণায় উঠে এসেছে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত স্বকীয়তাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে: ১৯৫০ সালে সমগ্র পূর্ব বাংলা থেকে জমিদারতন্ত্র বিলোপ করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন উপজাতি রাজার অনুশাসনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিদ্যমান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সেজন্য সেখানে দেশের অপরাপর অংশে প্রচলিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন প্রাদেশিক আইনসভায় দুটি আসন বরাদ্দ করে জনগণকে প্রথমবারের মতো আধুনিক নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতীক ভোটাধিকার প্রদান করেছে। পার্বত্য জেলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা ৩৯টি ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে প্রথাগত হেডম্যানদের সামাজিক আচার বিচার ও পদ মর্যাদার চ্যুতি বা অবনমন না ঘটিয়ে। এতে পাহাড়িদের মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে। নতুন নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। পাকিস্তান সরকারের গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি নীতির বড় অবদান সম্ভবত এই যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনই হল সেই নির্বাচন যেখানে অংশগ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক গণমুখী রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠার প্লাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে লারমা ভ্রাতৃদ্বয়ের আবির্ভাব প্রধানত এই নির্বাচনী রাজনীতির প্লাটফর্ম ব্যবহার করেই ঘটেছে।

৫

ঔপনিবেশিকোত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পাকিস্তানি জাতি নির্মাণ ছিল একটি অগ্নিপরীক্ষা। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কল্পিত পাকিস্তান রাষ্ট্র যখন বাস্তবে রূপ নিল তখন এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ছিল ভুঁইফোড় জাতি নির্মাতাদের জন্য কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে গিয়ে তারা অবলোকন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুধু ধর্মীয় ঐক্য ছাড়া অন্য কোনো রেডিমেড তৈরি করা শক্তি সম্বল নেই। এমতাবস্থায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকার জন্য পাকিস্তানকে দ্রুত অর্থ-সম্পদে বলীয়ান করা আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, ‘‘On one side was the developmental need of hydroelectric energy for a nation’s growing economy. On the other side were the villagers, whose villages had to get submerged as a price to be paid

for the nation's insatiable, limitless need for energy."[৮১৪] এ প্রয়োজন মেটাতে তারা বহির্বিশ্বের দিকে তাকায় এবং বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহ পাকিস্তানকে বিশ্বের বৃহৎ পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈকট্যে নিয়ে আসে।

অতপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক, কারিগরি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতায় পাকিস্তান স্বীয় দেশজ প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনশীল কাজে লাগায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে গৃহীত উন্নয়ন নীতি তারই ফলাফল। কিন্তু এসব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয়দের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ করেছে অল্পই। এতে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞগুলো স্থানীয়দের আর্থ-সামাজিক জীবনে মারাত্মক অভিঘাত হিসেবে হাজির হয়। এ অভিঘাত সৃষ্টি করে তাদের জন্য ছুঁড়ে দেয়া হয় টিকে থাকা ও ঘুরে দাঁড়ানোর বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে গিয়েই পাহাড়িদের ঔপনিবেশিক ধ্যান ধারাণার আড়ষ্টতা ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় নব মানস। আধুনিক মানুষের চৈতন্য। পাহাড়িদের শিক্ষার দৈন্যদশা এবং রাজনৈতিক চেতনার অভাবই ষাটের দশকে তাদের বিপন্নতার অন্যতম কারণ। শিক্ষার দৈন্য থেকেই আসে রাজনৈতিক চেতনার অভাব– এ বোধোদয় যখন তাদের হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে রাষ্ট্রযন্ত্র পাহাড়িদের জীবনে সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সরকারি উদযোগে শুরু হয় শিক্ষার উন্নয়ন। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়সহ বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং উচ্চশিক্ষার জন্য াতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগসহ রাঙামাটিতে সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব পদক্ষেপের ফলে পাহাড়িদের মধ্যে নতুন ধারার রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা সামগ্রিক অগ্রগতির পথে পাহাড়ি সমাজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজে পরিবর্তন সাধনের চিন্তা তাদের মধ্য থেকেই জাগ্রত হয়েছে।

৬

৬ষ্ঠ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের বিভিন্ন কৌশল ও তার প্রতি পাহাড়িদের প্রতিক্রিয়া, প্রতিরোধ ও ফলাফল পর্যালোচনা করা। এক্ষেত্রেও মিশেল ফুকোর ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রতিরোধের ধারণাকে ভর করে আলোচনাকে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফুকো বলেছেন,

> ক্ষমতার মুঠো থেকে আধুনিক সমাজবদ্ধ মানুষের মুক্তি নেই। প্রতিরোধ অবশ্য আছে– ব্যক্তিগতভাবে, হয়তো গোষ্ঠীগতভাবেও। প্রতিরোধ সম্ভব, সে প্রতিরোধ হয়েও থাকে। প্রতিরোধ হয় ... নানা ছুতোয় অনুশাসনের (সরকারি নীতির) বেড়াজাল এড়ানোর চেষ্টায় কিংবা প্রশাসনিকতাকে অমান্য করায়। কিন্তু তা কখনোই ক্ষমতাতন্ত্রের সামগ্রিক কাঠামোকে নড়াতে পারে না, তাকে সাময়িকভাবে বিব্রত করতে পারে, এইমাত্র। আর সেই সাময়িক অসুবিধা কাটিয়ে উঠে নতুন সমীক্ষা, নতুন তথ্য, নতুন নীতির সাহাযে প্রশাসনিক প্রকরণ যখন আরও কার্যকর, জনহিতকর, আরও মঙ্গলময় হয়ে ওঠে, ক্ষমতাতন্ত্র হয়ে যায় আরও পরিব্যাপ্ত, আগের থেকে অনেকবেশি কার্যকর।[৮১৫]

---

[৮১৪] Maj Gen Dipak Mukherjee, *Battle for Hearts and Minds: From North East to Kashmir and Beyond* (New Delhi: Vitastaa, 2016), p. 112.

[৮১৫] পার্থ চট্টোপাধ্যায় , "ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত: গ্রামশি ও মিশেল ফুকো" পারভেজ হোসেন (সম্পা.) *মিশেল*

বাংলাদেশের সরকারসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের মূলধারার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা অনুশাসনের সঙ্গে একীভূত করার লক্ষ্যেই বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পাহাড়িদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে বেগবান করেছে। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সংসদীয় নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু তখন জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী এবং প্রথম সংবিধান প্রণয়নকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতি পাহাড়ি মানুষের আস্থা তৈরি হয়নি। কিন্তু ১৯৯১ ও ১৯৯৬ এর নির্বাচনে দেখা গেল জাতীয় দলগুলোর প্রতি বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে পাহাড়িদের দলগত সম্পৃক্ততা (এফিলিয়েশন), দলীয় নীতি ও কর্মসূচির প্রতি সমর্থন ও আস্থা জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। এ পরিবর্তন জাতীয় রাজনৈতিক দল ও দলীয় সরকারের নীতির প্রতি বিশেষ জনগোষ্ঠীর আনুগত্যের পরিচায়ক।

অন্যদিকে বাংলাদেশের সামরিক সরকারগুলোর নীতিতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী প্রতিরোধপরায়ণ হয়েছে। ১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত ১৫ বছর পর্যন্ত পাহাড়িদের সক্রিয় সশস্ত্র প্রতিরোধ চলেছে। এই প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে তারা নিজেরা সংগঠিতও হয়েছে, রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছে, সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী গড়ে তুলেছে। ঐ বাহিনীর সহায়তায় নিজেদের প্রভাবাধীন এলাকায় সরকারি প্রশাসনের মতো সমান্তরালভাবে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ সীমা, সরকার, কূটনীতি, প্রশাসন, বিচার পরিচালনা করেছে। দেশের অভ্যন্তরে এমন সাংঘর্ষিক অবস্থা থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে সরকার বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়েছে। তার প্রতিফলন দেখা যায়, সরকারের তরফ থেকে রাজনৈতিক সংলাপ আয়োজন, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নমনীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃজনে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, পাহাড়িদের উন্নয়নের জন্য পাহাড়িদের দ্বারা পরিচালিত বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, পাহাড়িদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, মূলধারার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আনুগত্য সৃজনের জন্য সরকারি চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন, সর্বোপরি অনমনীয় ধারার প্রতিরোধপরায়ণ পাহাড়ি নেতৃত্বকে বিদেশের মাটি থেকে স্বদেশের স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মতো নীতি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে ফুকোর বিশ্লেষিত ধারণা মতে, সরকারি অনুশাসন অমান্য বা প্রতিরোধ সাময়িকভাবে হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারের ইতিবাচক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির ফলে বিশেষ জনগোষ্ঠীর সাময়িক প্রতিরোধপর্ব কেটে গিয়েছে। ফলে নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন আইন ও নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে সরকারি প্রশাসনিকতা আরও কার্যকর, পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা (ঢাকা: সংবেদ, ২০০৭), পৃ.১৭০- ১৭৮।

বিশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের নমনীয় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির ফলে রাষ্ট্র ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সুসম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তা যাতে পুনরায় প্রতিরোধের ঢেউ এসে তছনছ করতে না পারে সেজন্য কিছু বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ৮৭ বছর ব্রিটিশ শাসনাধীনে থেকেও কেন প্রতিরোধপরায়ণ না হয়ে ব্রিটিশানুগত প্রজায় পরিণত হয়েছে তা এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন দলীয় সরকারের নীতি নির্ধারক, চিন্তক বা পরামর্শদাতারা এগুলো বিবেচনায় নিতে পারে। কারণ দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ গড়ে তুললে তা স্বাভাবিক করতে গিয়ে দেশের মানুষের প্রাণ ও সম্পদহানি ঘটে। এজন্য সরকার বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য নমনীয় ও অংশগ্রহণমূলক কল্যাণমূলক কর্মসূচি (এ্যাফারমেটিভ এ্যাকশন) গ্রহণকে প্রাধিকার দিতে পারে।

২) পুরো ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্ত-নৃগোষ্ঠী ও পাহাড়ি-অপাহাড়িদের মধ্যকার সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল সৌহাদ্যপূর্ণ। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে অপাহাড়ি জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে শিল্পায়ন, আধুনিকায়নের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির স্বাভাবিক ফল হিসেবে। এতে পূর্বেকার হৃদ্যতাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের কোনো ফাটল ধরেনি। চর্তুথ অধ্যায়ের আলোচনায় উঠে এসেছে: মৌলিক গণতন্ত্রের যুগে রাঙামাটি ইউনিয়ন কাউন্সিলে চেয়ারম্যান পদে একজন বাঙালি মুসলিম প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য চাকমা রাজা স্বয়ং প্রচারণা চালিয়েছেন এবং তাঁর বৃদ্ধা দাদিমাকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন ঐ প্রার্থীকে ভোট দানের জন্য। আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে কোনো সহিংসতা ছিল না। একজন চাকমা বুদ্ধিজীবী ও গবেষকের পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য: "Moreover, the natives, during Pakistani rule, never faced forced eviction or any physical threat (such as beating, torture, killings, etc.) from the non-natives and the Chakma Chief had always friendly relations with the Pakistani authorities. As a result, the natives never revolted or took up arms against the Pakistani Government in spite of destruction cuased by the hydro-dam.[৮১৬]" কিন্তু ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে এবং অব্যবহিত পর থেকে অপাহাড়িদের সাথে পাহাড়িদের সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান এবং হু. মু. এরশাদের আমলে পাহাড়িদের প্রতিরোধস্পৃহা দমনের উপায় হিসেবে পাহাড়ি এলাকায় বাঙালি মুসলিম পুনর্বাসন নীতি বাস্তবায়ন ও সামরিক বাহিনীর নিবর্তনমূলক অভিযানের ফলে সেটা সংঘাতময় রূপ ধারণ করে। এ সংঘাতময়

[৮১৬] Aditya Kumar Dewan, *Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh*, p. 185

পরিস্থিতি একটি অঞ্চলের তো বটেই পুরো দেশের সামগ্রিক সুনাম ও উন্নয়নের পথে বিরাট অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়। সুতরাং পার্বত্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ভুলে কর্মোপযোগী (ওয়ার্কেবল) জাতিগত সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে জাতীয় নীতি হিসেবে *সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের* ধারণা গ্রহণ, প্রচার-প্রসারের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণ, সরকার ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র, দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যম, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক, শিক্ষামন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে একসঙ্গে বাস করতে হবে; সংঘাত, সংঘর্ষ অনেক হয়েছে। যেকোনো মূল্যে এর পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হবে। সুতরাং অতীতের সেইসব ঘটনা, উৎসব, অনুষ্ঠান, জীবনী, প্রভৃতির আলোচনা দরকার – যা' থেকে পাহাড়ি-বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং ঐক্যের ভাব বৃদ্ধি পায়। আর যেসব ঘটনার আলোচনা পুরাতন ক্ষতকে নতুন করে জাগিয়ে দেয়, সে সবের যত কম এবং সন্তর্পণে উল্লেখ হয় ততই মঙ্গল। যেখানে সে সবের উল্লেখ অপরিহার্য, সেখানে নিরপেক্ষভাবে যাতে ঘটনাবলির আলোচনা হয়, কোনো বিশেষ জাতিকে দোষী না করে যাতে প্রকৃত অপরাধীর ওপরই দোষারোপ করা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সকলের বাঞ্ছনীয়। এজন্য জাতীয়ভাবে একটি নৃগোষ্ঠী নীতি প্রণীত হতে পারে।

৪) সশস্ত্র আন্দোলন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা পাহাড়ি রাজনৈতিক দল জেএসএসসহ সকল রাজনীতি সচেততন গোষ্ঠীকে দেশ গঠনে নিয়োজিত রাখার ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে সে ব্যাপারে আরও সংবেদনশীল নীতি দরকার। এ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে প্রকৃতঅর্থেই পাহাড়ি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের আশ্রয়স্থল বা প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় পরিণত হয় সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সক্রিয় উদযোগ আবশ্যক।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশের সরকারি প্রশাসনিক কেন্দ্র বিন্দু বাংলাদেশ সচিবালয়ে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৫৪ নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠিত হয় আঞ্চলিক পরিষদ। একটি বিষয় সংশ্লিষ্ট সবার নজরে থাকা ভাল যে, মন্ত্রণালয় পরিচালিত হয় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা। সেখানে

চুক্তি সম্পাদনকারী জেএসএসের নীতি নির্ধারণী নেতৃত্বের পক্ষে দায়িত্ব পালনের সুযোগ সুদুর পরাহত। অন্যদিকে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের সুস্পষ্ট প্রেক্ষাপটটি সবার সুপরিজ্ঞাত। এটিও শান্তি চুক্তি ঔরসজাত প্রতিষ্ঠান এবং আঞ্চলিক পরিষদ একটি মাঠ পর্যায়ের বিশেষায়িত সংস্থা। এটি একটি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ যাদের জনগণের কাছে জবাবদিহির প্রশ্ন জড়িত। আশু পদক্ষেপ হিসেবে জেএসএসের মূল নেতৃত্ব এ সংস্থার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত যে-ব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে থাকে না। অধিকন্তু এ সংস্থার চেয়ারম্যান পদটি প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদার। সুতরাং তাঁর সাথে সরকারের বাৎসরিক সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের বৈঠক কিংবা মন্ত্রিসভায় ''আমন্ত্রিত সদস্য'' হিসেবে তাঁর যোগদান ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যায়। এতে সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী মহলের সঙ্গে আঞ্চলিক পরিষদের নিয়মিত যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। সরকার ও জেএসএস নেতৃত্বের মধ্যকার দূরত্ব অনেকাংশে ঘুচে যাবে। পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক দৃঢ় হবে। দেশ গঠনে অংশীদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আঞ্চলিক পরিষদের বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হবে। পরিষদ সদস্যদের মন থেকে নিজেদেরকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে গুরুত্বহীন ভাবার হীনমন্যতা কেটে যাবে। তখন সবাই একই সুরে মনেপ্রাণে বলতে পারবে: *আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।*

পরিশিষ্ট ১

১৯৩১ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাহাড়ি চিফদের প্রেরিত স্মারকলিপি

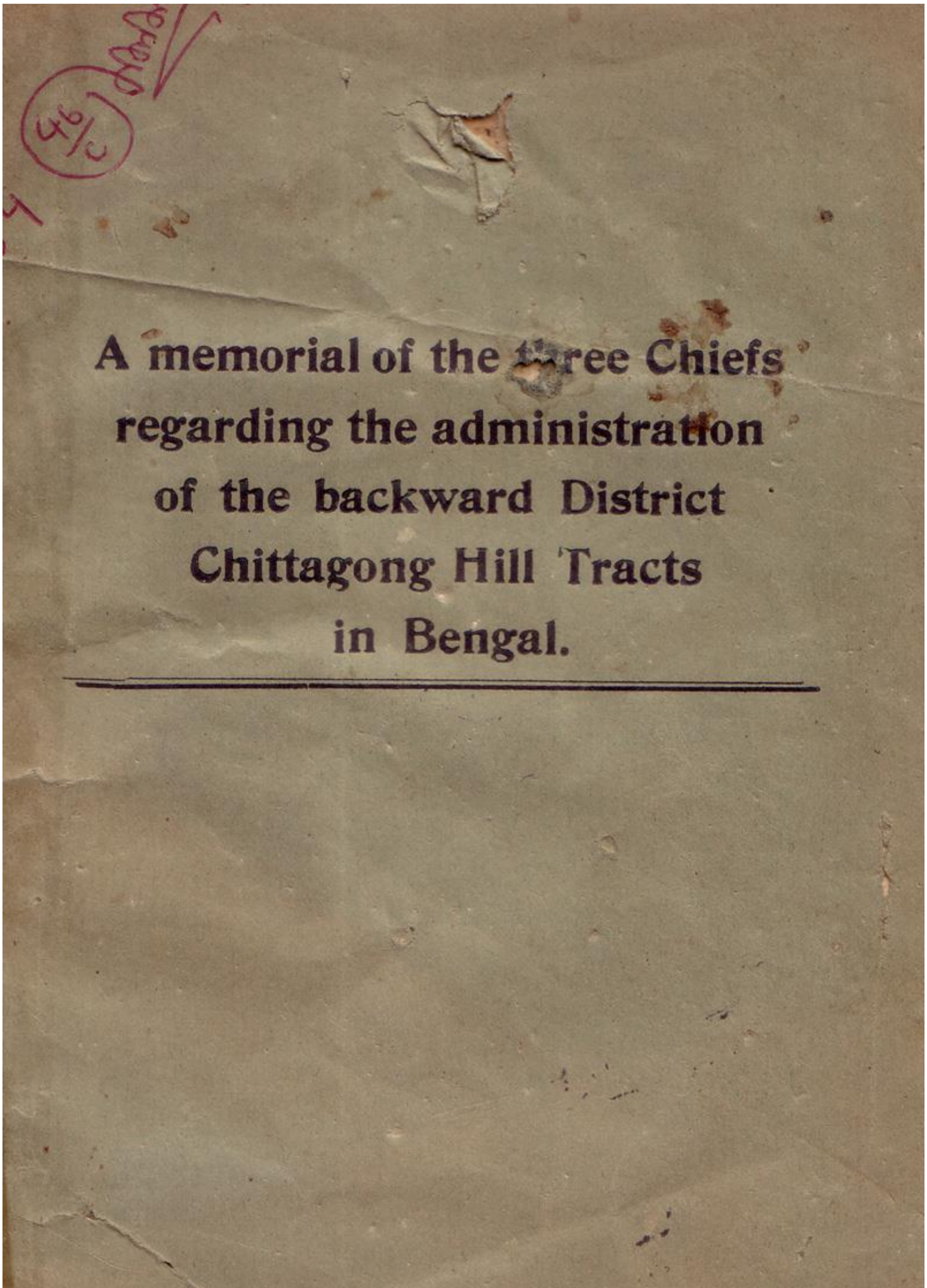
A memorial of the three Chiefs regarding the administration of the backward District Chittagong Hill Tracts in Bengal.

১৯৩১ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাহাড়ি চিফদের প্রেরিত স্মারকলিপি

To

His Majesty's the Right Hon'ble
Prime Minister

AND

The Right Hon'ble Secretary of state
for India

AND

THROUGH

His Excellency the viceroy and
Governor General of India in Council

AND

THROUGH

The Hon'ble Revenue Member
(Excluded Branch)
of the Government of Bengal.

The humble representation of the under-signed respectfully sheweth :

1. That the question of the future administration of the Chittagong Hill Tracts on the North-Eastern Frontiers of the Bengal Presidency has recently been discussed by the Simon Commission (Vide Simon Report Vol. 1P. 62 Vol. II Pages 127-134 uuder the head "Backward Tracts" and by Government of India in their Despatch of the 20th September 1930, pages 45 -48 and there is every possibility of this matter coming under discussion by the Federal Structure Committee of the Round Table Conference which are to begin their deliberations shortly ;

[2]

2. That the undersigned are the Chiefs of the three 'Circles' into which the adminstration of the Chittagong Hill Tracts has been divided since the year 1860 when they were brought inside the settled jurisdiction of the British Government in India;

3. That they are descended from princely families of great and historic antiquity, exercising for many centuries the rights and prerogatives of independent rulers over their respective people and territories ;

4. That these Tracts comprise an area of 5,138 sq. miles and have a total population of about 200,000 and have a great strategic importance, bounded as they are by the state of Hill Tipperah on the north, on the west by the District of Chittagong, on the south by Arakan, and on the east by the Arakan Hill Tracts and the Lushai Hills ;

5. That the Hill Tracts are inhabited by a variety of hill tribes with complicated social manners and customs, and with but little affinity with the more advanced plains-men of the contiguous districts ; that their religion is Buddhist and their entire social fabric is controlled by tribal laws of long standing which for ages have been administered by the Chiefs assisted by headmen ;

6. That the people of the Hill Tracts are unsophisticated and straightforward and are averse to any complicated system of administration and are apt to resent foreign and extraneous interference of any from ; that though, essentially peace loving in charactor they have a long record as fighters and if properly drilled and disciplined are likely to make excellent soldiers ;

7. That they have complete confidence in and respect for their Chiefs whom they look up to as their paterfamilias and who have functioned as such for genarations ;

8. That the three Chiefs have often and again e.g. in the Arracan War, and in the Lushai expeditions and the Kuki expedition proved their staunch loyalty to the British Throne and their ancestors, and the present incumbents have received recognition of their faithful services from the Government :

9. That when first this areas were taken up under the direct control of the Crown, the newly appointed Superintendent of these Tracts received as part of his instructions a mandate to *"issue no orders except through the Chiefs"* (Vide Rules for the administration of the Chittagong Hill Tracts, 20th June 1860.) ;

10. That even so early as 1829, Mr. Halhead, the Commissioner of Chittagong, remarked. "The Hill Tribes are not subjects but merely tributaries. I do not recognise any right on our part to interfere with their internal arrangements" ; and about 40 years later, (1866 A.D.) Captain Lewin wrote : "The outward symbol as well as inward basis of the Chiefs' authority was the collection of taxes from the inhabitants of the Hills" ; and later on, the Bengal Board of Revenue in 1869, wrote to the Government "Each Chief has a prescriptive right to levy an undefined capitation tax on every head of a family in his tribe wherever he may be" ;

11. That the Paramount British Power originally received its share of the revenue from these Tracts in Cotton and that money payment in lieu of cotton was first establishment in 1789 ;

12. That since the year 1860 when the three Chiefs were brought into definite contractual relations with the British Government, the jum tax being the time-honoured

tax levied on each family unit by the Chiefs, has been levied by the Chiefs on their own prescriptive and inalienable authority through the headmen and only a portion of the levy has been paid to the Government, the Chiefs having also enjoyed the right of collecting the plough revenue (i.e. revenue on land cultivated by the plough as distinguished from jum or hill soil cleared and fired and thus made fit for crops by primitive methods) from their subjects, and receiving a stipulated portion of the payment ;

13. That while the British Government in earlier days and even now recognised the status of the Chiefs and the right to administer their territory, unfortunately the policy of the local admistration in recent times towards the Chiefs has not been one of mutual trust, co-operation and goodwill, and attempts have been made and enforced from time to time by the Government to deprive the Chiefs, long recognised as feudatories, by stages, first of their tax-collecting authority and next of their judicial and administrative powers, and that this gradual diminution and dilution of the rights and privileges of the Chiefs which was temporarily arrested under the generous regime of that far-sighted Governor of Bengal His Excellency Lord Ronaldshay (than whom the Chiefs had seldom a better friend, now the Marquis of Zetland and an honoured member of the Round Table Conference) culminated during the last days of the satrapy of His Excellency Lord Lytton in a calculated move by the Bengal Government to divest the Chiefs of all responsibility and authority in the matter of collection of plough-rent and to deprive them of control of tribal affairs and matters of internal arrangement including the "prescriptive" right of even jum-tax collection and of the very small and limited judicial powers at present enjoyed by the Chiefs assisted by their headmen (though happily some of these proposals have not been carried out) ;

14. That during the last few years the 'Circles' have been placed under Sub-divisional officers with concurrent jurisdiction with the Chiefs, these officers being subordinate to the Deputy Commissioner who has replaced the old-time Superintendent ;

15. That a further attempt was made to curtail the power and prestige of the Chiefs by deputing an officer of the distant Assam Frontier service possessing no knowledge of local conditions to make an enquiry into the administration of the Hill Tracts —a procedure unjust both to the tribes and their trusted Chiefs, unwarranted by historical precedents, old contracts and rules of administration. That this officer submitted a report recommending the taking over the whole administration of the Tract directly by the Government of Bengal, and reducing the Chiefs whose titles to Chiefdom and internal control date back in some cases to the 12th and in some others to the 16th centuries to mere pensioned retainers of Government. That in lieu of some shadowy honours of very little value and consolidated monetary allowance the Chiefs were asked to accede to a proposal to deprive them of all power and authority, which for centuries has been direct and beneficient and particularly suited to tribal requirments and to reduce the Chiefs to the servile position of mere stipendaries, honorary magistrates and advisers, of the local agents of the Government of Bengal ;

16. That the Chiefs take this momentous occasion as a great and fitting opportunity to officially represent matters to the Heads of the Indian affairs in Great Britain and to seek for bare justice, at the source, the fountain-head of all justice, all law, all equity in the British Empire. The Chiefs have been absolutely devoted to the person of His Majesty, the King Emperor and loyal to their pledges ; they rendered material

assistance, consonantly with their resources, the Paramount power during the Great War of 1914-18, and even during the Civil Disobedient movement of 1930-31, on occasion of a recent local disturbance when the Government Forest Reserves at Kassalong were subjected to trespass by the ignorant and ill-advised villagers who owed allegiance to the Chakma Raja and when penal measures taken by Government Officials and even a threat of marching Military Police Force through the disturbed area had practically failed to ease the tension, the Chakma Chief gladly placed his great powers of persuasion at the disposal of Government and secured by his personal influence alone what the terrors of the law aided by police had failed to achieve ;

17. That the entire British Indian System is now being revised, remoulded, and brought into line with India's natural aspiration to be an equal ally and partner with the other self-governing units inside the British Empire ; that the Indian Princes, big and small, have been invited to join the Round-Table Conference for the second-time as honoured partners and helpers in evolving a scheme of All-India Federal Dominion. That it is at this juncture when all the interests including those of outlying tracts like the Hill Tracts, are going to be considered with a view to frame in new constitute for India, the Chiefs ever loyal to the Sovereign Power beg of His Majesty's Prime Minister and the Hon'ble Secretary of State for India to be so kind as to review the whole position with regard to the administration of the Chittagong Hill Tracts and to reassure the Chiefs not only as to their continuance of the established and enjoyed privileges but to a further expension of power so that

(a) under any scheme of Provincial autonomy the

15

newly formed Bengal Legislative Council and Cabinet of Ministers may be debarred by Statute to exercise any authority direct or indirect over these three Chiefs and the tracts under their charge.

(b) The entire area might be placed under the direct control of the Government of India functioning through an accredited agent;

(c) All powers of collection of taxes, whether from 'plough-lands' or 'jums', and all civil and criminal authority inside their areas may be fully exercised without let or hindrance, by the Chiefs.

(d) The status of the Chiefs may be similar to that of other Feudatory Chiefs in India;

(e) And the coustomary hereditary titles of Raja for the Chakma Chief, Bohmong Raja for the Bohmong Chief and Mong Raja for the Mong Chief sanctioned by immemorial usage and accepted by the Government up till recently in respect of all three Chiefs may be secured to them and their descendants according to tribal custom;

18. That in support of their prayer for a review, reconsideration and strenghtening of their status as feudatory Chiefs allied by unbreakable ties of reciprocal goodwill to the British Paramountcy, the Chiefs may be permitted to refer to the following recommendations of Simon Commission with reference to backward tracts :—"only if responsiblity for the backward tracts is entrusted to the centre, does it appear likely that it will be adequately discharged", (Vol II p. 109, Simon report); and even the Government of India, in their despatch dated 20th September 1930, have been pleased to make the acknowledgment that the whole subject (administration of the Chittagong Hill tracts) will require further detailed consideration".

[8]

19. That in conclusion, the memorialists be permitted to offer through you their combined respectful homage to their dearly beloved and much honoured Soverign His Majesty the King-Emperor and to reiterate their complete faith in the goodwill and justice of his trusted advisers in Great Britain. That they have made no secret of their sore grievances with regard to the narrow policy pursued in respect of them from time to time by the Government of Bengal, a policy made more grievous by the attitude displayed by some of the past local-Government agents and calculated to-inflict a deep wound on their susceptibilities and sense of tribal honour as descendants of "the oldest and most respectable families in Chittagong and Hill Tracts Districts" (Hutchinson), which were independent not in name but in actual authority, paying no tribute even to the great Moghul till 1713 A. D.);

20. That the Chiefs respectfuly beg that an active policy of trustful good will may be recommended towards their rightful claims and that their deep seated loyalty and continued readiness for service on many a momentous occasion may be given the generous recognition that it can request from the trustees of a mighty World-Empire on which the Sun never sets and whose watch words have ever been "live and let live." That your memorialists again reiterate their unflinching confidence in and loyal devotion to the Paramount Power and press most respectfully their request for a speedy and permanent redress of their grievances under the existing regime. Yours memorialists beg to subscribe themselves.

Your most loyal allies and devoted servants

CHITTAGONG HILL TRACTS

The 5th September 1931.

Raja **Bhuvan Mohan Roy.**
Chakma Raja.

Keozan Phru.
Bohmong Raja.

Nephru Sain.
Mong Raja.

পরিশিষ্ট ২

১৯৪৭ সালে সীমানা কমিশনের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির স্মারকলিপি

পা. চ. জনসমিতির স্মারকলিপি- ১৯৪৭

A MEMORANDUM INDICATING THE POLITICAL DEMANDS

OF

The People Of Chittagong Hill Tracts

(EXCLUDED AREA) BENGAL.

1. The district of Chittagong Hill Tracts is a frontier district of Bengal in the east, bounded by native state Hill Tippera on the north, by Arakan on the south, by the Lushai Hills and part of Arakan on the east and by the district of Chittagong on the west, comprising an area of 5073 square miles out of which about 1400 square miles lie within Government Reserve Forests. The district is chiefly inhabited by several small hill tribes with a small number of Bengalee immigrants numbering 13,661 out of which 7270 are Mohammadans. The Chakmas who are more or less pro-Bengalees, form the major part of the tribal population as well as the advanced section of the people. According to the census report of 1941 the population of the district is noted below :—

Total population	....	247,053			
Tribal population	....	233,392	viz.	94·47%	of total population.
Non-Muslim population.	....	239,763	viz.	97·06%	,,
Muslim population.	....	7,270	viz.	2·91%	,,
Buddhist population.	....	205,716	viz.	83·25%	,,

Note :—The district is therefore a purely non-muslim and tribal area in Bengal. As the only non-Muslim area with a predominance of tribal population this district presents a very delicate position in Eastern Bengal where there is an overwhelming Muslim majority.

The district now called as the Chittagong Hill Tracts originally formed a part of Chittagong district proper and was only separated from the main district in the year 1860 when the British Govt. directly took charge of the administration of this land.

Present Administration :—Ever since its creation in the year 1860 this district has been administered as a non-regulation district on a principle of exclusion from civilised administration and isolation from the rest of the Province. The result proved subversive to all progressive activities from inside and outside for a long period. It has again been excluded from the Reforms of 1935 which has caused a severe setback and disappointment to the people. The administration is carried on by a Deputy Commissioner who is not only both the executive and the judicial head of administration but also controls all other functions of every branch of civil administration within the district by virtue of which he exercises unlimited powers like an absolute monarch with none to dispute him.

পা. চ. জনসমিতির স্মারকলিপি- ১৯৪৭

[2]

3. As regards the coming Reforms, the local agents of the government want the people of this particular region to say that they are satisfied with the existing order of things, the facts being just the reverse.

4. The people of Chittagong Hill Tracts do no more desire that they should be ostracised from Reforms. But at the same time they halt to hazard themselves adrift, all on a sudden, into the midst of their advanced neighbours. And so they feel that until they attain the standard of equality with the neighbouring districts it would be safer for them to preserve their territorial and national integrity in an autonomous district.

5. Under such circumstances they emphatically demand that the Constituent Assembly of India should pay particular attention to the aspirations of the people of Chittagong Hill Tracts, briefly indicated below, in making a constitution for them:—

(a) That Chittagong Hill Tracts shall be an autonomous district, administered strictly under democratic principles and popular Government, and constituting a unit in the Indian Federation.

(b) That in order that these backward people may soon rise to stand on equal footing with their advanced neighbours of the Indian family of nations, the Union Government shall provide for adequate funds for their speedy uplift.

(c) That in order that the Constituent Assembly may be properly enlightened of the facts of this tribal district, the only Excluded Area in Bengal, a representative of the people of this district should be taken in the Advisory Committee to the Constituent Assembly.

Rangamati,
Chittagong Hill Tracts.

15-2-47.

Kamini Mohan Dewan
President,

Sneha Kumar Chakma
General Secretary,
The Chittagong Hill Tracts
Peoples Association.

উৎস: D. K Chakma (ed.), *The Partition and The Chakmas*, pp. 200-201.

ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমা নেতাদের স্মারকলিপি-১৯৭১

Annexure — 10

MEMORANDUM OF CHAKMA LEADERS OF TRIPURA .

To
The Lt. Governor of Tripura

on
Mass killing of Chakmas in Chittagong Hill Tracts
by Mukti Bahini and local muslims.

Sir, On behalf of the Chakma Community of Tripura we beg to bring to your kind notice and through you to the notice of the Govt. of India the following facts :-

1. The main-body of Chakma Community , to whom the Chakmas of Tripura are closely related still live in Chittagong Hill Tracts. We are very much distrubed at the disquietening news coming from the border areas of ChittagongHill Tracts.

2. Success of Bangladesh has seriously told upon the Chakma community of Chittagong Hill Tracts, because they were from the very inception of the Bangladesh movement, with purpose, segregated out of the freedom fight.

3. Mukti Bahini men in command betrayed their evil intentions by saying : "Chakmas shall be annihilated".

4. They have been found executing their purpose as soon as the Bahini entered Chittagong Hill Tracts :-

(a) On 7.12.71 and 8.12.71 the victorious Mukti Bahini entered Panchari and Mahalchha and burnt hundreds of Chakma houses and killed more than hundred chakmas including women indiscriminately.

(b) On 15.12.71 and 16.12.71 they indiscriminately killed hundreds of Chakmas and burnt hundres of Chakma houses of Gasban Kukkichara, Paracharа and Chinginala etc. under Khagra-chari Sub-Divisional Head Quarter and are perpetrating, loot rape and so on .

ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমা নেতাদের স্মারকলিপি- ১৯৭১

(c) The Mukti Bahini is undertaking the mass atrocities in collusion with the local muslims of Tabalchari Union under Ramgarh P.S.

5. From the Tripura Border down to Khagrachara, Kasalchari about 30 miles most of the Chakmas are living in forest and jungles.

6. Indian Army men are not with the Mukti Bahini and the Chakmas are praying for Indian Army to intervene.

7. In this Emergency period and a period of victory of India Government Policy we are really sorry to make this report. But our anxiety for our own race, and to make the secular policy of India a universal success, we feel it necessary to bring these to your kind notice.

It is hoped that you will exercise your kind influence and power to make and end of the misdoings of India's bold ---- creation " Bangladesh".

Dated,
the 22.12.71

Yours faithfully,

(Ghanashyam Dewan), Mainama.

(Sneha Kumar Chakma) Agartala.

(Protaranjan Khisa), Agartala.

(Gunamani Karbari),Silachari.

(Mrinal Kanti Chakma) Silachari

(Dhaniram Talukder) ,Manmara.

(Karma Karbari) Dhanichari.

Babru Rahan Chakma
Agartala

Copy to Sri Shivabhakti Sankar Ray
Central Education Minister
w.s.t. Tripura.

D. K Chakma (ed.), *The Partition and The Chakmas*, pp. 251-252.

পরিশিষ্ট - ৪

১৯৭০ সালের নির্বাচনে চারু বিকাশ চাকমার নির্বাচনী ইশতেহার

আমার ইস্তেহার

—()—

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনগণের প্রতি—

আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন আমি জাতীয় পরিষদে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম নির্ব্বাচন কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেছি। আমাদের পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আমাদের জাতীয় নেতারা সব সময়ই ভুল নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তাঁদের স্বার্থ প্রনোদিত অথবা সঠিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবের জন্য তাঁরা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণের জন্য এ পর্য্যন্ত অশেষ দুঃখ দুর্দ্দশা টেনে নিয়ে এনেছেন— যে দুঃখ দুর্দ্দশা আমরা তাঁদের সঠিক ও সাহসিকতাপূর্ণ নেতৃত্বের জন্য অনায়াসেই পরিহার করতে সমর্থ হতাম। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে মহামান্যা কালিন্দী রাণীর ভুলের জন্য দেড়শত বৎসরের বৃটিশ শাসনাধীনে আমরা ইংরেজ শাসকদের যথোপযুক্ত অনুগ্রহ ও সহযোগিতা লাভ করতে পারিনি। বিশ্বাসঘাতক স্নেহ কুমার চাক্মার ভুল নেতৃত্বের জন্য গত ২৩ বৎসর আমরা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে যথোপযুক্ত অনুগ্রহ লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছি। অতীতের ভুল নেতৃত্বের জের এখনও আমাদের জাতীয় নেতারা টেনে চলেছেন। যে মুসলিম লীগ গত ২২ বৎসর ধরে শুধু ২২ পরিবারের স্বার্থ রক্ষা করে আসছে ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে সমগ্র পাকিস্তানের ১২ কোটি জনসাধারণকে নির্ম্মমভাবে শোষন করার সুযোগ দিয়েছে সেই মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে তল্পীবাহক হতে আমাদের জাতীয় নেতারা এখনও প্রস্তুত রয়েছেন। তাই তাঁদের স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী নেতৃত্বের ঐতিহাসিক প্রতিবাদ হিসাবে আমি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ৪ লক্ষ আপামর জনসাধারণের পক্ষ হয়ে সমগ্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরাধা আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের উপর গভীর আস্থা রেখে পাকিস্তানের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ গণনায়ক, জাতির কাণ্ডারী শেখ মজিবুর রহমান কর্ত্তৃক রচিত ১২ কোটি মজলুম পাকিস্তানী জনতার মুক্তি সনদ ৬ দফা বাস্তবায়নের জন্য অর্থাৎ পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের পূর্ণস্বায়ত্ব শাসনের দাবী আদায়ের জন্য জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম নির্ব্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেছি।

এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম বাঙ্গালী ও এক ডজনেরও বেশী বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ অনুন্নত অঞ্চল। পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পূজারী শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে এক বিশেষ অনুন্নত অঞ্চল বা উপজাতীয় এলাকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে চারু বিকাশ চাকমার নির্বাচনী ইশতেহার ৪/২

[২]

হিসাবে শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে মর্য্যাদা আয়ুবী শাসনতন্ত্র ১৯৬৩ সনের হঠকারিতা মূলক সংশোধনা প্রস্তাবের মারফৎ (Appendix 1. the constitution 1st amendment act, 1963) আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। একটি বিশেষ অনুন্নত অঞ্চল হিসাবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অনুন্নত অধিবাসীদের এই নূন্যতম বাঁচার দাবী ও আয়ুব সরকার কেড়ে নিয়েছিলেন ১৯৬৩ সনে যার প্রতিবাদ করতে আমাদের জাতীয় নেতারা—যাঁরা তখন পুর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে মেম্বার ও মন্ত্রী হিসাবে বহাল ছিলেন—সাহস পাননি। আমি জাতীয় নেতাদের সাম্প্রতিক প্রকাশ্য বহু গণসভায় অনুরোধ করেছি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে জাতীয় পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য। কিন্তু তাঁরা এ পর্য্যন্ত রাজী হননি কারণ তাঁরা আওয়ামী লীগের মত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করতে নারাজ। কাজেই আমি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অনুন্নত বুভুক্ষ আপামর জনসাধারণের পক্ষ হয়ে এক বিরাট রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়েছি গণবিমুখ নেতাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যাহত মজলুম জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে। আমি মনে করি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য এক বাস্তব মুখী কার্য্যকরী অর্থনৈতিক কর্ম্ম পন্থার প্রয়োজন যার প্রতিধ্বনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং ঐ অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমকে বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদের পাঁচটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হতে হবে :— ১) নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করবার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাও, ২) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাও, ৩) নিজস্ব সামাজিক জীবনধারা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাও, ৪) উৎপাদন বাড়াবার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাও, ৫) গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

আমরা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা আজ এই শপথ নেবো যে, সমগ্র পাকিস্তানের ১২ কোটি সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্ম হয়ে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বীর সৈনিক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগের বিঘোষিত গনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার সংগ্রামে অংশ গ্রহন করবো ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এমন এক সুন্দর, সমৃদ্ধ, সুখী ও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করবো যে সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি লোক অভাব মুক্ত ও অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে এক স্বাধীন, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে উন্নত জীবন উপভোগ করতে পারবে। তাই ঐ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য নিম্নলিখিত গণদাবীগুলি পেশ করতেছি এবং বিশেষ জোর দিয়ে ও অসীম গুরুত্ব সহকারে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছে ও জাতীয় পরিষদে পেশ করবো (যদি আপনারা আমাকে জয়যুক্ত করেন) যাতে আগামী শাসনতন্ত্রে ও আগামী গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উক্ত গণদাবীগুলি পূরণ করার জন্য সুনিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

দাবী সমূহ

১। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে এক বিশয অনুন্নত অঞ্চল বা উপজাতি অঞ্চল হিসাবে শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা দিতে হবে এবং উক্ত অঞ্চলের অনুন্নত বাঙ্গালী ও উপজাতীয় অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ রক্ষা কবজের সুনিশ্চিত বিহিতব্যবস্থার যথোপযুক্ত সংবিধান আগামী শাসনতন্ত্রে সংযোজিত করতে হবে।

(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার—'উপজাতি এলাকা' কলাম পৃষ্ঠা ২৬)

২। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী এই অনুন্নত বিশেষ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত করতে হবে এবং উক্ত অঞ্চলের শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য গণভোটে নির্ব্বাচিত পরিকল্পিত গণপ্রতিনিধি সভায় যথেষ্ট সদস্য সংখ্যার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বাঙ্গালী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রত্যেকটি উপজাতি সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করতে পারে। তদুপরি এই অঞ্চলের শাসন কর্তৃপক্ষকে সরাসরিভাবে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে যাতে উক্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা এই অঞ্চলের জনগণের সর্বাত্মক উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োগ করা যায় ও জণগণের দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়।

(রেফার—নিখিল পাকিস্তাম আওয়ামী লীগের ইস্তেহার—গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার 'ডি' কলাম পৃষ্ঠা ৪)

৩। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের জন্য বিশেষ অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে উপজাতীয় ও বাঙ্গালী জনসাধারণ নিজদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষন করতে সুযোগ পায়। এইজন্য পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শিল্প এলাকাগুলির জন্য প্রাদেশিক পরিষদে একটি বিশেষ আসনের ব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৪। (ক) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনার ক্ষতিগ্রস্থ ৫৫০০০ একর জমির প্রতি একর জমি ৬০০০'০০ টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং উক্ত বাঁধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) উক্ত ক্ষতিপূরণ বাবৎ প্রাপ্য ৩০ কোটি টাকা (ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জন্য সর্বমোট খরচ বাবৎ মাত্র ৩ কোটি টাকা পূর্ববর্ত্তী সরকার ব্যয় করেছেন বলে জানা গেছে) হইতে পর্য্যায়-ক্রমে মঞ্জুরীকৃত অর্থ বরাদ্ধ টাকা দিয়ে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্পে স্বয়ং শাসিত ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি বিশেষ সরকারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে হবে। যদি একটি নতুন সরকারী উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করা সম্ভব না হয় তা'হলে পাকিস্তান ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক বা অন্য যে কোন স্থায়ী সরকারী ব্যাঙ্কে একটি বিশেষ ডিভিশন খুলতে হবে। যদি প্রাথমিক ভাবে ক্ষতিপুরণ বাবৎ শুধুমাত্র ৫ কোটি টাকাও দেওয়া হয় তা'হলে শতকরা ৫'০০ হারে বাৎসরিক সুদের টাকার বাবৎ উক্ত বোর্ডের ২৫ লক্ষ টাকা আয় হবে। উক্ত অর্জ্জিত অর্থ থেকে ষ্টাফ

খরচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে কমপক্ষে ১০ হইতে ১৫ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত থাকবে যে টাকাগুলি অনায়াসে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয় করা যাবে।

৫। কাপ্তাই বাঁধের পানির উচ্চতা সব সময় ৯০ ফুটের নীচে যথাসম্ভব সীমিত রাখতে হবে যাতে জলে ভাসা জমিতে শীত কালীন বোরো ধানের সুষ্ঠু চাষবাসের ব্যবস্থা করা যায়।

৬। জলে ভাসা জমিগুলি স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল বা অন্য কোন বিশেষ কমিটির মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করতে হবে।

৭। উপজাতীয় ও বাঙ্গালী জনগনের সহ-সমৃদ্ধি ও পরস্পর অর্থনৈতিক সহযোগীতার উপর ভিত্তি করে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে হবে এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে।

৮। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ছোট শিল্প, কুটিরশিল্প, হাস-মুরগী, ডেয়ারী ফার্ম, গরু, শুকর, ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি পশুপালন, কৃষিকাজ ও বাগান সম্প্রসারণ প্রভৃতি উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর জন্য ব্যক্তিগত, সমবায় বা বহুমুখী সমবায় সমিতি দ্বারা সংগঠিত অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার জন্য স্থানীয় উপজাতীয় ও বাঙ্গালী জনসাধারণকে যথেষ্ট পরিমানে ব্যাপক আর্থিক ও অন্যান্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এইসব অর্থনৈতিক উৎপাদনমূলক কর্মসূচীর জন্য পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যাঙ্ক থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পর্য্যাপ্ত পরিমান দেওয়া হবে। টিনজাত গো মাংস, শুকরের মাংস, ডিম ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এইভাবে এই অঞ্চলের ব্যাপক বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে।
(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ১৪, ১৫, ১৭, ২০)

৯। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় মৎস্য-জীবিদের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ঋণদান, মাছ ধরবার জাল ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যাপকহারে সরবরাহ করতে হবে এবং তাহাদের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতিগুলিকে সমস্ত রকম সাহায্য দিতে হবে ও তাহাদের বিশেষ পেশাজাত স্বার্থ সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।
(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার— ফিসারিস কলম, পৃষ্ঠা ২০)

১০। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় তাঁত শিল্পকে সমবায় ভিত্তিতে সংগঠিত করে উন্নত পর্য্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

১১। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যগত মদশিল্পকে আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত করে মদ্যজাত দ্রব্যকে জাপান ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

১২। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের আনারস বাগানের অতি দ্রুত ও ব্যাপক হারে সম্প্রসারণ কল্পে আনারস বাগানের মালিকদের দ্বারা গঠিত একটি ক্রয় বিক্রয়কারী সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের একচেটিয়া ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা দিতে হবে যাতে তারা আনারসের উচিত দর পায় এবং আনারস টিনজাত বা সংরক্ষিত করে বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের কৃষি উন্নতিকল্পে সেচ প্রথাসহ একটি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ও চাষীদের ব্যাপক হারে দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ দিতে হবে। বর্ত্তমান সরকারী কৃষি ঋণের শতকরা ৫০% ভাগ মওকুফ করে দিতে হবে।

১৪। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাষী ও জুমিয়াদের কৃষি সমবায় ইত্যাদি জাতীয় গঠনমূলক কাজের জন্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য, পাকিস্তানী জাতীয় ভাবধারায় উৎবুদ্ধ করবার জন্য, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম কৃষক সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।

১৫। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের যাতায়াত, যোগাযোগ, যানবাহন ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি সাধন করতে হবে।

১৬। (ক) প্রদেশের সমস্ত কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক আসন অনগ্রসর এলাকা হিসাবে নির্দ্দিষ্ট ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ দানের উদ্দ্যেশ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিশেষ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কারিগরি ভিত্তিক শিক্ষা প্রচলন এবং উক্ত জেলায় নতুন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করতে হবে এই জিলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুন করে সৃষ্ট, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে যথাসম্ভব স্বয়ং শাসিত করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করতে হবে। এই উদ্দ্যেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য বা ঋণ দিতে হবে যাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজস্ব বিভিন্ন অর্থকরী সংস্থা গড়ে তুলতে পারে যেখানে ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের কারিগরি বা কৃষি ও বাগান ইত্যাদি কাজে হাতে কলমে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারে। পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক ঋণ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া যাইতে পারে।

(গ) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমানে ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্ব্বে উল্লেখিত উন্নয়ন ব্যাঙ্কের অর্জ্জিত সুদের টাকা হইতে ষ্টাইপেণ্ড ও শিক্ষা উন্নয়নমূলক কার্য্যাবলীকে পর্য্যাপ্ত পরিমানে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে।

(গ) বান্দরবান ও মং সার্কেলের অনুন্নত বাঙ্গালী ও উপজাতীয়দের মধ্যে ব্যাপকহারে শিক্ষা প্রসারের জন্য ও তাঁদের সামাজিক অগ্রগতির জন্য পর্য্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে ও ঐ অঞ্চলের ছাত্র ছাত্রীদের বেশী সংখ্যক ষ্টাইপেণ্ড মঞ্জুর করতে হবে।

১৭। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী উপজাতীয় জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করতে হবে। ইহার উন্নতিকল্পে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিতে উপজাতীয় ছাত্র ছাত্রীদের নিজ নিজ ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার—'ভাষা ও সংস্কৃতি কলাম' পৃষ্ঠা ২৬)

১৮। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যাতে তাঁদের জীবন ধারনের মন উন্নীত হয়। তদুপরি তাঁদের যথাযত সামাজিক মর্য্যাদা দিতে হবে।

(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার—শিক্ষকতা পেশা কলাম, পৃষ্ঠা ২৩)

১৯। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একটি বাস্তব কার্য্যকরী কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি জাতীয় সমাজ-সেবা পরিক্রমায় বাধ্যতামূলক ভাবে অংশ গ্রহণ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার—নিরক্ষতা দূরীকরণ কলাম, পৃষ্ঠা ২২)

২০। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ৫ বৎসরের মধ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ ব্যাপকভাবে প্রসার করতে হবে।

(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার—
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কলাম, পৃষ্ঠা ২২)

২১। মহামেডান এবং হিন্দু উত্তরাধীকারী ও সামাজিক রীতি-নীতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য উচ্চ বিচার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সম্মিলিত উপজাতীয় আদালত গঠন করতে হবে। এই আদালত নির্দ্দিষ্ট লিপিবদ্ধ আইনসঙ্গত উপজাতীয় সামাজিক আইন বিরুদ্ধ বিবাহ, অযুক্তিক বিচ্ছেদ, চুক্তিকারীদের দ্বারা নারী অপহরণ ইত্যাদি বিবিধ সামাজিক অপরাধগুলির বিচার করবে। এই আদালত উপজাতীয় চীফদের ও একজন উপজাতীয় সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা গঠিত একটি সভাপতিমণ্ডলী ও উপজাতীয় জুরি দ্বারা ইহার বিচার কার্য্য পরিচালনা করবে।

২২। (ক) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সরকারী চাকুরির সমস্ত পর্য্যায়ে স্থানীয় অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জনের অগ্রাধিকার দিয়ে নিয়োগ করতে হবে।

(খ) পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উচ্চ পর্য্যায়ের (সিভিল সার্ভিস ইত্যাদি) সমস্ত চাকরি-গুলিতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য সংখ্যার ভিত্তিতে বিশেষ কোটা সংরক্ষ-ণের ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে হবে।

[৭]

২৩। পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও মিলিশিয়া (গণসৈন্য) বাহিনীতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্য হইতে অধিক সংখ্যক লোক দ্বারা বিশেষ ইউনিট সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উপর দেশরক্ষার মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে।

২৪। জুম চাষীদের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ধান্য বা পাহাড় জমি বন্দোবস্তী দিতে হবে।

২৫। সরকারী সংরক্ষিত বন এলাকায় ফরেষ্ট ভিলেজারদের ন্যায্য অধিকার ও স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৬। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম চাষীদের ৮৩/৪ একর হোল্ডিং পর্য্যন্ত ধান্য বা পাহাড় জমি বন্দোবস্তীর রাজস্ব খাজানা মকুব করে দিতে হবে।
(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইস্তেহার—জমি রাজস্ব খাজানা কলাম, পৃষ্ঠা ১৬)

২৭। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য প্রতি থানায় একটি করে হস্‌পিটাল ও প্রতি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলতে হবে। ঐসব হস্‌পিটাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঔষুধ ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত থাকতে হবে।
(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইস্তেহার—স্বাস্থ্য কলাম, পৃষ্ঠা ২৩, ২৪)

২৮। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের দুঃখগ্রস্থ অধিবাসীদের মধ্যে সস্তায় চাল, গম, লবণ, কেরোসিন, ডালতৈল ও মোটা বস্ত্র সরবরাহ করার জন্য বিতরণ কেন্দ্র খুলতে হবে।
(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইস্তেহার—অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কলাম, পৃষ্ঠা ১১, ১২)

২৯। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইস্তেহার অনুযায়ী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।
(রেফার—নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইস্তেহার— শ্রমিকের অধিকার কলাম, পৃষ্ঠা ২০, ২১)

৩০। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতিকে জাতীয় গঠনমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করার এবং তাদের দাবী দাওয়া পেশ করার পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

ইতি—

চারু বিকাশ চাকমা
২৪।৯।৭০ ইং

সরোজ আর্ট প্রেস, নিউ রাঙ্গামাটি।

Registered No. DA-1.

The Dacca Gazette

GOVERNMENT OF EAST BENGAL

EXTRAORDINARY

Published by Authority.

THURSDAY, FEBRUARY 18, 1954

PART I.—Orders and Notifications by the Governor of East Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF EAST BENGAL

HOME DEPARTMENT

Constitution and Elections.

NOTIFICATION.

No. 617C.E.—18th February, 1954.—In exercise of the power conferred by sub-rule (2) of rule 4 of the East Bengal Legislative Assembly Electoral (Conduct of Elections) Rules, 1953, the Governor is hereby pleased to publish for the constituencies of the East Bengal Legislative Assembly mentioned in the first column of the Schedule below the date or dates respectively specified in the corresponding entry in the second column of that Schedule which has or have been fixed by him under sub-paragraph (*1*) of paragraph 20 of Part I of the Government of India (Provincial Legislative Assemblies) Order, 1936, read with clause (d) of sub-rule (2) of the said rules as the date or dates on which a poll shall be taken in connection with elections to be held in those constituencies in pursuance of notification No. 2 C.E., dated the 1st January, 1954.

THE SCHEDULE.

Constituency.		Date or dates on which a poll shall be taken.
Muslim Constituencies.		
Thakurgaon North	...	8th March, 1954.
Thakurgaon South	...	Ditto.
Dinajpur Central	...	Ditto.
Dinajpur Sadar West	...	Ditto.
Dinajpur Sadar East	...	Ditto.

331

Constituency.	Date or dates on which a poll shall be taken.
Muslim Constituencies—*concld.*	
Tippera Sadar South-East ...	8th and 9th March, 1954.
Tippera Sadar South ...	Ditto.
Tippera Sadar Central-South ...	Ditto.
Tippera Sadar Central-West ...	Ditto.
Chandpur East ...	Ditto.
Chandpur Central-East ...	Ditto.
Chandpur North-West ...	Ditto.
Chandpur Central-West ...	Ditto.
Chandpur South-West ...	Ditto.
Chandpur South-East ...	Ditto.
Noakhali Sadar North-West ...	Ditto.
Noakhali Sadar West ...	Ditto.
Noakhali Sadar Central-West ...	Ditto.
Noakhali Sadar South-West ...	Ditto.
Noakhali Sadar South ...	Ditto.
Noakhali Sadar South-East ...	Ditto.
Noakhali Sadar Central-South ...	Ditto.
Noakhali Sadar Central ...	Ditto.
Noakhali Sadar Central-North ...	Ditto.
Noakhali Sadar East ...	Ditto.
Feni North-West ...	Ditto.
Feni East ...	Ditto.
Feni South ...	Ditto.
Chittagong Sadar North-West ...	Ditto.
Chittagong Sadar North-East-*cum*-Ramgarh ...	8th, 9th and 10th March, 1954.
Chittagong Sadar West ...	Ditto.
Chittagong Sadar Central-North ...	Ditto.
Chittagong Sadar East-*cum*-Rangamati ...	8th and 9th March, 1954.
Chittagong City ...	Ditto.
Chittagong Sadar Central-East ...	8th, 9th and 10th March, 1954.
Chittagong Sadar Central-West ...	8th and 9th March, 1954.
Chittagong Sadar South-West ...	8th, 9th and 10th March, 1954.
Chittagong Sadar South-East-*cum*-Bandarban ...	Ditto.
Cox's Bazar North-East ...	8th and 9th March, 1954.
Cox's Bazar West ...	8th, 9th and 10th March, 1954.
Cox's Bazar South ...	
General Constituencies.	
Rajshahi Division North ...	10th and 11th March, 1954.
Rajshahi Division North-East ...	11th March, 1954.
Rajshahi Division Central-North-West ...	9th, 10th and 11th March, 1954.
Rajshahi Division Central-East ...	Ditto.
Rajshahi Division Central-West ...	11th March, 1954.
Rajshahi Division South-West ...	10th March, 1954.
Bakarganj North-East ...	12th March, 1954.
Bakarganj South-West ...	Ditto.

পরিশিষ্ট ৫/৩

General Constituencies—*concld.*

Faridpur West	...	11th March, 1954.
Faridpur East	...	10th, 11th and 12th March, 1954.
Dacca West	...	9th, 10th, 11th and 12th March, 1954.
Dacca Central	...	10th, 11th and 12th March, 1954.
Dacca East	...	Ditto.
Mymensingh West	...	10th and 11th March, 1954.
Mymensingh Central	...	Ditto.
Mymensingh East	...	Ditto.
Sylhet North-West	...	11th March, 1954.
Sylhet North-East	...	Ditto.
Sylhet South	...	Ditto.
Sylhet South-West	...	Ditto.
Tippera North	...	Ditto.
Tippera Central	...	Ditto.
Tippera South	...	Ditto.
Noakhali West	...	9th, 10th and 11th March, 1954.
Noakhali-*cum*-Chittagong	...	11th March, 1954.
Chittagong North	...	Ditto.
Chittagong South	...	Ditto.
Chittagong Hill Tracts	...	8th and 10th March, 1954.

Scheduled Caste Constituencies.

Dinajpur North	...	9th March, 1954.
Dinajpur Central	...	Ditto.
Dinajpur South	...	Ditto.
Rangpur Central	...	10th March, 1954.
Rangpur North-West	...	Ditto.
Rangpur East	...	Ditto.
Bogra-*cum*-Pabna	...	Ditto.
Rajshahi West	...	9th and 10th March, 1954.
Rajshahi East	...	Ditto.
Pabna-*cum*-Kushtia	...	Ditto.
Jessore West	...	10th March, 1954.
Jessore East	...	Ditto.
Khulna North-West	...	9th March, 1954
Satkhira South	...	Ditto.
Khulna North-East	...	Ditto.
Khulna Sadar South	...	Ditto.
Bagerhat South	...	Ditto.
Bakarganj West	...	11th March, 1954.
Bakarganj North-East	...	Ditto.
Bakarganj South-West	...	Ditto.
Faridpur North-East	...	9th, 10th and 11th March, 1954.
Faridpur North-West	...	10th March, 1954.
Faridpur South	...	9th, 10th and 11th March, 1954.
Faridpur South-West	...	8th, 9th, 10th and 11th March, 1954.
Dacca West	...	10th and 11th March, 1954.
Dacca East	...	9th, 10th and 11th March, 1954.
Dacca Central	...	Ditto.

পরিশিষ্ট ৫/৪

Constituency.		Date or dates on which a poll shall be taken.
Scheduled Caste Constituencies—*concld.*		
Mymensingh West	...	9th and 10th March, 1954.
Mymensingh Central	...	Ditto.
Mymensingh East	...	Ditto.
Sylhet North	...	10th March, 1954.
Sylhet South-West	...	Ditto.
Sylhet South-East	...	Ditto.
Tippera North	...	Ditto.
Tippera-*cum*-Noakhali	...	Ditto.
Chittagong-*cum*-Chittagong Hill Tracts-*cum*-Noakhali.		Ditto.
Women's Constituencies.		
(*i*) *Muslim.*		
Dinajpur-*cum*-Rangpur-*cum*-Bogra	...	8th and 9th March, 1954.
Rajshahi-*cum*-Pabna	...	Ditto.
Faridpur-*cum*-Kushtia-*cum*-Jessore-*cum*-Khulna.	...	Ditto.
Bakarganj	...	8th, 9th and 10th March, 1954.
Dacca City West	...	9th March, 1954.
Dacca-*cum*-Narayanganj	...	Ditto.
Mymensingh	...	8th and 9th March, 1954.
Tippera-*cum*-Sylhet	...	Ditto.
Chittagong-*cum*-Noakhali	...	Ditto.
(*ii*) *Scheduled Caste.*		
Rajshahi Division	...	9th and 10th March, 1954.
Buddhist Constituencies.		
Chittagong Hill Tracts	...	8th and 10th March, 1954.
East Bengal	...	11th and 12th March, 1954.

By order of the Governor,

M. AZFAR,

Election Commissioner, East Bengal,
Ex-Officio Secretary to the Government,
East Bengal.

Printed and Published by Abu Reza, M. Pr.(London), Superintendent, Government
East Bengal, Dacca.

পরিশিষ্ট ৬/১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

নং-পাচবিম-(সম)-আঞ্চলিক পরিষদ-১/৯৮/২ তারিখ ০৬-০৯-১৯৯৮ইং / ২২-০৫-১৪০৫বাং

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিলেন ঃ

১।	জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা পিং-চিত্ত কিশোর লারমা সাং-মিজ্জিবিল, থানা-পানছড়ি জেলা-খাগড়াছড়ি।	চেয়ারম্যান
২।	ঊষাতন তালুকদার পিং-অজিত কুমার তালুকদার সাং-ভেদভেদী, থানা-রাঙ্গামাটি সদর জেলা-রাঙ্গামাটি।	সদস্য
৩।	গৌতম কুমার চাকমা পিং-নগেন্দ্র লাল চাকমা সাং-কবাখালী, থানা-দীঘিনালা জেলা-খাগড়াছড়ি।	সদস্য
৪।	রূপায়ন দেওয়ান পিং-চন্দ্র মোহন দেওয়ান সাং-কাটা পাহাড়, থানা-রাঙ্গামাটি সদর জেলা-রাঙ্গামাটি।	সদস্য
৫।	সুধাসিন্ধু খীসা পিং-যামিনী কুমার খীসা সাং-খুলারাম পাড়া, থানা-মহালছড়ি জেলা-খাগড়াছড়ি।	সদস্য
৬।	স্নেহ কুমার চাকমা পিং-মুকুন্দ লাল চাকমা সাং-রূপকারী, থানা-বাঘাইছড়ি জেলা-রাঙ্গামাটি।	সদস্য
৭।	রক্তোৎপল ত্রিপুরা পিং-হলেন্দ্র লাল রোয়াজা সাং-বাঙ্গালকাটি, থানা-খাগড়াছড়ি সদর জেলা-খাগড়াছড়ি।	সদস্য

400.29(19)
400.29(19)

পরিশিষ্ট ৬/২

৮। সাধুরাম ত্রিপুরা — সদস্য
পিং-মুইক্রীহা ত্রিপুরা
সাং-মুংছাপাড়া, থানা-রুমা
জেলা-বান্দরবান।

৯। থৈমাছিং চৌধুরী — সদস্য
পিং-উগাজাই চৌধুরী
সাং-মাষ্টারপাড়া, থানা-রামগড়
জেলা খাগড়াছড়ি।

১০। মংনুচিং মারমা — সদস্য
পিং-আচাইং মারমা
সাং-চিংমরম, থানা-কাপ্তাই
জেলা-রাঙ্গামাটি।

১১। কেএসমং মারমা — সদস্য
পিং-কহেঞো মারমা (মাষ্টার)
সাং-বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর
জেলা-বান্দরবান।

১২। নীল কুমার তনচৈংগ্যা — সদস্য
পিং-লক্ষী কুমার তনচৈংগ্যা
সাং-ত্রিপুরাছড়ি, থানা-কাপ্তাই
জেলা-রাঙ্গামাটি।

১৩। লয়েল ডেভিড বম — সদস্য
পিং-জনঠাংনি বম
সাং-বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর
জেলা-বান্দরবান।

১৪। মোহাম্মদ শফি — সদস্য
পিং-মোহাম্মদ আমিন
সাং-পাইলট ফার্ম, থানা-পানছড়ি
জেলা-খাগড়াছড়ি।

১৫। মোহাম্মদ জাফর আহমেদ — সদস্য
পিং-মোখলেসুর রহমান
সাং-খাগড়াছড়ি সদর
জেলা-খাগড়াছড়ি।

১৬। নুরুল আলম — সদস্য
পিং-আলহাজ্ব মফিজুর রহমান
সাং-কাঠালতলী, থানা-রাঙ্গামাটি সদর
জেলা-রাঙ্গামাটি।

১৭। জনাব মাহবুবুর রহমান — সদস্য
পিতা-মৃত ফাহিম উদ্দিন
থানা-রাঙ্গামাটি সদর
জেলা-রাঙ্গামাটি।

পরিশিষ্ট ৬/৩

১৮। মোঃ শফিকুর রহমান — সদস্য
পিতা-মৃত আলহাজ্ব চন্দু মিয়া
থানা-বান্দরবান সদর
জেলা-বান্দরবান।

১৯। কাজল কান্তি দাশ — সদস্য
পিতা-মৃত মুকুন্দ লাল দাস
থানা-বান্দরবান সদর
জেলা-বান্দরবান।

২০। মাধবী লতা চাকমা — সদস্য
পিং-গিরিশ চন্দ্র কার্বারী
সাং-কমলছড়ি, থানা-খাগড়াছড়ি সদর
জেলা-খাগড়াছড়ি।

২১। উনু প্রু — সদস্য
পিং-চিটি প্রু
সাং-বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর
জেলা-বান্দরবান।

২২। রওশন আরা বেগম — সদস্য
পিং-শামশুর রহমান
সাং-কাঠালতলী, থানা-রাঙ্গামাটি সদর
জেলা-রাঙ্গামাটি।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/=
(কাজী গোলাম রহমান)
সচিব

উপনিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(উপরোক্ত প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হইল)

নং-পাচবিম-(সম)-আঞ্চলিক পরিষদ-১/৯৮/২(৩৯) — তারিখ ০৮-০৯-১৯৯৮ইং / ২৪-০৫-১৪০৫বাং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
গ্রাম-মিজ্জিবিল, থানা-পানছড়ি
জেলা-খাগড়াছড়ি।

২। চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা
স্থানীয় সরকার পরিষদ।

পরিশিষ্ট ৬/৪

৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। সচিব
....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬। প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

৭। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন
চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।

৮। মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

৯। মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রাইফেলস
পিলখানা, ঢাকা।

১০। মহাপরিচালক
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, ঢাকা।

১১। মহা পুলিশ পরিদর্শক
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।

১২। বিভাগীয় কমিশনার
চট্টগ্রাম বিভাগ।

১৩। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর একান্ত সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

১৪। ভাইস চেয়ারম্যান,
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

১৫। জেলা প্রশাসক
রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

১৬। পুলিশ সুপার
রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

১৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮। মাননীয় চীফ হুইপ
ও
শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক
মহোদয়ের একান্ত সচিব
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

১৯। উষাতন তালুকদার, পিং-অজিত কুমার তালুকদার
সাং-ভেদভেদী, থানা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি।

২০। গৌতম কুমার চাকমা, পিং-নগেন্দ্র লাল চাকমা
সাং-কবাখালী, থানা-দীঘিনালা, জেলা-খাগড়াছড়ি।

২১। রূপায়ন দেওয়ান, পিং-চন্দ্র মোহন দেওয়ান
সাং-কাটা পাহাড়, থানা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি।

পরিশিষ্ট ৬/৫

২২। সুধাসিন্ধু খীসা, পিং যামিনী কুমার খীসা
সাং-খুলারাম পাড়া, থানা মহালছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি।

২৩। স্নেহ কুমার চাকমা, পিং মুকুন্দ লাল চাকমা
সাং-রূপকারী, থানা-বাঘাইছড়ি, জেলা-রাঙ্গামাটি।

২৪। রক্তোৎপল ত্রিপুরা, পিং-হলেন্দ্র লাল রোয়াজা
সাং-বাঙ্গালকাটি, থানা-খাগড়াছড়ি সদর, জেলা-খাগড়াছড়ি।

২৫। সাধুরাম ত্রিপুরা, পিং-মুইক্লীহা ত্রিপুরা
সাং-মুংছাপাড়া, থানা-রুমা, জেলা-বান্দরবান।

২৬। থেমাছিং চৌধুরী, পিং-উগাজাই চৌধুরী
সাং-মাষ্টারপাড়া, থানা-রামগড়, জেলা-খাগড়াছড়ি।

২৭। মংনুচিং মারমা, পিং আচাইং মারমা
সাং-চিৎমরম, থানা-কাপ্তাই, জেলা-রাঙ্গামাটি।

২৮। কেএসমং মারমা, পিং-কহেঞো মারমা (মাষ্টার)
সাং-বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

২৯। নীল কুমার তনচৈংগ্যা, পিং-লক্ষী কুমার তনচৈংগ্যা
সাং-ত্রিপুরাছড়ি, থানা-কাপ্তাই, জেলা-রাঙ্গামাটি।

৩০। লয়েল ডেভিড বম, পিং-জনঠাংনি বম
সাং-বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

৩১। মোহাম্মদ শফি, পিং-মোহাম্মদ আমিন
সাং-পাইলট ফার্ম, থানা-পানছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি।

৩২। মোহম্মদ জাফর আহমেদ, পিং-মোখলেসুর রহমান
সাং-খাগড়াছড়ি সদর, জেলা-খাগড়াছড়ি।

৩৩। নূরুল আলম, পিং-আলহাজ্ব মাফজুর রহমান
সাং-কাঠালতলী, থানা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি।

৩৪। জনাব মাহবুবুর রহমান, পিতা-মৃত ফাহিম উদ্দিন
থানা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি।

৩৫। মোঃ শফিকুর রহমান, পিতা-মৃত আলহাজ্ব চন্নু মিয়া
থানা-বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

৩৬। কাজল কান্তি দাশ, পিতা-মৃত মুকুন্দ লাল দাস
থানা-বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

৩৭। মাধবী লতা চাকমা, পিং-গিরিশ চন্দ্র কার্বারী
সাং-কমলছড়ি, থানা-খাগড়াছড়ি সদর, জেলা খাগড়াছড়ি।

৩৮। উনু প্রু, পিং-চিটি প্রু
সাং-বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

৩৯। রওশন আরা বেগম, পিং-শামশুর রহমান
সাং-কাঠালতলী, থানা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি।

০৮..
(মোহাম্মদ জুলফিকার আলী)
উপসচিব
ফোন: ৮৬৯৭৪৭

পরিশিষ্ট ৭/১

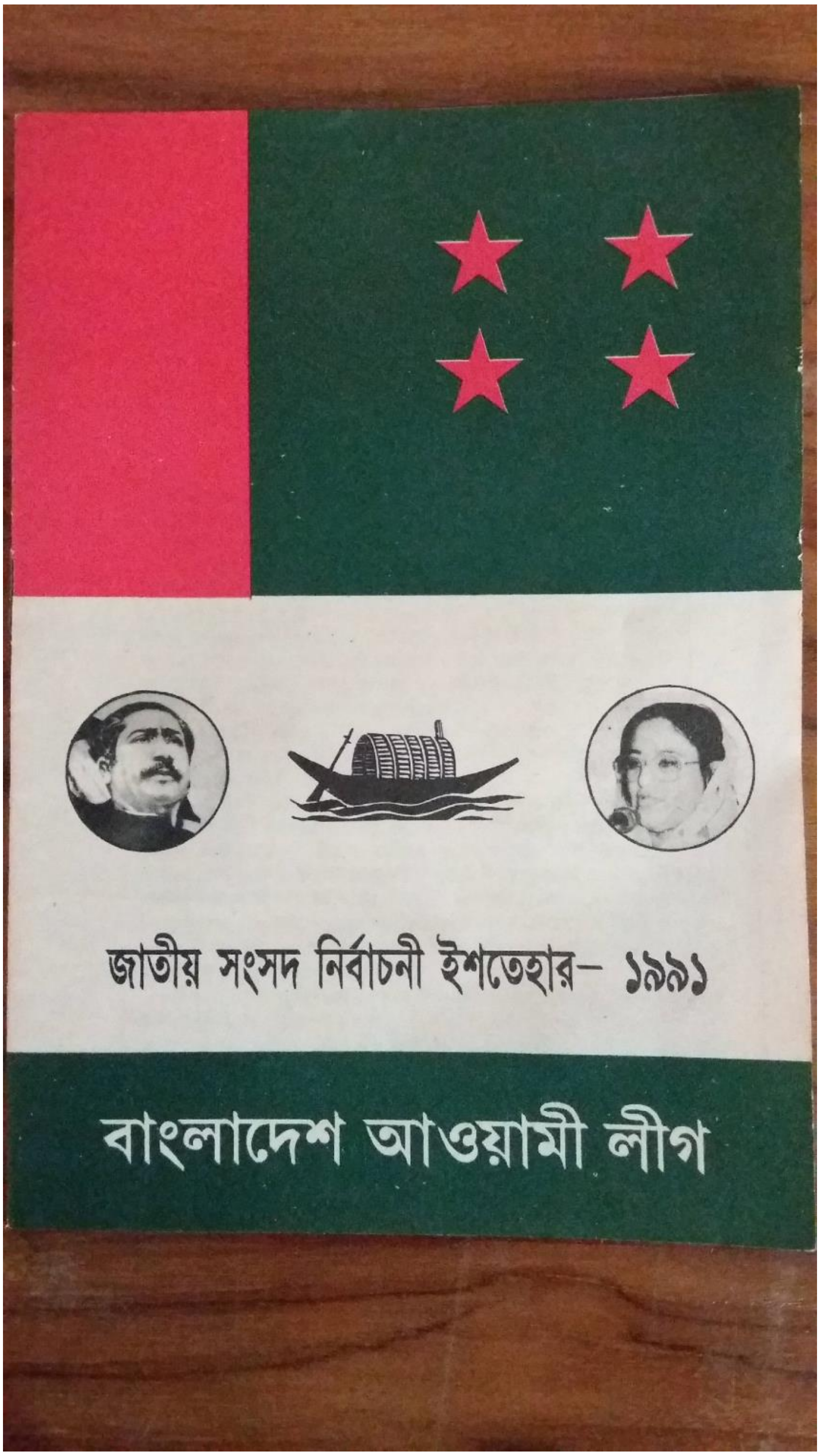

পরিশিষ্ট ৭/২

করে গড়ে তোলা হবে এবং যথা-সম্ভব প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে চিকিৎসাকে বাস্তব অর্থে ফলপ্রসূ করে তোলা হবে।

* জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন গবেষণালব্ধ যথাযথ কৌশল অবলম্বন করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জন্মহার হ্রাস করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দেশের নারী সমাজ ও জাতীয় উন্নয়ন

* বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারী-পুরুষের সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী। সে অর্থে যে কোন নারী-পুরুষের মধ্যে যে কোন বৈষম্যমূলক নীতিমালার বিরোধী।
* নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
* নারী সমাজকে জাতীয় উন্নয়নের উপযুক্ত অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের ব্যবহার

* বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং তার ফলে বন্যার ভয়াবহ পরিণতি সমস্ত অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে, সেহেতু বন্যা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
* এই সমস্যা সমাধানে সমস্ত আন্তর্জাতিক কৌশলগত প্রচেষ্টার সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সত্বর জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
* পানি বন্টনের প্রশ্নে বাংলাদেশের ন্যায্য জাতীয় চাহিদাকে সংরক্ষিত করে ভারতবর্ষের সাথে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান নিশ্চিত করা হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

* পানি, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করতে হবে।
* বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ফলে যে বিরাট আর্থিক লোকসান হচ্ছে তা রোধ করার জন্য উৎপাদন ও সরবরাহ ক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে একদিকে যেমন বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব হবে অন্যদিকে এই খাতে রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উপজাতি

* দেশের উপজাতিদের স্বীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্ত্বা সংরক্ষণ ও বিকাশের নিশ্চয়তা ও বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাবলী সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে।

পরিশিষ্ট ৮

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচনী রিটার্ন

FORM XVII

[*See* rule (26)]

RETURN OF ELECTION

Election to the ~~*National Assembly of Pakistan~~
Provincial Assembly of East Pakistan

From......PE 300-Chittagong Hill Tracts-II......Constituency

Serial No.	Names of the contesting candidates	Number of valid votes Polled
1.	Mr. Aung Shwe Prue Chowdhury.	18,383
2.	Mr. Golam Mostafa.	373
3.	Mr. Jnanendu Bikash Chakma.	5,962
4.	Mr. Kalpa Ranjan Chakma.	354
5.	Mr. Sayedur Rahman.	10,790
6.	Mr. Sayed Tafazzal Hussain.	6,229

Total number of valid votes polled......42,091......
Total number of rejected votes......883......
Total number of tendered votes......55......

I declare that—

Mr./~~Mrs./Miss~~......Aung Shwe Prue Chowdhury......son/~~wife/daughter~~ of
Late Thwe Aung Prue Karbari......of......Bandarban, Ctg.Hill Tracts......(address) has been duly elected.

Date......24-12-70......
Place......Rangamati......

24.12.70.
Returning Officer.

Addl. Deputy Commissioner.
&
Returning Officer,
Chittagong Hill Tracts.

*Strike off the words not applicable.

PCPPD—S-3—449/70-71/(C)—5-10-70—11,550.

পরিশিষ্ট ৯
১৯৭৩ সালের নির্বাচনে নির্বাচনী রিটার্ন

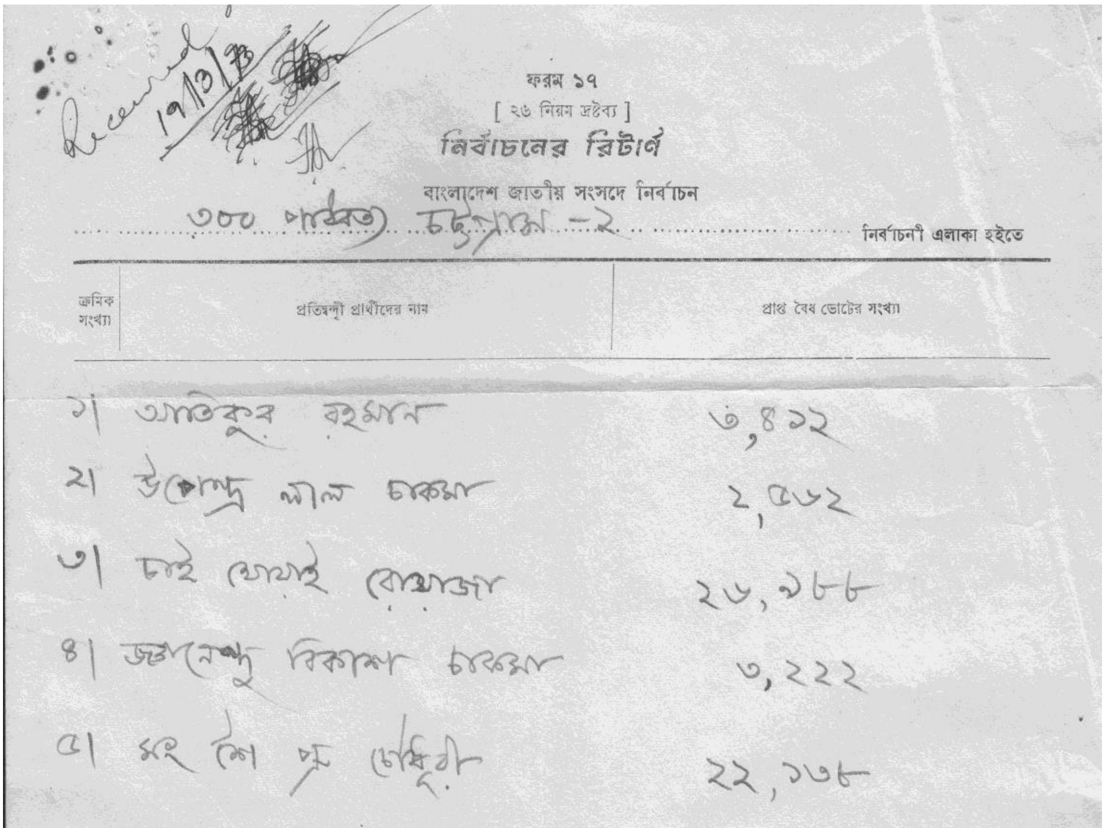

Received 19/3/73

ফরম ১৭
[২৬ নিয়ম দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনের রিটার্ন

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নির্বাচন

৩০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম -২ .... নির্বাচনী এলাকা হইতে

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা
১।	আতিকুর রহমান	৩,৪১২
২।	উপেন্দ্র লাল চাকমা	২,৫৬২
৩।	চাই থোয়াই রোয়াজা	২৬,৭৮৮
৪।	জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা	৩,২২২
৫।	মং শৈ প্রু চৌধুরী	২২,১৩৮

প্রাপ্ত বৈধ ভোটের মোট সংখ্যা ৫৮,১২২
বাতিলকৃত ভোটের মোট সংখ্যা ২,০০০
টেণ্ডারড্ ভোটের মোট সংখ্যা ৪১
আমি ঘোষণা করিতেছি যে—

জনাব/শ্রী/বেগম চাই থোয়াই রোয়াজা
পিতা/স্বামী নিচাই চু রোয়াজা
ঠিকানা ১৮, কচুখালী মৌজা থানা কোতোয়ালী পার্বত্য চট্টগ্রাম

যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থান রাঙ্গামাটি
তারিখ ১২/৩/৭৩ ইং

রিটার্নিং অফিসার।
Addl. Deputy Commissioner,
&
Returning Officer,
Constituency No 300
Chittagong Hill Tracts. -II

জিপিপিডি—শাখা-৪—৮৬১/৭২-৭৩/ (সি)—১২-১-৭৩—৮,০০০।

পরিশিষ্ট ১০/১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

খাগড়াছড়ি

২৮ মাঘ, ১৪০৪

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮

400.29(14)

400.229(14)

পরিশিষ্ট ১০/২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রিসভায় আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,
সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ,
সম্মানিত উপজাতি নেতৃবৃন্দ,
মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দ,
বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ,
সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশে শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে একটি অনন্য দিন। আজকের এ শুভদিনে প্রথমেই আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা করছি এবং তাঁর রহমত কামনা করছি।

আপনারা জানেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে সমিতির ৬০০ জন সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়ে আজ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছেন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রত্যাশায় আজ খাগড়াছড়ির নবনির্মিত স্টেডিয়ামের এই আন্তরিক অনুষ্ঠানে যাঁরা অস্ত্র জমা দিচ্ছেন, আমি তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি।

পরিশিষ্ট ১০/৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

তাঁদের বরণ করে নিচ্ছি অন্তরের গভীরতম ভালোবাসায়। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম আজ থেকে এ আনন্দময় ইতিহাসের অংশ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো। অনন্য এ ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম যাতে পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন ক্রীড়ার বিকাশ ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য এ স্টেডিয়ামকে একটি পুর্ণাঙ্গ ক্রীড়া কমপ্লেক্সে রূপান্তরের জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ অস্ত্র জমাদান আমাদের দেশের ইতিহাসে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এক নবদিগন্তের সূচনা করবে। আমাদের দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে যা ত্বরান্বিত করবে। উপজাতি ও অ-উপজাতীয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এদেশের সর্বস্তরের জনগণ এর সুফল ভোগ করবে। জনসংহতি সমিতির সদস্যবৃন্দ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের উন্নয়নেও অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অবাধ-নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনে জনগণের রায় নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আমরা সরকার গঠন করার পর খোলামনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমাদের আলোচনার সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতীতের সরকারগুলো কখনো কখনো সমস্যাটিকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এর সমাধান চেয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি মূলত ছিল একটি রাজনৈতিক সমস্যা। আমিই প্রথম ১৯৮২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে একটি সেল গঠন করা হয় এবং এ এলাকার ঘটনাবলির উপর সচেতন দৃষ্টি রাখা হয়। সমস্যা কি কি সমাধানের পথ কি ইত্যাদি বিষয়ে

পরিশিষ্ট ১০/৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

এই সেল দীর্ঘদিন কাজ করে এবং মাঝে মাঝে রিপোর্ট পেশ করতে থাকে। আর তাই সমস্যা নিরূপণ করা ও সমাধান খুঁজে পাওয়া আমাদের জন্য সহজ হয়।

দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আমরা অনুভব করি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে দেশের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ১১০ দিনের মাথায় চৌদ্দই অক্টোবর ১৯৯৬ তারিখে জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। সরকারি ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজকর্মীদের এ কমিটির সদস্য করা হয়। এ জাতীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে বিএনপির ২ জন সংসদ সদস্যও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে এ কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয়পক্ষ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঢাকায় একনাগাড়ে তা অনুষ্ঠানে একমত হন। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে পরবর্তী ৬টি বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপি দলীয় দু'জন সংসদ সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু, তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রথম থেকেই আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি অসহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করে আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা সমগ্র বিষয়টি সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। পক্ষান্তরে, সমস্যা সমাধানে বিগত বিএনপি সরকারের আমলে যে কমিটি গঠন করা হয় সে কমিটিকে আমরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সবসময় সমর্থন দিয়ে এসেছিলাম। আমাদের দু'জন সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা এবং মোস্তাক আহমদ চৌধুরী জনসংহতি সমিতির সাথে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকেই যোগ দিয়েছিলেন

পরিশিষ্ট ১০/৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

এবং তাঁরা সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এমনকি আমরা যখন সংসদ থেকে পদত্যাগ করে পথে আন্দোলন করেছিলাম তখনও আমাদের সংসদ সদস্যরা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে এ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। সমস্যার দ্রুত সমাধান যাতে হয় এজন্য বিএনপি সরকারকে আমরা সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলাম।

২৬ নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখ থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সপ্তম বৈঠক শেষে গত ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে সমগ্র জাতি এ চুক্তিকে শান্তি চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মহল ছাড়া সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও অপাহাড়ি আপামর জনসাধারণসহ সমগ্র দেশবাসী ও বিশ্ববাসী এ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন দেশসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছে। আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে বিএনপিসহ কয়েকটি সমমনা দল অযৌক্তিকভাবে ভুল তথ্যনির্ভর এবং একপেশে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁদের অনুরোধ করব অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে আসুন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি বাবু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং তার সহকর্মীবৃন্দ দেশের ও বিশ্বের বিরাজমান অবস্থার এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সমস্যা সমাধানে প্রজ্ঞা ও

পরিশিষ্ট ১০/৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আমি এজন্য তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আলোচনা অনুষ্ঠানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে সহায়তা করেছেন আমি তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কোনরূপ দ্বিধা সংশয় ছাড়াই স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং আনুগত্য সমুন্নত রেখেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ বিষয়ে কারো মনে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি, অস্পষ্টতা, দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা থাকা সমীচীন হবে না। দেশের সকল নাগরিকের বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি বাঙালি সকলের অধিকার অতীতে যা ছিল তাই নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা তিনটিতে ডিসি-এসপি থাকবেন, থাকবেন পূর্বের ন্যায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী। বাঙালিরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। গুচ্ছগ্রামবাসীরাও স্বভূমিতে থাকবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পাশাপাশি তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করবো। আমি আবারো দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালি সবাই থাকবেন, কোন বাঙালিকে বলপূর্বক প্রত্যাহার করা হবে না।

আমি আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে কোন কারণে হোক না কেন আমাদের পাহাড়ি ভাইবোনদের একটি অংশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিগত সরকারগুলো শরণার্থীদের অন্তরে আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে পারেনি বলেই অধিকাংশ শরণার্থীই ভারতে থেকে যান। আমরা তাদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। আমরা তাঁদের আশ্বস্ত করেছি যে দেশে তাঁদের প্রত্যাবর্তনকে নির্বিঘ্ন করা হবে, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের

পরিশিষ্ট ১০/৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

যথাযথ পুনর্বাসন করা হবে। আমরা প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য ২০ দফা সুযোগ সুবিধা সম্বলিত প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। এপর্যন্ত ৭,২৬৭টি শরণার্থী পরিবারের ৩৭,৯৯৬ জন সদস্য দেশে ফিরে এসেছেন। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য আমি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। শরণার্থীদের সকলকে সরকার প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যথোপযুক্তভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশা করি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারত থেকে সকল শরণার্থীর দেশে প্রত্যাবর্তন শেষ হবে। ফলে তাঁদের দুঃসহ শরণার্থী জীবনের অবসান ঘটবে। উপজাতীয় শরণার্থী শব্দটি আমাদের জীবন থেকে চিরদিনের মতো মুছে যাবে বলে আমি আশা করি।

এদেশ আমার আপনার — আমাদের সবার। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান অস্থিতিশীল অবস্থার অবসান ঘটবে। এখানে শান্তি ফিরে আসবে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলে এখানে পর্যটন শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে। এর সুফল পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীসহ সমগ্র দেশবাসী ভোগ করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থা এবং বন্ধুরাষ্ট্রের কাছ থেকে ব্যাপক বিনিয়োগের সাড়া পাওয়া গেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অপরিহার্য এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ফলে এখন এসব বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-অপাহাড়ি উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের দীর্ঘদিনের ইতিহাস রয়েছে। আমি আশা করি তা বজায় থাকবে এবং স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানিতে কোনরূপ অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। আমরা বিশৃংখলা সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টাকে কঠোর হাতে দমন করতে বদ্ধপরিকর। আইন-শৃঙ্খলাসহ স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা হবে। আমাদের সরকার সকল নাগরিকের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পরিশিষ্ট ১০/৮

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ চুক্তির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সঠিক নেতৃত্ব। সকল মহলের সর্বাত্মক সহযোগিতায় আমরা এই দুরূহ কাজের সফল বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো ইনশাল্লাহ্। আমি দেশবাসীর প্রতি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি-অপাহাড়ি বাঙালি সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি এই চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অতীতের দুঃখজনক ঘটনাবলি এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমরা ভুলে যেতে চাই। আমি জানি, পার্বত্য এলাকার সর্বস্তরের জনগণকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহে দীর্ঘদিন অনেক অসুবিধা ও অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সব কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাকে অতীতের বিষয় হিসেবে গণ্য করে ভবিষ্যত সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধ এক নতুন জীবনের প্রত্যাশায় আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে কাজ করি।

আমরা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ পার্বত্য চট্টগ্রামকে সকল দিক থেকে উন্নয়নের আদর্শ এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমাদের এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আশু, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা। আশু কার্যক্রম বাবদ ১৫৮ কোটি ১৭ লাখ টাকা ইতোমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী চাহিদা বাবদ ২৮৮ কোটি টাকা, মধ্য মেয়াদী চাহিদা বাবদ ৪৬৬ কোটি টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা বাবদ ১২৩৭ কোটি টাকা প্রদানের জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সর্বমোট ২,১৪৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

আশুকরণীয় কর্মসূচির আওতায় শরণার্থীদের ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নগদ অর্থ সাহায্য, খাদ্য সাহায্য ও গৃহ নির্মাণ সামগ্রী সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পুরাতন অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ। এছাড়া, এর আওতায় সড়ক, রাস্তা,

পরিশিষ্ট ১০/৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

পুল, সেতু, স্কুল, চিকিৎসালয়, গ্রামীণ সড়ক ও বাজারের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ে চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে। কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রমও এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, মার্ট ক্ষয়রোধ প্রকল্প, পাহাড়ি জমিতে উন্নত চাষ পদ্ধতির উদ্ভাবন, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, বাজার উন্নয়নসহ অন্যান্য কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় আমরা এ এলাকার প্রতিটি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবো। প্রতিটি থানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য-উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বনজ, ফলমূল ও রাবার বাগান স্থাপন, কৃষিজাত শিল্পায়ন, বিদ্যুতায়ন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প।

এছাড়া, কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এ এলাকায় আরো সহস্রাধিক কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। শিশু নারীদের সার্বিক উন্নতির জন্যও এখানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা যাতে এ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে পারেন সেজন্য আমরা উৎসাহ প্রদান করছি। এ এলাকার শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যে খাগড়াছড়ি, বান্দরবন এবং রাঙ্গামাটি জেলা চেম্বার অভ্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ গঠিত হয়েছে। এ তিনটি জেলা চেম্বারকে ফেডারেশন অভ্ বাংলাদেশ চেম্বার অভ্ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ তাদের সদস্যভূক্ত করেছে। আশা করা যাচ্ছে, এ তিনটি জেলা চেম্বার এ এলাকার শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অচিরেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

- ৯ -

আমরা পাহাড়ি জনগণের বৈচিত্রময় নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশেও ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশেও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, যা আপনারা অবগত আছেন। এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের সমৃদ্ধ এক রূপসী এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এজন্য আমরা এ এলাকার উন্নয়নের সকলক্ষেত্রে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আশা করা যায় অচিরেই তার সুফল পাহাড়ি-বাঙালি সবাই ভোগ করবে।

ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত সমাজ গঠন আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু দেশের একটা অংশকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সংঘাতের পথ পরিহার করে শান্তি স্থাপনকেই আমরা শ্রেয় মনে করি এবং শান্তিই আমাদের সবার কাম্য। শান্তির পথেই স্থিতিশীলতা আসে, গণতন্ত্র বিকশিত হয়, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। আমরা তাই -

সংঘাত নয় শান্তি চাই
ধ্বংস নয় সৃষ্টি চাই
পশ্চাৎপদতা নয় অগ্রগতি চাই

বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা তাই কবির ভাষায় বলতে চাই - "জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক"। নতুন পথের যাত্রী আমরা নতুন শতাব্দীকে আমরা শান্তির বার্তা নিয়ে বরণ করতে চাই। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছেও আমার আবেদন থাকবে - নতুন শতাব্দী যেন শান্তিময় বিশ্ব হিসেবে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে-এ লক্ষ্যে একাত্ম হয়ে কাজ করার।

পরিশিষ্ট ১০/১১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

- ১০ -

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজনকে সফল করতে সেনাবাহিনীর সকল স্তরের অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ, বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, পুলিশ-বিডিআর, আনসার সদস্যবৃন্দ এবং রাজনৈতিক ও উপজাতি নেতা ও কর্মীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আসুন, দেশের উন্নয়নে, জনগণের উন্নয়নে আমরা দলমত-পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

শান্তির পথে, কল্যাণের পথে, অগ্রগতির পথে এবং উন্নয়নের পথে আমাদের অগ্রযাত্রার জয় হোক। খোদা আপনাদের সবার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুন এ প্রার্থনা করি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
বাঙালি-পাহাড়ি সম্প্রীতি দীর্ঘজীবী হোক
খোদা হাফেজ

পরিশিষ্ট ১১

চাকমা রাজা হরিশ্চন্দ্রকে ব্রিটিশ ভারত সরকার কর্তৃক রায় বাহাদুর খেতাব অর্পণের পত্র

No. 1937-P.

FROM THE UNDER-SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA,
Foreign Department,

TO THE OFFG. SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL
In the Judicial Department.
Dated Simla, the 12th September 1872.

SIR,

IN reply to your letter No. 4217, dated 17th July 1872, I am directed to state that the Viceroy and Governor-General in Council is pleased to sanction the grant of compensation for loss of Forest Revenue to the Kalindee Ranee, at the rate of Rs. 1,143 per annum and to the Mong Rajah at the rate of Rs. 153 per annum, as a favour which the Government of India is pleased to grant in recognition of the services rendered by them during the Lushai Expedition.

2. His Excellency is further pleased to approve of the presentation of a gold watch and chain of the value of £100 to Baboo Hurrish Chunder and to confer upon him the title of Rai Bahadur as a reward for hisexertions during the same expedition. A Sanad conferring the above title for presentation to Baboo Hurrish Chunder, together with a copy thereof, and of the notification publishing the conferment of the honour in the *Gazette of India*, are herewith forwarded.

3. AS regards the Bohmong Rajah His Excellency concurs with His Honour in thinking that as a punishment for his misconduct during the expedition the amount of compensation for loss of revenue which he would otherwise have received should be withheld and that the payment of Rs. 2,600 which he has been receiving on account of services which he does not perform, should be withdrawn. I am to add that the Rajah might be told that the renewal of this grant in whole or in part will depend entirely on the future behaviour of the Rajah.

Under-Secretary.

Government of India, Notification No. 1936-*P.*,
Dated Simla, the 12*th September* 1872.

TO BABOO HURRISH CHUNDER ROY.

IN recognition of the valuable services rendered by you during the progress of the late operations in the country of the Lushais, I hereby confer upon you the title of Rai Bahadur as a personal distinction.

(Sd.) NORTHBROOK,
Viceroy and Governor-General.

সংগৃহীত আলোকচিত্র

বান্দরবানের বোমাং রাজা মং শৈ প্রু (১৯৫৯-১৯৯৬ খ্রি.)

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ আসন থেকে নির্বাচিত এমএলএ

শ্রীকামিনী মোহন দেওয়ান

জন্ম :- ৮ইমার্চ শ'নবার, ১৮৯০ ইং।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম হিন্দু আসন থেকে নির্বাচিত এমএলএ

বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা এমএলএ

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম দুইজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির একজন বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা (বি কে রোয়াজা) ১৯১৩ সালে খাগড়াছড়ি জেলার ঠাকুরছড়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। ১৯৩২ সালে তিনি রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে এন্ট্রাস, ১৯৩৪ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ হতে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। বিএ পাস করার পর তিনি প্রথমে রাঙ্গমাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন।

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৫৪ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আসনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর অঞ্চল হতে বিপুল ভোটে তিনি এম এল এ নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হহওয়ার পর ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' গঠিত হলে তিনি এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিকে রোয়াজা ১৯৮৫ সালে ২ নভেম্বর ঠাকুরছড়াস্থ নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন।

www.zks-bd.org

Zabarang
Kalyan Samity

চাকমা রানি বিনীতা রায়(১৯০৭-১৯৯০)

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ দূত হিসেবে রাজা ত্রিদিব রায়কে ফিরিয়ে আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং ১৯৭৬-থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সায়েম ও জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চারু বিকাশ চাকমা (১৯২৯-২০০৯)

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর মনোনীত প্রার্থী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মি. গৌতম দেওয়ানের সঙ্গে গবেষকের ছবি

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ (২১ সদস্য)

উপবিষ্ট (সামনের সারি) :- "বাম থেকে ডানে" বাবু নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, জনাব মোঃ মোহসিন (পররাষ্ট্র সচিব), মেজর জেনারেল আবদুস সালাম, পি এস সি (এরিয়া কমান্ডার, চট্টগ্রাম), এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ, কে, খন্দকার (পরিকল্পনা মন্ত্রী), বাবু উপেন্দ্র লাল চাকমা, জনাব ফারুক আহমদ চৌধুরী (ভারতে নিযুক্ত হাই কমিশনার), জনাব আলী হায়দার খান (বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম) ও জনাব মোহাম্মদ জমির (পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)।

উপবিষ্ট (পিছনের সারি) :- "বাম থেকে ডানে" বাবু রামচাই চৌধুরী, বাবু সমীরণ দেওয়ান, বাবু যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বাবু পীযুষ কান্তি চাকমা, বাবু নবীন কুমার ত্রিপুরা, বাবু জগদীশ চন্দ্র চাকমা, বাবু নগেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও বাবু অনন্ত বিহারী খীসা।

দাঁড়ানো (বাম থেকে ডানে) :- বাবু মুনিন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা, বাবু বকুল চন্দ্র চাকমা, বাবু পুরুষোত্তম চাকমা, বাবু কংজরী চৌধুরী, বাবু পাইহ্লাপ্রু চৌধুরী, বাবু রণ বিক্রম ত্রিপুরা, বাবু রূপম দেওয়ান, বাবু মংহ্লাপ্রু চৌধুরী, বাবু মং সাজাই চৌধুরী, বাবু চাইথোয়াই অং চৌধুরী ও বাবু ক্রেম্রাচাই মারমা।

শব্দকোষ

সরকারী নীতি	: ১৮৬০ সাল থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশি সরকারসমূহের পার্বত্য চট্টগ্রামে গৃহীত শাসন নীতি
রাজনৈতিক বহির্ভূতকরণ নীতি	: ১৮৬০ থেকে ১৯৯৪৭ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ রেগুলেশন দিয়ে বঙ্গীয় আইনসভা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শাসন নীতি।
গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তকরণ	: ১৯৫৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটাধিকার প্রদান এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদভুক্তির মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা
রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তকরণ	: জাতীয় রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের সম্পৃক্ততা, সমর্থন, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান।
কেপিএম	: কর্ণফুলী পেপার মিল
জেএসএস	: পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি
সার্কেল	: ১৮৮১ সালে গঠিত চাকমা, বোমাং ও মং রাজস্ব সার্কেল
রাজা/চিফ	: চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেল চিফ ও প্রথাগত রাজা
দেওয়ান	: চাকমা রাজ প্রশাসনে অভিজাত ও মর্যাদাপূর্ণ পদবি, পরে বংশগত উপাধিতে রূপান্তরিত।
রোয়াজা	: বোমাং ও মং রাজ প্রশাসনে দেওয়ানি দায়িত্বপ্রাপ্ত পদবি ও ত্রিপুরাদেরও সামাজিক নেতা
হেডম্যান	: ১৮৯২ সালে গঠিত মৌজার প্রধানের দাপ্তরিক পদবি।
কার্বারী	: পাড়া বা গ্রাম প্রধান।
জুমকর	: ঘরপ্রতি জুমিয়া পরিবারের উপর ধার্যকৃত কর।
প্লাউ রেন্ট	: ১৮৮৪ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব
বেগার	: বিনা পারিতোষিকে খাটা শ্রম। সাধারণ জুমিয়াদেরকে রাজা/হেডম্যানদের বৎসরে ১৫ দিন দিতে হতো।
কার্পাস মহল	: ১৮৬০ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্ব ইউনিটের নাম
শান্তিবাহিনী	: ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি জন সংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা
ইউনিয়ন কাউন্সিল	: ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩৯টি ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হয়।
স্থানীয় সরকার পরিষদ	: ১৯৮৯ সালে গঠিত তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ
আঞ্চলিক পরিষদ	: ১৯৯৮ সালে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। একটি বিশেষ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ।
শান্তিচুক্তি	: ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও জেএসএসের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিদের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কল্পরঞ্জন চাকমা (১৯২২-জুলাই ২০১৮)

কল্পরঞ্জন চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রবীণ রাজনীতিবিদ। ২০১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখ তাঁর তবলছড়িস্থ নিজ বাসভবনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তাঁর সাথে আলাপ সূত্রে জানা যায় ১৯৪৭ সালে দেশভিাগের সময় তিনি রাঙ্গামাটি সরকারি হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে চট্টগ্রামের কানুনগোপাড়ার স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে্াতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম ডিসট্রিক্ট কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোয়ন নিয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে বিএনপি আমলে গঠিত জাতীয় কমিটিতে বিরোধী দলীয় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তি প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় কমিটি ও জেএসএসের মধ্যে প্রধান সমন্বয়কারী ভূমিকা পালন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হলে তিনি উক্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২০০১ সাল পর্যন্ত।

শ্রী গৌতম দেওয়ান (৩০ আগস্ট ১৯৫২-)

শ্রী গৌতম দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্বজ্জন, রাজনীতিক, সমাজনেতা। ২০১৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর নিজ বাসায় এই গবেষকের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আড়াই ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বি.এ অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৭১ সালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিলেন। একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে ছাত্রলীগের মধ্যে বিভাজন তৈরি হলে তিনি জাসদের পক্ষ নেন। ১৯৭৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর আসনে জাসদ মনোনীত প্রার্থী উপেন্দ্র লাল চাকমার পক্ষে কাজ করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত রাঙ্গামাটি পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় মেয়াদের পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালে তিনি এরশাদের আমলে গঠিত অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে. খন্দকারের নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় কমিটির সাথে রাঙ্গামাটি আলোচক দলের পক্ষে সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হলে তিনি রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ১৯৯১ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি রাঙ্গামাটির সচেতন নাগরিক কমিটি সনাকের আহবায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার আন্দোলনের আহ্বায়ক এবং রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা (১৯৩৭ খ্রি-)

এ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা পেশায় আইনজীবী হলেও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিজীবী। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে ৫/৯/২০১৭ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার তাঁর নিজ বাসায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে দ্বিতীয় এলএলবি ডিগ্রিধারী ব্যক্তি। ছাত্রজীবনে বামধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ আসনে যথাক্রমে স্বতন্ত্র ও ন্যাপ (এম) এর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারী বিভিন্ন ডেলিগনে সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে সেপ্টেম্বর থেকে এরশাদের জাতীয় কমিটির সাথে রাঙ্গাগামাটির আলোচক দলের সদস্য হিসেবে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হলে সেখানে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৭ সালে পুনর্গঠিত না হওয়া পর্য্নত। তিনি *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ* (১৯৯৩), *পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ও ভূমি রাজস্বব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (২০০৩) গ্রন্থের প্রণেতা। এছাড়া তিনি *বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী* (১৯৯৮) *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও লুসাই পাহাড়* (১৯৯৬) গ্রন্থের অনুবাদক। এছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও লিটন ম্যাগাজিনে তার অসংখ্য নিবন্ধ ছাপা হয়েছে।

ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায় (১৯৫৯ খ্রি-

ব্রিটিশ প্রবর্তিত ঐতিহ্যবাহী সার্কেল প্রশাসনের অন্তর্গত চাকমা সার্কেলের চিফ ও চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজা। ১৯৭৭ সালে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা নিবন্ধ, প্রবন্ধ রচনা করেন। ২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তাঁর রাজবাড়িস্থ সার্কেল চিফ কার্যালয়ে তিনি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ২০১৪ সালে এ্যাডভোকেট প্রতিকার চাকমার সাথে তাঁর লিখিত সর্বশেষ গ্রন্থ *পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০* প্রকাশিত হয়।

স্বর্গীয় নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা

নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম হিন্দু সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রী হিসেবে জেলা কাউন্সিল সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলে পাকিস্তানি বাহিনী রামগড়ে তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর তিনি খাগড়াছড়ির গণ্যামান্য ব্যক্তি হিসেবে

বিভিন্ন ফোরামে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮ সালে খাগড়াছড়ি আলোচক দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২০১৫ সালের ২৪ ফেব্রয়ারি তারিখে টেলিফোনে তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

শ্রী লারমার রাঙামাটি কল্যাণপুরস্থ সরকারি বাসভবনে (২৯ মার্চ ২০১৫) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ লাউঞ্জে ৯/১০/২০১৫ তারিখে সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি। তিনি ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে্াতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথমে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬০ এর দশকে মৌলিক গণতন্ত্রীদের কার্যক্রম তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং নিজেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠিত হলে তিনি ঐ কমিটি মুখ্য পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঐ নির্বাচনে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর আসন থেকে জয়যুক্ত হন। ১৯৭২ সালে গঠিত জনসংহতি সমিতির তিনি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং তিনি ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে ধৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার ছিলেন। ১৯৮৩ সাল তাঁর ভাই নিহত হলে তিনি জেএসএসের কর্ণধার হিসেবে আবির্ভূত হন।

দেবদত্ত খীসা, অবসর প্রাপ্ত যুগ্ম সচিব

১৯৪৭ সালে রাঙ্গামাটি নানিয়ারচর উপজেলায় জন্ম। ১৯৬৪ সালে মেট্রিকুলেশন পাস। ১৯৭০ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে্াতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭২-৭৩ দৈনিক বাংলার রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৭২ সালে চারু বিকাশ চাকমা নেতৃত্বে ডেলিগেশনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৭৪ সালে রাঙ্গামাটি কলেজে যোগদান পরে। ১৯৭৬ সালে বিসিএস পাস করে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবন শুরুকরেন। ১/৫/২০১৮

লক্ষীকুমার চাকমা, বি এসসি।

শ্রী চাকমা পেশায় শিক্ষক। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাঘাইছড়ি উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর কালিন্দিপুরস্থ নিজবাসায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন ৫/৯/২০১৭ তারিখে।

অনিরুদ্ধ চাকমা,

১৯৬৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ডিসট্রিক্ট কাউন্সিলে নাজির হিসেবে কর্মজীবন শুরু এবং রাঙামাটি পৌরসভার সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ। তাঁর রাঙামাটির কলেজ গেইটের বাসায় ৩০/৩/২০১৫ তারিখে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম

রাঙামাটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৩০/৯/২০১৫ তারিখ। স্থান এ্যাডভোকেট প্রতীম রায় পাম্পুর চেম্বার, কোর্ট রোড রাঙামাটি। ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভাগীয় কাউন্সিলের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মনোনীত সদস্য ছিলেন। তিনি রাঙামাটি পৌরসভার দ্বিতীয় নির্বাচিত চেয়ারম্যনা হিসেবে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

এ. কে. এম মকছুদ আহমেদ

তিনি পেশায় সাংবাদিক। তার রিজার্ভ বাজারস্থ কার্যালয়ে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তিনি তাঁর প্রকাশিত সাপ্তাহিক বনভূমির বেশকিছু সংখ্যাও গবেষকের হাতে তুলে দেন। ১৯৭০ এর দশক থেকে রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক বনভূমি* পত্রিকার সম্পাদক এবং ৯০ এর দশক থেকে প্রকাশিত *দৈনিক গিরিদর্পণ* পত্রিকার সম্পাদক। তিনি বাসস, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক আজাদী*সহ বিভিন্ন পত্রিকা জেলা প্রতিনিধি ছিলেন। জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা ছিলেন কয়েকবার।

ডাঃ এ. কে. দেওয়ান

তিনি ১৯৬০ সাল থেকে ডাক্তার পেশায় নিয়োজিত। রাঙামাটি পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান (১৯৭৪-৭৭)। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ব থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুদিপ্তা দেওয়ান ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর মনোনীত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংরক্ষিত আসনের প্রথম মহিলা এমপি ছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালে গঠিত রাঙামাটি বাকশাল কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৭-১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাঙামাটি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও নিযুক্ত হন। ১৯৮৮ সালে রাঙামাটি আলোচক দলের সদস্য ছিলেন। ২০১৫ সালে তিনি *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

মংক্য শোয়েনু নেভী ।

বান্দরবানের বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী। তাঁর নিজ চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ে সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত হন।

এছাড়া অনন্ত বিহারী খীসা, শ্রী বিজয় কেতন চাকমা, এম এন লারমা ফাউন্ডেশনের সভাপতি, অধ্যাপক বকুল চন্দ্র চাকমা (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সুধীন কুমার চাকমা (খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ), শ্রী উষাতন তালুকদার, সহসভাপতি জেএসএস, রূপায়ন দেওয়ান(আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য), গৌতম কুমার চাকমা (আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য), কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা, (গল্পকার, লেখক বুদ্ধিজীবী), বুদ্ধজ্যোতি চাকমা (সাংবাদিক), অরুনেন্দু ত্রিপুরা (প্রাক্তন ছাত্র নেতা), জয়শ্রী দেওয়ান (রাজপরিবারের সদস্য) প্রমুখের সাথে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় ও আলোচনা হয়।

তথ্য ও সূত্র নির্দেশ

ক. অপ্রকাশিত দলিল

১. *A memorial of the three Chiefs regarding the administration of the backward District Chittagong Hill Tracts in Bengal to Memorial to Prime Minister of Great Britain, The 5th September 1931.*

২. *Joint Reply of the Three Chiefs of the Chittagong Hill Tracts to MR. Mills' Report The 15th April, 1929.*

৩. *List of Correspondence regarding the Chakma Raj of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong from 1823-1928.*

৪. *Family History of Mong Raja 1936.*

৫. *Records from the Office of the Deputy Commissioner, Chittagong Hill Tracts, 18th October 1955.*

৬. *Note on the Problem of Rehabilitation Consequent on the Hydel Project Scheme by* L H Niblett, Deputy Commissioner, CHTs, 10th February 1956.

৭. *H. E. The Governor's Speech* at Rangamati, 1956.

৮. *H. E. The Governor's Speech* at Kaptai, 1956.

৯. Facts About KPM

১০. Kaptai Hydel Dam Displaced Peoples' Welfare Association. *America Owes 60 Million Dollars to the People of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (Rangamati, 1992)

খ) প্রকাশিত সরকারি দলিল

১১. *Selections from the Records of the Bengal Government, N-XI.* Report on the Forays of the wild Tribes of Chittagong Frontier 1847.

১২. Government of Bengal. Judicial Department. *Proceedings No. 451-53*. July 1861. Proceedings No. 339-40. Aug. 1861.

১৩. Government of Bengal. Judl. Department. *Proceedings No.226-27,* July 1862.

১৪. Government of Bengal. Judl. Department. *Proceedings No. 76-78,* July 1863.

১৫. Government of Bengal. *Selections from the Correspondence on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1887).

১৬. Government of Bengal. *Selections from the Correspondence on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts 1862-1929* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1929).

১৭. Government of Bengal. Bengal Revenue Department, *Chittagong Hill Tracts Manual with the Survey and Settlement Report,* (Calcutta: Bengal Government Press, 1927)

১৮. Government of Bengal. *Final Report on the Settlement Survey Operations undertaken in the CHT between 1909-1926, (1927)*

১৯. Government of Bengal. *Bengal District Gazetteer. B Volume. Chittagong Hill Tracts Statistics, 1901-1911.* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1912).

২০. Government of Bengal. *Bengal District Gazetteer. B Volume. Chittagong Hill Tracts Statistics, 1921-1931.* Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot. 1933.

২১. Government of Bengal. Appointments Dept. Reforms. *The Bengal Electoral Orders and Rules* published by the Superintendent, Government Printing, Bengal (Alipore: Bengal Government Press, 1936. (Fifth Schedule)

২২. Government of East Pakistan. Board of Revenue, *Report on the Administration of the Chittagong Hill Tracts for the year 1949-50* (Dacca: East Pakistan Government Press, 1959).

২৩. Government of East Pakistan. Board of Revenue, *Report on the Administration of the Chittagong Hill Tracts for the year 1950-51* (Dacca: East Pakistan Government Press, 1959).

২৪. Government of East Pakistan. Board of Revenue, *Report on the Administration of the Chittagong Hill Tracts for the year 1951-52* (Dacca: East Pakistan Government Press, 1959).

২৫. Government of East Pakistan. Board of Revenue, *Report on the Administration of the Chittagong Hill Tracts for the year 1953-54* (Dacca: East Pakistan Government Press, 1959).

২৬. Government of East Pakistan, Basic Democracies & Local Government Department, Section IV, *Important Circulars, Instructions, Manuals and Type. Plan of Works Programme issued from 25th September 1962 to 31st December 1967. (Dacca:* East Pakistan Govt. Press, 1968).

২৭. Government of Pakistan, Planning Board. *Report of West Pakistan Economists Conference on the First Five Year Plan of Pakistan, November 1956*. (Lahore: Superintendent of Govt. Printing, West Pakistan, 1958).

২৮. Forestal Forestry and Engineering International Limited, Vancouver, Canada. *Chittagong Hill Tracts Soil and Land Use Survey Report, 1964-66,* 9-Vols.

২৯. Government of Bangladesh. *A Report on the Problems of the Chittagong Hill Tracts and Bangladesh Responses for their Solution.* (Dhaka: Special Affairs Division, Prime Minister's Office, 1993).

৩০. Avtar Singh Bhasin (ed.), *India Bangladesh Relations Documents–1971-2002*. Vol. V (New Delhi: Geetika Publishers, 2003).

৩১. Return of Election, Election to the Provincial Assembly of East Pakistan, Returning Officer, Chittagong Hill Tracts, 24.12.70

৩১. Rangamati Hill District Council, *Rangamati Hill District Council in Brief* (Rangamati: RHDC, 2005)

৩২. পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা, রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচনের রিটার্ণ, ৩০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম-২, তারিখ ১২/৩/৭৩ ইং

৩৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত লিখিত ভাষণ, খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

গ) প্রকাশিত সরকারি দলিলঃ সেন্সাস রিপোর্ট, গেজেটিয়ার, রেগুলেশন, আইন,

১. Census of Bengal, 1872. (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872).

২. Census of Bengal, 1881. Part II

৩. Census of Bengal, 1891. Vol. III, IV, V

৪. Census of India, 1901. Vol. VI B. Part III

৫. Census of India, 1911.Vol. V. Part II.

৬. Census of India, 1921. Vol. V. Part I.

৭. Census of India, 1931a. Vol. V. Part II.

৮. Census of Pakistan, 1951, Population According to Religion (Table 6), Census Bulletin no. 2 October 1951.

৯.Census of Pakistan, 1961. *Chittagong Hill Tracts. District Census Report*, Karachi.1964.

১০. Hutchison, R. H. Sneyd, *Chittagong Hill Tracts*, District Gazetteer, Calcutta, 1909, Reprint, Vivek Publishing Company, Delhi, 1978.

১১. Government of Bengal, *Chittagong Hill Tracts Regulation,* 1900. Alipore.

১২. O' Malley, L. S. S. *Eastern Bengal District Gazetteers: Chittagong* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1908).

১৩. Government of India Act, 1919, 1935- (sixth Schedule)

১৪. Ishaq, Mohammad, *Bangladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts,* (Dacca: Bangladesh Govt. Press, 1975).

১৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *বাংলাদেশ আদম শুমারী ২০০১, কমিউনিটি সিরিজ*, জেলাঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ঢাকা, ২০০৫।

১৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, *পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন সংহিতা* (রাঙ্গামাটিঃ ২০১০)

১৪. রায়, ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ, ও চাকমা, এ্যাডভোকেট প্রতিকার (সম্পা.), *পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০* (ঢাকাঃ এএলআরডি, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ২০১৪)

ঘ) প্রকাশিত সরকারি দলিলঃ নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট

১. Bangladesh Election Commission, *Report on the First General Election to Parliament in Bangladesh 1973,* 22nd June 1973.

২. Bangladesh Election Commission, *Report on the Parliamentary Election,* February 18, 1979.

৩. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা, *নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন,* ১৯৯১, ২৭ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭

৪. Bangladesh Election Commission, Statistical *Report 7th Jatiya Shangshad Election, June 12, 1996.*

ঙ) ইংরেজিতে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Ahmad, Z. A. *Excluded Areas under the New Constitution*. (Allahabad 1937).

২. Acemoglu Daron, and Robinson, James. *Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity and Poverty* (USA, Turkey: Crown Business, 2012).

৩. Adnan, Swapan. *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict*: *Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh* (Dhaka: Research & Advisory Service, 2004).

৪. Ahmed, Maudud. *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman* (Dhaka: University Press, 4th Imp.1991).

৫. Ali, Murtaza. *History of Chittagong* (Dacca: Standard Publishers Ltd. 1964).

৬. Ali, S Mahmud. *The Fearful State: Power, People and Internal War in South Asia* (London & New Jersey: Zed Books, 1993).

৭. Ali, Syed Murtaza. *The Hitch in the Hills: CHT Diary* (Chittagong: Pub. by Dil Monowara Begum, 1996).

৮. Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1991).

৯. Belal, Khaled. (ed.), *The Chittagong Hill Tracts: Falconry in the Hills* (Chittagong: Published by writer, 1992).

১০. Bessaignet, Pierre. *Tribesmen of Chittagong Hill Tracts* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1958).

১১. Bandyopadyay, Sekhar, Abhijit Dasgupta, Willem Van Schendel. *Bengal: Communities, Development and States*, (Dhaka: University Press Ltd, 1995).

১২. Barua, B. P. *Ethnicity and National Integration in Bangladesh. A Study of the Chittagong Hill Tracts* (New Delhi: Har-Anand Publications Pvt. Ltd., 2001).

১৩. Bhaumik, Subir, *Insurgent Crossfire North-East India* (New Delhi: Lancer Publishers Pvt. Ltd., 1996).

১৪. Bhaumik, Subir, Meghna Guhathakurta and Sabyasachi Basu Ray Chaudhury (eds.) *Living on the Edge: Essays on the Chittagong Hill Tracts* (Calcutta: South Asia Forum for the Human Rights/ Calcutta Research Group, 1997).

১৫. Bodley, John H. *Victim of Progress* (Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Fift edition, 2008).

১৬. Chowdhury, Bikach Kumar. *Genesis of Chakma Movement (1772-1989): Historic Background* (Tripura: Tripura Darpan Prokashani, 1991).

১৭. Chakma, Sharadindu Shekhar. *The Untold Story* (Dhaka: Jatiya Grantha Prakashan, 2003).

১৮. Chakma, D. K. (ed.), *The Partition and the Chakmas and other writings of Sneha Kumar Chakma* (India: Pothi. Com, 2013).

১৯. Chakma Harikishore, Chakma Tapas, Dewan Preyasi, Mahfuz Ullah, *Bara Parang: The Tale of the Developmental Refugees of the Chittagong Hill Tracts* (Dhaka: Centre for Sustainable Development, 1995).

২০. Choudhury, G. W. *Constitutional Development in Pakistan* (London: Longman, 2nd Imp. 1969).

২১. Cotton, H. J. S. *Memorandum on the Revenue History of Chittagong* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1880).

২২. Chatterji, Joya. *Bengal divided: Hindu communalism and partition, 1932-1947* (New Delhi: Cambridge University Press, 1996).

২৩. Ericson, F. David. ed., *The Politics of Inclusion and Exclusion: Identity Politics in the Twenty-first Century America* (New York: Routledge, 2011).

২৪. Gain, Philip. (ed.), *The Chittagong Hill Tracts: Man-Nature Nexus Torn* (Dhaka: Society of Environmental and Human Development, 2013).

২৫. Grimwood, B. *Reports on Agriculture/Horticulture Sector* (May, 1976).

২৬. Guldi, Jo and Armitage, David, *The History Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).

২৭. Harvey, G. E. *History of Burma* (London: Longman, Green & Co., 1925).

২৮. Hasan, Masud-Ul. *Law and Principles of Basic Democracies* (Lahore: Pakistan Social Service Foundation, 1960).

২৯. Hossain, Kamal. *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice* (Dhaka: University Press Ltd., 3rd Imp. 2016).

৩০. Hashmi, Taj ul-Islam, *Peasant Utopia: The Communalization of Class Politics in East Bengal, 1920-1947* (Dhaka: The University Press Ltd, 1994).

৩১. Hutchinson, R. H. Sneyd. *An Account of Chittagong Hill Tracts* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1906).

৩২. Hodson, H. V. *The Great Divide: Britain-India-Pakistan* (Karachi: Oxford University Press, 1985).

৩৩. Husain, Syed Anwar, *War and Peace in the Chittagong Hill Tracts: Retrospect and Prospect* (Dhaka: Agamee Prakashani, 1999)

৩৪. Hunter, W. W. *A statistical Account of Bengal*. Vol. VI., Trubner & Co., London, 1876, (Delhi: Reprinted by D. K. Publishing House, 1973).

৩৫. Huq, Muhammad Mufazzalul. *Government Institutions and Underdevelopment: A Study of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (Dhaka: Centre for Social Studies, 2000).

৩৬. Huque, Mahmudul. *War and Peace in South Asia: American Policy in Historical Perspective* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2014).

৩৭. Huque, Mahmudul. *From Autonomy to Independence, The United States, Pakistan and Emergence of Bangladesh* (New Delhi: Vikash Publishing House, 2014).

৩৮. Jahan, Rounaq. *Pakistan: Failure in National Integration* (Dhaka: University Press Ltd., 2nd Imp., 2001)

৩৯. Karim, Sayyid A. *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy* (Dhaka: The University Press Ltd., 2005).

৪০. Keith, Arthur. B. *A Constitutional History of India* (Lahore: Lawyers home, Abridged edtion, 1965 1st pub in 1936)

৪১. Khisha, Mukur K. *All That Glisters* (London: Menerva Press, 1996).

৪২. ________, *Time and Again*, (New Delhi: Macmillan, 2004).

৪৩. Lewin, Capt. Thomas Herbert. *The Hill Tracts of Chittagong and Dwellers Therein with Comparative Vocabularies of the Hill Dialects* (Calcutta: Bengal Printing Company Ltd., 1869).

৪৪. --------------, *Wild Races of South-Eastern India*, London, W H Allen & Co., 1870, (Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd., Rpnt., 1978).

৪৫. --------------, *A Fly on the Wheel or How I Helped to Govern India* (London: Constable & Company Ltd., 1912).

৪৬. Loffler, Lorenz G. *Basic Democracies in den Chittagong Hill Tracts,* Ost Pakistan, 1967.

৪৭. Mackenzie, Alexander. *History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of North-East Frontier of Bengal* (Calcutta: The Home Department Press, 1884).

৪৮. Majumdar, Chandrika Basu. *Genesis of Chakma Movement in Chittagong Hill Tracts* (Kolkata: Progressive Publishers, 2003).

৪৯. Mohsin, Amena. *The Politics of Nationalism: The case of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh,* 2nd edition, (Dhaka: The University Press Ltd, 2002).

৫০. Mohsin, Amena and Hossain Delwar, *Conflict and Partition: Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (New Delhi: Sage Publications, 2015).

৫১. Meron, Stanley. (ed.) *Pakistan Society and Culture*. New Haven, 1957.

৫২. Mensergh, Nicholas, and Moon Penderel (ed.), *The Transfer of Power 1942-47,* vols XII, (London: Her Majesty's Stationary Office, 1983)

৫৩. Mey, Wolfgang (ed.), *Genocide in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh,* IWGIA Doc. No. 51 (Cophenhegen, IWGIA, 1984).

৫৪. -------, *J. P. Mills and Chittagong Hill Tracts*, Annotated and Commented Edition, 2009.

৫৫. Mukherji, Saradindu. *Subjects, Citizens and Refugees: Tragedy in the Chittagong Hill Tracts (1947-1998)* (New Delhi: Indian Centre for the Study of Forced Migration, 2000).

৫৬. Papanek, Gustav F. *Pakistan's Development: Social Goals and Private Incentives* (Pakistan: Oxford University Press, 1968).

৫৭. Powell, Baden Henry. *The Land System of British India* (Delhi: Low Price Publications, Rpnt, 1990, 1892)

৫৮. Qanungo, Suniti Bhushan. *Chakma Resistance to British Domination 1772-1798,* (Chittagong, Published by Author, 1998).

৫৯. Raha, M. K. and Khan, I A. *Polity, Political Process and Social Control in South Asia: The Tribal and Rural Perspectives* (New Delhi: Gyan Publishing House, 1993).

৬০. Rahim, Enayetur. *Proncial Autonomy in Bengal (1937-1943)* (Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1981)

৬১. Rajput, A. B. *The Tribes of Chittagong Hill Tracts* (Karachi: Pakistan Publications, 1965).

৬২. Risley, H. H. *The Tribes and Caste in Bengal: Ethnographic Glossary,* Vol.1 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1892).

৬৩. Roy, Raja Bhuvan Mohan, *History of the Chakma Raj Family* (Rangamati, 1919).

৬৪. Roy, Rajkumari Chandra. *Land Rights of the Indigenous Peoples of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.* (Copenhagen: IWGIA, 2000).

৬৫. Roy, Devasish. *Background Study on the Chittagong Hill Tracts Land Situation,* (Rangamati : CARE-Bangladesh, 2004).

৬৬. Shahed, Kalam, *Ethnic Movements and Hegemony in South Asia* (Dhaka: Hakkani Publishers, 2000).

৬৭. Serajuddin, Alamgir Muhammad. *The Revenue Administration of East India Company in Chittagong 1761-1785* (Chittagong: University of Chittagong, 1971).

৬৮. Schendel, W. van (ed.) *Francis Buchanan in Southeast Bengal in 1798* (Dhaka: University Press Ltd., 1992)

৬৯. Schendel, Willem Van, Mey Wolfgang and Dewan, Aditya Kumar. *The Chittagong Hill Tracts: Living in Borderland* (Dhaka: The University Press Ltd., 2001).

৭০. Shelley, Mizanur Rahman (ed.), *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untold Story* (Dhaka: CDRB, 1992).

৭১. ---------, *Emergence of a New Nation In a Multi-Polar World: Bangladesh* (Dhaka: Academic Press and Publishers Ltd., 2000).

৭২. Sobhan, Rehman, *Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan* (Dhaka: Oxford University Press, 1968).

৭৩. Stephen, R. Lewis Jr. *Pakistan: Industrialization and Trade Policies* (London: Oxford University Press, 1970).

৭৪. Talukdar, S. P., *The Chakmas: Life and Struggle* (Delhi: Gyan Publishing House, 1988).

৭৫. ----------, *Chakmas: An Embattled Tribe* (New Delhi: Uppal Publishing House 1994).

৭৬. Ziring, Lawrence. *Bangladesh From Mujib to Ershad: An Interpretive Study* (Dhaka: University Press Ltd., Repnt. 1994, 1st published 1992.)

চ) ইংরেজিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বইয়ের অধ্যায়

১. Ahmad, Nafis and Rizvi, A. I. H. ``Need for the Development of Chittagong Hill Tracts,'' *Pakistan Geographical Review*, Lahore, 6.2 (1951).

২. Ahmad, Nafis. ``The Pattern of Rural Settlement in East Pakistan,'' in *Geographical Review*, New York, 46.3 (1956).

৩. Ahmed, Kazi S. ``Hydro-electric Develpment in Pakistan" *Pakistan Geographical Review*, 11.2(1956).

৪. Ahmed, Jamil-ud-Din.``Pakistan: Concept and Practice" in *Pakistan Observer*: *An Observer Supplement*, Octber 27, 1967.

৫. Rizvi, A. I. H. æAgricultural Problems of the Chittagong Hill Tracts,'' *Pakistan Business New Views* 1.3 (1952).

৬. Ahmed, Aftab.``Ethnicity and Insurgency in the Chittagong Hill Tracts Region: A Study of the Crisis of Political Integration in Bangladesh'', in *Journal of the Commonwealth & Comparative Politics*, London, 31:3 (1993)

৭. Ahsan, S. A., and Chakma, Bhumitra.``Problems of National Integration in Bangladesh: The Chittagong Hill Tracts,'' *Asian Survey*, 29:10 (1989).

৮. Balan, Sergiu. ``M. Foucault's View on Power Relations in *Cogito.* Multidisciplinary Research Journal, Bucharest, 2.2(2010).

৯. Bernot, Lucien.``Ethnic Groups of Chittagong Hill Tracts'' in Pierre Bessaignet, (ed.), *Social Research in East Pakistan*, 2nd edition, (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1964).

১০. Bertocci, Peter, J.``Resource Development and Ethnic Conflict'' in M. S. Qureshi (ed.), *Tribal Cultures in Bangladesh* (Rajshahi: IBS, 1984).

১১. Bhaumik, Subir, ``Strategic Pawn: Indian Policy in the Chittagong Hill Tracts in Subir Bhaumik et at (eds.) *Living on Edge: Essays on the Chittagong Hill Tracts* (Calcutta: South Asia Forum for Human Rights, 1997)

১২. Chakraborty, Ratan Lal.``Chakma Resistance to Early British Rule'' in *Bangladesh Historical Studies*, Vol. 2, Dhaka, 1977.

১৩. Chowdhury, Hasanuzzaman, ``Politics and the Tribal Question: a review of the developments in the Chittagong Hill Tracts,'' in Manis Kumar Raha and Iar Ali Khan (eds.), *Polity, Political Process and Social Control in South Asia: The Tribal and Rural perspectives*. (New Delhi: Gyan Publishing House, 1993).

১৪. Dewan, Aditya Kumar. ``The Indigenous people of the Chittagong Hill Tracts: Restructuring of Political System'' in Manis Kumar Raha and Iar Ali Khan (eds.), *Polity, Political Process and Social Control in South Asia*, (New Delhi: Gyan Publishing House, 1993).

১৫. Dar, Ahmed, Farooq. ``Boundary Commission Award: The Muslim League Response” in *Pakistan Journal of History and Culture*, 33.1(2010).

১৬. Husain, Hyder. ``Chittagong Hill Tracts: Land People and Its Problem.’’ in *Pakistan Today*, Dacca 6.5(1953).

১৭. Kaufmann, ``Observations on the Agriculture of the Chittagong Hill Tribes’’ in John, E. Owen, (ed.), *Sociology in East Pakistan*, (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1962).

১৮. Khan, Niaz Ahmed. ``A Prove into the Historical Trends in Forest Resource Use in Bangladesh with Special Reference to Chittagong: The British Period (1757-1947)’’ in *Itihas Patrika*, (University of Chittagong: Dept. of History, 2005).

১৯. Loffler, Lorenz G.``A note on the history of the Marma Chiefs of Banderban’’ *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, 13:2 (1968).

২০. Mey, Wolfgang.``Political System in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh: A Case Study’’ in Chritoph Von Furer Haimendrof (ed.), *Asian Highland Socities, In Antropological Perspective*, (New Delhi: Sterling Publishers Pvt Ltd., 1981, First Reprint, 1984).

২১. Mey, Almut.``Modernisation in the Chittagong Hill Tracts/ Bangladesh: A Case Study’’ in Christoph Von Furer Haimendrof (ed.), *Asian Highland Socities, In Antropological Perspective*, (New Delhi: Sterling Publishers Pvt Ltd, 1981 Reprint, 1984).

২২. Phayre, Arthur. ‘‘Account of Arakan,’’ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 3.117 (1841).

২৩. Roy, Raja Devashish. ``The System of Traditional Administration in the Chittagong Hill Tracts’’ in *Chakma Rajpunyah 2003*, (Rangamati, 2009).

২৪. Serajuddin, Alamgir Muhammad. ``The Origin of the Rajas of the Chittagong Hill tracts and their Relations with the East India Company in the Eighteenth century,’’ in *Journal of Pakistan Historical Society*, January, 1971.

২৫. -------------,``The Chakma Tribes of the Chittagong Hill tracts in the 18th century’’, *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 1(June 1984)

২৬. Schendel W. van. ``The Invention of the Jummas’: State Formation and Ethnicity in Southeastern Bangladesh, in S. Bandyo Padhyay et al., (eds.) *Bengal: Communities, Development and States* (Dhaka: University Press Ltd, 1995).

২৭. Zaman, M. Q. ``Crisis in Chittagong Hill Tracts: Ethnicity and Integration.’’ *Economic and Political Weekly*, January 16, 1982.

২৮. Sopher, David, E.``Population Dislocation in the Chittagong Hills’’ *American Geographical Review*, 3 (1963)

২৯. --------. , ‘‘Swidden/Wet Rice Transition Zone in the Chittagong Hills.’’ *Annals of Association of American Geographers,* (Kansas. 1964)

৩০. Montu, Kazi. ``Life in the Hill Tracts,’’ *Holiday,* July, 6, 1980.

৩১. Uttaran, Sree. ``A Genesis of the Movement for Self-Determination of the Jumma People of Chittagong Hill Tracts and Its Future,’’ in *10 e November ’83 Smarane,* 1985.

৩২. Montu Kazi. ``Tribal Insurgency in Chittagong Hill Tracts,’’ *Economic and Political Weekly,* September 6, 1980.

৩৩. Kamaluddin, S.``A Tangled Web of Insurgency,’’ *Far Eastern Economic Review,* May, 23-29. 1980.

৩৪. Schendel, Willem van. `Bengalis, Bangladeshis and Others: Chakma Visions of A Pluralist Bangladesh’ in Rounaq Jahan edited, *Bangladesh: Promise and Performance* (Dhaka: The University Press Ltd., 2nd Imp. 2002).

৩৫. Chaudhury, Sabyasachi Basu Ray, and Biswas, Ashis K. ``A Diaspora is Made: The Jummas in the North-East India” in Subir Bhaumik et al, (ed.) *Living on the Edge: Essays on the Chittagong Hill Tracts* (Calcutta: SAFHR, Katmandu, 1997)

ছ) সমীক্ষা, গবেষণা, তদন্ত রিপোর্ট

১. Chowdhury, R. I., M. Mizanur Rahman Miah, Musharraf Hussain, A. F. Hassan, and Golam Quddus, *The Tribal Leadership and Political Integration: A Study of Chakma and Mong Tribes in Chittagong Hill Tracts,* (Chittagong: University of Chittagong. 1979).

২. Anti-Slavery Society, *The Chittagong Hill Tracts,* Indigenous Peoples and Development Series, Report no.2, London, 1984.

৩. Amnesty International, Bangladesh: *Unlawful Killings and Torture in the Chittagong Hill Tracts, London,* 1986.

৪. Chittagong Hill Tracts Commission, *Life is Not Ours: Land and Human Rights in CHT,* Bangladesh. May 1991.

৫. Rashiduzzaman, Dr. Mohammad and Chowdhury, Dr. Mahfuzul Hoque, *Building Peace in Bangladesh’s Chittagong Hill Tracts (CHT): An Assessment of the 1997 Peace Accord*. Glassboro, April 2008.

৬. Jaenicke, Hannah. *Lines in the Sand: Deconstructing the Construction of the Indo-Pakistan Border,* A Project of Haverford College, 23rd April, 20 https:/scholarship.tricolib.brynm... Last access date: 30.3.2018

জ) বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী ও স্মারক গ্রন্থ/স্মরণিকা

১. আনিসুজ্জামান, *বিপুলা পৃথিবী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ১ম প্রকাশ ২০১৫, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০১৭)

২. আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম, *ভারত স্বাধীন হল* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রা. লি. ২০০৪, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯)

৩. চাকমা, শরদিন্দু শেখর, *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন* প্রথম খণ্ড (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০২)

৪. চাকমা, স্নেহ কুমার, *জীবনালেখ্য: জীবন, সংগ্রাম ও সংঘাতময় দিনগুলির কথা* (রাঙ্গামাটি: মিসেস অনামিকা চাকমা প্রকাশিত, ২০১১)

৫. চৌধুরী, ফারুক, *জীবনের বালুকাবেলায়* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, ৫ম মুদ্রণ ২০১৭)

৬. দেওয়ান, কামিনী মোহন, *পার্বত্য চট্টলের এক দ্বীন সেবকের জীবন কাহিনী* (রাঙামাটি: সরোজ আর্ট প্রেস, ১৯৭০)

৭. দেওয়ান, ড. মানিক লাল, *আমি ও আমার পৃথিবী* (রাঙামাটি: দীপিকা দেওয়ান প্রকাশিত, ২০১৩)

৮. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, প্রথম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা *প্রার্থীত প্রহর* ১৯৯০ ইং।

৯. বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, প্রথম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা *শান্তির অন্বেষায়* ১৯৯০ ইং।

১০. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, *অন্বেষা: স্মরণিকা ১৯৯০* রাঙ্গামাটি, ১৯৯০।

১১. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, *পদক্ষেপ: পঞ্চবর্ষপূর্তি স্মরণিকা* ১৯৯৪।

১২. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একদশক পূর্তি *স্মরণিকা: এক দশক*, রাঙ্গামাটি, ২০১০।

১৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২*

১৪. জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল (জাক), *জাক'র ২৫ বর্ষ পূর্তি সংকলন ২০০৫* (রাঙ্গামাটি: জাক, ২০০৫)

১৫. Roy Raja Tridiv, *The Departed Melody* (Islamabad: PPA Publications, 2003).

১৬. Anisuzzaman, *Cultural Pluralism* Indira Gandhi Memorial Lecture 1991 (Kolkata: The Asiatic Society, 2nd Reprnt. 2016. 1st Pubished in 1993).

ঝ) অপ্রকাশিত এমফিল, পিএইচডি থিসিস

১. আহমেদ, মেসবাহ উদ্দিন, 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম,' পিএইচডি থিসিস, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস বিভাগ, জুন ২০১৫)

২. ঘোষ, স্নেহাশীষ, 'বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদ, বিশেষভাবে উল্লেখ্য চাকমা প্রসঙ্গ' (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ১৯৯৬)

৩. ভুঁইয়া, মো. আব্দুল লতিফ, 'পূর্ব বাংলার সরকার ও রাজনীতি: ১৯৪৭-১৯৫৪,' পিএইচডি থিসিস (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: আইবিএস, ২০১২)

৪. ফায়েক উজ্জমান, মো., 'মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,' পিএইচডি অভিসন্দর্ভ (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়, ২০০৪)

৫. Dewan, Aditya Kumar. 'Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh' (McGill University, Montreal: Department of Anthropology, 1990).

৬. Akanda: Safar A. 'East Pakistan and Politics of Regionalism.'(University of Denver: The Faculty of the Graduate School of International Studies, 1970).

৭. Titan Chakma, 'A Study on the Tribal Buddhists in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh' an unpublished PhD Thesis (Delhi: University of Delhi, 2005)

৮. Hossain, Ashfaque. 'Historical Globalization and Its Effects: A Study of Sylhet and Its People, 1874-1971,' PhD Thesis, University of Nottingham, 2009.

ঞ) বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জি

১. আইয়ুব, সালাহউদ্দীন (অনু.), *দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮* (ঢাকা: আইসিবিএস-৫, ১৯৯৪)

২. আজাদ, হুমায়ুন, *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝর্ণাধরা* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭)

৩. আহমেদ, এ. এফ সালাহউদ্দীন, *ইতিহাস, ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩)

৪. আহসান, সৈয়দ আলী, (অনু.), *প্রভু নয় বন্ধু* (ঢাকা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮)

৫. আলী, এস ওয়াজেদ, *ভবিষ্যতের বাঙালি* আবুল মোমেন (সম্পা), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৬)

৬. আলম, মাহবুব-উল, *চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল)* (চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৬৫)।

৭. আরেফিন, এ এস এম সামসুল, সংকলন ও সম্পাদনা, *বাংলাদেশের নির্বাচন (১৯৭০-২০০১)* (ঢাকা: বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩)

৮. ইমাম, এইচ টি, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪)

৯. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০)

১০. ইবরাহিম, মে. জে. সৈয়দ মুহাম্মদ, *পার্বত্য চট্টগ্রাম : শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন* (ঢাকা ও মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ. ২০০৪)

১১. কামাল, আহমেদ, *কালের কল্লোল: ইতিহাস, উন্নয়ন ও রাজনীতি* (ঢাকা: সংহতি, ২০০৮)

১২. খান, হাফিজ রশিদ, *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীঃ অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত* (বান্দরবান: প্রকাশক চিংসাপ্রু কেসি, ১৯৯৩)

১৩. খান, জাফর আহমদ (সম্পা.), *রাঙ্গামাটি: বৈচিত্রের ঐক্যতান* (রাঙ্গামাটি: জেলা প্রশাসন, ২০০৪)

১৪. খান, এম এ বাশার ও এ আর হাওলাদার (সম্পা.), *পার্বত্য শান্তিচুক্তি: সংবিধান, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্টে স্টাডিজ ফোরাম, ১৯৯৮)

১৫. খান, আবদুল মাবুদ, *বান্দরবান জেলার মারমা সম্প্রদায়* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭)

১৬. খীসা, প্রদীপ্ত, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ,১৯৯৬)

১৭. ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি. ৪র্থ মুদ্রণ ২০০০; ১ম সং ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)

১৮. ঘোষ, সতীশ চন্দ্র, *চাকমা জাতি: জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশন, ২০১০)

১৯. চন্দ্র, বিপন, *আধুনিক ভারত* ভাষান্তর- গোপাল সেনগুপ্ত, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯)

২০. চাকমা, চারু বিকাশ, *আমার ইস্তেহার* (রাঙ্গামাটী: সরোজ আর্ট প্রেস, ১৯৭০)

২১. চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ* (রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩)

২২. চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ (অনু.) *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও লুসাই পাহাড়* (রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬)

২৩. চাকমা, হিরহিত, (অনু.) *চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও তার অধিবাসীবৃন্দ* (রাঙামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬)

২৪. চাকমা, বিপ্লব, *পার্বত্য চট্টগাম ; স্বায়ত্তশাসনের ও স্বাধীকারের সন্ধানে* (ঢাকা: পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৭)

২৫. চাকমা, শরদিন্দু শেখর, *পার্বত্য চট্টগ্রামের একাল সেকাল* (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০২)

২৬. চাকমা, শরদিন্দু শেখর, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম* (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬)

২৭. চাকমা, কুমুদ বিকাশ, *শিক্ষাঙ্গনে চাকমা জাতির অগ্রগতি* (১৮৬২-২০০০) (রাঙ্গামাটি: দ্রোপদ চাকমা ও রিপা চাকমা প্রকাশিত, ২০০২)

২৮. চাকমা, মঙ্গল কুমার (সম্পা.), *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: জীবন ও সংগ্রাম* (রাঙ্গামাটি: এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, ২০০৯)

২৯. চাকমা, মৃত্তিকা (সম্পা.), *ডা: ভগদত্ত খীসা রচনা স্মারক* (রাঙ্গামাটি: ডা: পরশ খীসা প্রকাশিত, ২০১২)

৩০. চ্যাটার্জী, জয়া, *বাঙলা ভাগ হল* (অনু:) আবু জাফর, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি,২০০৩)

৩১. চৌধুরী, আবদুল গাফ্ফার, *আমরা বাংলাদেশী, না বাঙালি?* (ঢাকা: অক্ষরবৃত্ত, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৫)

৩২. ছফা, আহমদ, *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত প্রবন্ধ* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১২, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮)

৩৩. ত্রিপুরা, প্রশান্ত ও হারুন, অবন্তী, *পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ* (ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ২০০৩)

৩৪. ত্রিপুরা, নব বিক্রম কিশোর, (সম্পা.), *পার্বত্য চট্টগ্রাম: বন-পাহাড়ের সাত-সতের* (ঢাকা: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১৪।

৩৫. দত্ত, দেবযানী ও চৌধুরী, অনুসূয়া বসু রায়, *পার্বত্য চট্টগ্রাম: সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম* (কলকাতা: সাউথ এশিয়া ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস, ১৯৯৬)

৩৬. দেওয়ান, অশোক কুমার, *চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার* (খাগড়াছড়ি: ১৯৯১)

৩৭. দেওয়ান, বিরাজ মোহন, *চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত* (রাঙ্গামাটি: উদয় শংকর দেওয়ান প্রকাশিত, ২০০৫)

৩৮. দেওয়ান, ডাঃ এ কে, *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু* (রাঙ্গামাটি: লেখক ২০১২)

৩৯. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ (অনু.), *সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি. ষোড়শ মুদ্রণ, ২০১১)

৪০. মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয়, *ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান: প্রস্তুতি ও পরিণতি, ১৯৪৫-১৯৪৭* (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ২০১২, ১ম প্রকাশ,২০০২)

৪১. মে, ভল্ফগাং, *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম সমাজ: একটি আর্থ-সামাজিক ইতিহাস* (অনু:), স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী), ফার্মা কেএলএম প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৯৬.

৪২. মৈত্র, মিহির, *শেখ মুজিবের বাংলাদেশ: প্রত্যক্ষদর্শীর ডায়েরি থেকে ১৯৭২-১৯৭৬* (কলকাতা: রচয়িতা, ২০১৫)

৪৩. লারমা, চিত্ত কিশোর, *চাকমা জাতির জীবন স্মৃতি* (কলকাতা: জুম্ম প্রকাশনী, ১৯৯৯)

৪৪. লেনিন, নূহ-উল-আলম (সম্পা.), *জুম পাহাড়ে শান্তির ঝর্ণাধারা: ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি* (ঢাকা: গণপ্রকাশন, ১৯৯৮)

৪৫. বাহাদুর, মৌলভী হামিদুল্লাহ খান, *আহাদিসুল খাওয়ানিন: চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস* (অনু.) খালেদ মাসুকে রসুল, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩)

৪৬. বুলবুল, আজাদ, *স্বপ্নভ্রষ্টা কাপ্তাই বাঁধ* (ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স , ২০০৮)

৪৭. বড়ুয়া, বিপ্রদাস (সম্পা.), মাধব চন্দ্র চাকমা কর্ম্মীর, *শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫)

৪৮. মনির, খায়রুল হক (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর ষোলোটি ভাষণ* (ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০১৮)

৪৯. মামুন, মুনতাসীর ও রায়, জয়ন্ত কুমার, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৯০* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৪)

৫০. মিয়া, এম এ ওয়াজেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইউ পি এল, ১৯৯২)

৫১. মাসকারেনহাস, এ্যান্থনী, *বাংলাদেশ রক্তের ঋণ* মোহাম্মদ শাহজাহান (অনু.), (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১৪ প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮)

৫২. মুখোপাধ্যায়, হরিদাস ও উমা, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪)

৫৩. মুহাম্মদ, আনু, *রাষ্ট্র ও রাজনীতি : বাংলাদেশের দুই দশক* (ঢাকা: সন্দেশ, ২০১৬)

৫৪. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬)

৫৫. রহমান, শেখ মুজিবুর, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০১২)

৫৬. রহমান, মাহবুবুর (সম্পা.), *বিংশ শতকে বাংলা* সেমিনার খণ্ড(রাজশাহী: আইবিএস, ২০১০)

৫৭. ---------, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৫, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯)

৫৮. হুমায়ুন, রফিকুজ্জামান, (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং সংগ্রামী জীবন* (ঢাকা: সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১১)

৫৯. রায়, প্রতিম, *পার্বত্য আইন : তত্ত্বে ও প্রয়োগে* (রাঙ্গামাটি: রাঙ্গামাটি প্রকাশনী, ২০০১)

৬০. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯)

৬১. রায়, রাজা দেবাশীষ, *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি এবং পার্বত্যবাসীর অধিকার ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: মালেইয়া ফাউন্ডেশন, ২০১৬)

৬২. রায়, ত্রিদিব, "পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী ভাই-বোনদের প্রতি বিনীত আবেদন" শীর্ষক নির্বাচনী ইস্তেহার (রাঙ্গামাটী: সরোজ আর্ট প্রেস, ১৯৭০)

৬৩. রীয়াজ, আলী, *শেখ মুজি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: আনন্দধারা, ১৯৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক লাপিয়ের, *ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট* (অনু) রবিশেখর সেনগুপ্ত, (কলকাতাঃ এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. পরি, সং.২০০৫, ১ম সং ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ)

৬৫. সামাদ, সৈয়দ আব্দুস, *যখন দুঃসময়, সুসময়* (ঢাকা: আনিকা জাঈদা খানম প্রকাশিত, ২০০৬)

৬৬. সামাদ, সালিম, (সম্পা.), *পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম-১* (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৮)

৬৭. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭* (কলকাতাঃ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০১৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩)

৬৮. হাসান, মোরশেদ শফিউল, *আহমদ ছফা নির্বাচিত প্রবন্ধ* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ৫ম মুদ্রণ, ২০১৫ ১ম প্রকাশ ২০০২)

৬৯. হোসেন, পারভেজ (সম্পা.), *মিশেল ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা* (ঢাকা: সংবেদ, ২০০৭)

৭০. হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার ও সেলিম, মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি ও ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫)

৭১. হোসেন, সেলিনা, *পার্বত্যভূমির পথে প্রান্তরে* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ১ম সং ২০১৪, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯)

৭২. হোসেন, আশফাক, *মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের জন্ম ও জাতিসংঘ* (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০১২ ১ম প্রকাশ বাংলা একাডেমি ২০০২)

৭৩. সিংহ, যশোবন্ত, *জিন্না: ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ২০০৯)

৭৪. সুর, ড. অতুল, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন* (কলকাতাঃ সাহিত্যলোক, ২য় সং, ১৯৯৪; ১ম প্রকাশ ১৯৮৬)

৭৫. সেন্দেল, ভেলাম ভান ও বল, এলেন, (সম্পা.), *বাংলার বহুজাতি; বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ* (কলকাতা: আইবিএস, ১৯৯৮)

ট) বাংলায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বইয়ের অধ্যায়

১. আহমেদ, কামাউদ্দিন, ' 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচন: স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ' সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩)

২. আকাশ, এম এম, 'ক্ষমতা প্রশ্ন ও মিশেল ফুকোর মতামত' নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), মিশেল ফুকো: ইতিহাস-তত্ত্ব-দর্শন (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২য় মুদ্রণ ২০১৪)

৫. আহসান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আলী, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা" এম এ বাশার খান ও এ আর হাওলাদার (সম্পা.) *পার্বত্য শান্তি চুক্তি: সংবিধান, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডিজ ফোরাম, ১৯৯৮)

৬. কবির, শাহরিয়ার, ''শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম" *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭।

৭. কামাল, আহমেদ, 'স্বাধীনতার সময়ে পূর্ব বাংলা' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০)

৮. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিতঃ গ্রামশি ও মিশেল ফুকো' পারভেজ হোসেন (সম্পা.), *মিশেল ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা* (ঢাকা: সংবেদ, ২০০৭)

৯. চাকমা, ভুমিত্র ''পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত জাতীয়তাবাদ," *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৪৯, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।

১০. চৌধুরী, ফারুক, "শুল্ক পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ: বাংলার অশান্ত অগ্নিকোণ (২)" *ভোরের কাগজ*, মার্চ, ৯, ১৯৯৭।

১১. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, "রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির অগ্রপশ্চাৎ" স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, *প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০১৭।

১২. জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ও খালেদা জিয়া" *দৈনিক জনকণ্ঠ* ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭।

১৩. ত্রিপুরা, যতীন্দ্র লাল, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা: একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা' আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া (সম্পা.) *প্রার্থীত প্রহর: বর্ষপূর্তি উদযাপন স্মরণিকা, ৯০* (খাগড়াছড়ি : স্থানীয় সরকার পরিষদ, পার্বত্য খাগড়াছড়ি, ১৯৯০)

১৪. নেভী, মংক্য শোয়েনু, "পুণ্যলোকের যাত্রী" রেপ্রুচাই (সম্পা.) *মো লাং নীং* (ঢাকা: বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল, ২০১২)

১৫. বর্মন, ডালেম চন্দ্র, 'স্থানীয় সরকার' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০)

১৬. বোস, এন. কে., ট্রাইবাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া, উদ্ধৃত- 'ভারতের উপজাতির সংজ্ঞা এবং কিছু সমস্যা' সেন্দেল, ভেলাম ভান ও বল, এলেন, বাংলার বহুজাতি; বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ (কলকাতা: আইবিএস, ১৯৯৮)

১৭. ভট্টাচার্য, পঙ্কজ, "জুন্ম জাতির মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা" দীপায়ন খীসা (সম্পা.) *মাওরুম:* মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিশেষ সংখ্যা (ঢাকা: সৌম্য প্রকাশনী, ২০০৯)

১৮. মুৎসুদ্দী, চিন্ময়, "পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন" *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৩ বর্ষ ২ সংখ্যা ২৫ মে ১৯৮৪।

১৯. হোসেন, শওকত আরা, ''পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি সমস্যা ও বাংলাদেশ সরকার'' *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট পত্রিকা* অষ্টম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯০।

২০. হোসেন, শওকত আরা, "শান্তির প্রত্যাশায়" *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭।

২১. হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, "শান্তি অশান্তির দোলাচলে পার্বত্য চট্টগ্রাম" *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৯০)

২২. রায়, কুমার কোকনদাক্ষ, "বিপুল সুদূর" *গৈরিকা*, ৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৫১

২৩. রশিদ, হারুন-অর, 'বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা ১৯৩৭-১৯৪৭' সিরাজুল (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০)

ঠ) চাকমা ভাষায় প্রকাশিত কাব্য

১. চাঙমা, মুকুন্দ, *হিলট্রেকসর দুগ সুগ* [পার্বত্য অঞ্চলের সুখ-দুঃখ] (খাগড়াছড়ি: জ্ঞানের আলো চাঙমা, ২০১২)

ড) সাময়িক পত্রিকা/ সংবাদপত্র

১. *গৈরিকা*, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১৯৩৬-৫১।

২. *সাপ্তাহিক সত্যবার্তা*

৩. *সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য*

৪. *কোহিনূর*

৫. *পার্বত্য বাণী*

৬. *ঝরণা*

৭. *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা* (প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা সম্মিলিত) উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৫

৮. *গিরি নির্ঝর, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৯৮৪*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

৯. *ঐ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭*

১০. *ষষ্ঠ সংখ্যা,১৯৮৮*

১১. *৭ম সংখ্যা, ১৯৮৯*

১২. ৮ম সংখ্যা, ১৯৯০

১৩. *দৈনিক পূর্বদেশ*

১৪. *দৈনিক বাংলা*

১৫. *দৈনিক আজাদী*

১৬. *দৈনিক প্রথম আলো*

১৭. *দৈনিক জনকণ্ঠ*

১৮. *ভোরের কাগজ*

১৯. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*

২০. *সাপ্তাহিক রোববার*

২১. *সাপ্তাহিক বনভূমি*

২২. *সংহতি*

২৩. *জুন্ম সংবাদ বুলেটিন।*

২৪. *জুম*

২৫. *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*

২৬. *পার্বত্য পূরাণ*

ঢ) ইংরেজি জার্নাল/ পত্রিকা/ সাময়িকী

Journal of The Asiatic Society of Bengal

The Asiatic Society, Kolkata.

Asian Survey

Journal of Asiatic Society of Pakistan

Journal of Pakistan Historical Society

Journal of Asiatic Society of Bangladesh

Journal of History Association

Itias Patrika

Paksitan Geographical Review

Middle East Journal

Cogito

Far Eastern Economic Review

Economic and Political Weekly

Morning News

Pakistan Observer

Pakistan Quarterly

Statesman

Sunday Times

The Daily Star

Weekly Holiday

Electronic-Resources:

http://www.bl.uk.reshelp/findhelpregion/asia/india/indianindependence/map2index.html

Chatta, Ilyas Ahmed. 'Partition and Its aftermath: Violence, Migration and the Role of Refugees in the Socio-economic Development of Gujranwala and Sialkot cities, 1947-1961.' PhD Thesis, Centre for Imperial and Post Colonial Studies, University of Southampton, 2009. http: // eprints.soton.ac.uk. Access: 27-09-2015.